বাংলার ছোটগল্প

বাংলার ছোটগল্প

অষ্টম খণ্ড

সম্পাদনা

ড. বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ

৯এ নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা ৭০০ ০০৯

BANGLAR CHHOTO GALPA
Collection of Bengali Short Stories
8th Volume
Edited by
Dr. Bijit Ghosh

Price Rs 100/-

প্রচ্ছদ ঃ সুনীল শীল

ISBN 81-7332-380-6

দাম ঃ ১০০ টাকা

পুনশ্চ, ১১৪ এন ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০০১০ থেকে সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস ১১৪ এন ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত।

'সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি,
দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভ'রে।

তবু তুমি সেই তো আমার তুমি—
আবার তোমায় চিনব নূতন ক'রে।।'

প্রিয় বন্ধু
নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়-কে

প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা ঃ অষ্টম খণ্ড

অষ্টম খণ্ডটি দীপঙ্কর দাসের গল্প দিয়ে শুরু করে শেষ হয়েছে কুণালকিশোর ঘোষের গল্পে এসে। এই খণ্ডে নির্বাচিত গল্পের সংখ্যা ৩৮। সময়-সীমা ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৪।

এখানেও নির্বাচিত লেখকদের একটি করে অসামান্য গল্পের বাইরেও তাঁদের আরো-একাধিক অনবদ্য গল্পের কথা উল্লেখের দাবি রাখে। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে শচীন দাশের 'বর্ণপরিচয়', 'চোখ', 'অলীক চতুর্ভুজ', 'শকুন', 'পরমেশ ব্যানার্জীর জীবনের শেষ দিন', 'বন্ধু বিপ্লব', 'বনবিবির বাওয়ালি'; সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'চোখ', 'রক্তের স্বভাব', 'ইচ্ছের গাছ', 'অনুভব' নামের গল্পগুলির কথা।

জয়া মিত্রের 'স্বজন বিজন', 'ঘৃণার সমস্যা'; সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের 'বাদ্যকর', 'বিষহর', 'যে দেশেতে রজনী নাই'; রাধানাথ মণ্ডলের 'যন্ত্রত্রয়', 'আটঘরার মহিম হালদার' 'অমিতাভ' সিরিজের গল্পগুলি; অমর মিত্রের 'ডাইন', 'দানপত্র', 'প্রত্নতত্ত্ব', 'আগুনের দিন', 'চাঁদ ও শশকের পৃথিবী', 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ', 'মেলার দিকে ঘর', 'দৈব কেরামতি', 'ভাবুক', 'চরণ', 'দেবী ভাসান', 'নিবারণের কথা নেই', 'রাজকাহিনী', — এই প্রতিটি গল্পই অনন্য-সাধারণ নির্মাণ।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর', 'পুরোহিত দর্পণ', 'ভূমিসূত্র', 'রক্ত', 'ভর', 'রত্নাকরের পাপের ভাগ', 'মেয়ে মানুষ অথবা কলাগাছ', 'সর্ষে ছোলা ময়দা আটা' তো অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

মানব চক্রবর্তীর 'ওয়াভারের মৃত্যু', 'বোয়াল', 'চতুর্বেদ', 'বালাবাহমনি'; বীরেন শাসমলের 'বর্ণপরিচয়', 'পান পাতা মুখ', 'বর্ণবিদ্বেষ', 'নদেবাবুর প্রজাগমন' ; নলিনী বেরার 'বাবার স্মৃতি', 'পুষ্করা'; আবুল বাশারের 'নিশিকাজল', 'মাঠচরাণী মেয়ে', 'সীমার', 'ভোর পোয়াতির তারা' গল্পগুলির কথা ভোলার নয়।

সুদর্শন সেনশর্মার 'ভালোবাসার ডালপালা', 'গঞ্জের ধর্মাধর্ম'; কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ললিত সাঁতরার সম্পত্তি লুঠ', 'অনশন'; শ্যামল মজুমদারের 'প্রাকটিস চলছে', 'আকাশের যুবরাজ', 'নিজের কাছে'; সনৎ বসুর 'লক্ষ্মীর অমৃত কথা', 'আবহমানের ছবি'; সুতপন চট্টোপাধ্যায়ের 'ক্ষতমুখ', 'তিসির মাঠসন্ধ্যা', 'সুখ-অসুখ' গল্পগুলির কথা মনে পড়ছে।

কিন্নর রায়ের 'রথযাত্রা', 'পরচারক', 'ভোজ', 'আলি আসগর, জয়ন্তী অথবা ধর্মনিরপেক্ষতার গল্প'; অশোককুমার কুণ্ডুর 'গাঁওভাটি'; কুণালকিশোর ঘোষের 'সেই সুধারস' ইত্যাদি অ-সাধারণ গল্পগুলির কথা মনে থাকবে অনেকদিন।

পুনশ্চ ঃ বিশেষ উৎসাহী/আগ্রহী সহৃদয় পাঠকদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি কথা। দশ খণ্ডের 'বাংলার ছোটগল্প' গ্রন্থের **কেবলমাত্র প্রথম খণ্ডেই রয়েছে বাইশ পৃষ্ঠার একটি তথ্যসমৃদ্ধ দীর্ঘ ভূমিকা।** সেখানে আছে বাংলা **গদ্যের সূচনা, গদ্যগ্রন্থ, গদ্য-সাহিত্য, আদি-গল্প, গল্প; ছোটগল্পের আবির্ভাব** ঃ তার **জন্ম ও উৎস** সন্ধান, **সংজ্ঞা** ইত্যাদি বিষয়ের উপর দীর্ঘ আলোচনা। আছে অসংখ্য ছোটগল্প সৃষ্টির অনিবার্য প্রেরণা হিসেবে অপরিহার্য পটভূমি সমূহের (ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতি, নানা ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন,

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সংঘাত-সংঘর্ষ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের নানাবিধ সমস্যা, সংকট ইত্যাদি) তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে বিস্তৃত বিশ্লেষণ।

বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামন্বন্তরে ভেঙে পড়া বাংলার সমাজ-অর্থনীতি; **দেশভাগ, খণ্ডিত-স্বাধীনতা-প্রাপ্তি, উদ্বাস্তু স্রোত**; সেই মহা-প্রলয়ের সময়ের জীবন্ত ছবিও (এক-একটি কালজয়ী গল্পের সঙ্গে যে পটভূমির অঙ্গাঙ্গী যোগ) প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আগস্ট অন্দোলন, ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা তথা '**গ্রেট ক্যালক্যাটা কিলিং**' আর ঠিক তার পরই **তেভাগা আন্দোলন**; পরবর্তীকালে '**নকশাল আন্দোলন**', '**জরুরী অবস্থা**', বার বার বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উত্থান, — এ-সব কিছুই বাংলার গল্পকে দিয়েছে নতুন প্রাণ। তারও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সেখানে করেছি আমি।

আবার বিভিন্ন সাহিত্য-আন্দোলন ('**কল্লোল**', '**শ্রুতি**', '**হাংরি জেনারেশন**', '**শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলন,**' '**এই দশক**', '**নিম সাহিত্য-আন্দোলন**', '**নতুন রীতির গল্প আন্দোলন**' ইত্যাদি); লেখক-পাঠক-সম্পাদক-প্রকাশকের ছোটগল্প ব্যাপারে দায়িত্বহীনতা ও দায়িত্বের কথা; সর্বোপরি পাঠকের কাছে সে-কাল ও এ-কালের ছোটগল্পের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের সম্ভাব্য কারণগুলিও বিশ্লেষিত হয়েছে সেই ভূমিকায়।

তাই, উৎসুক শ্রদ্ধেয় পাঠক সেটি একবার দেখে/পড়ে নিলে সম্পাদকের শ্রমের ভার কিছুটা লাঘব হবে।

(ড. বিজিত ঘোষ)

সূচীপত্র

দাঙ্গার দিকে

দীপঙ্কর দাস

— অ গোবিন্দ, বাড়ি আছিস নাকি রে?

রাতের বাসি অন্ধকার ফিকে হয়ে এলেও এখনো সূর্য ওঠেনি। পাখপাখালি সবে ডাকছে। সিসার বাষ্পর মতো রঙ ছড়িয়ে আছে চারপাশে। অঘ্রানের শেষ, শীত পুরোপুরি আসার কথা নয়। তবে করিমগঞ্জের ভূগোলটাই এমন যে এখানে এর মধ্যেই শীতের রাজ্যপাট খানিকটা বিছিয়ে গেছে। রাতের বেলায় যে শিরশিরে উত্তুরে বাতাস বয়ে আসে করিমগঞ্জের দিকে সেই বাতাসের রেশ ভোর সকালেও রয়ে যায়। শিশিরে ভেজা থাকে ঘাস পাতা। নিসিন্দা আকন্দ কদম কলা গাছের পাতার গা চুঁইয়ে শিশির ঝরে পড়ে টুপটাপ।

— আরে অ্যাই গোবিন্দ, ঘুম ভাঙে নাই নাকি! আবার হাঁক ছাড়ল জয়নাল। জয়নালের গায়ে হাতাওয়ালা কটস্‌উলের গেঞ্জি। ঠিক কবে কোন হাট থেকে শীতবস্ত্র হিসেবে গেঞ্জিটাকে কত টাকার বিনিময়ে কিনেছিল— মনে নেই জয়নালের। তবে শখের এই শীতবস্ত্রটির বয়স যে নেই নেই করে আট-দশ বছর হয়ে গেছে, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই জয়নালের। শীতের শুরুতে গায়ে ওঠে গেঞ্জিটা। শরীর থেকে নামতে নামতে মাঘ পেরিয়ে ফাল্গুন। বয়সের চিহ্নও একেবারে অপ্রত্যক্ষ নয় গেঞ্জির শরীরে। দুই চার জায়গায় ফেঁসে যাওয়ার কারণে মোটা সুতির কাপড়ের তাপ্পি দিয়েছে হালিমা। হালিমার সেলাই-এর হাত এক সময় ভালই ছিল। বিয়ে-সাদির পর জয়নাল একবার পরিকল্পনা করেছিল হালিমাকে করিমগঞ্জের নতুন বাজারের কোনো দর্জির দোকানে লাগিয়ে দেবে। দৈনিক আয় খুব খারাপ হবে না। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পায়নি। হালিমার হাতে সেলাই মেশিন ওঠার বদলে উঠেছে লোহার গামলা, ওলোনদড়ি, কর্ণি। অর্থাৎ হালিমা জয়নালের জোগাড়ে হয়েছে। তাও মন্দ কী। এই মাগ্গি-গন্ডার বাজারে সব কিছুর দর হু হু করে বেড়েছে। ঠিক সেই হারে মানবশ্রমের মূল্য না বাড়লেও, একটু বেড়েছে। জোগাড়ের দৈনিক মজুরি এখন তিরিশ টাকা। সদরে সেই দর চল্লিশ।

অন্যদিন জয়নালের হাতে থাকে যন্ত্রপাতি। আজ কেবল আড়বাঁশের লাঠি। ভাবটা এমন যেন কোনো যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়েছে জয়নাল। তার প্রথম কাজ করিমগঞ্জের কামিন পাড়ার সব রাজমিস্ত্রিদের সকাল সকাল জাগিয়ে দেওয়া। আসন্ন যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দেওয়া।

মাটির ওপর হাতের লাঠিটাকে জোরে ঠুকল জয়নাল। হয়তো মাটির ঠিক নিচে কোন পাথরখণ্ড লুকিয়ে ছিল। ফলে তার গায়ে লাঠির আঘাত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ বাজল— ঠঙ। শব্দটা যেন জয়নালের ভেতর আত্মবিশ্বাসকে আরো একটু উসকে দিল। আবার গলা চড়িয়ে হাঁক দিল জয়নাল— বিবির তাপ পরে নিও গোবিন্দ। এইবার চলো।

— আইতাসি মিঁয়া। চেঁচাইও না। ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিল গোবিন্দ। রসিকতা করে বলল, আইজ কি ভাবী তোমার বিছানায় জল ঢাইলা দিসে। তুমি তাপ লও নাই।

— হ্ হ্। ব্যাজাল পারিস না। এইবারে বাইরে আয়। জয়নাল মাথা নাড়ল। মুখটাকে টেরচা করে তাকাল গোবিন্দর পেছনে উঁকি দেওয়া গোবিন্দর পরিবার সুবুচুনির দিকে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসির গমক সামাল দিচ্ছে গোবিন্দর পরিবার। গাটা অকারণে জ্বলে উঠল জয়নালের। —বলি ঘরের পোলাপানের প্যাটে ভাত নাই। সর্বক্ষণ খিদার আগুন জ্বলে। সেই জ্বালায় অস্থির। এরপর আবার বিবির তাপ!

দাওয়া ছাড়িয়ে বাঁশঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল গোবিন্দ। গোবিন্দের কোমরে লুঙ্গি। গায়ে হাতকাটা টেরিকটের বড় বড় চেকের জামা। রঙ জ্বলে গেছে। বহু ব্যবহারে কাঁধের কাছে পুট ফেঁসে গেছে। সেখান দিয়ে গোবিন্দর ডান কাঁধের মাংস চোখে পড়ছে। কাঁধের ফাঁসটা দিনদিন বেড়েই চলেছে। হুঁস নেই সেদিকে। গোবিন্দর পরিবার কী এমন রাজকর্ম করে যে ওটুকু জায়গা সেলাই করে দিতে পারে না? সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়ে দাঁড়িয়ে গেছে। এটুকু কি বোঝে না সুবুচুনি?

কথাটা বলেছিল বসির মিঁয়া। পরপর সাতদিন নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকতে থাকতে যখন হাত পায়ে বাত ধরার দশা, তখনই করিমগঞ্জের নতুন হাটের বুড়ো বটতলার নিচে বসে কথাটা বলেছিল বসির। — শোন গো, বাংলায় প্রবচন আছে, সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়। অর্থাৎ কিনা সময় থাকতে থাকতে ব্যবস্থা না নিলে অসময়ে সেই সমস্যা দশগুণ বেড়ে হাতের বাইরে চলি যায়। এখন বুঝো তোমরা। সময় থাকতি থাকতি ব্যবস্থা নিবে, নাকি এই ভাবে হাত পা গুটাইয়ে বইসে থাকবা!

বোঝার কী আছে! এ তো আর ইস্কুল কলেজের জটিল কোনো অঙ্ক নয় যে মাথা ঘামিয়ে বুঝতে হবে। এ তো একেবার সাদাসাপটা পেট-ভাতের সমস্যা। একটা দিন কর্মহীন কাটলেই ঘরের বাচ্চা-কাচ্চার মুখে ভাতের জোগান দেওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। সেখানে এক নাগাড়ে সাতদিন, একসপ্তাহ উপার্জনহীন দিন চলে গেল। কাজ জোটেনি কপালে। পেটের ভেতর দাবানল। সমস্যার মূলটাকে ঘটা করে শনাক্ত করতে হয় না। আপনিই চিনিয়ে দেয়।

করিমগঞ্জ নামক জনপদে কয়েক বছর ধরে বাড়বাড়ন্তর ঢেউ আছড়ে পড়েছে। পররাষ্ট্রের সীমানা যেহেতু ঢিল ছোড়ার দূরত্বে, এবং সেই সীমান্ত যথেষ্ট সংরক্ষিত নয়, তাই 'চোরা কারবারিদের' প্রধান ফটক এই করিমগঞ্জ। তার ফলে মাত্র বছর কুড়ি আগে যে করিমগঞ্জ দেশের আর দশটা গ্রামের সঙ্গেই তুল্য ছিল, সেই করিমগঞ্জ এখন বর্ধিষ্ণু শহর। স্থানীয় মানুষের হাতেও যেমন টাকা এসেছে তেমনি টাকাওয়ালা বহু ধনী ব্যক্তিরাও করিমগঞ্জে স্থায়ী বাসভূমি গড়ে তুলেছে। জনপদের সম্প্রসারণ যেন থামতেই চায় না। ফলে আর দশটা শ্রমসাধ্য বৃত্তির মতো রাজমিস্ত্রি জোগাড়েদেরও কর্মসংস্থান প্রসারিত হয়েছে অনেকখানি। এর ওপর করিমগঞ্জের পশ্চিম প্রান্তে রামনগর অঞ্চল পঞ্চায়েতের ভেতর তৈরি হচ্ছে একের পর এক ফুড কর্পোরেশনের গোডাউন। আর উত্তরপূর্ব প্রান্তে প্রবাহিত জলঙ্গী নদীর দুই পাড় ধরে নির্মিত হচ্ছে বাঁধ এবং স্লুইস। ব্যক্তিগত কাজের সঙ্গে সরকারি উদ্যোগ যুক্ত হয়ে আরো বিস্তৃত হয়েছে মিস্ত্রি জোগাড়েদের উপার্জনের উৎস। ফলে যে করিমগঞ্জে একজন দক্ষ রাজমিস্ত্রির কপালে দৈনিক পঁচিশ-তিরিশ টাকার বিনিময়ে কাজ জোটা ছিল রীতিমতো অনিশ্চিত, সেই করিমগঞ্জে এখন রাজমিস্ত্রিদের দৈনিক মজুরি পঞ্চাশ। এবং জোগাড়ের রোজ তিরিশ। আর যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজমিস্ত্রি এবং জোগাড়ে একই পরিবারভুক্ত, তাই দিনান্তে ঘর পিছু আশি টাকা উপার্জন একেবারে নিশ্চিত, আর এই সুবাদে করিমগঞ্জের আশপাশ এলাকার গাঁগঞ্জে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রাজমিস্ত্রি জোগাড়েদের বসতির গায়ে নতুন প্রাণের রঙ পড়তে শুরু করেছিল।

কিন্তু সেই রঙে হঠাৎ করে ভুষোকালির প্রলেপ পড়তে শুরু করেছে।

সমস্যাটা আগেও ছিল। করিমগঞ্জের চারপাশের—হাতালপাড়া, চাষাপাড়া, হাঁসমারি, কৃষ্ণগঞ্জ, জংলাপুর নামক এলাকার রাজমিস্ত্রিরা রোজ ভোর সকালে একে একে এসে জড়ো হয় করিমগঞ্জের নতুনহাটের বটতলার নিচে। এই বটতলা থেকেই ঠিকাদারের লোক থেকে শুরু করে গৃহস্থ— মিস্ত্রি-মজুর সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। এই প্রথা আজকের নয়। তিন পুরুষ ধরেই চলে আসছে এই পদ্ধতি।

এই জটলার মধ্যে প্রায় প্রতিদিনই একটা দুটো করে নতুন মুখের আমদানি ঘটেছিল। এবং বসির, গোবিন্দ, জয়নাল, জয়দেব, হালিমা, বাসন্তীদের অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়েও যাচ্ছিল নতুন মুখগুলি। নতুন মুখগুলির পুরুষ-নারী— সকলের ত্রস্ত ইতিউতি চাউনি বলে দিত — এরা 'বর্ডার ক্রশ' করা অনুপ্রবেশকারী। স্থানীয় ভাষায় ওপারের মানুষ। এরাও গোবিন্দ, জয়নাল, বসির, জয়দেবের সঙ্গে মিস্ত্রির কাজের সন্ধানে এসে দাঁড়াত বটতলায়।

তখন তেমন গা করত না বসিররা। কাজ তো কম নেই। চারদিকে কাজের জোয়ার বইছে। নিজেদের ভাগের কাজের পরেও যে পরিমাণ কাজের অংশ পড়ে থাকত তার সীমাও কম ছিল না। তাই সীমানা অতিক্রম করে আসা 'ওপারের মানুষগুলি'র শঙ্কিত এবং সঙ্কুচিত অবস্থান দেখে একরকম মজা পেত। সেই সঙ্গে কৌতূহলও জাগত 'ওপারের মানুষগুলি'র প্রতি।

— ঘর কোথায় গো মিঁয়া! বিড়ি ধরিয়ে গত রাতের ঘুমের আলস্য ছাড়াতে ছাড়াতে জিজ্ঞেস করে বসির।

সহজে কি সত্যি কথাটা বের করা যেত ওপারের সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষগুলির মুখ থেকে! একে তো বে-আইনি অনুপ্রবেশ। বর্ডারের দুই পক্ষের আড়কাঠিদের পাওনা মিটিয়ে ওপার থেকে এপারে আসা। হাতে না আছে পাশপোর্ট, না আছে ভিসা। এমনকি দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের কেনো সুপারিশও নেই। থাকার মধ্যে আছে তো কেবল পেটভর্তি ক্ষিদে আর দুই চোখ ভর্তি আশঙ্কা। তাই একটু সাবধানী হতেই হতো।

কোনোরকমে জড়ানো গলায় নিকটবর্তী কোনো গাঁয়ের নাম বলত ওপারের মেয়ে-পুরুষগুলি— আড়ংঘাটা। আড়ংঘাটায় ঘর আমাগো।

— ক্যান্ মিথ্যা কথা কও মিঁয়া! জয়দেব বিড়ির ধোঁয়া গিলে সেই ধোঁয়া নাক দিয়ে ছাড়তে ছাড়তে বলত—মুখ দেইখাই মালুম হয় ওপারের মানুষ। বর্ডার ক্রশ কইরা আসা হইসে।

এর পর আর আড়াল করার কিছুই ছিল না। একে তো নতুন ভূমি; মানুষজনও নতুন। পায়ের তলায় দাঁড়ানোর মতো একখণ্ড মাটি পর্যন্ত নিশ্চিত নয়। ফলে আত্মসমর্পণ করত মানুষগুলো— তা বটে। ঐ পার থিকা আইসি। কুষ্টিয়া জেলা, চটকাতলি গাঁ। বর্ডারের লাগোয়া। দ্যাশে কাম কাজ নেই। অথচ ভাত কাপড়ের দাম আকাশ ছুঁইসে। আর ছুঁইবো না ক্যান? দ্যাশ তো এখন দুই বেগমের কাজিয়া লইয়াই ব্যস্ত। তাই চইলা আইসি। এখন আপনারা যদি দয়া করেন!

হাঁ হাঁ করে উঠত জয়নাল— ঐ কথা কও ক্যানে মিঁয়া। খোদার দুনিয়া। খোদার সন্তান সব। হাত আছে, পা আছে— নাইড়া ভাতের ব্যবস্থা করবা, সেইখানে আমাগোর দয়ার কথা আসে ক্যামনে। লাগো, লাগো, কামে লাইগা যাও!

এক সঙ্গে দল বেঁধে ফুড কর্পোরেশনের গো-ডাউনের কন্ট্রাক্ট পাওয়া ঠিকাদারের লোকের সঙ্গে কাজে লেগে যেত সবাই।

সে এক অভিজ্ঞতা। ওপারের মানুষগুলির কাজকর্মের ছিরি দেখে হেসে পেটে খিল ধরার উপক্রম হতো জয়নালের, গোবিন্দর।

— ও মিঁয়া, বলি কয়পুরুষ ধইরা রাজমিস্ত্রির কাম কর? জয়নাল হাসির কুলকুচি সেরে জিজ্ঞেস করত।

— ক্যান্, ভুল হইতাসে নাকি? ওপারের মানুষগুলির মুখচোখে অনিশ্চয়তা ফুটে উঠত।

—না, ভুল হইব ক্যান্। গোবিন্দ আরো এক ধাপ এগিয়ে যেত। বলত—ইটের গাঁথুনি তুলতাসো নাকি উঠানে গোবর ল্যাপতাসো? দেইখা তো মনে হয় জীবনে কর্ণি হাতে লও নাই। আর বিবিজানগো কই, ঐ ভাবে সিমেন্ট-বালির মশলা মাখে না। এ যেন পিঠা-পাটিসাপটার জন্য চালগুড়া আর গুড় মিশানো হইতাসে। বলতে বলতে গোবিন্দ গামলা থেকে সিমেন্ট-বালির মিশ্রণ থেকে কর্ণির ওপর কিছুটা মশলা নিয়ে বলত, দ্যাখো মিঁয়া, ভাল কইরা চাইয়া দ্যাখো। এই ভাবে ইটের উপর মশলা লাগাইতে হয়। বলে গোবিন্দ কর্ণি ধরা ডানহাতটাকে কব্জির কাছে অদ্ভুত এক মোচড় দিত। তারপর কর্ণির টানে ইটের ওপর সমান করে ছড়িয়ে দিত মশলাটা। দুই ইটের ফাঁকে মশলার প্রলেপের স্তর একেবারে সমান। উনিশ-বিশটুকুও ঘটে না। এ যেন নিছকই ইটের গাঁথুনি তোলা নয়। কোনো দক্ষ সেতার শিল্পীর আঙুলের সাবলীল সঞ্চালন। প্রতিটি আঙুল সেতারের তারে সুশৃঙ্খল ভাবে সুর তুলছে।

দেখত ওপারের মানুষগুলি। তাদের চোখ দুটো আগ্রাসী খিদে নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত কর্ণির সঞ্চালন। দেখত বাঁ হাতে গোটা ইট নিয়ে ডান হাতে বাসুলির নিখুঁত আঘাতে কেমন করে দুখণ্ড হয়ে যায় গোটা ইট। এবং খণ্ড দুটিকে কেমন করে গাঁথুনির প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে হয়।

— বলি,যে পূজার যা মন্ত্র। জয়দেব হাঁটু ভেঙে বসে শ্বাস নিত টেনে টেনে।— যে কাজের যেমন তালিম। তার উপর রাজমিস্ত্রির কাজ। মুখের কথা তো নয়। কথায় বলে মিস্ত্রির যে রাজা, সেই কিনা রাজমিস্ত্রি। তালিম না নিলে এত বড় কাজটা শিখবা ক্যামন কইরা!...একটু থামত জয়দেব। তারপর স্মৃতিচারণের মধ্যে যেত।— হ্যাঁ, মিস্ত্রি ছিল আলাউদ্দিন মিস্ত্রি। ঐ আমাদের আঁদুলি গায়ের লোক। কর্ণির মশলার গায়ে যেন মন্ত্র জড়ানো ছিল। এক ফোঁটা মশলা নিচে পড়ত না। আর ইটের গাঁথুনি? চোখের পলক পড়ার আগেই পাঁচ-সাত ফুট দেওয়াল গাঁথা হয়ে যেত। ওলোনের দরকার পড়ত না এমনই হাতের গুণ ছিল যে ওলোন ছাড়াই দেওয়াল একেবারে সিধা। একচুল এদিকে সেদিকে হেইলা যাইব না। শেষ কথাটা উচ্চারণের সময় জয়দেবের বুক আত্মশ্লাঘায় স্ফীত হয়ে উঠত।

সায় দিত বসির, জয়নাল, গোবিন্দ। বলত—বটেই তো। আলাউদ্দিন মিস্ত্রির কাছে তালিম নিছিলাম বলেই তো আজ পেটের ভাত জোগাড় করতে পারছি।

সেই শুরু। একজন দুজন তিনজন করে 'ওপারের মানুষে'র ভিড় বাড়তে লাগল করিমগঞ্জের নতুনবাজারের বটতলায়। জয়দেব বসির গোবিন্দ জয়নালের ভুরু কুঁচকে গেল।— এযে দেখি শেষ নাই। জয়নালের চাপা গলায় অজানা আশঙ্কা উঁকি দেয়।— অরা যে আসতাসেই। এভাবে ওপারের মানুষের ঢল নামলে আমরা যামু কোথায়?

আশঙ্কা অমূলক ছিল না। দুশ্চিন্তায় কপালে নদীনালা জেগে ওঠার মতো পর্যাপ্ত কারণও ছিল। করিমগঞ্জকে কেন্দ্র করে নির্মাণকাজের পরিধি যতই সম্প্রসারিত হোক না কেন, পরিমাণে এতটা তো নয় যে অকাতরে দানছত্র করা যায়। বহিরাগত মানুষের, বিশেষ করে পররাষ্ট্র থেকে অনুপ্রবেশকারীদের প্রবাহ যদি এভাবে বাড়তে শুরু করে তাহলে যে করিমগঞ্জের মিস্ত্রি-মজুরদের কর্মসংস্থান সঙ্কুচিত হতে হতে একেবারে অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

তবু আশার কথা শুনিয়েছিল বসির।— আমরা হইলাম গিয়া আলাউদ্দিন মিস্ত্রির হাতে গড়া রাজমিস্ত্রি। আর অ'রা আনাড়ি। কোনোকালে কর্ণিই হাতে নেয় নাই। বাবুরা ঠিকই বুঝব আমাগো কামকাজের গুণ। ভিনদেশি আনাড়িগুলিরে ঠিক বাতিল কইরা দিব।

দক্ষতা, কোনো সন্দেহ নেই, গোবিন্দ, জয়নাল, বসিরদের সর্বশেষ এবং একমাত্র পুঁজি। দক্ষতার কারণেই ভিনদেশি অনুপ্রবেশকারীদের অনেকটা পিছনে ফেলে রেখেছিল। অবশেষে সেখানেও হেরে গেল বসির জয়নালরা।

আঘাতটা যে এদিক থেকে আসতে পারে টের পায়নি করিমগঞ্জে বংশানুক্রমে কাজ করে আসা রাজমিস্ত্রি জোগাড়েরা।

অবিশ্বাস্য কম মজুরিতে কাজে লেগে গেল 'বর্ডার ক্রশ' করা মানুষগুলি। যেখানে বসিরদের প্রাপ্য-হার গিয়ে দাঁড়িয়েছিল রাজমিস্ত্রি পিছু দৈনিক পঞ্চাশ টাকা এবং জোগাড়ে পিছু তিরিশ টাকা, সেখানে ভিনদেশিরা পঁচিশ-ত্রিশ টাকা রোজে কাজ শুরু করল।

ঠিকাদারের লোকেরাও সুযোগটাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে শুরু করল। তাদের লোক চাই। সস্তায় শ্রম কিনতে পারলেই তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। মিস্ত্রির গুণাগুণ নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। গুণাগুণ নিয়ে যাতে কোনো প্রশ্ন না ওঠে তার জন্যে তাদের পক্ষে আছেন ইঞ্জিনিয়ারবাবুরা। আর ইঞ্জিনিয়ারবাবুদের কী করে সন্তুষ্ট রাখা যায় সেটুকু জ্ঞানের অভাব নেই ঠিকাদারবাবুদের।

বসির জয়নাল, গোবিন্দ জয়দেবেরা নতুনহাটের বটতলায় উবু হয়ে বসে বসে দেখল কেমন করে তারা নিষ্কর্মা হয়ে যাচ্ছে। দেখল কেমন করে পরিত্যাজ্য হয়ে যাচ্ছে বটতলা। ওপারের মানুষরা জলঙ্গীর পাড় ধরে অস্থায়ী বসতি স্থাপন করে ফেলেছে। জলঙ্গীর উঁচু বাঁধের ওপর দিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে মাথায় ঝুড়ি কোদাল বেলচা কর্ণি বাসুলি নিয়ে ঠিকাদারের লোকের পিছু পিছু কাজে চলে যায় ও-পারের মানুষজন। আর বসির জয়নাল, গোবিন্দ জয়দেবের ফ্যাকাশে দৃষ্টির সামনে সকালের পৃথিবী বয়স্ক হয়। বটগাছের ছায়া ক্রমশ ছোট হতে থাকে। রোদের উত্তাপ বাড়ে। আরো একটি কর্মহীন দিনের যন্ত্রণা নিয়ে ঘরে ফিরে আসে তারা।

— আর তো সয় না ভাই। বটতলার নিচে গুটিয়ে আসা ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলে গোবিন্দ।— ঐ শালা বর্ডার ক্রশ করা ওপারের মানুষগুলো চোখের উপর দিয়া কাজে লাইগা যাইব, আর আমরা বউ বাচ্চা নিয়া খিদায় জলুম, এ তো চলতে দেওয়া যায় না।

— না সইয়া করবিটা কী? জয়নাল মাটিতে ডান হাতের থাবা মারে। ধুলো ওড়ে। গুমরে ওঠে জয়নাল—পারবি অ'গো মতো তিরিশটাকা রোজে কাম হাতে নিতে।

— পঞ্চাশ থেকে তিরিশ। আমাগো মজুরি এত নিচে নামাইল কারা? হিসহিস করে সাড়া দেয় জয়দেব।

— কারা নামাইসে বুঝো নাই! বসিরের চোখ দুটো দব করে জ্বলে ওঠে।

— তাইলে? কে যেন আকাশের দিকে মুখ করে প্রশ্নটা ছুড়ে দিল।

— তাইলে কী? কার কণ্ঠস্বর বাতাসে ভর দিয়ে মিলিয়ে গেল।

— সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়। দমচাপা গলায় বলল বসির। ঘরে বিবিবাচ্চা মরব অনাহারে, আর আমরা বইসা বইসা আঙ্গুল চুষুম—তা হয় না।

না, হয় না, তবু হয়ে চলছিল। কেবল করিমগঞ্জের আশপাশের এলাকাতেই নয়, সীমান্তবর্তী খানপুর, অন্তস্থলি, সাহারা আমডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে একই ঘটনা ঘটে চলল।

পঞ্চাননতলার মোফিদ কানাই রেজিনা বাতাসীরা সরকার বাড়ির সম্প্রসারিত অংশের কাজে নিযুক্ত রাজমিস্ত্রি জোগাড়েদের সঙ্গে একরকম খণ্ডযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। নিহত হয়নি কেউ, তবে রক্তপাত ঘটল। সরকার বাড়ির যাবতীয় কাজে— সে বৎসারান্তে সংস্কারের কাজই হোক কিংবা নতুন কোনো অংশের নির্মাণের কাজই হোক— সরকারবাড়ির জন্মকাল থেকেই পঞ্চাননতলার মিস্ত্রিরাই করে এসেছে। এবার সরকার বাড়ির বার-মহল নতুন করে সম্প্রসারিত হচ্ছে। নতুন বাড়ির 'নির্মাণ কাজের' ওপর পঞ্চাননতলার মিস্ত্রিদেরই অলিখিত অধিকার জন্মেছিল। কিন্তু কলকাতা ফেরত সরকার বাড়ির মেজোবাবু 'ভিনদেশি' ওপারের মানুষদের' সঙ্গে চুক্তি করে নির্মাণের কাজে নিযুক্ত করে দিলেন।

মোফিদ কানাইরা ব্যাপার-স্যাপার দেখে সরকারবাড়ির মেজোবাবুর কাছে গিয়েছিল মনের ক্ষোভ জানাতে।— এইটা কেমন বিবেচনা হইল বাবু! এই বাড়ির কাজ আমরা তিনপুরুষ ধইরা কইরে আসছি। হঠাৎ করে আমাগো ভাতে মারনের ব্যবস্থা ক্যান করলেন?

মেজোবাবু মোফিদ কানাইদের কথার সরাসরি উত্তর দেননি। ঘুরিয়ে বলেছেন, আচ্ছা মোফিদ, ধর তুমি বাজারে গেছ আলু কিনবে বলে। বাজারে গিয়ে দেখলে রামের আলুর দর পাঁচ টাকা কেজি, আর শ্যামের কাছে তিন টাকা কেজি। তুমি কার কাছ থেকে আলু কিনবে?

ঘুরিয়ে বললেও মোফিদ কানাইরা কলকাতা ফেরত মেজোবাবুর কথার মর্মার্থ বুঝতে পারবে না, তেমন অশিক্ষিত নয় তারা। তাই গলা নামিয়ে বলেছিল,— রামের আলুব গুণ আর শ্যামের আলুর গুণ একবার যাচাই কইরে দেখবেন না বাবু?

হো হো করে হেসে উঠেছিলেন মেজোবাবু। হাসতে হাসতেই বলেছিলেন,— ভারি তো মিস্ত্রির কাজ। তার আবার গুণাগুণ। তোমরা কি নিজেদের শিল্পী-টিল্পী ভাব নাকি যে তোমাদের হাতে যে সুর বাজবে, সেই সুর ওদের হাতে বাজবে না?

বড় তীক্ষ্ণ, আত্মমর্যাদায় আঘাত করার মতো কথা। শিল্পের অতশত জানে না মোফিদ কানাইরা। জানে না হাতের কাজ ঠিক কোন মানে পৌঁছলে সেটি শিল্প হয়। আর ঠিক কোন কোন কাজ শিল্পের বিভাগে পড়ে, কিংবা পড়ে না। তবে এটা দীর্ঘদিনের তালিম এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আজ তারা রাজমিস্ত্রির স্তরে পৌঁছাতে পেরেছে। যখন হাতে কর্ণি নিয়ে বালি সিমেন্টের পাঁচ একের মিশেলের মশলা সহযোগে একটির পব একটি ইঁট গাঁথে তারা, তখন তাদের মনে থাকে না যে, তারা দৈনিক মজুরির চুক্তিতে কোনো ধনী মালিকের গৃহের দেওয়াল গাঁথছে। তখন নিজের কাজে এতটাই মগ্ন হয়ে পড়ে যে, মনে হয় ইঁটের দেওয়াল নয়, হয়তো বা তাদের কোনো সন্তানের শরীরই গড়ে তুলছে।...এই প্রক্রিয়ার নাম কী? শিল্পের গূঢ় কথা তারা ঠিক বোঝে না।

হঠাৎ করে মাথায় রক্ত লাফিয়ে উঠেছিল মোফিদ কানাইদের। সব জ্বালা, সব অপমানের উৎস তো ঐ 'বর্ডার ক্রশ' করে আসা মানুষগুলি। ফলে তাদের ওপর মারমুখী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পঞ্চাননতলার রাজমিস্ত্রি জোগাড়ে, কর্মচ্যুত ঘরামির দল। সরকাব বাড়ির মেজোবাবু তার পারিবারিক বন্দুক থেকে আকাশে গুলি ছুঁড়েছিলেন দাঙ্গা থামাতে। থানায় ডায়েরিও করেছিলেন। তারই জোরে মোফিদ কানাইবা এখন জেলহাজতে।

সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর খবর এল করিমগঞ্জের বাসস্ট্যান্ড থেকে। সেখানে বাসে বাসে ঘুরে যাত্রীদের কাছ থেকে অন্ধ কানা খোঁড়া ভিখারির দল ভিক্ষা চেয়ে আসছে সেই কোন কাল থেকে। তাদের বাজারও নিরাপদ রইল না। অনুপ্রবেশ ঘটল ঝাঁক-ঝাঁক ভিখারির। যারা সকলেই 'বর্ডার ক্রশ' করা। ফলে ভিখারিদের মধ্যে শুরু হলো বচসা।

হাতাহাতি। তারপর এল লাঠি। বাসস্ট্যান্ডের ড্রাইভার হেলপার কন্ডাক্টর হকাররা ঠিক সময় হস্তক্ষেপ না করলে নাকি দু-চারটে লাশ পড়ে যেত সেদিন।

অঘ্রানের হালকা কুয়াশায় পর্দা একটু একটু করে পাতলা হচ্ছে। আকাশে আবির গোলা রঙ। করিমগঞ্জের হাটের পশ্চিম দিকের বটতলায় একে একে এসে জমা হচ্ছে সবাই। বসির এল। এল গোবিন্দ। জয়নাল জয়দেবরাও এল পেছন পেছন।

চাপা উত্তেজনায় হিমজড়ানো সকালেও সকলের শরীরের রক্ত গরম হয়ে আছে। গায়ে শীতবস্ত্রের করুণ স্বল্পতা কিংবা সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি যাবতীয় প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে। পায়ের নিচে শিশির জড়ানো ধুলো। পায়ের ঘর্ষণে সেই আর্দ্র ধুলো শুকিয়ে বাতাসে উড়ে যাচ্ছে; করিমগঞ্জের নতুনবাজারের বটতলায় আজ ভোর সকালে এক অভিনব দৃশ্যের সৃষ্টি হলো।

একটা হেস্তনেস্ত আজই করে ফেলতে হবে। জলঙ্গীর পাড় বরাবর যে ভিনদেশিদের অস্থায়ী বাসভূমি গড়ে উঠেছে, তাকে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলতে হবে। হুকুম জারি করতে হবে—হয় বর্ডার পেরিয়ে নিজের নিজের ভূমিতে ফিরে যাও, না হয় এক মজুরিতে কাজ কর। তখন দেখি মালিকরা কাকে ছেড়ে কাকে কাজে নিয়ে যায়। বেইমানি আর সহ্য করব না।

এত সকালে করিমগঞ্জের নতুনহাটের দোকানপসার খোলে না। ব্যাপারিদেরও আনাগোনা শুরু হয় না। তার ওপর এখন অঘ্রানের শেষ। মাঠ থেকে সবে ধান উঠেছে। গোলাজাত হচ্ছে ধনী চাষীর ঘরে। তারপর ধানঝাড়া, ধানসেদ্ধ— অনেক কাজ। সেসব সারতে সারতে পৌষ এসে জোঁকের মতো হিম কামড় বসিয়ে দেবে করিমগঞ্জের শরীরে। তারপর প্রাণ ফিরবে করিমগঞ্জের নতুনহাটে। বস্তাবন্দি চাল ধান বয়ে নিয়ে আসবে লরি, টেম্পো, চার চাকার ম্যাটাডোর, ভ্যান রিকশা, গরুর গাড়ি। সারাদিন দর হাঁকাহাঁকি। মহাজনদের গুদামে ধানচালের বস্তা নিয়ে আসা, টাকা-পয়সার খসখস ঝনঝন আর মুটে মজুরদের হাঁকাহাঁকি— সব মিলিয়ে নতুন বাজার গমগম করবে। ততদিন একটু মন্দা চলে নতুন বাজারে।

তবু যে দু-চারজন বাজার পাহারাদার জেগে ছিল, তারা দেখছিল বটতলার নিচের ভিড়কে।

—এইবার চলছে। বেলা যায়। উ'শালারা আবার না ফাঁক বুঝে ঠিকাদারের লোকের সঙ্গে কাম কাজে বেরিয়ে যায়।...জটলার মধ্যে থেকে কে যেন হাঁক দিল।

জটলাটা এতক্ষণে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। কোনোরকম জ্যামিতিক আকার নিতে পারছিল না। অথচ আকার নেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। এবার একটার পর একটা জ্যামিতিক আকাব এবং আকৃতি নিতে নিতে এবং পরক্ষণে ভাঙতে ভাঙতে পুনরায় সংগঠিত হতে হতে একটি দীর্ঘ, সরলরেখায় পরিণত হলো। এবং প্রাগৈতিহাসিক কোনো সরীসৃপের মতোই হিসহিস শব্দে শ্বাস ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলল জলঙ্গীর দিকে।

রোদ এখন আংশিক উজ্জ্বল। কুয়াশা এবং ধুলোর মিশ্রণে চারপাশে যে পর্দা তৈরি হয়েছিল, তা অপসৃত। বাতাসেও হিমের দংশনবিষ ঝরে গেছে। ঝলমলিয়ে উঠেছে গাছগাছালির মাথা। তবু প্রকৃতির এমন স্নিগ্ধ দৃশ্যের প্রতি কারুর হুঁশ ছিল না। পেটের আগুন তখন মাথায় চড়ে গেছে। তাদের চোখে-মুখে জেগে উঠেছে আদিম প্রতিহিংসা। শরীরের ভাষায় প্রতিবাদের গর্জন। অঘ্রানের সকালে বনবাদাড়ে যে ভুলো বাতাস বয়, যে দিক-কানা পাখপাখালির ঝাঁক বিচিত্র স্বরে ডাকতে ডাকতে মাঠঘাটের ওপরকার

আকাশে অযথা পাক খায়— এমন সব তুচ্ছ ঘটনাবলী থেকে যেন দীর্ঘ মিছিলের মানুষগুলো সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়ে পড়েছে।

— উ'রা যদি পাল্টা মার দেয়? মিছিলের ভেতর থেকে কার যেন কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

— আমরাও মায়ের দুধ খাইসি। সাড়া দিল কেউ একজন।

— যদি দাঙ্গা বাধে!

— বাধুক।

জলঙ্গী পাড় বরাবর যে অস্থায়ী বাসভূমি জেগে উঠেছে গত কয়েক বছরে, সেই বাসভূমির মানুষও বাতাসে বয়ে আনা সংবাদে তৈরি হয়ে নিয়েছে।— দ্যাখো হে, খুন দিতে তৈরি হও সবাই।... জলঙ্গীর তরঙ্গহীন শীতল জলে আছড়ে পড়ল হুঙ্কার।

তৈরি। দুই পক্ষ তৈরি। মুখোমুখি দুই পক্ষ। মাঝখানে মাত্র এক মাঠ দূরত্ব। অনাবাদী পতিত জমি। আকন্দ, বাবলা, বৈঁচি, নিসিন্দার ঝোপঝাড়ে আকীর্ণ মাঠ।

একটু একটু করে নিকটবর্তী হতে থাকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী দুই গোষ্ঠী। সংক্ষিপ্ত হতে থাকে দুই গোষ্ঠীর মাঝখানের পতিত জমি। অদূরে স্থির হয়ে যায় জলস্রোত। বাতাস অকস্মাৎ গতিহীন হয়ে পড়ে। আকণ্ঠ কৌতূহল নিয়ে ভোর সকালের সূর্য বেশ কয়েকটা লাফ দিয়ে উঠে আসে পুব আকাশে। শেষ অঘ্রানের সকালটা গুমোট তপ্ত হয়ে যায়। সবাই শ্বাসরুদ্ধ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, সব জড়িয়ে আসন্ন এক দাঙ্গার উৎকণ্ঠা!

একপা একপা করে এগুচ্ছে এপারের গোবিন্দ সাহা, জয়নালরা। অন্য দিক থেকে এগিয়ে আসছে হামিদ শেখ, মৃত্যুঞ্জয় বসাকরা। সকলের হাতে উদ্ধত লাঠি। লাঠির গায়ে তেলের মতো জড়িয়ে থাকে শেষ অঘ্রানের কাঁচাহলুদ রোদ। সেই একই রোদ—যে রোদ বর্ডার মানে না। এপার ওপার বলে বিকিরণে পক্ষপাতিত্ব করে না কখনো। দুই পক্ষের নিশ্বাস দ্রুত হয়। শ্বাসপ্রক্রিয়া দ্রুততর হতে থাকে। লম্বা শ্বাস গ্রহণের ফলে দুই পক্ষের বুকের ফুসফুস ভরে ওঠে হেমন্তের নরম বাতাসে। সেই একই বাতাসে— যা সীমানা অতিক্রম করে বয়ে যায়। বয়ে আসে। সঙ্গে করে বয়ে বেড়ায় আত্মীয়তার ঘ্রাণ।

মানবগোষ্ঠী নিজের তাগিদে এঁকে নেয় ভূমির সীমানা। সভ্যতার পরম্পরাতেই বার বার খণ্ডিত হয়েছে ভূমির খণ্ডচিত্র। সভ্যতার অনিবার্য উপসর্গ হয়ে জন্ম নিয়েছে রাষ্ট্র এবং তার সীমা। আবার এই সভ্যতাই প্ররোচিত করেছে রাষ্ট্রসীমা লঙ্ঘনের আগ্রাসী প্রবণতা। তেমন কোনো আক্রোশের তাড়নাতেই যেন এখন গোবিন্দ সাহা, জয়নালদের দুই চোখে আগুন জ্বলছে। প্রতিহিংসার রক্ত দাপাচ্ছে হামিদ শেখ মৃত্যুঞ্জয় বসাকদের মাথায়। তাদের উদ্ধত লাঠি ভাল করেই জানে কোন কৌশলে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে পরস্পরের মাথায় নির্ভুল ভাবে আছড়ে পড়বে। চৌচির করে দেবে মাথার খুলি।

ঠিক সেই সময় দূরে, বাঁধের ওপর নিরাপত্তার বলয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠিকাদাররা তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ বেষ্টিত হয়ে দেখছিল এক অভিনব দৃশ্য। আর গভীর প্রফুল্লতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল তাদের মুখ।— ভিনদেশি বলে বর্ডার ডিঙিয়ে আসা মানুষগুলি যে চিরকাল অনুগত থাকবে, উচ্চহারের মজুরির জন্য দাবি তুলবে না— এমন নিশ্চয়তা কোথায়! তার আগেই মীমাংসাটা হয়ে যাওয়া জরুরি। একটা দাঙ্গা— সামান্য একটা দাঙ্গা— গোটা কয়েক মৃত্যু, কিছু ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, কিছু রক্তস্রোত— কী এমন বিরল ঘটনা?

দাঙ্গায় শাসকরাও খুশি। আর ইতিহাস ঠিকাদারকেও শিক্ষিত করে তোলে।

উনিশ শ' একাত্তর

হুমায়ূন আহমেদ

তারা এসে পড়ল সন্ধ্যার আগে আগে।

বিরাট একটা দল। মার্চ টার্চ কিছু না। এলোমেলোভাবে হেঁটে আসা। সম্ভবত, বহু দূর থেকে আসছে। ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ছে একেক জন। ঘামে মুখ ভেজা। ধূলি ধূসরিত খাকি পোশাক।

গ্রামের লোকজন প্রায় সবাই লুকিয়ে পড়ল। শুধু বদি পাগলা হাসিমুখে এগিয়ে গেল। মহানন্দে চেঁচিয়ে উঠল, বিষয় কি গো?

পুরো দল থমকে দাঁড়াল মুহূর্তে। বদি পাগলার হাতে একটা লাল গামছা। সে গামছা নিশানের মত উড়িয়ে চেঁচাল, কই যান গো আপনেরা? এমন অদ্ভুত ব্যাপার সে আগে কখনো দেখেনি।

মেজর সাহেবের চোখে সানগ্লাস। তিনি সানগ্লাস খুলে ফেলে ইংরেজিতে বললেন, লোকটা কি বলছে? রফিকউদ্দীন সঙ্গে সঙ্গে বলল, লোকটা মনে হচ্ছে পাগল। আমাদের সব গ্রামে একটা করে পাগল থাকে।

তাই নাকি?

জি স্যার।

বুঝলে কি করে এ পাগল?

রফিকউদ্দীন চুপ করে গেল। মেজর সাহেবের খুব পেঁচানো স্বভাব। একটি কথার দশটি অর্থ করেন। বদি পাগলাকে দেখা গেল ছুটতে ছুটতে আসছে। তার মুখ ভর্তি হাসি। রফিক ধমকে উঠল, 'এ্যাই, কি চাস তুই?' বদি পাগলার হাসি আরো বিস্তৃত হল। রফিক কপালের ঘাম মুছল। সরু গলায় বলল, লোকটা স্যার পাগল। আমাদের সব গ্রামে একটা করে...।

এই কথা তুমি আগে একবার বলেছ। একই কথা দু'তিনবার বলার প্রয়োজন নেই।

রফিক ঢোক গিলল। মেজর সাহেব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, এ জায়গাটা আমার পছন্দ হচ্ছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক। সবাই টায়ার্ড।

মাইল পাঁচেক গেলেই স্যার নবীনগর। খুব বড় বাজার, পুলিস ফাঁড়ি আছে। সন্ধ্যা নামার আগে আগে স্যার নবীনগর চলে যাওয়া ভাল।

কেন? তুমি কি ভয় পাচ্ছ?

জি না স্যার, ভয় পাব কেন?

মেজর সাহেব দলটির দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বললেন। মৃদু সাড়া জাগল। নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়ল সবাই। মাথা থেকে ভারী হ্যালমেট খুলে ফেলতে লাগল। মেজর সাহেব নিচু সুরে বললেন, পাগলটাকে বেঁধে ফেলতে হবে। তিনি কাঠের একটি

বাক্সের উপর বসে পাইপ ধরালেন। খাকি পোশাক পরা কারো মুখে পাইপ মানায় না। কিন্তু এই মেজর সাহেব অসম্ভব সুপুরুষ। তাঁর মুখে সবকিছুই মানায়।

পাগলটাকে আম গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হল। তার কোন আপত্তি দেখা গেল না। বরং কাছাকাছি থাকতে পারার সৌভাগ্যে তাকে আনন্দিতই মনে হল। কেউ তার দিকে তেমন নজর দিল না। এরা অসম্ভব ক্লান্ত। এদের দৃষ্টি নিরাসক্ত ও ভাবলেশহীন।

মেজর সাহেব পানির বোতল থেকে কয়েক চুমুক পানি খেলেন। বুটজুতা জোড়া খুলে ফেললেন। তাঁব বাঁ পায়ের গোড়ালিতে ফোস্কা পড়েছে। রফিক বলল, ডাব খাবেন স্যার? মেজর সাহেব সে কথার জবাব না দিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, আগে আমবা কোন গ্রামে গেলেই ছোটখাট একটা দল পাকিস্তান পতাকা হাতে নিয়ে আসত। এখন আব আসে না। এর কারণ কি জান?

জানি না স্যার।

ভয়ে আসে না। এই গ্রামের সব ক'টি লোক এখন জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। ঠিক না?

রফিক জবাব দিল না। বদি পাগলা বলল, এট্টু বোতলের পানি খাইতে মন চায়।

ও কি চায়?

ওয়াটার বটল থেকে পানি খেতে চায় স্যার।

গ্রামের সবাই পালিয়ে গেলেও আজীজ মাস্টার যেতে পারেনি। কারণ সোনাপোতা থেকে তার ছোট বোন এসেছিল। আজ সকাল থেকেই তার প্রসবব্যথা শুরু হয়েছে। এরকম একজন মানুষকে নিয়ে টানাটানি করা যায় না। তবু আজীজ মাস্টার দু'বার বলল, ধরাধরি কইরা নাওডাত নিয়া তুললে শ্যামগঞ্জ লইয়া যাওন যায়। তার জবাবে আজীজ মাস্টারের মা তার কাপুরুষতা নিয়ে কুৎসিত একটা গাল দিয়েছেন। পা-ভাঙ্গা বিড়ালের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আজীজ মাস্টার প্রতিবাদ করেনি। কারণ কথাটি সত্যি। সে বড়ই ভিতু। গ্রামে মিলিটারি ঢুকেছে শোনার পর থেকে তার ঘনঘন প্রস্রাবের বেগ হচ্ছে। সে বসে আছে উঠোনে। এবং সামান্য শব্দেও দারুণভাবে চমকে উঠছে।

মাস্টার বাড়িত আছ?

কেডা?

আমরা। খবর হুনছ? বদি পাগলারে বাইন্ধা রাখছে আম গাছে।

হুনছি।

নীলগঞ্জের মুরুব্বিদের কয়েকজন শঙ্কিত ভঙ্গিতে উঠে এল উঠোনে।

তোমার তো একটু যাওন লাগে মাস্টার।

কই যাওন লাগে?

দবীর মিয়া তার উত্তর না দিয়ে নিচু গলায় বলল, তুমি ছাড়া কে যাইব? তুমি ইংরেজি জান। শুদ্ধ ভাষা জান।

মিলিটারির কাছে যাইতে কন?

আমি গিয়া কি করতাম?

গিয়া কইবা এই গেরামে কোন অসুবিধা নাই। পাকিস্তানের নিশানটা হাতে লইযা যাইবা। ভয়ের কিছু নাই।

মাস্টার অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না। দবীর মিয়া বিরক্ত হয়ে বলল, কথা কওনা যে? আমি যাই ক্যামনে? বাড়িত অত বড় বিপদ। পুতির বাচ্চা অইব।

তোমার তো কিছু করনের নাই মাস্টার। তুমি ডাক্তারও না, কবিরাজও না।

মাস্টার ক্ষীণস্বরে বলল, পাকিস্তানের পতাকা পাইয়াম কই?

ক্যান ইস্কুলের পতাকা কি করলা?

ফালাইয়া দিছি।

ফালাইয়া দিছ? ক্যান?

মাস্টার জবাব দেয় না। দবীর মিয়া রাগি গলায় বললে, আই এ পাশ করলে কি হইব মাস্টার, তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি অয় নাই। পতাকাটি তুমি ফালাইলা কোন আক্কেলে? অখন কি আর করবা। যাও খালি হাতে।

আমার ডর লাগে চাচাজী।

ডরের কিছু নাই। এরা বাঘও না, ভল্লুকও না। তুমি গিয়া খাতির-যত্ন কইরা দুইটা কথা কইবা। এক মিনিটের মামলা। কি কও আসমত?

নেয্য কথা।

দেরি কইরো না। আন্ধাইর হওনের আগেই যাও।

একলা?

একলা যাওনই বালা। একলাই যাও। তিনবার কুলহু আল্লাহ কইয়া ডাইন পাওডা আগে ফেলবা। পাঁচবার মনে মনে কইবা, 'ইয়া মুকাদ্দেমু।" ভয়-ডরের কিছুই নাই মাস্টার। আল্লাহর পাক কালাম। এর মরতবাই অন্য রকম।

আজীজ মাস্টার মাথা নিচু করে বসে রইল। তার আবার প্রস্রাবের বেগ হয়েছে। ঘরের ভেতর থেকে পুতি কুঁ কুঁ করছে। প্রথম পোয়াতি খুব ভোগাবে।

ভইনটারে এমুন অবস্থায় ফালাইয়া ক্যামনে যাই?

এইটা কি কথা? তুমি ঘরে থাক্যা করবাটা কি? বেকুবের মত কথা কও খালি। উঠ দেহি।

আজীজ মাস্টার উঠল।

মেজর সাহেব দীর্ঘ সময় তার দিকে সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন। অন্ধকার হয়ে আসছে। তাঁর মুখের ভাব ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তিনি বসে আছেন কাঠের একটি বড় বাক্সের উপর। পা দু'টি ছড়ানো। মেজর সাহেব পরিষ্কার বাংলায় বললেন, কি চাও?

আজীজ মাস্টার থতমত খেয়ে গেল। এ বাংলা জানে নাকি? কি আশ্চর্য।

কি চাও তুমি?

জি, কিছু চাই না।

মেজর সাহেব এবার ইংরেজিতে বললেন, কিছু না চাইলে এসেছ কেন? তামাশা দেখতে? সার্কাস হচ্ছে? আজীজ মাস্টার ঘামতে শুরু করল। মেজর সাহেবের পরবর্তী সমস্ত কথোপকথন হল ইংরেজিতে। আজীজ মাস্টার বেশীরভাগ জবাবই দিল বাংলায়। তাতে অসুবিধা হল না। মেজর সাহেব বাংলা বুঝতে পারেন।

তুমি কি কর?

আমি এখানকার প্রাইমারি স্কুলের টিচার।

এখানে আবার স্কুলও আছে নাকি?

জি স্যার।

আর কি আছে?

একটা মসজিদ আছে।

শুধু মসজিদ? মন্দির নেই? পূজা হয় যেখানে?

জি না স্যার।

ঠিক করে বল মন্দির আছে কিনা।

নাই স্যার।

মেজর সাহেব পাইপ ধরালেন। ঠাণ্ডা গলায় কাকে যেন পাঞ্জাবী বা অন্য কোন ভাষায় কি বললেন। সেই লোকটি উঠে এসে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিল আজীজ মাস্টারের গালে। আজীজ মাস্টার চিৎ হয়ে পড়ে গেল। আম গাছের সঙ্গে বাঁধা বদি পাগলা দারুণ অবাক হয়ে বলল, ও মাস্টার উঠ উঠ। যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে মেজর সাহেব বললেন, তোমার নাম কি?

আজীজুর রহমান।

আজীজুর রহমান, তোমাদের এদিকে মুক্তি বাহিনী আছে?

জি না।

সবাই পাকিস্তানি?

জি।

বাহ্ খুব ভাল। তুমি নিজেও একজন খাঁটি পাকিস্তানি ঠিক?

জি স্যার।

সবাই পাকিস্তানি হলে এত ভয় কিসের? আমার তো মনে হয় এ গ্রামের সবাই ভয়ে পালিয়েছে। মেয়েগুলি লুকিয়ে আছে জঙ্গলে, ঠিক না?

আজীজ মাস্টার জবাব দিল না। তার মাথা ঘুরছে। বমি আসছে। বহু কষ্টে সে বমির বেগ সামলাতে লাগল।

তোমাদের কি ধারণা আমরা তোমাদের মেয়েদের ধরে নিয়ে যাব?

আজীজ মাস্টার চুপ করে রইল।

কি, কথা বলছ না যে? তোমার স্ত্রীও কি জঙ্গলে লুকিয়েছে?

স্যার আমি বিয়ে করিনি।

বিয়ে করনি? বয়স কত তোমার?

চল্লিশ।

চল্লিশ, এখনো বিয়ে করনি? তাহলে চালাও কিভাবে? মাস্টারবেট কর?

আজীজ মাস্টার কপালের ঘাম মুছল। মেজর সাহেব হুংকার দিয়ে উঠলেন, কথার জবাব দাও। রফিকউদ্দীন ক্ষীণ সুরে বলল, স্যার জানতে চাচ্ছেন আপনি হস্তমৈথুন করেন কিনা। বলে ফেলেন ভাই। স্যার রেগে যাচ্ছেন।

করি না।

বল কি? তোমার যন্ত্রপাতি ঠিক আছে? দেখি পায়জামা খুলে সবাইকে দেখাও তো।

স্যার কি বললেন?

পায়জামা খুলে তোমার যন্ত্রটা সবাইকে দেখাতে বললাম। ঝটপট কর। দেরী করবে না। আমার হাতে সময় বেশি নেই।

আজীজ মাস্টার অবাক হয়ে তাকাল রফিকের দিকে। রফিকউদ্দীন অস্পষ্ট স্বরে বলল, খুলে ফেলেন ভাই। ব্যাটা ছেলেদের মধ্যে আবার লজ্জা কি? খুলে ফেলেন, স্যার রাগ করছেন। মেজর সাহেব নিচু গলায় কি একটা বললেন। একজন এসে হ্যাঁচকা টানে আজীজ মাস্টারের পায়জামা নামিয়ে ফেলল। মেজর সাহেব বললেন, জামাটাও খুলে নাও।

আজীজ মাস্টার দু'হাতে তার লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করতে লাগল। একটা মৃদু হাসির গুঞ্জন উঠল চারদিকে। একজন কে যেন কাগজের দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারল আজীজ মাস্টারের দিকে। মেজর সাহেব বললেন, তুমি পাকিস্তানীদের ভালবাস?

জি স্যার।

ভেরী গুড। আমাকেও নিশ্চয়ই ভালবাস। বাস না? বল, বলে ফেল।

বাসি স্যার।

যে তোমাকে নেংটা করে দাঁড়া করিয়ে রেখেছে তাকেও তুমি ভালবাসছ। তুমি তো বিশ্বপ্রেমিক দেখছি।

মেজর সাহেব অনুচ্চ স্বরে কি একটা বলতেই চারদিকে হাসির বান ডেকে গেল। বদি পাগলা চোখ বড় করে বলল, মাস্টার, তোমার কাপড় কই? এ্যাই মাস্টার।

আজীজ মাস্টার ঘোলা চোখে তাকাল তার দিকে। তার বমি-বমি ভাবটা কেটে গেছে। শুধু মাথার পিছন দিকটায় তীব্র ও তীক্ষ্ণ একটি যন্ত্রণা। মেজর সাহেব বললেন, আজীজুর রহমান, তুমি ভয়ে মিথ্যা কথা বলছ প্রাণে বাঁচবার জন্যে। সত্যি কথা বল, তোমাকে ছেড়ে দেব, তুমি কি আমাকে পছন্দ কর?

না।

এইতো আসল কথা বেরুচ্ছে। তুমি কি চাও এটা বাংলাদেশ হোক?

জি স্যার।

তুমি তাহলে একজন দেশদ্রোহী। দেশদ্রোহীর মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। আমি সেই ব্যবস্থাই করতে চাই। নাকি তুমি বাঁচতে চাও?

আজীজ মাস্টার জবাব দিল না।

দেরি করবে না। বলে ফেল বাঁচতে চাও কি-না।

রফিকউদ্দীন ভয়-পাওয়া গলায় বলল, বলেন ভাই, বাঁচতে চাই। এরকম করছেন কেন? শুধু শুধু নিজের বিপদ ডেকে আনছেন।

বদি পাগলা আবার কথা বলে উঠল, ও মাস্টার কাপড় পিন্দ। তুমি নেংটা।

আজীজ মাস্টার নড়ল না। মেজর সাহেব বললেন, কাপড় পর। কাপড় পরে আমার সামনে থেকে বিদেয় হয়ে যাও। ক্লিয়ার আউট।

আজীজ মাস্টার কাপড় পরল না। হঠাৎ এক দলা থুথু ফেলল। সেই থুথু মেজর সাহেবের ডান প্যান্টের হাঁটুর কাছে এসে পড়ল। মেজর সাহেব চোখ তুলে তাকালেন। চারদিকে কোন শব্দ নেই। আজীজ মাস্টার এগিয়ে এসে আরেক দলা থুথু ফেলল। সেই থুথু মেজর সাহেবের সার্টে এসে পড়ল। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে। এবার আমরা রওনা হব।

সৈন্যদল মার্চ করে এগুচ্ছে। মেজর সাহেবের মুখ অসম্ভব বিবর্ণ। পেছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একজন নগ্ন মানুষ।

আঁতুড়

দুলাল ঘোস

হরিগঙ্গা বসাক এখন একজন রাস্তার নাম। আগরতলার ব্যস্ত সমস্ত একটা পথ। এসময় যদিও ঘরের মানুষ ঘুমিয়ে থাকার কথা। রাত কটা হবে? তার দুইপাশে যতসব দালানবাড়ি, দোকানপাট আছে, গভীর রাতে ঐসব বারান্দাও বেদখল হয়। বেওয়ারিশ গরু ছাগল, বেওয়ারিশ মানুষ, তবু ঘুম কি আর হয়? ঘুমের নামে বুক ভাঙে, ভোরের আগে জায়গা খালি করে দিতে হবে।

শুধু কাংরীর কোন দায়িত্ব নেই এখন। সে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে হাঁটছিল। পা তুললে স্তম্ভ, ফেললে ঢল। নিচে জল, পাথরও নরম লাগে তার, ভাল লাগে। আর আলো ধুয়ে ধুয়ে আজ একেবারে হয়রান হয়ে যাচ্ছে বৃষ্টি। মাঝে মাঝে জেব্রা অন্ধকার— ঝড় ঝাপটা, কনকনে বাতাস। যেন আলোর জ্যোৎস্না গলে খানাখন্দে নূতন ধন্ধ হয়েছে।

কাংরীর পিঠে পাছায় ক্রমাগত বিদ্যুৎ চমকায়। সে নিষ্কম্প হাঁটে। সঙ্গে একটানা আঘাত করার শব্দ ও এইমাত্র কানের ভিতর কিছু জল ঢুকে পড়লে সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। চোখের চুল বেয়ে ঢল নামে। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে কত সময়। অর্থাৎ মুখের ওপর বৃষ্টিপাত বেশি পায়। ক্রমশ কষ্ট হয় তার। একেবারে অসহ্য হলে আবার তাকায়। এইবার চোখের পাতাগুলি একফালি রোদের মতই হেসে ওঠে—কারণ সামনে আরেকটি নেড়ি কুকুরের বাচ্চাকেও দেখা যাচ্ছে। ভিজে এক্সা। তারপর নর্দমা ঘাঁটা-ঘাঁটি করতে থাকলে—

চিত্রকথা সিনেমা হলের ঠিক উল্টোদিকে যে ল্যাম্পপোষ্ট দাঁড়িয়ে আছে, তার নীচে মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা যত আবর্জনা জড়ো করে। এই আলো আবর্জনা আর বৃষ্টির মধ্যে এখন কাংরীও ভিজছে। কিছুই তো নেই, শুধু একটা নর্দমা এবং কয়টা ডিমের খোসা ভাসতে থাকে। বড়সড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়লে আবার গা থেকে গা আলগা হয়ে পড়ে খোসাগুলি।

বুকের ভিতর শূন্য হয়ে পড়ে। তখন জয়বাংলার যুদ্ধ। একদিন মা তাকে কানে কানে বলেছিল— তোর তো তেরো বছর বয়স হয়ে গেল। তবু বাঁজা, আমাদের পরিবার থেকে তুইই যা বাঙ্কারে। প্রথমে কথাটা সে বুঝতেই পারেনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল জগদ্ধাত্রীর দিকে। শালি কয় কিতা! শুনছি বাঙ্কার থাইক্যা রোজদিন গন্ডায় গন্ডায় শাড়ি ব্লাউজ ছায়া হাবিজাবি কতকিছু ছুইড়া মারে ওরা। তারপর গাছ, সাইজ্যা পরিবারের জিনিস খুইজ্যা লইয়া যায় জয়বাংলার মানুষ। কিন্তু আমার একটাই মাত্র জামা। নিচে পেন্ট পর্যন্ত নাই। সেদিন জলজংলার পাশে সে কি তার চোখগুলি বন্ধক রেখে, দাঁতে দাঁত চেপে, দুই হাত ও বুকে ঠোকাঠুকি, শীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল? না। এখনও তো হাত ধরে হ্যাঁচ্‌কা টান দিলে— দাঁত কপাটি আলগা হয়ে পড়ে তার। সে মাটিতে চিৎপাত শুয়ে পড়ে।

কাংরী হাসেও। মরণরে অত সহজে মেনে না নিলে— এতদিনে সে মরেই যেত। তখন জামার নিচে সাধারণত প্যান্ট থাকত না তার। এইভাবে নাই নাই ভাবটা আমার শরীরে সবসময় জিইয়ে রাখতো মা, আর তাড়া দিত কেবল। আরেকদিন অন্যমনস্ক হাঁটতে হাঁটতে, পেছনের জঙ্গল ধরে, অনেকক্ষণ ধরেই সে একটা উইঢিবির উপর দাঁড়িয়ে পুঁইগোটা রঙ দেখছিল আঙুলে—বেশি দিন থাকে না। থুতনিটা বুকে ঠেকিয়ে রাখলেই লোলের সুতো জড়িয়ে যায়। কিন্তু এত কাছে এসেও কেন বাঙ্কারে ঢুকতে পারছিল না কাংরী এবং কোন কিছু করতে না পারার যে কান্না আছে, তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। অনেকটা ফুপিয়ে ফুপিয়ে বললেই ঠিক হবে। সঙ্গে সঙ্গে ফলও মিলল। দেয়ালের উপরেই একটা বন্দুক চিৎকার করে উঠল— হল্ট। এবং আমিও তখন দুইহাত গাছের উপরে তুলে ধরেছিলাম কেমনে কেমনে। তারপর সামনে বাড়িয়ে দিয়েছিলাম, ভিক্ষা মনে হবে—

তবে ওদের যে জল-বাতাসের চল নেই আমি জানি। ওরা তেলেভাজা রুটি আর তরকারি দিল আমাকে। মগ দিয়ে একমগ জল দিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিন্তু পরপর দুইটা ঢেকুর উঠে গেল আমার। স্বাভাবিক আমি আর সান্ত্রী একে অন্যের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলাম। তারপর হাত ধরাধরি করে ঢুকে গেলাম বাঙ্কারে। সবাই আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। একজন বয়স্ক লোক বলল— কুত্তো কা মাফিক নেহি, আদমি কি তরা, সামালকে সামালকে।

বাঙ্কার তো আসলে জঙ্গলই, গুহা, বালুর বস্তা ঘেরা। তখন ত্রিসন্ধ্যা হবে। স্যাঁতসেঁতে জলজংলা, ক্রমশ তার পিঠ পাছা ও মাথার চাপে কয়টা বনগাঁদাফুলের গাছ থেঁতলে গিয়েছিল, ঔষধি গন্ধ ও একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল কাংরী।

দুই

সেই ব্যথাটা এখন আবার তলপেট থেকেই শুরু হয়। তারপর বৃষ্টির দাপট কমে এলে তবু পিনির পিনির পড়ছিল। রাস্তার আলো ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তবে ক্যাকটাসের বলের মত। আরেক জায়গায় সে খামচে ধরে রয়েছে নাভি, চোখ মুখ কুঁচকানো, তাই ছুঁচোর মত অস্থির হয়ে পড়েছে এখন। একটু নুয়ে নাবালিকাটি তারপর আগরতলার কোন গলির ভেতর ঢুকে গেলে, কানাগলির শেষে পোড়োবাড়ি থাকে একটা। এটা রাজার দেশ বলেই আমরা জানতাম। এখন গলির মাঝামাঝি একটা আলো লক্ষ্য করে। বৃষ্টি থেমে গেছে। উপরে তারা, আরেকটা জলে ভারি পাতা উড়ে উড়ে কাংরীর পায়ের কাছে পড়লে সে শিউরে উঠে, এবং একদিন বুঝতে পারে ব্যাটামানুষেরাই সব, মেয়েরা কিচ্ছু না—নিজের বলতে তাদের শুধু ক্ষুধা আর হজম করার শক্তি আছে।

আঃ! পায়ের দুই পাতা থেকে মাথার চুল পর্যন্তই তড়িৎ ব্যথা। অথচ সে কেন পেটের কাছে নুয়ে পড়ে আছে শুধু? আর থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস। যেন তার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্যই নেই। সেই যে বাংলাদেশী—যে তারে একদিন গভীর রাতে সীমান্ত পার করে দিয়েছিল— লোকটা ভাল ছিল না মন্দ— এখনও তেমন স্পষ্ট নয় কেন? মনে হয় নিজের বাপকে অন্তত মেয়েরা সন্দেহ করতে শেখেনি। লোকটা ফাঁক পেলেই আমার শরীরে খামকা খোঁজাখুঁজি করত। আমিও ভাবি বুড়া তুই খুঁজতে খুঁজতে কি পেয়ে যাস দেখি!

আরেকদিন আখাউড়া বর্ডারে, আমরা এম্নি বেড়াতে যেতাম মাঝে মাঝে। বাবার লুঙ্গির খুঁটে আট দশটা জিওল মাছ বাঁধা ছিল। পথে আধমরা এক নদীর শরীর থেকে আমি আর

বাবা খপাখপ ধরে নিয়েছিলাম। তখনও আঁঠালি মাটি চিহ্ন দু এক জায়গায় লেগে রয়েছে আমার। বিশেষ করে ঘন রোমগুলিতে কামড়ে ধরে ঝুলেছিল। কেমন যেন সুড়সুড়ি লাগছিল টানটান। স্বাভাবিক আমিও অন্যমনস্ক হয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখি কয়জন পুলিশ ভারী বন্দুক ঝুলিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। এসবের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় এবং অভ্যাস' থাকা সত্ত্বেও এখন আমি আৎকে উঠেছি কারণ আচমকা ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দেয়ার মতই হঠাৎ আমাকে কে ঠেলে দিল এপারে? হাসির রোল উঠল। আমি একটা লুলি, তাকিয়ে দেখলাম—আমাদের জিওল মাছ, বাবার লুঙ্গির খুঁট সবই এখন ধরে রেখেছে পুলিশ। ফাঁকে ফাঁকে তাদের পানলাল জিহ্বা দেখা যাচ্ছে। ভয়ে পেছন ফিরে দেখি— আরো এক নাগা সন্ন্যাসী যার লুঙ্গি এখন পুলিশের হাতে, চুল দাড়ি সবই সাদা— পড়িমরি করে তিরিমিরি বাতাসে মিলিয়ে গেল।

এতক্ষণ এই লোকটাকে আমি বাবা বলে ডেকেছি, এজন্যে যে যুদ্ধের পর তিনিই তো আমাকে বাঙ্কার থেকে টেনে বের করে এনেছিলেন। তাছাড়া বাবাদের শরীরে আর কি জিনিস আলাদা থাকে? তারপর থেকেই আমরা হাঁটছিলাম। উনার তিন তালাকের ছয় বউ, একটিও মেয়ে অবশিষ্ট নেই, সবই বাঙ্কারে গেছে। তাই যুদ্ধের পরে কেবল আমরাই এখন মুক্ত। শুধু হাঁটছিলাম আর মাঝে মাঝে মাটিতে শুয়ে বিশ্রাম। বুড়ো মানুষ— বেশী দোষারোপও করা যায় না। একদিন এমনি বাবা আর মেয়ে একটা গাছের নিচে শুয়ে গল্প করার মত তিনি আমার পাছায় হাত রাখলেন,' বললেন— তুই কিন্তু ইন্ডিয়ায় গিয়ে, সাবধান, কোন ক্যাম্পে উঠবি না! তাহলে আবার ঠেলে দেবে এপারে।

— চাচা, আমার মায়ের কি হবে?

— মা মারাইছ না বেটি, কত বাঙ্কার খুইজ্যা যে তোরে পাইছি—

— আইচ্ছা আইচ্ছা। ইন্ডিয়ায় কিতা কামকাজ আছে নি চাচা? গরু গোয়াল?

— ভর্তি ভর্তি গোলা।৷ তর কোন চিন্তা নাইরে!

তিন

তারপর পুলিশেরা যখন আমাকে মুক্তি দিল, অর্থাৎ ইন্ডিয়ায় ঢুকতে দিল, তখন আমি ক্ষেতের আলজমিন থেকে উঠে দাঁড়িয়েছি মাত্র। মনে হয়েছিল যেন শূন্য একটি শ্মশান, সদ্য আগুন নেভানো গন্ধ চারিদেকে, কাংরী কোনদিকে যাবে ঠাহর করতে পারছিল না— চুলার দিকে নাকি নদীর দিকে। ভ্যাবাচ্যাকা দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ। পরে বুঝতে পেরেছিল— নূতন চিতা একটা জ্বলে উঠেছে তার পেটে। বাংলাদেশে রাজাকার বা খান সেনারাও তাকে মাঝে মাঝে বাসি রুটি দিত, ফলে এখনও দোয়া মাগার মতই তার হাতদুটি কাংরীর আগে আগে হাঁটতে থাকে।

বয়স কত হল কাংরীর? বর্ডার পার হয়ে এসে রাতের বেলা একসময় সে একটা বড়সড় বাড়ি দেখে ঢুকে পড়েছিল। খানে খানে অনেকগুলো পেট্রোমাক্স জ্বলে। কালো মস্ত মস্ত মটকা। লোকজনের সীমা সংখ্যা নেই— বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। আর রাবণের চুলাও মনে হয় তত বড় নয় শুধু ধান সেদ্ধ হচ্ছে। পুলি পিঠ্যার গন্ধ কিন্তু ললিত গুঁড়ওতো একসময় অসহ্য লাগে! এবং নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সামনে যতদূর চোখ যায়— সবই তাদের উঠান, ধান শুকানো হচ্ছে। পালা করে কাজ করে সবাই। একদল খায় তো আরেক দল ঘুমায়,

একদল ঘুমায় তো আরেকদল কাজ করে। কোন কথা নেই। আমিও একটা লাইনে বুদ্ধি করে ঢুকে পড়েছি। আর টুকরি টুকরি গরম ধান নিয়ে ফেলতে হবে আরেক জায়গায়। একসময় একটার পর একটা হাই উঠতে থাকল। কী করব আমি? লাইনে লাইনে এসে এবার খাবার ঘরে ঢুকে পড়েছি। লঙ্গর করে কলাপাতায় খেলাম আমরা। বয়স্করা চলে গেল এক ঘরে। কমবয়েসী মেয়েরা একঘরে। তারপর সব বয়সের বেটামানুষেরা পালা করে আসতে থাকল। একসময় আমি ঘুমিয়ে পড়লে অন্যঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরদিন অনেক বেলা করে উঠেছি আর সব অঙ্গে ব্যথা। বাড়ির বুড়া মালিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল সর্দারনি। থুরথুরা লোকটি সত্যি ভালা মানুষ। প্রথমেই মা ডাকল আমাকে। ওরাও নাকি বাংলাদেশ থাইক্যা আগরতলায় আইছে। তারপর দুঃখ কইরা কইল— ছিলাম ভারতবাসী, পাকিস্তানি হইলাম, তারপর বাংলাদেশী, অখন আবার ইন্ডিয়ান। কাংরী যদিও কথাগুলি কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি তবু একটা চোরা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল। পরে বুইড়া বেটা, তার পিঠে হাত রাইখ্যা কইল— তুই তো কচি মাইয়া, আমার ইখানে ধামরা বেটি না হইলে কোন কাম অইত না!

কী আর করা যাবে! মনের দুঃখে কাংরী এবার রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতে থাকে। একদিন হঠাৎ ভি এম হাসপাতালের সামনে তার কিনার ঘেঁইস্যা একটা রিক্সা দাঁড়াইল। মেয়েটারে আমি চিনছি। নাম ভটলি, ঐ বড় বাড়িতেই দেখেছিলাম। আর রিক্সাওয়ালাটা হইল পরাণ, তার আসিক। সে জিগাইল—কাম করবিনি? কাংরী উত্তর দিল না। তারপর কইল— একটা ইট ভাট্টা আছে। সে মনে ভাবলো—বহু দূর থাইক্যা দেখছি— খুবই উচা, জাহাজের মত ধুঁয়া উড়ে! ভটলি একটু সইরা বইল, কাংরী উঠল। তারপর আসাম আগরতলা রাস্তা ধরে নিজেকেই প্রশ্ন করল— কই যাইতাছি? তখনই ব্রেক কষল পরাণ, ওরা নামল, ভিতরে ঢুকল— এখানেও লঙ্গরখানা দেখি! সারি সারি লোক কাজ করছে। শুধু পরাণ ভটলি ওরা এত লীলা খেলায় ব্যস্ত এখন, দুই এক কদম পিছিয়ে পড়ে কাংরী হাওয়া। তারপর থেকে রাস্তায়— চিকনি ভটলি, কুটুম— কত বেটা বেটিরে দেখলাম কামের নামে কুকাম করাইল। তাও সে চইল্যা যাইতে আছিল বেশ। হঠাৎ কইরা আবিষ্কার করল— ভাদ্রর শেষে আশ্বিনে যেমন কুত্তির শরীরে ফুল ফেটে— তেমনি কাংরীও এক্কেবারে ফুইট্যা গেছে গিয়া। সে পালিয়ে বেড়ায় এখন।

দেশের বাড়িতে থাকতে মা মাঝে মাঝে দিদি পিসীদের নিকার বাতচিৎ করত। লক্ষ্য করত কাংরী—তারে নিয়া অবশ্য নাকের শ্বাসটুকু ফেলতো না কেউ। কিছু একটা কমি নিশ্চয়ই ছিল। এখনও একগাছা সূতার নাল নেই শরীরে। এইটা যদিও অন্য গল্প। আসলে তার নিচের অংশ শরীর ঢাকতে গিয়েই পরনের জামা ধরে সবসময় টানাটানি করত। সেটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে একসময় নাভির উপরে ওঠে। তারপর আরো উঠতে চাইলে টেপ জামাটা খুলে একদিন ড্রেইনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এই ঘটনার পর যে কয়দিন গেছে, সবসময় সূতার জাল লেগে রয়েছে ভেবে অস্বস্তি হত।

এখন আর কোন দুঃস্বপ্ন নেই। সব বাতাসই তার গা সহা লাগে। প্রতিদিনের ধূলো বালিতে লোমের গোড়াগুলি আরো শক্ত হয়েছে— সাধারণ কাঁপাকাঁপিতে আর কিছু ভাবে না বা ভাবায় না। শুকনো গোবর এবং মাটির চট্টা লেগে রয়েছে। এখন কোনমতে শুয়ে পড়তে পারলেই হল বা ওরাই শুইয়ে দেয় তারে প্যাক কাদায়, ঝামা পাথরে, টিলা টংকরে। আহা কতদিন একটা তক্তপোষ চোখে দেখেনি। আর একবার শুয়ে পড়তে পারলেই আর উঠে দাঁড়াতে পারে না, যদি না মায়া করে কেউ তারে টেনে তুলে দেয়।

তখনো টল্লায় কিছু সময়। তারপর সবই সহ্য হয়ে যায়। আর যদি নরম মাটির মধ্যে পায়ের ছাপ রেখে চলে যায় কেউ? এখন শুধু মাছি উড়াউড়ি করে যেখানে তার মুখ গহ্বরগুলি। কিছু খুচরো, কটা অচল পয়সা রেখে যে যার চলে গেলে—

কাংরী নিজে নিজেই উঠে বসতে চাইছে। পিঠ দেখাচ্ছে বারবার। আবার চিৎ হয়ে যাচ্ছে। তার পাশে ছোট্ট একটা নালার দুই পাড়ে পা দিয়ে হঠাৎ বসে পড়ে কাংরী। জলে স্রোতস্বিনী আলো দেখে, শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি। তখন দিদি তারে দেমাক করে বলেছিল— তোর কি রক্ত যায় মাসে মাসে? সেদিন কোন উত্তর দিতে পারেনি, কিন্তু আজ? যদিও তার আগেই ত্রিভুবন দেখা শেষ কাংরীর। এখনও সঠিক কিছু বলা যাচ্ছে না— এই শুরু, নাকি শেষ? যাই হউক নালাটার দুই পাড়ে পা দিয়ে এখন সে দেখছে— অন্য কোন উৎস থেকে একটা অচেনা, অথচ বড় আপন প্রপাত জলীয় শব্দ করছিল জলে, যেন নিজেকে এখন খুবই জীবিত মনে হচ্ছে। এমন কি সে নিঃশেষিত হয়ে যদি, শুধু পোশাক আসাকই পরে থাকে— তবু বোধ হয় সুখ! কাংরী স্বপ্ন দেখে।

চার

গলির শেষে বহু পুরোনো একটি দৈত্যবাড়ির এক অংশ ভেঙে অনেক দিন হয় এপথ বন্ধ হয়ে গেছে। ইয়া লম্বা লম্বা ঘাস। পোষা বৃক্ষগুলিও এতদিনে বন্য হয়েছে। বুড়ো তেঁতুল গাছটা রোদে পুড়তে থাকলে কানাবাদুড় সব অন্ধকার ঘরের ভিতর ঢুকে যায়। খানে খানে চুন সুরকির ঢিবি। ভাঙা জানালা দিয়ে মোটা কৃষ্ণচূড়া বেরিয়ে গেছে একটা। একটুকরা শিকড়ে মাথা রেখে এখন টক্কা, অইরা, তারপর কাংরী শুয়ে থাকে।

— অইরারে, রোজ রোজ রাতের বেলা তুই যাছ কই?

অইরা হাসে। দীর্ঘ ব্যবহারে এখন অন্ধকারও অনেক সহজ হয়ে গেছে। দুই জাতের ক্ষুধা আছে তার। সে একই সাথে দুইটাকে দমন করতে পারে ইদানিং। কিছু পয়সাও বেঁচে যায়। হাল্কা হাওয়া লাগে। পুৎ পুৎ করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে অইরা। যতসব নিশক্তির কুযুক্তিতে সে.নেই। তাছাড়া ছোটজাত ছোটঘরে তার জন্মও মনে হয় না। তাহলে কী মনে হয় আপনার? অইরা রাগ করে। ভিংলাইয়া ভিংলাইয়া চায়। মনে হয় মানে মনে হয়। যেমন শুধু অইরার এখন একটা সুপারীর খোল আছে,শুকনো মাটিতে ফু দিয়ে মুড়ি চিড়া খেতে ভাল লাগে না তার। রোজই চান করা, চুল আঁচড়ানো এসব বাতিকও আছে। মাঝে মাঝে গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে বসে চান দেখা, অইরা বলে— আমি সমুদ্র দেখিনি কোন দিন। অথচ বাকি সব কাজই তার পশুদের মত। যেমন জালালি কবুতরের মুণ্ড ছিড়ে রক্ত। এমন আর কি! আবার সবই সে হাসতে হাসতে করে। মুখটা হাড়ের উপর তেলতেলে চামড়া। একটাও লোম নেই, লম্বাটে। মেয়েদের মত মাঝখান দিয়ে সিঁথি পাড়ে।

— আমার মা বাপ কে হইতে পারে, ক চাই দেখি তোরা? অইরার কথা শুনে টক্কা খুক খুক হাসে। জানালা দিয়ে গম্বুজগুলি দেখায়। তখন অইরা ভাবে— হতে পারে আমি রাজ-বংশী! আবার ভাবে কার রক্তে দোষ নাই? এক মন্দিরের পুরোহিতকে সে চেনে, লোকটা গোপনে গোপনে কবিরাজী করে, সহরের সব কর্তাব্যক্তিদের বাড়ি ঘরে যৌবন-বটিকা না কি যেন নাম, সাপ্লাই করে লোকটা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। হতে পারে, এদেরই অপকর্মের ফল হতে পারে অইরা— কথাটা সে বিশ্বাস করে। তবে পালিয়ে

বাঁচারও যে একটা প্রবৃত্তি তার আছে— সেটা কার রক্ত? কোন সম্প্রদায় ভিত্তিতে কি তার বিচার করা যাবে?

এইরকম বাতাসের জন্য হাঁ করে থাকলেই বোঝা যায় অইরা অন্যমনস্ক। তাছাড়া শুধু কি আর বাতাস—তার গুড়ি গুড়ি অগুনতি পাখাও আছে। ঘরের ভিতর এই অন্ধকার। হঠাৎ হা-মুখে এক দঙ্গল মশা ঢুকে পড়লে, দ্রুত ঢোক গিলে অইরা।

সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে একটা পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। দুই চোখ ঠিকরে জলের তোড় বেরিয়ে আসতে চাইছে। আসলে বাঁচতে চাইছে অইরা, মানুষ হালে। তবে তার কোন লিঙ্গ নাই। সে একটা পাইড়া বেটামানুষের প্রতি বড় দুর্বল। এবং বেটারা বেটি দেখলেই—খালি কেন্নায়। আহা টক্কার গোঁফদাড়ি, এমনকি বুকের লোম পর্যন্ত নাই। কিন্তু ঢাউস গুড্ডির মত ছিনা আছে। নিজের মুঠো হাতটাকেই, এবার আংটির মাপে মেলে ধরে, ভাবে এর বেশি নিশ্চয়ই বড় হবে না টক্কার কোমর তবে নিচের দিকটা পুরো পাথুরে—বাতাসে বাতাসে কাটা। পায়ের দুইটা থাবা যেন চেপে ধরেছে পৃথিবী। অইরা আরো বুঝতে পারে এই মাটির মতই সহনশীল হতে হবে তারও—নইলে কলসি ফুটো করে একদিন ঠিক চলে যাবে আমার প্রেমিক।

বুকের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনি হয়, মুচড়ে মুচড়ে ওঠে কান্না, আর পারে না, আচমকা চিৎকার করে ওঠে— মরার পরে আবার জন্ম হয়নি গো বাবা? তুই কোন্ শালার শালারে?

ত্রিপুরার রাজবাড়ির বাইরে যে নহবৎ মঞ্চ আছে, তার পাশেই ফুটপাত ঘেঁষে একটা ডাস্টবিন—সেখানেই একদিন নাকি তার জন্ম হয়েছিল, লছমীর কাছে শুনেছে। তাই এখন সে আবার স্বস্থানে হাত দেয়, নিজের ত্রুটি খোঁজে, পাপ পায়—তার বা পূর্বপুরুষের। ফলে আবর্জনা ভর্তি মিউনিসিপ্যালিটির লম্বা গাড়িটার জন্যে সেদিন তার অপেক্ষা করতেই হত, যতক্ষণ পর্যন্ত না গামবুট পরা একজন লছমীর কোদাল তারে শূন্যে তুলে নেয় এবং সে কেঁদে ফেলে। আরে না না। সে নর্দমা ঘাটাঘাটি করছে না এখন। তবু ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ফুটে ওঠে শরীরে। দিনের মধ্যে কতবার যে এমন হয়! নিজেকে আর কিছুতেই চেপে রাখতে পারে না, তার হাঁপানী আছে।

এইভাবে ক্রমাগত ক্রোধই কি ক্ষুধার সুড়সুড়ি? তাই অন্য কোনো মানুষের মুখোমুখি হলেই চোখে চোখ বিঁধে রাখা একটা অভ্যাস হয়ে গেছে অইরার। যেন ছিঁড়ে খুবলে খাবে! লোকে বলে তার চোখের পুতলিগুলিতেও নাকি ধর্ষণকারীর ভূত নাচানাচি করে। আর মানুষমাত্রই চোখ নামিয়ে ফেলা স্বাভাবিক।

তখনই খুব কাঁদতে ইচ্ছে হয়, মানুষের জন্যে মায়া হয়, নিজের জন্যেও কষ্ট হয় তার—মৃত্যুর পরে আত্মা যেভাবে আর প্রিয়জনের শরীরে ছুঁয়ে দেখতে পারে না।

পাঁচ

আমাদের আগরতলা শহরে সে পালিয়ে বেড়ায় অন্য কারণে। এখানে গুর্মা হিজড়াদেরও একটা সংগঠন আছে। সম্পাদক শ্রীদাম দাসী, সভাপতি রতিরমণ। এবং অইরারে দেখলেই ওরা মারে। এইতো সেদিনও গোলবাজারে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল। আর হাঁটু দিয়া তলপেটেই বেশি মারে ওরা। দুই তিনটা কিক্ মারার পরই মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়েছিল। তবু সে যায় নি। ওরা বাড়ি বাড়ি যায়। গুর্মা নাচে গায়।

এসব তার ভাল লাগে না। যেমন ভিক্ষা না দিলে পরনের কাপড় খুলেই ওরা ছেলে খেলা করে।

একটু আগে যদিও তার যৌনতার অজুহাত ছিল অন্ধকারে একদঙ্গল মশা গিলে ফেলা, এখন আবার ফোঁটা ফোঁটা ঘাম গড়িয়ে ক্রমশ ভিজে উঠেছে মাটি। পাকা গয়ামের গন্ধ ফুটে ওঠে তার শরীরে। হাতের কাছে টক্কাও আছে— যে তারে বিষ্ঠার চেয়ে বেশি ঘৃণা করে। কিন্তু উপায় নেই। আরো ধৈর্য্য ধরতে হবে তার। আপাতত দুই দাঁতে একটা না একটা ঠোঁট কামড়ে ধরলেই কাম হবে। তারপর একই কৃষ্ণচূড়া গাছের শিকড়ে মাথা রেখে শুয়ে থাকবে অইরা।

— কালো মোটা ঐ দোকানদারটার সাথে তোর কি সম্বন্ধ আছে রে?

অইরার হাতে কিছু পয়সা আছে এখন, সে বিড়ি টানতে থাকলে গাঁজার বিচি ফাটা শব্দ হয়। শালার বেটা দোকানদার— দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকলে ভুড়িটা মাটি ছোঁয়। প্রথমে হাঁটু গেড়ে হাতজোড় প্রণাম করে অইরা, তারপর যত্ন সহকারে বেটাদের লিঙ্গ নিজের মুখে নিয়া কসরৎ করে থাকে। তার বড় বেশি ক্ষুধা। সে দাঁত ও জিহ্বা দিয়া অনবরত কসরৎ করতে থাকে। অবশেষে, দুই জাতের ক্ষুধাই একসঙ্গে নিবৃত্ত হয়।

সর সর শালা খচ্চর। কৈ থাইক্যা একটা উলুমভোস আইয়া উঠছে! টক্কার গোসা দেখে অইরাও নানানে বিনানে শব্দ করে। ফিস-কারি মারে কাংরী।

আমার টাক্কালটা কাছে থাকলে প্রথমেই শালা গুর্মার গলা ফালাইয়া দিতাম আমি ! টক্কা পাশ ফিরে শোয়। আসার সময় মাইল্যাটারে যে কই ফালাইয়া আইছি। কিতা অইব ইতান দিয়া। শুকনা গাছের ডাল হাত দিয়াও ভাঙা যায়। আর জ্বালানী জড়ো কইরাই বা লাভ কিতা— দানা কই? পাইড়ারাতো অনেকদিন ধইরাই মাইট্যা ইন্দুর হইছে। শিকড়-বাকড় খাইয়া বিষ বেদনায় মরতাছে। তাছাড়া ত্রিপুরার পাহাড়ে কোটি কোটি সুড়ঙ্গ শুধু। জুম নাই, জল নাই, গাছ গাছালি, এমনকি পাখির পালক পর্যন্ত কুড়িয়ে পাওয়া যায় না।

যাই হউক দীর্ঘসময় একপাশে শুয়ে থাকলে, তারপর পাশ ফিরলে ছাতের শরীর থেকে মাকড়সার জাল,এখন ছিন্ন হয়। সূতা ছিড়ে মাকড়সাও টক্কার শরীরে কম্পন সৃষ্টি করে, চঞ্চল হয়ে পড়ে টক্কা। তার মনে পড়ে কাংরীর নর্দমা শরীরটাকে যেদিন টানতে টানতে এইখানে তুলেছিল, সেই থেকে অইরাও টক্কার সাথে আর কথা কয় না। কেন? বুকে ভীষণ কষ্ট হতে থাকে। কদিন ধরে তার মাথাটা বড় ভার। কদিন ধরে কাংরীর বুকে পরিবর্তন লক্ষ্য করে সে— এই এট্টু আট্টু আদোল আদোল। কাংরী ছাড়াও শরীরে অন্য কেউ কেউ আছে মনে হয়, নদীর মত ছলবল করে উঠে হঠাৎ হঠাৎ। টক্কা শুনেছে— কোন সময় ঘুমের মধ্যেও নাকি বন্যা হয়ে যায়। ভয় বাড়ে। কোন দিন তার দুই কূল ভাসিয়ে কি চলে যাবে কাংরী? স্যাতস্যাতে মাটিতে পুরনো পাতার মত সেও কি মাটি হয়ে যাবে? তারপর একটা চিমটে ধরে টক্কার কঙ্কালটাকে বাইরে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসবে অইরা। টক্কা ঘামে, তারও তলপেটে খিল ধরে এখন। সে আরো নিচে হাত দেয়— সবই অর্থহীন মনে হয় তার। যেমন পাহাড়ে জঙ্গলে পশু পাখির সাথে কিছু মানুষও বেঁচে থাকে। পৃথিবীটার আদি বাসিন্দা তারা। লংতরাই পাহাড়ে সেই ঝর্ণা জলের ছিটা এখনও তার সম্বিৎ ফিরায়। সেই দিন সে একটা টিলার পেটে বসেছিল। ছাই মাটির শেষে জুমটিলা। পোড়াজমির সবখানে তখনও নূতন পা পড়েনি। ছোট ছোট ছাই উড়ছে। আধমরা একটা ঝর্ণা জলের যত গুড়া— যতটা পারে ভারি হয়েছে বাতাস,

টকাই জামাতিয়া আজ শহরে যাবে। টং ঘরের লোকগুলি অবশ্য এর বিন্দু বিসর্গও জানে না। নিচে আসাম-আগরতলা, একবার পা পিছলে গেলে মুশকিল আছে! সাপটা মাঝে মাঝে নড়েচড়ে। দু-একটা বাস যায়। ছাদভর্তি মানুষ। টকাই কিন্তু অপেক্ষা করতে থাকে মাল মানুষ ছাড়াই শূন্য একটা লরীর। কারণ সে তো আর বিদায় নিয়ে যাচ্ছে না যে শহরমুখী ভিড় সহজে মেনে নেবে!

তার পরনে ধুতির মত করে এক টুকরো মার্কিন কাপড় ছিল। আরেকটা হাফহাতা নিমা। আগরতলার মোটরস্ট্যান্ডে নেমে সে কোন দিকে যাবে ভাবতে না ভাবতেই কামান চৌমুহনীর ফলের দোকানগুলির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। দুইপাশে ডাবের ছড়া ঝুলে আছে দেখে খুই তেষ্টা পেয়েছিল তার। ঐ পর্যন্তই মনে আছে। তারপর তো একেবারে হতভম্ব অবস্থা! দিনদুপুরেই! একপাল বন্য কুকুর ছেঁকে ধরল তারে। সে আঁৎকে ওঠে। তবে আওয়াজগুলো একেবারেই অন্যরকম। ঘেস ঘুস যত নরক নরক শব্দ। আর পাইড়া ল্যাবা লোলা ইত্যাদি যেন খই ফুটছিল— মকাই। তারপর পেচ্ছাপের উপক্রম হলে, একজন পুলিশ এসে একটি অশৌচ গরুকে লম্বা লাঠি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ফুটপাত পার করে দিয়েছিল।

তারপর অবশ্য সে আর এই বুক-শহরে যাওয়া আসা করে না বেশী। কাংরীও তারে কোনকিছু কিনে আনতে পাঠায় না বা কোন কিছু বেচতে। কারণ টক্কারে দেখলেই মানুষ বেশি বেশি দাম রাখে বা খুব কম দাম দিতে চায় জিনিসের। তাছাড়া সে কোন কামকাজও খুঁজে পায়নি। শুধুই পাইড়া ল্যাবা লোলা ইত্যাদি শব্দগুলি ক্রমাগত হাতুড়ি ঠুকতে থাকে মাথায়। মনে হয় আমাদের মুখ ও ভিতরের জড়ভরতটাই এর জন্য দায়ী! এমন কি কান্নায় যখন উল্টোমুখি বুক ভাসে তখনও লোক দেখাতে পারি না আমরা বা যখন লাথি মারার কথা তখনই পা দুইটা শেওড়া গাছের জড় হয়ে যায়। টক্কা ভাবে এজন্যে কে দায়ী— আমরা নিজে, নাকি আমাদের সৃষ্টিকর্তা ভগবান বা প্রতিপালকেরা?

মোদ্দা ক-থা হল টক্কা এখন এই খন্ডহরে আছে আর শিষ্য হয়েছে সে কাংরীর। কেবল ফরমাস খাটাখাটি করে, পোদ্দারি। আসলে যৌথ জোগার থেকে চলে টক্কাও।

আর সারাদিনে একবার মাত্র কুশল জানতে চাইলে অইরার চোখে যাবতীয় আগুনই নিভে যায় সে দেখেছে। ডগমগ করে ওঠে নপুংসকটা। তারপর গহন বনের মতই আপনমনে ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু কাংরীর চোখগুলি ইদানীং ঘোলা ঘোলা। যদিও স্বপ্নপাখিটা এখনও উড়ে যায়নি। তবু চুলের জল ঝেড়ে ফেলার নামে বারবারই সে ডানা ঝাপটাচ্ছিল। তাই টক্কাই একমাত্র প্রহরী এখন জেগে বসে আছে। এবং অন্ধকার শিয়রে বটের শিকড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে এইমাত্র। বিকাল হয়ে গেছে। ঘরে ফেরা কিচির মিচির শুরু করেছে পাখিরা। সূর্য চলে গেলেও তার শরীরের গন্ধ রয়ে গেছে মরা রোদে। এখন শূন্য টক্কা স্মৃতির খলই খুঁজে আর একটি দাড়কিনা মাছও পায় না। চোখ তুলে দেখে— আবার সেই রাজবাড়ির গম্বুজটাই চোখে পড়ে এদিক থেকে সেদিকে। সে শত চেষ্টা করেও তার পূর্বপুরুষের মুখ মনে করতে পারছে না এখন। অথচ মজার কথা হল— যখনই স্মৃতি এবং চোখ বুজে পিতৃপুরুষের মুখগুলি খোঁজার চেষ্টা করে তারা— জলের মত কাঁপতে কাঁপতে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন রাজা। আশীর্বাদি হাসতে থাকেন। কিছুটা অস্পষ্ট হলেও তার সঙ্গে আছেন রাজপুরোহিত চন্তাই।

ছয়

এর বেশি স্মৃতির সুড়ঙ্গে ঢোকার কোন ইচ্ছেই নেই তার। তাছাড়া রাজায় প্রজায় ভেদাভেদ পায় না সে। প্রজারাও তো রাজা হইছে— কিতাই এমন আর উল্টাই লাইছে। কম দেখলাম না তো! থুক করে বিড়ির টুকরাটা ছুঁড়ে দিল। অবশ্য তার আগেই চতুর্দশ দেবতা, রাজা, চন্তাই— সবই একবার একবার মনছবি দেখা শেষ। শেষমেষ একটা বুড়া বরাকবাঁশ, নিঃসন্তান, টক্কার চোখের সামনে তার কঞ্চিগুলো কেবল দুলছিল। কচি কাঁচা বাঁশ খুব স্বাদ। তার গন্ধ এখনও পাগল করে টক্কারে। বাঁশ পূজাও করে তারা।

হাই উঠল একটা, তারপর আরেকটা। এবার বারান্দা থেকে সে ফিরে আসবে কি আসবে না করছিল। কারণ গাছের পাতার সঙ্গে শরীরের রঙও মজে যাচ্ছে পলকে পলকে। ঘরের ভেতরে আগুনের কুন্ডলীটার কথা হঠাৎ মনে হতেই ফিরে আসে সে। তাদের সংসারে এই একমাত্র আলো এই চুলা দিনরাত জ্বলে। যেন তিন তিনটে প্রেতের প্রাণ থাকে এইখানে, কেউ দুষ্টুমি করে জল ঢেলে দিলেই ব্যাস— সব খেলার শেষ। সেই কৃষ্ণচূড়ার শিকড়ে মাথা রেখে সে আবার শোবে এখন। তার ঠিক আগে আধশুয়ে ভাবে— কাংরী আর অইরা— দুই মেরুর দুইটা একসাথে কই গেল গিয়া? মাথাটা তখনও শিকড়ে নামিয়ে রাখতে পারেনি। হুড়মুড় করে ওঠে সিংহদরজা। যেন যাবতীয় পথ বন্ধ করে আরো এক প্রস্থ ছাদ ভেঙে পড়ল। ছিলা ছিঁড়ে টান টান দাঁড়িয়ে পড়ল টক্কাও।

এই ঘরে মাত্র তিনজন কেন— একসাথে দশটা মানুষও ঢুকতে পারে এতবড় দরজা। টক্কা সিনেমা দেখছে, নাকি স্বপ্ন? একজনের হাতে ছোটমোট একটা বন্দুকও আছে। আর লোকগুলি কোন কথা বলছে না এখন। জলের মত কাঁপছে তাদের কালো রঙের মুখোশ বা টক্কার নাইয়ের গোড়াও হতে পারে। কোন ফাঁকে যে বন্ধুরা এসে তার পাশে পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে খেয়াল করেনি। এখন বড় প্রশ্ন হল— আমাদের প্রাণের আগুন তো নিভে আসছে ক্রমশ— তাতে সঞ্চয় দেবে কে? তখনই ফস করে জ্বলে ওঠে ঐ লোকগুলোর হাতে দেশলাই কাঠি। আবার নিভে গেল। এক মুহূর্ত। বাপ দাদার নাম মনে পড়ছে না যদিও। তার আগেই ভোম্মা বিড়িধরানি জ্বলে ওঠে লুক্কা। মুহূর্তে প্রকাশিত হয়ে পড়ে টক্কা অইরা আর কাংরী। অপরপক্ষে আলোর নিচে একটা হাত দেখা যাচ্ছিল শুধু।

বুট জুতার মচমচি শব্দগুলি তারপর বারান্দায় দিয়ে দাঁড়াল। বন্দুক পকেটে পুরো তিনজনই সিগারেট ধরালো একই দেশলাই কাঠির আগুনে। বর্মা নামে একটা লোক বলল— কমরেড ডাকলেও কিন্তু ওদের সাড়া পাওয়া যেত না। তাছাড়া এটা তো লোকালয় নয় রে ভাই! শ্রমের কোন প্রশ্ন নাই এখানে। শ্রেণী বিন্যাসও না। শুধুই ঘাটের মরা আছে কয়টা। প্রকৃতি আছে জালালী কবুতর এবং তক্ষকের ডিম। এখানে আর যাই হোক— কোন সংগঠন হয় না। একটু আগে কে যেন হাই তুলেছিল একটা। সেটাই এখন সংক্রামিত হল সবার মধ্যে। ঘোষণা হল— ঘুম পাইছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে আগুন নিবু নিবু, অন্ধকারের জীবগুলিও কী করছে বোঝা যাচ্ছে না। ইনারা শেষে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এক এক করে তিনটা সুখটান দিয়ে ফেলে দিলেন আজকের দিনগুলি।

তিন তিনটা আগুনের ফুলকি মিলিয়ে গেল বাতাসে। কিন্তু মুশকিল হল পুলিশেরা জোনাকি পর্যন্ত বিশ্বাস করে না। বিশেষ করে এখন জরুরী অবস্থা!

ওরা ঠোঁটে আঙ্গুলে ইশারা করে— চুপচাপ ঘুমিয়ে থাকতে হবে। কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারলেই হল।

আশ্চর্য, এখানে অন্য অস্তিত্বের কথা কি ভুলেই গেলেন আপনারা? এই বাড়িটাতে কোন চৌকাঠ নেই তাই অনুমান হয় ওরা ভিতরে ঢুকে পড়েছিল ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যত উপেক্ষা অভিসন্ধি বিদীর্ণ করে কয়টা স্বদেশী বাদ্যযন্ত্র বেজে ওঠে। মনে হয় কোন দলামোচা টিনের ভিতর একখন্ড গাছের শিকড় ঢুকিয়ে ঢন ঢন-ঢন। তারপর দাঁতাল তাড়ানি শব্দের সঙ্গে সমবেত সঙ্গীতও শুরু হল এখন— আউর মারো, কাৎলা মারো, আউর মারো বোয়ারি! পুলিশ পুলিশ! শেষমেশ অইরা নাকি এই আর্তনাদগুলি শুনেছিল। তারপর সব ঠাণ্ডা। এখন হাতড়ে হাতড়ে একমুঠো গোবর গুড়া খুঁজে পায়, ছুঁড়ে মারে— প্রাণটা আবারো চিরবির করে ওঠে। অনেকটা ঘর অলোকিত হয়। সবই ঠিকঠাক মনে হয় নিজস্ব আছে। উপরে বন্ধু মাকড়সা, নিচে ছেঁড়া জাল ঝুলে ছুঁয়ে যায়। এক এক করে আবার শুয়ে পড়েছে ওরা গাছের শিকড়ে। আবার অইরার মানবজন্মের আকাঙ্ক্ষা ভূতগ্রস্ত হবে। আবার ভীত হয়ে পড়বে টক্কা— ফাঁক পেলেই কাংরীটা তারে ছেড়ে চলে যাবে। কিরকম জানি ধুচুনুচু শুরু করেছে কদিন ধরে। জেগে থাকলে জানালার পাশে কৃষ্ণচূড়ার ডালে গিয়ে বসে থাকে। শুয়ে থাকলে পাশ ফিরে শোয়, এমনসময় আকাশে একটা চাঁদ উঠলো, যেন ঘুম থেকে উঠল কাংরী, আড়মোড়া ভাঙলো ও চুটি মেরে হাই তুললো একটা দুইটা— এই লোকগুলোকে ঘুমে গুতা দিতে হবে।

— টক্কারে তক্ষকের ডিম আছেনি আর?

— নাই।

কাংরী খিল খিল করে হেসে উঠে— আছে, বেটামাইনষের ডিম আছে দুইটা।

— কাংরী শুনছসনি?

— কিতা?

— তুই যাইছ না।

— আইচ্ছা, আনন্দমেলা দেখাইবেনি ক?

— দেখিছ।

সাত

বুকটা হু হু করে ওঠে কাংরীর। কান্নাগুলি যেন ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়েছিল। টক্কার মুখের ভাষাও বড় অপরিচিত লাগে। তবু, তবু মিছিমিছি এই ডাক তার ভাল লাগে। তালের রসের মত ভারি হয়ে ক্রমশই বুক বাড়ছে তার। বাচ্চাকে দুধ দেয়ার মত উন্মুক্ত হতে ইচ্ছে করছে। কথা শুনে মনে হচ্ছে টক্কাও এইবার আমার আবু হতে পারে! আরো আরো নুয়ে পড়তে পারে কাংরীও। দুই চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। জীবনে এই প্রথম তার কাছে কেউ কিছু চাইল। অথচ সে কিছুই দেবে না টক্কারে। এখান থেকে চলে যাবে। কাংরী স্বপ্ন দেখে—

শাড়ি পরা কাংরী, সে অন্য কোনখানে চলে যাবে। এখন পায়ের নিচে ঠান্ডা নরম ঘাস, কাংরী ছুটতে থাকে, তার আলতা পরা পা। ছুটতে ছুটতে ঢল নামে সে টের পায়। তার পায়ের পাতা একটু বেশি মাত্রায় মাংসল এখন। চিহ্ন ছড়িয়ে পড়ছিল নরম ঘাসে।

ফলে পা পিছলে পড়েও যায় কাংরী। পড়ে গিয়ে লাভই হল তার। স্বপ্নমগ্ন পতন। দুইহাত দশ নখে এখন সে খামচে ধরল এঁটেল মাটি। তাতে সদ্য গোবর গুলে লেপাপুছা শুরু করে দিল সে— মস্ত উঠান, দাওয়া দেয়াল। শেষে তেল-সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে আমপাতাগুলিকে ঝুলিয়ে রাখল চৌকাঠে।

— এই কাংরী, তুই বারবারই কই ফিসকাইয়া যাছ গিয়া লো? তোর কিতা কোন ঠিকানা আছেনি?

আরেকটা অস্পষ্ট নদী সারাক্ষণ কাংরীকে পেঁচিয়ে রাখে। তন্ময় হয়ে কোন কিছু ভাবতে গেলেই পায়ের কাছে তাল পড়ার অভ্যাস আছে তার।

এমনি আরেকদিন সন্ধ্যা বেলা— ঢেউ-এর মত দ্রুত কয়টা নৌকা এসে ঘাটে লাগল। কয়জন খানবাহাদুর নেমে এল। দ্রুত ধরতে হবে অথচ পথ পিছল। একই সঙ্গে আমার মায়ের হাত থেকেও কেরোসিন কুপিটা গড়িয়ে গড়িয়ে নদীর জলে ঝুপ করে শব্দ হল একটা। আবার অন্ধকার।

স্বাভাবিক ভাবেই আগুনের কুন্ডলীটার দিকে এখন আবার চোখ পড়ল কাংরীর। ঘরময় দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। এই স্যাতস্যাতে মাটি সাপ সাপ। শুকনো পাতার আগুনে গোবর গুড়া ছুঁড়ে মারে অইরা। লেলিহান শিখা তার ঠোঁটের কোণে— গনগনে হাসিটা দেখে ভয়ে আঁৎকে ওঠে কাংরী। নিজেরই হাত পা হাতড়াতে থাকে। ফলে অদ্ভুত এক পরিবর্তন খুঁজে পায়— সত্যি সত্যি নারী হয়ে গেছে নাকি সে? কি যে নোংরা পরিবেশ। এখনই স্নানের ইচ্ছে হয় তার! টলটল পরিষ্কার জল চাই।

— সব আছে, সব দিমুরে, তুই যাইছ না।

— ছাড় ছাড়, শালা পাখির ডিম খাওরা, ইতর—

— যা চাই তোর, সব দিমু আমি দেখিছ।

— ছাড়, আমারে ছাইড়া দেরে টক্কা, আইজ বাইত অইব।

— কাংরী, খুব খিদা পাইছেনি তোর?

— মর মর।

এমন সময় একজন মানবীর যাবতীয় স্বপ্ন ভেঙে গেলে যেমন হয়— আঁচল খসে পড়ে, বিশ্রীভাবে ব্যবহৃত মনে হয় বুক। যদিও তার শরীরে অনেকদিন ধরেই সূতার নাল পর্যন্ত নাই। এখন আবার অন্ধকার। ঘামে কপালে চুলের গোছা লেপ্টে রয়েছে কিনা কে জানে? কাংরী শান্ত। প্রতিটি ঝড় ঝঞ্ঝার পরে তো মেয়েরা স্বাভাবিক উঠে দাঁড়ায়, বাইরে যায়, আবার ফিরে আসে। তবে কাংরী আর আসেনি।

আট

ঘরের ভেতর কিছু জোনাকি ঢুকেছিল চুপি চুপি। আরেকটা গোবরা পোকা হঠাৎই অস্থির ভোঁ ভোঁ শুরু করে অইরার চারপাশে। বেশ নাদুস নুদুস। তড়পানিও ভালই লাগছে তার। হলে কি হবে— বারবার ছক ভাঙে, বারবারই সে ছক কাটে অতি গোপনে। একাই সে তার ঈশ্বর এখন। একবার, অন্তত একবার একটা মানব জন্মের কল বানাবে সে। কোনরকমে অতি ধর্ষিত একটি যোনি জোগাড় করতে পেরেছে। আরেকটি ক্রীতদাসের লিঙ্গ। শালার শালা নিবীর্য কিনা তাও জানি না। ঐসব যৌনরোগী বনজরভূমির কাছ থেকে তুমি কী ফল কামনা কর?

— বিষ্ঠার পোকারা শোন। কোন কামনা বাসনা নয়— আমি একটি পুরুষ বানাব। পূর্ণ দৈর্ঘ্য লিঙ্গ চাই আমার। পুংলিঙ্গ। প্রকৃত বীর্যবান আর একটি বীজ চাই আমি।

এখন টক্কার শরীরের প্রতি তার যাবতীয় দুর্বলতা সত্ত্বেও অন্যমনস্ক হয় অইরা। আমার কি কোন উত্তরাধিকারী থাকতে পারে না? গোবরা পোকাটা বেশ বড় ও ভারী। উদভ্রান্তের

মত বারবারই অইরার ভুড়ি ছুঁয়ে দিচ্ছিল। তবুও আগুনের আঁচে, তার গনগনে হাসিটা ঠিক আছে। এবং অস্থিরতা ইত্যাদি খুবই উপভোগ করছে অইরা। পোকাটা একসময় থপ কইরা মাটিতে বইসা পড়ে।

নয়

বছর বছর বেশ সুন্দর আনন্দমেলা চলছিল আগরতলার চিলড্রেনস পার্কে। গতকাল চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেল। কে একজন নাকি খুন হয়েছে। চারদিকে পুলিশ। তবু অন্যদিনের মত আজও হরিগঙ্গা বসাকে উঁপচে পড়ছে ভিড়।

চিত্রকথা সিনেমা হলের ঠিক উল্টো দিকে যে ডাস্টবিন, যে রাস্তা দিয়ে সেইদিন রাতে কাংরী চলে যাচ্ছিল বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে, এখন দাঁড়ায়। কত শত ধ্বজভঙ্গ পুরুষ দেখে। ওরাও যেতে যেতে কাংরীকে দেখছিল। সে নিজে পোকাকাটা হলেও কিন্তু লোকগুলোকে দেবতা জ্ঞান করে, গনেশঠাকুর। এতদিন কে বাঁচিয়ে রেখেছে? কাংরী গড় করে। শুধু টক্কার কথা মনে হলেই আর মাথা ঠিক রাখতে পারে না। কেন সে কি করেছে?

— ও দাদাবাবু, সোনামামা, পিসাগো, মৌসা তোমরা শোন— শালার শালা টক্কা আমার আশা নদীতে বান্দ দিছে। রুটি রুজির পথ বন্ধ কইরা দিছে এক্কেবারে!

ভিড়গুলির স্বভাবও ঠিক পিঁপড়ের মত— চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে, গলা উঁচিয়ে একটুখানি উঁকি দিয়ে আবার চলা। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে মাঝখানে কে দাঁড়িয়ে। সেই যে বাদলা দিনের মত। আজও তো নর্দমা লক্ষ্য করছে কাংরী। আরেকটা বুড়া কুত্তা দুই পা পাড়ে দুই পা ডুবে। সিনেমা হলগুলির আশেপাশে যে কয়টা খানাপিনার দোকান আছে, গভীর রাতে তাদেরই পুষ্যি কুকুর বেড়াল, যত উচ্ছিষ্ট ভোগের পরেও যা পড়ে থাকে, বাসন মাজে যে বেটিটা— খুটে জড়ো করে এনে ঢেলে দেয় এই নর্দমায়। ভাতের রোয়াগুলি কিন্তু ডোবে না। কালো প্যাক কাদা থল থল করে। এখন ল্যাম্পপোস্টের নিচে নর্দমার কাছাকাছি যতই সে নামিয়ে আনতে চাইছে মুখ, ততই একটা অস্বস্তিকর অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে। সাদা পুতির মত ভাতগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়। ফলে কাংরী আর দেরী করে না, একটা ঝাপ দেয়। এইবার তার শরীর মাপের যতটা খাদ্য তলিয়ে যাবে তো যাবে। বাকিটা অন্তত খুটে খুটে খেতে পারবে সে। একবার ছলকে উঠে আর নর্দমার ঢেউ নেই এখন। বেশ অর্ধেক ডুবে রয়েছে কাংরী। নিচে হাত পা পর্যন্ত কল্পনা করা যায়না, পাড়ে দাঁড়িয়ে কয়টা গলা ভাঙ্গা কুত্তা শুধু ঘেউ ঘেউ করে।

সব দেখে শুনে এইবার পাখির মত দুই ঠোঁটে অন্ন খুঁটতে শুরু করে। পুট পুট করে আওয়াজ হয়, সঙ্গে জলীয় ভাব। বাংলাদেশে নদীর পাড়েই তাদের বাড়ি ছিল। ছোট ছোট একজাতের মাছেদের গল্প শুনেছিল কাংরী। ওরা দলে চলে। তাদের দাঁতগুলি ক্ষুরের চেয়েও বেশি ধার। হাতিও যদি সে পথে পড়ে— সব বেটাকেই সাবাড় করে দিতে পারে ওরা। এবার কাংরীও যতটা ডুবে রয়েছে নর্দমায়, তার সবই ঠিকঠাক আছে মনে হয়।

সাদা মধুফুলগুলির মধ্যেই এখন তন্ময় হয়ে পড়েছে। আসলে একাগ্রতাও এক ধরনের ধান্ধা। দেখতে দেখতে নর্দমার প্যাক কাদাও যে কোন্ ফাঁকে মা বনে গেল। অসংখ্য বিষ্ঠাপোকার জন্ম দিয়ে চলেছে ক্রমাগত। ছোট ছোট লেজও আছে তাদের, হঠাৎ করে ধরা যায় না। কাংরীর পেটটা ফুলে ঢোল হয়ে যায়।

দশ

পাখি উড়ে যাওয়ার পর ইদানিং মাঝে মাঝে বাজারে যায় টক্কা। নূতন কিছু কথা শোনে। নাসবন্দী, ইমারজেন্সী ইত্যাদি। একদিন কাঁচা মরিচ বেচইন্যা বেটা টক্কার কান টাইন্যা নিয়া কইল— ইতান বাদ দে, ছুন্নত শুনছসনি ক? তবু টক্কা হাবার মত দাঁড়িয়ে থাকলে, বেটাটা এমনই জোরে ধাক্কা দিল— শালা, রফিক আলিরে জিগা গিয়া যা।

রফিক মিঞা খুব আদর কইরা তারে কাছে বয়াইলে, প্রথমে মুখ টিপ্পা, তারপর হাইস্যা কইল—দুইটা দুই জিনিস রে ভাই। নাসবন্দী অইল— তোর একটা পথ বন্ধ কইরা দিলে আর বাইচ্চা অইত না, খুইল্যা দিলে আবার অইব। আমারে দেখছ না— আমি তো কত টাকা পয়সাও পাইছি, কোন বিষ বেদনাও নাইরে।

টক্কার বেবাইট্যামি শুনতে শুনতে এখন অইরাও লুটুপুটু যায়।

— ইতান তো বেটা যত নিবীর্য মাইনষের কথা। আমার কিতা? সেই নপুংসকটা আজ আবার খরার দিনে এমন একটা বানের খবর লইয়া আইল যে— দেখ গিয়া, তোর মাগিটা মাঝ রাস্তায় দাঁড়াইয়া কেমনে ভেংচি কাটে!

কাংরী চলে গেলেও কিন্তু এই খন্ডহরে একজন বনকর্মীর মতই চারপাশে আগুন জ্বালিয়ে সে রাত কাটাচ্ছিল ভয়ে ভয়ে। কুন্ডলীর ওপারেও যে একজোড়া হিজড়া চোখ তারে সারাক্ষণ পাকে পাকে বিঁধে রাখে— টক্কা জানে। খুবই সতর্ক থাকে সে। আর অবসর পেলেই শালির খিলখিল হাসি, আচমকা কথা, চড়াই পাখির মত এখনও শরীরে তুষ ওড়ায়। গরম লাগে। ঘাম হয়। রুটির জন্য আজকাল রিক্সাও চালায় টক্কা।

সকাল বেলা থেকেই আজ গা গরম তার। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। তবু অইরা ভূতের মুখে খবর শুইন্যা আর স্থির থাকতে পারেনা। কান ঝা ঝা করে। ঠান্ডা বাতাস বলতে যত পুরনো কথা মনে পড়ে যায়। কত ভয়, সাপের গাতায় হাত ঢুকিয়ে কাংরীর মন পাওয়া ইত্যাদি।

এখন আর একটুও সময় নষ্ট করে না, এক দৌড়ে বেরিয়ে যায় সে।— কাংরী তাইলে বাইচ্যা আছে দেখা যায়!

এগার

বেটিমুখা বেটাটা এইবার খন্ডহর থাইক্যা বাইরইয়া গেলে গিয়া অইরা আবার তার স্বস্থানে হাত রাখে, বিড়বিড় করে—

— কিয়ের লাইগ্যা যে কথাটা কইতে গেলাম টক্কারে। কাংরী চলে গেলেও কিন্তু শালার শালা আমারে এক্কেবারেই পুছতো না। রাইত দিন আগুনের ভোম্বা একটা সঙ্গে রাখতো সবসময়।

— এর লাইগ্যাই তো রে শালার শালা, তোরে খবরটা দিলাম, দেখ গিয়া যা— তোর মাটি মাগীর শরীর থাইক্যা কেমনে ইন্দুরে ধান লুইট্যা পুইট্যা ঝাঁঝরা কইরা দিছে!

একজন টিপরা বেটার প্রতি এত লোভ থাকলেও কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি তার অভিযোগ নেই। এই সমাজটাকে সে ঘৃণা করে। পরিবর্তনের নিজস্ব চিন্তা ভাবনাও আছে তার, একটা কারখানা। মানুষ বানানির কারখানা গড়তে চায় অইরা।

তার ছকটা কি আবারো মাঠে মারা পড়ল? সে কারিগর রইল ঠিকই, কিন্তু খড় মাটি ছন বন নাই আর। অনেক কষ্টে এক জোড়া কবুতর জোগাড় করেছিল সে, দুইটারে জিন্তা রাখছিল খাওয়াইয়া খাওয়াইয়া। আর ডিম পাড়ার ঠিক আগে মাগীটা উইড়া গেল গিয়া। জীবনে এই প্রথম একজন উত্তরাধিকারীর শোকে সে কেঁদে ফেলে। কিছুতেই

শ্রীদাম দাসী আর রতিরমণের কাছে ফিরে যাবে না। তাইলে কি করা এখন? একটা আধলা ইট অনুমান করে আস্তে আস্তে বসে। কোমরের প্যাঁচ খুলে বিড়ি আর দেশলাই নেয়। আবার কি মনে করে সে হাঁটুর উপর হাত রেখে বারুদ বিচি ধরে বসে থাকে কত সময়।

বারো

ফাল্গুন মাস। বিকেলের শেষ রোদে তেমন তাপ নেই। শুধু রাতে একটু শীত শীত করে। আজ ম্যাটিনীসিনেমার মানুষই বেশি ভিড় করেছিল পোষ্টাপিস চৌমুহনীতে— সেই নর্দমা থেকে ঘটনাটা বেশী দূরে নয়।

দেখোরে! দুইটা কাঠি দিয়ে এবার নিজের পেটেই ঢোল পিটাতে থাকে কাংরী। তার নাক মুখ ফুঁড়ে দলা দলা গরম শ্বাস সাপের জিহ্বার মত তেড়ে ফুড়ে বেরিয়ে আসছিল বোঝা যায়। খুব গোঁসা। সে দীর্ঘ মাইট্রল নখগুলি দিয়া অনবরত পেটে আঁচড় কাটতে থাকে বা ঢোল পেটাতে থাকলে— দেখোরে, শালার বেটা টক্কা— আমার স্বপ্নচোখ উপড়ে নিল যে বাদুড়ে, তার রক্ত খাই আমি! সত্যি হাতের কাছে যা পায় এখন তাই গিলে খাচ্ছে কাংরী। বিশেষ করে— উড়ে আসা গাছের পাতা ও পায়ে পায়ে শিকড় জাতীয় সবকিছু। আরেকদলা গলিত গোবর মুখে পুরে দিলে ট্রাফিক পুলিশও হেই হেই করে ওঠে।

— কাংরীরে, খুব খিদে পাইছেনি তোর?

— মর মর।

তার চোখের পুতলি দেখেই বোঝা যায়— এখন আর মানুষ থেকে মানুষ আলাদা করতে পারে না কাংরী। ফলে বাতাসেই বিষ ছুড়ে দিচ্ছিল সে। হাতের চেটো ও আঙ্গুলগুলির অবশিষ্ট গোবরে বালুমাটি মাখে এই বার। তারপর লম্বা জিহ্বা দিয়া শব্দ করে আচার চাটতে থাকে।

এই দৃশ্যটিকে বাঁশে বালুতে কড়কড়ি শব্দ করে ওঠার মত কিছু একটা মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে পথুয়া পোলাপানও ঢিল ছুঁড়তে শুরু করে। হেই হেই করে ওঠে ট্রাফিক পুলিশ। শুধু কাংরীকে কেউ ধরে রাখতে পারে না। বৃত্তের ভেতরে বুড়িছুঁই খেলার মত ছুটোছুটি করতে থাকে— মার মার, টক্কার মাথা সই কইরা মার। চিৎকার করতে করতে এইবার সে তার পরিণত পেট তুলে ধরে জনসমক্ষে। অথচ উড়ন্ত আধলা ইঁটগুলি এসে পড়ে তারই মাথায়। পিচকারী দিয়ে রক্ত। এক্কই— শব্দ করে মাটিতে বসে পড়ে সে।

— কাংরীরে ওঠ ওঠ— ১, ২, ৩, ৪, ৫...। সে পুরোপুরি অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে কিন্তু তার সামনে এসে দাঁড়ায়নি টক্কা। গায়ে হাত দেয়নি।

তেরো

সতীর দেহ নিয়ে শিব যখন খন্ডহরে এসে পৌঁছল, তখন আবার অন্ধকার। মেঘে ঢেকে ফেলেছে চাঁদ। সদ্য রাত হয়েছে। আগুনে টায়ার পুড়া দিয়েছে অইরা। বল্কা বল্কা ধোঁয়া। তাছাড়া ঘাড়েও তার ভীষণ ভার লাগছে। হাঁটু দুইটার খিল খুলে যাচ্ছে। কাংরীকে আবার ফিরিয়ে আনা গেছে। ফলে ঘরময় এখন কেবল গোঁসা, কালো বল্কা বল্কা। এর মধ্যে লোম পোড়া একটা শূয়র নামিয়ে রাখার মত— প্রথমে লেজ, তারপর ফটাশ কইরা মাটিতে ফেলে দিল টক্কা। এছাড়া আর কোন শব্দ হল না। এবার একটা বিড়ি লাগে! কিন্তু টায়ারের তীব্র ঝাঁঝ গিলে খায় সে। বমির ভাব করে। সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের

শিকড়ে এখন ওদেরই গায়েগায়ে টক্কাও শুয়ে থাকবে অন্য কারণে। আবার কি পাহাড়ে ফিরে যাওয়া যাবে? টাক্কালের একেকটা কোপ, কয়টা মাত্র বীজ পুতে বিড়ালের গু লুকোনোর মত এই জীবন— শুধুই আকাশের দিকে মুখ তুলে বসে থাকা আর ভাল লাগে না তার। এখানে আর কিছু না হউক, প্রচুর জলের ব্যবহার আছে, পেট ভরে ঢেকুর তুলে আগরতলা শহরে ঘুমিয়ে থাকাও অনেক ভাল।

যেন ডুবে যাচ্ছে ক্রমশ। কে জোর করে তার চোখের পাতা এক করে দিচ্ছে। বড় ভয়। অইরাটা কই? শুয়ে পড়েছে নাকি টক্কারই পাশে? খপ করে যদি ধরে ফেলে? আর না ছাড়ে? কাংরীটাও ভীষণ বোকা। খালি উচাটন করে, হাতের একটা পাখি যে বনের দুইটা পাখির চেয়ে অনেক ভাল, বোঝে না।

তখন তারে নিয়া খন্ডহরে ঢুকতে ঢুকতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছিল টক্কা। চিতার চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে এগুলো কি? নড়াচড়াও করে কালোর মধ্যে সাদা সাদা। হালকাগুলি আবার উড়ে উড়ে আগুনে পুড়ছিল। আসলে তাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল জালালী কবুতরের পালক, ছাল চামড়া ইত্যাদি। অইরার গোঁসা এমনই। সবই লন্ডভন্ড করে ফেলে। কয়টা নারকেল ঠুলিও আছে তার নিজস্ব। গোপন লবণ, মরিচের গুড়া ইত্যাদি সবই গড়াগড়ি যায় এখন। ছাদের শরীর থেকেও ঝুরঝুর চুন সুড়কির বৃষ্টিপাত চলে। এবং কানের কাছে হঠাৎ এক ঝড়বাতাস বয়ে গেলে, আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে বসে পড়ে টক্কা, ভয়ে কাঁপতে থাকে— মা তক্ষকটা প্রতিশোধ নিতে আসেনি তো? না। শালা কানাবাদুড় সব ঘর করেছে এখানে।

চোদ্দ

কাংরীর শিওয়ের পাশে সেই আগুন আবার নিবু নিবু। কিন্তু হাতের কাছে এতটুকু জ্বালানী পায় না টক্কা। অন্ধকার যত বাড়ে আরো অস্থির হয়ে পড়ে সে। অইরাটা গেল কই? কথা কহনা কেনে লো কাংরী?

কিছু সময় এইভাবেই কাটে। অল্প আলোয় একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে টক্কা। এবার কার শরীর কাঁপছে— ওর না আমার? আরো ঘনিষ্ঠ হয়। সন্দেহ বাড়ে। আশাও জাগে।

— জল খাইবিনি লো কাংরী?

দাঁতে দাঁতে বিকট শব্দ করে ওঠে। আরেকটা হাত এসে পড়ে টক্কার কোলের কাছে। তীক্ষ্ণ নোংরা নখ। একজন মাকড়ি কোনরকমে টক্কার কোলের কাছে। তীক্ষ্ণ নোংরা নখ। একজন মাকড়ি কোনরকমে টক্কার নাভি খুঁজে পায়, আলতো হাতায়, হঠাৎ খামচে ধরে।

— ছাড় ছাড়।

গাছ-হরিণীর শিং! এইবার কোন দিশা মিশা নাই, টক্কার পেটের ভিতরেই গুচ্ছমূল ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

— আমারে ছাইড়া দে। টক্কা কাঁদতে থাকে। আগুনের ধারে কাছেই হাতড়াতে থাকে কেবল। বগলের রগগুলিও মনে হয় ছিড়ে যাবে, তাই শেষবারের মত সে শিথিল হয়ে পড়ার আগে আর ছুঁইতে পারে না কিছুই। একসময় একখন্ড ঘর্মাক্ত কাঁচাকাঠ, তার ধোঁয়ার গন্ধও পায়, পেয়ে যায় টক্কা। উন্মাদ হয়ে যায় আর কি! এলোপাথারি ছেকা দিতে থাকে কাংরীর চোখে মুখে। — মা তক্ষক এইবার অন্তত ছাইড়া দে আমারে—

ভেতরে ভেতরে অনেকক্ষণ আগেই ছাই হয়ে যাচ্ছিল কাংরী। এইবার বেশ জোর বাতাস বইছে খন্ডহরে। বাতাসই কথা কইছে। তাড়াতাড়ি সমস্ত পুড়ে আগুনও নিবু নিবু এখন। শুধুমাত্র শুকনো ছায়া একটা কোথা থেকে উল্টেপাল্টে এসে কাংরীর তলদেশ থেকে একখন্ড মাংসপিন্ড কোলে তুলে নিল ঝটিতি। ছেড়া তেনা গামছা দিয়ে দ্রুত ঢেকে ফেলল। আবারো গড়িমসি করে উল্টে পাল্টে একই দমকা হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে এল এই খন্ডহর থেকে।

প্রেম

শিবতোষ ঘোষ

শ্রাবণীকে আমার শেষ চিঠি ছিল, এখনও তার একটা লাইন মনে আছে, আমার যদি ক্ষমতা থাকত তা হলে শ্রাবণী তোমার একটা চুলও আমি ছাড়তাম না।

কিন্তু আমি অবাক হয়ে যচ্ছি, শ্রাবণী হাঠৎ চোদ্দ বছর পর আমার খোঁজে এল কেন?

চোদ্দ বছর বনবাস, এর সঙ্গে কোনও মিল আছে নাকি?

আমি বাড়ি গেছি, গিয়ে শুনি শ্রাবণী এসেছিল।

— কে শ্রাবণী?

আমার যেন ধন্ধ হয়।

কুমকুম বলল— তোমার বউ!

আমার ওইটুকু ছেলে পর্যন্ত জানে কুমকুমই আমার বউ, সে বেশ মজা করে আধো-আধো বলে— বাবা, মা তোমার বউ? আমি কুমকুমকে বুকে টেনে নিয়ে বলি— আমার হৃদয়েশ্বরী!

শ্রাবণীকে নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনও গোপনীয়তা নেই। কুমকুম আমার পারমিশান নিয়েই আমায়র ডায়েরী পড়েছে, ক্লাস এইট থেকে কলেজ পাস করা পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লেখা আছে। কি জানি কিসের তাগিদে আমি আমার শেষ চিঠিটাও ডায়েরিতে টুকে রেখেছিলাম: আমার যদি ক্ষমতা থাকত তা হলে শ্রাবণী তোমার একটা চুলও আমি ছাড়তাম না।

কিন্তু যেহেতু ক্ষমতা নেই সেহেতু তাকেই ছেড়ে দিতে হয়েছে। এখন কুমকুম ঠাট্টাচ্ছলে মনে করিয়ে না দিলে আর মনে পড়ে না।

আমি তার বিয়ের পাঁচ-ছ' বছর পরে বিয়ে করি, আমি বোধহয় আমার প্রেম নিয়ে একটু বেশি কবিত্ব করে ফেলেছিলাম।

গোড়া থেকে দেখছি শ্রাবণীর প্রতি কুমকুমের অদ্ভুত একটা বিদ্বেষ আছে, বিদ্বেষ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তার বিদ্বেষ সে আমাকে বাতিল করেছে বলে।

— এত স্পর্ধা তোমাকে বাতিল করে! তাহলে ডুবে ডুবে জল খেত বলো।

আমি বললাম— না, সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছে!

— কিন্তু তোমাকে বাতিল করল কেন, আমি তো তোমার সঙ্গে এত বছর সংসার করছি, কই আমার দারুণ ভাললাগে তোমাকে, আমি তো তোমাকে দারুণ ভালবাসি।

— ধ্যাৎ, এখন শ্রাবণী-টাবনি ছাড়ো তো!

•

আমি পনের কুড়িদিন অন্তর বাড়ি আসি। শহরের পাশে একটা আইডিয়াল গ্রামে আমার বাড়ি। নদী আছে, জঙ্গল আছে, খেতখামার-বাঁশবাগান, কোকিল-ঘুঘু পাটকাক-উদবিড়াল... একশো বকম ঘাসফুল চারদিকে ছড়িয়ে। এই ফুল-পাতার হাটে আমি, আমার

স্ত্রী, মা আর ছোট্ট খোকা— মোটামুটি নিরবচ্ছিন্ন সুখে আমরা বসবাস করছি। আমি শেষ কেঁদেছি আমার বিয়ের সময়, প্রচণ্ড কেঁদেছি, কিন্তু সে কি শ্রাবণীর জন্য? তার বিয়েতে তো একেবারে খট্‌খট্‌ করে গেলাম। তাকে মাঝে বসিয়ে মহিলামহল তখন সাজাচ্ছিল, গীতবিতান ধরিয়ে দিয়ে নেমে এলাম। রাগে নিজের নামটাও পর্যন্ত লিখিনি। বেরিয়ে আসার সময় মেসোমশায় জিজ্ঞেস করলেন, খেয়েছ তো? আমি মিথ্যে অথচ সহজ ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়েছিলাম। কিন্তু প্রায় দুশো সাক্ষী আছে, সেই আমি আমার বিয়েতে কীরকম ছেলেমানুষের মতো...। সবাই ধরে নিলো আমি শ্রাবণীর জন্যে কাঁদছি। সাধারণভাবে ছেলেরাই বিট্রে করে, মেয়েরাই কাঁদে, কিন্তু কোনও-কোনও রাক্ষসীও আছে এবং আরও বড় কথা কোনও ছেলেও যে এরকম একটা রাক্ষসীর জন্য এমন হাউ-মাউ করে কাঁদতে পারে তাদের কাছে এ দৃষ্টান্ত ছিল খুবই বিরল।

বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেল, শীতকাল, কুমকুম গরমজলে আমার পা ধোয়াচ্ছিল। আমি বাধা দিলে বলে— আমি তোমার রক্ষিতা নই। এসব কথা শোনার ভয়ে আমি আর বাধা দিইনি, যা খুশি করুক। সে পনেরো দিনের শোধ একদিনে তুলে নেয়। কাছে থাকলে সিগারেটটা পর্যন্ত ধরিয়ে খেতে দেয় না। আমাদের এমন মধুর জীবনে হঠাৎ শ্রাবণীর আবির্ভাব রীতিমতো বেমানান। আমি আর জিজ্ঞেস করলাম না শ্রাবণী কেন এসেছিল। এসেছিল-এসেছিল, বাড়িতে তো কত লোক আসে, শ্রাবণীও তেমনি একটা লোক।

কুমকুম সোজা হয়ে মা কোথায় দেখে নিয়ে আমায় একটু চুমু খেলো।

সে-ই হাসতে হাসতে বলল— জানো, তোমাকে দেখতে এসেছিল, বলল চন্দনদা'কে কতদিন দেখিনি! আবার আসবে বলে গেছে।

ফস্‌ করে বলে ফেললাম— কেন, ওর স্বামীর কিছু হলো-টলো নাকি?

— ভ্যাট্‌, এ কী ইয়ার্কি? এসো মা ডাকছে, খাবে এসো।

খেতে-খেতে মা বলল— শ্রাবণী এসেছিল তোর সঙ্গে দেখা করতে। যাওয়ার সময় আমাকে জড়িয়ে বলল— মাসিমা, আপনার বউ আপনাকে ভালবাসে, আপনি সুখী তো?

মা'কে আর জিজ্ঞেস করলাম না, তুমি কি বললে, আমি অল্প খেয়েই উঠে পড়লাম।

এও একটা আমাদের মজার দৃশ্য, যেদিন আমি কম খেয়ে উঠি সেদিন একদিকে মা ধরে, একদিকে কুমকুম ধরে, একজন হয়তো পটলভাজা মুখে পুরছে, একজন পোস্তভাজা। — কী মুড়মুড়ে হয়েছে খেয়ে দ্যাখো।

আজ আর কেউ কিছু বলবে না। ওরা ধরে নিলো আমি শ্রাবণীকে নিয়ে কিছু ভাবছি। হয়তো দুজন দুজনকে মনে মনে বকছে— আপনি খাওয়ার সময় বললেন?

— তুমি তো ধুলো পায়েই বলতে শুরু করে দিলে, আমি সব শুনেছি।

মা আর কুমকুম খাচ্ছে, আমি ঘরে এসে বিছানায় বসে আরাম করে একটা সিগারেট ধরালাম। আমার বাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় আমার বিলাসিতা, মজুরটাকে বললাম নদীর পাড় থেকে এক ঝুড়ি বালি নিয়ে আয় তো, হয়তো একঘণ্টা ধরে নদীর বালিতে পা ডুবিয়ে বসে রইলাম। বহুকালের পুরনো আশুদগাছ ছিল পাড়ায়, কেটে নিয়ে গেছে, কোনওদিন দু'আড়াই ঘণ্টা গিয়ে সেই কাটার ওপরে বসে থাকি। কুমকুমকে নিয়ে মাঝে মাঝে বাঁশ-বাগানগুলোতে বাঁশকড়া দেখতে যাই, তাকে আঙুল বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখাই, হাত দিয়ে ফেলেছিল একদিন, হাতভর্তি রোঁয়া শুয়োপোকার কাঁটার মতো হাতে পিল পিল করছে আর কুমকুম ভয়ে অ্যাঁ-অ্যাঁ করছে।

কুমকুমও খুব প্রকৃতিপ্রেমিক, কোথাও জোড়া-শালিক দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ডেকে দেখায়।

কোনওদিন জ্যোৎস্না দেখে দু'ঘণ্টার জন্য বঁচার নৌকা ভাড়া করে নিলাম, আমরা দুজনেই মোটামুটি গান জানি— এই পথ যদি না শেষ হয়... এই পৃথিবীটা যদি স্বপ্নের দেশ হয়... কিন্তু শ্রাবণী এর মাঝখানে ঢুকে গিয়ে, না: তার ঢোকার আর কোনও রাস্তা নেই, সে এখন গাছের শেকড়ের মতো, আমরাই এখন ফুল-ফল।

কুমকুম রান্নাঘরের পাট সেরে ঘরে ঢুকল, আমি তখনও গুন-গুন করে গাইছি: এই পৃথিবীটা যদি...

কুমকুম বলল— কী বউ এসেছিল বলে খুব ফুর্তি যে!

আমি তাকে তুলে নিয়ে এক প্যাঁচ ঘুরিয়ে খাটে আছড়ে দিলাম।

কুমকুম উঠতে যেতে বললাম— কী হল?

— দাঁড়াও তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।

আমার সেই ডায়েরিটা নিয়ে এল। গায়ে ধুলো-টুলো নেই, এর মানে সময়ে সময়ে ব্যবহার হচ্ছে। নিয়ে এসে আমার সামনে এক চান্সে একটা পাতা খুলল।

আজ শ্রাবণীর কাঁধে হাত রাখি। আগুনে হাত দেওয়ার মতো ভয় করছিল। কী হয়ে গেল, তার পাতলা শাড়ির মধ্যে সেই দুই মনোমুগ্ধকর... কিন্তু সত্যি সত্যি ছ্যাঁক করে উঠল যে। আমার পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, মাথার ছাদ নেবে আসছে।

— ধুস্ এসব ছেলেমানুষি রাখো তো!

ইয়ার্কি মারলাম— তার বুক-টুক কেমন দেখলে বলো। আমি হো-হো হাসছি, কুমকুম আমাকে টেনে নিয়ে বলল— এই যে মশায় এখানটা পড়ো!

আজ প্রতিজ্ঞা করছি রাত দশটা থেকে এগারোটা প্রতিদিন একঘণ্টা করে শ্রাবণীকে ডাকব— শ্রাবণী-শ্রাবণী...

আজ একঘণ্টায় চব্বিশ হাজার চারশোবার ডাকলাম।

আমি খপ্ করে হাত বাড়িয়ে ডায়েরির ওই পাতাটা ছিঁড়ে ফেলি। কুমকুম আঁ... করে ভেতর থেকে একটা চিৎকার করে ওঠে।

রাতটা আমাদের ভাল কাটেনি। কী হয়ে গেল যে— দুধ কেটে গেলে যেমন হয়! সকালে বাপ-বেটায় কিছুক্ষণ টেনিস খেললাম, মাকে দাওয়ায় বসিয়ে তার কাছ থেকে খানিকক্ষণ পুরনো দিনের গল্প শুনলাম, ইউক্যালিপটাস চারা দুটোর গোড়া কুপিয়ে দিলাম, রান্নার জন্যে সজনেডাঁটা পেড়ে দিলাম। মা জিজ্ঞেস করল— সজনেফুল খাবি?

আমি বললাম— না থাক্। ফুল খেতে আমার কষ্ট হয়।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে একটু শুয়েছি, সকালে উঠে আমার পনরো কুড়িদিনের চলে যাওয়া, সাধারণত দুপুরে কোনওদিন শোওয়া হয় না। নিমাই, বচনদা এল দেখা করতে। আমাকে গ্রামের সকলে খুব ভালবাসে। কিছু উপকার করতে না পারি আশ্বাস দিতে দোষ কি!

উঠতে যাচ্ছি কুমকুম এসে ধমক দিল।

— ঠিক আধঘণ্টা শুয়ে থাকবে, আমি ওদের বসাচ্ছি, চা করে দিচ্ছি।

— এই তাহলে তুমি মাকে বলো।

— কী?

— চা করতে, তুমি একটু এসো।

কুমকুম এল না, আমি অনেকক্ষণ বিরক্ত হয়ে শ্রাবণীর কথা মনে করতে লাগলাম। শ্রাবণীর একবার ভীষণ জ্বর হয়েছিল, আমি তার কপালে জলপট্টি দিয়েছিলাম, রাসপূর্ণিমার রাতে ছাদের ওপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘন্টাখানেক চাঁদ দেখেছিলাম, গানের স্কুল থেকে শান্তিনিকেতন গেছলাম, দুজনে একটা রিক্সা নিয়ে দ্রষ্টব্যস্থানগুলো ঘুরেছিলাম, আর ওই কাঁধে একবার... আমার প্রেমের দাবি বলতে এই। তখন বয়স কম ছিল, এই সামান্য কারণের ওপর ভিত্তি করে তাকে একখানা বিশাল চিঠিও লিখে ফেললাম— আমার ক্ষমতা থাকলে শ্রাবণী... এসব এখন ব্যঙ্গের মতো শোনায়।

শ্রাবণী একদিন আমার জন্যে লুচি আর মাছভাজা এনেছে। আমি তখনও কাঁটামাছ বেছে খেতে পারতাম না, মা বেছে দিত। শ্রাবণী আমার মাছ খাওয়ার রকম-সকম দেখে কী হেসেছিল, জোর করে কাঁটা বেছে দিয়েছিল।

আমি এখন নিজে নিজেই চেঁচিয়ে উঠলাম, এগুলো কি প্রেম, এ এতো মাছ বেছে দেওয়া। শ্রাবণী বড়োলোকের মেয়ে, ওর বাবা নামী ডাক্তার। আমার একবার কঠিন অসুখ সারিয়েছিলেন, সেই থেকে পরিচয়। প্র্যাকটিক্যালি ওর বাবা-মা'র কাছে আমি ভীষণ ঋণী। আর এক মজার ঠাকুমা ছিল, হারমোনিয়ম মাঝখানে আমরা দুজন গল্প করছি, বুড়ি এসে বলত, ঠাকুমা রেওয়াজকে চর্চা বলত— চর্চা বাদ দিয়ে তোরা প্রেম করছিস! ঠাকুমাকে টেনে এনে হারমোনিয়মের কাছে বসিয়ে দিতাম দুজেন— দিদা, একটা গান গাও। প্রেমের প্রসঙ্গ ভুলে যেত, সে বলত— তোরা গা আমি শুনি, আমার এ ফোকলা দাঁতে কি গান হয়!

— বেশ হয়, হরি দিন তো গেল তো হবে, নাও!

শ্রাবণী সুর ধরিয়ে দিত, আমি তবলা টেনে নিতাম ধা-ধা ধিন্ তা, তেটে ধিন্ তা...

নাঃ, এ-সবের কোথাও শ্রাবণীর কোনও প্রেম ছিল না। সে এসেছে অন্য কোনও কারণে, হয়তো অন্য কোনও ধান্দা আছে।

আধঘণ্টা হয়ে যেতে কুমকুমই গায়ে হাত দিয়ে ডেকে দিল, আমি তাকে না ধরে খাট থেকে নেমে চলে এলাম।

বিকেলটাও এভাবে ঘুরে-ফিরে কাটল, স্কুটার নিয়ে সুবলদার চা দোকান পর্যন্ত একটা ট্যুর দিয়ে এলাম।

কোথাও মন বসছে না। শরীরে কোথাও একটা ঘা থাকলে যেমন কিছু ভাল লাগে না।

কুমকুমকে বলেছিলাম, চলো সিনেমা দেখে আসি। সে বলল, যাওয়া হবে না, কাজ আছে।

— কী কাজ?

— নাম বলতে নেই, প-এ হস্সই ঠয়ে একার, বুঝেছ?

তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে!

শ্রাবণী আমাকে বিয়ে না করে ভালই করেছে, সেটা বড় দৃষ্টিকটু হত। তাকে রাখতাম কোথায়! শুধু হৃদয় ছাড়া আমার সর্বত্র প্রচণ্ড দীনভাব। কুমকুম সাধারণ বাড়ির মেয়ে, কোনওরকমে ঘুস-ঘাস দিয়ে একটা মাস্টারী জোগাড় করেছে, ওর দাদার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল, সেই সূত্রে বিয়ে। আমি বিয়ের আগেও বেশ কয়েকবার ওদের বাড়ি গেছি, কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক কুমকুমকে তখন দেখিনি, ওদের বাড়িতে সদর-অন্দরের ভাগটা একটু বেশি ছিল।

একদিন শুধু দুটো ফর্সা পা দেখেছিলাম, তোড়া পরে বারান্দা দিয়ে ঝুমঝুম করে পার হচ্ছিল। সেই দৃশ্যটা আর শব্দটা কোথাও যেন ধরা হয়েছিল, এখানেও বাড়াবাড়ি

করলাম, বললাম,— মেয়ে আমার দেখা, আর দেখার দরকার নেই। কথাবার্তা হয়ে গেল, বিয়ে হয়ে গেল।

আমার একটা ভয় এসে গেছলো যে কাউকেই যদি পছন্দ না হয় কিংবা যাকে-তাকে হয়তো হ্যাঁ বলে ফেললাম। তখন মেয়েদের ওপর এমন অ-আসক্তি যে বিয়ে না করলেও চলত। এখন কুমকুম এক-একদিন টিপ্পুনি দেয়— এই লোক বিয়ে করবে না বলেছিল যে কী করে বুঝতে পারছি না। আমি কোনওদিন যদি শ্রাবণীর জন্যও কেঁদে থাকি তাহলেও কুমকুম প্রমাণ করে দিয়েছে, সেগুলো সব অনর্থক বাড়াবাড়ি। আমি যেমন স্বামীর আদর্শ, কুমকুমও তেমনি আদর্শ স্ত্রী।

তাই চোদ্দ বছর পর, যে শ্রাবণী অত্যন্ত হীন শ্রাবণী, সে এসে যে এমন ঝড় তুলে দেবে, ভাবতেই পারছি না।

আমি-মা-কুমকুম, আর খোকা আমার কোলে, চারজনে উনুনের পাশে গোল হয়ে বসে পিঠে খাচ্ছি। শীতের রাতে এভাবে গল্প করতে করতে খাওয়া বেশ জমে গেছলো। আমার বাবার কথা উঠল, খুব পিঠে খেতে ভালবাসত। কিন্তু খোকা আমার মুখটা টেনে বলল— বাবা-বাবা...মা, আমাদের বাড়ি কে এসেছিল?

— কবে?

— ওই যে... দিদা?

কুমকুম বলল— ও পিসি!

— পিসি! জানো বাবা, পিসি আমাকে কোলে করেছিল।

আমি বললুম— বাঃ!

আমার মুখটাকে ফের টানছে।

— শোনো না! পিসি আমাকে কোলে নিয়ে বলছে, আমাকে মা বল্, মা বল্! আমি হঠাৎ চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কাকে?

কুমকুম হঠাৎ জোরে হেসে উঠল।

আমি আর না, আর না করে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে পালিয়ে এলাম।

আমার প্রিয় বাতাবিতলায় বরাবর একটা দড়িখাট পাতা থাকে, আমি সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললাম, এবার আমি চাঁদ দেখব। অথৈ কুঁকড়ানো সমুদ্রের ফেনার মতো আকাশ, তার মাঝখানে চাঁদ। আজ কোন্ তিথির চাঁদ, দ্বাদশী?

মা'কে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম— মা পূর্ণিমা কবে?

মা বলল— আজ দ্বাদশী, হিসেব করে নে!

আমার দ্বাদশীটাই দরকার। আমি একবার না শুনেই বলে দিয়েছিলাম গাছটায় কতগুলো কাঁঠাল আছে। কেটে নামানো হচ্ছে, বোঁটায়-বোঁটায় চুন লাগিয়ে রেখে পাকাতে হবে, গাছে পাকানোর শত্রু অনেক।

কুমকুম বাজি ধরলো। বললাম— যদি বলে দিই! — একশো টাকা। — একান্নটা। গুনে দেখা গেল পঞ্চাশটাও নয়, একবারে একান্ন। অথচ শ্রাবণী কেন এসেছিল? আমাকে দেখতে চাইবে কেন, হিমালয়কে কেউ যদি ভালবাসে, হিমালয়ও কি তাকে ভালবাসবে? সে তো পাথর! তাহলে শ্রাবণী পাথর নয়।

ভালবাসার দাম চোদ্দ বছর পরেও রিটার্ন পাওয়া যায়।

বাতাবিগাছের ঝাঁকড়া ডালের ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্না গলে আসছে, কলাগাছে চার-পাঁচটা কলাবাদুড়ের বাচ্চা। পাকা কলা খুঁজতে আসে। ঝড় ঝড় করে একটা শব্দ হল ঢিল ছোঁড়ার মতো। আমি টর্চ জ্বালালাম, আবার ঝড় ঝড় করে পালিয়ে গেল। ডাবফুল ফুটেছে, গন্ধ আসছে, খুব হাল্কা গন্ধ; ফুলগুলোরও অবিকল চাঁদের মতো রঙ।

কখন কুমকুম এসে দাঁড়িয়েছে, তার খুব পাতলা পা, চলার সময় পায়ে কোনও শব্দ হয় না।

শ্রাবণীর পায়ে শব্দ হয়? না, মনে নেই?

সরু-সরু আঙুল, আঙুলের ডগায় দুটো আঙুলে আঙট, বাদামি নখ। কিন্তু এতো কুমকুমের পা।

হঠাৎ কুমকুমকে বললাম— তোমার একটা পা দেখি?

কুমকুম শাড়ি তুলে দেখালো! আমি একটু গুম হয়ে গেলাম। তারপর ঠোঁট নত করছি দেখে কুমকুম বলল— ভ্যাট্!

ঘুরে ফিরে সেই শ্রাবণীর কথাই আসছে আমাদের মধ্যে।

— এই, তোমার বউ না, বিশাল করে টিপ পরে, একদম মানায় না!

— তুমি বলে দিলে না কেন?

— আমায় বয়ে গেছে, খারাপ দেখালে তো ভাল, তবু আমার ভয় কমবে, এই ভদ্রলোকটিকে তো চিনি!

— এই তোমাদের মধ্যে কে বেশি সুন্দর?

— আমি?

কুমকুম তাড়াতাড়ি এমনভাবে বলল যে আমরা দুজনেই খ্যাক্-খ্যাক্ করে, না দু'বার হেসেই থমকে গেল কুমকুম। সে ভয় পাচ্ছে শ্রাবণীর কাছে না হেরে যেতে হয়! কী মুশকিল! এখানে হারজিতের কোনও প্রশ্নই নেই! ফুলের যত দামই হোক শুকিয়ে গেলে তার আর...

— না চলো, শুয়ে পড়তে হবে, কাল স্টিলে যাব!

স্টিল মানে আটটা পঁয়ত্রিশ, আমার যাওয়ার ট্রেন দশটা পাঁচ।

— কেন?

আসলে ভাল লাগছে না।

বললাম— একটা কাজ ফেলে এসেছি, খুব জরুরি।

গত রাতে ভাল ঘুম হয়নি, ঠাণ্ডা জল খেলাম, চোখে জলের ঝাপটা দিলাম। আমার অনেকদিন পর এই ঘুমহীন রাত, ভয় হল আজকেও যদি ঘুম না হয়! সেই আগের মতো শ্রাবণী-শ্রাবণী চব্বিশ হাজার চারশো বার, ওরে বাবা, মুখ ব্যথা, গুনে গুনে আঙুল ব্যথা।

কোত্থেকে শ্রাবণী চলে এল, কেন এলে তুমি,আমার কুড়িদিনের একটা দিন, কুমকুমের বুকে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকি, তুমি আমার এই প্রিয় সুখটাও কেড়ে নিলে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে এক-একটা অভিশাপ থাকে, শ্রাবণীও তেমনি আমার একটা অভিশাপ।

কুমকুম মশারি ঠিক করতে-করতে বলল, যে মশারি ঠিক করে আমি তার গায়ে হাত রাখি, এ এক অদ্ভুত খেলা। কতো বয়স পার হলে লোকে ম্যাচিওর হয়? কুমকুম বলে, তুমি ম্যাচিওর হলে না!

শুলো।

গালে গাল রাখলাম।

— এই খোকা কেমন পাজি দেখেছ?

— ও যে এত ত্যাঁদোড় দেখে বোঝা যাবে না। মনে রেখে যে পরে বলে দেবে দেখলে কারো বিশ্বাসই হবে না!

জিজ্ঞেস করলাম— হ্যাঁ, তারপর কী করলো, ও কি মা ডাকল?

— ডাকতেও পারে, বিচ্ছু— বিচ্ছু, লাইক ফাদার... জানো তো ব্লাড রিলেশনের চেয়ে হার্ট রিলেশন বড়!

আমার বালিশের নীচে ঘড়ি রেখে শোওয়া অভ্যেস, ঘড়িটা টিক-টিক করছে, আর বুকের ভেতরে আরও একটা বুকের টিকটিক শব্দ।

প্রেমের প্রসঙ্গে জ্যোৎস্না যেমন আছে, তেমনি আছে অন্ধকারের সঙ্গে গভীর যোগ। আমি কখনও এ মুহূর্ত নষ্ট করি না। কিন্তু আজ যেন আমার শরীর মাথা দুটো আলাদা হয়ে গেছে, শরীর যে কথা বলছে মাথা শুনছে না। কুমকুমকে ঠেললাম— ঘুম পাচ্ছে?

— না?

জিজ্ঞেস করলাম— আচ্ছা শ্রাবণীর তো ছেলেমেয়ে আছে?

— হ্যাঁ, দু মেয়ে।

— ব্যাপারটা অ্যানালিসিস করো তো!

— কোন ব্যাপারটা?

— শ্রাবণী কেন এসেছিল?

দুজনেই খুব সিরিয়াস হয়ে গেলাম। কুমকুম বালিশে বাঁ কনুই মুড়ে, আমি ডান কনুই মুড়ে।

— এই!

কেউ আর একটু ঝুঁকে গেলে নাকে নাকে ঠেকে যাবে আমার ছেড়ে দেওয়া নিঃশ্বাস কখনও কখনও কুমকুমেরও নিঃশ্বাস হয়ে যাচ্ছে! আমার মুখটা ঠেলে একটু সরিয়ে দিল।

কুমকুম বলল— ওর একটা আগের ছবি থাকলে ভাল হত!

— কেন?

— তুমি যে এত মোহিত হয়েছিলে কেন,একটু দেখতাম!

শ্রাবণীর কয়েকটা ছবি ছিল, একদিন ছিঁড়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি। সেও এক ছেলেমানুষি। যেন আমি আমার কোনও প্রিয়জনকে দাহ করে এলাম, অশৌচ পালন করলাম তিনিদিন, তিনদিন দাড়ি কাটলাম না, জুতো পরলাম না, আমিষ খেলাম না!

কিন্তু দাহ-র পরেও যে বেঁচে থাকে তাকে কী করবো!

আমি একটু রেগে উঠলাম।

— জানো আমার মনে হচ্ছে ওর হাজবেন্ডের কিছু একটা অভাব আছে, সেটাই চোদ্দবছর ধরে শ্রাবণীকে কুরে কুরে খাচ্ছে!

কুমকুম হাসল।

— কী হাসলে যে?

— সে তো তোমারও আছে!

আমার যে হাতটা গালপাট্টায় ঠেক দেওয়া ছিল সেটা হঠাৎ ফসকে গেল, মাথার নীচে পড়ে গেল।

কুমকুম লেপ টেনে মুখ পর্যন্ত চাপা দিয়েছে, আমি মাথার দিকে অনেকটা উঠে গেছি, আমার প্রায় আধখানা খোলা।

কুমকুমকে বললাম— এই আমার শীত করছে যে! সে আমাকে টেনে ঢাকা দিল।

না-না ও এমনি ইয়ার্কি করছে, আমাদের মধ্যে কী সুন্দর আন্ডারস্ট্যান্ডিং! আমি আজকাল মাছের গন্ধ সহ্য করতে পারি না সেজন্য আমি এলে মাছ খায় না। কে বলেছিল মেয়েদের চুলে হাত দিলে চুল উঠে যায়, এই ভয়ে কোনওদিন তার চুলে হাত দিতেই পারতাম না!

হাসতে-হাসতে বললাম, যাই বলো, শ্রাবণীকে চোদ্দবছর পরেও আমার কাছে ফিরে আসতে হল, তবে একটাই আপশোষ যে আমাকে বুঝতে শ্রাবণীর চোদ্দ বছর লেগে গেল।

খুব হাসছি।

হঠাৎ কুমকুম বলল— কিন্তু আমি কী করবো?

— কী?

— আমার যে কোনও চন্দনদা নেই?

আর হু হু করে কুমকুমের কান্না।

আমি যত তাকে থামাতে চাইছি— এই, কী হল, এই! আশ্চর্য!

কিন্তু আমার ভয় হল, আমি যে কোনওদিন তাকে আর থামাতে পারবো না।

কণ্ঠস্বর

নবকুমার বসু

অসময়ের কলিংবেল শুনে নিশ্চয়ই ভাবছ, এখন আবার কে এলো! এটা তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই অসময়। কারণ নিখিল অফিসে চলে গেছে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক আগে— নটা নাগাদ। গোগো এখনও স্কুল থেকে ফেরেনি। ও আসার আগেই তুমি রান্নাবান্নার কাজ সেরে নিচ্ছ। তুমি নিশ্চয়ই এখনও কিচেনে ব্যস্ত। গোগো এসে পড়লেই তুমি আর সংসারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পার না, তখন ওকে নিয়ে তোমার লাগতে হয়।

আমি শুনতে পেয়েছি, তুমি কিচেন থেকেই 'কে—' বলে রেসপন্স করেছ।

কিন্তু, বুলু, আমি তো রাস্তা থেকেই— 'বুলু, আমি মারফি কিংবা রুথ্' বলে চেঁচিয়ে তোমাকে আমার পরিচয় জানাতে পারি না। তাছাড়া, দুপুরবেলা রাস্তা থেকে চিৎকার করে একজন মহিলার পক্ষে নিজের পরিচয় জানানটা শোভনও নয় বোধ হয়। তার ওপর আবার তোমাদের এই যাদবপুর সেন্ট্রাল পার্কের মত জায়গায়। এই সময় এখানকার যেকোন বাড়িতে কেউ নক্ করলে, উলটো দিকের বাড়ির বারান্দা থেকে কেউ না কেউ একবার দেখে নেয়। সেটা আমার একদম ভাল লাগে না।

তুমি অবশ্য আমাকে দেখে অখুশী হবে না। কিন্তু একটু অবাক হবে। কেননা, প্রথমত এই সময়, দ্বিতীয়ত— আমি একা। আমি এতদিন তোমাদের বাড়িতে যখনই এসেছি— সন্ধ্যাবেলা এবং প্রশান্তর সঙ্গে।

একদিন বোধ হয় সানডে মর্নিং-এ এসেছিলাম। কিন্তু প্রশান্ত ছাড়া আজই আমি প্রথম এলাম। ভাব একবার, ওয়াইফ হিসাবে আমি কিরকম ইন্ডিয়ানাইজড্ হয়েছি। হাজব্যান্ড ছাড়া তোমাদের এখানে আসতেও ভাল লাগছিল না।

কিন্তু কি করব, বল। প্রশান্ত ত সেই বীরভূমের মেলায় গান গাইতে গিয়ে এখনও ফিরল না। অথচ ও ছাড়া ওর পিসীমার বাড়িতে আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারি না। শুধু নিজের ঘরটায় বন্দী হয়ে ত আর সারা দিনটা কাটান যায় না। তারপরও স্কুলেও এখন পরীক্ষা চলছে বলে আমার পাঁচদিন ছুটি।

কিন্তু ব্যাপারটা কি বলতো? তুমি দরজা খুলতে আসছ না কেন এখনও। বোধ হয় মাঝপথে কোন রান্না থামিয়ে আসতে পারছ না। ওই ত, নীচের বারান্দার দরজাটা খুলে তুমি আর একবার বললে, কে—। আমি এখন তোমার আসার পায়ের আর শাড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তুমি কি ভেতর থেকে ছোট্ট ভিউফাইন্ডারে চোখ লাগিয়ে দেখে নিলে আমাকে?

ভেতর থেকেই কাঁচটায় চোখ লাগিয়ে বুলু দেখতে পেল রুথ্‌কে। ওর সেই ঢোলা জিনের বেলবটস্ আর ওপরে ঢোলা পাঞ্জাবির মত হাফহাতা টেরিকটনের শার্ট। কাঁধে ঝোলান লম্বা, শান্তিনিকেতনী ব্যাগ। ওর টকটকে ফর্সা রং যেন একটু অ্যানিমিক্ একটু

কটা আর রুক্ষ। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা লাল্‌চে চুলগুলো সবসময়ই অবিন্যস্ত। বুলুর ধারণা, রুথ্ এর মুখে মেমসায়েব-সুলভ গ্ল্যামারও নেই আবার বাঙালীদের মত লাবণ্যও নেই। বরং একটা রুক্ষতা বয়সের ছাপের সঙ্গে মিশে থাকে। চোখেও যেন একটা উদাসী আর দুঃখী দুঃখী ভাব থাকে সব সময়।

কিন্তু স্ট্রাকচারটা সত্যিই সুন্দর। অমন ক্ষীণকটি আর দীর্ঘাঙ্গী আমাদের এখানকার মেয়েরা হয় না। মনটাও খারাপ না, এবং রুথ্ বুদ্ধিমতী। বাংলা কথাবার্তা কিছু কিছু বুঝতে এবং বলতে পারলেও, যেখানেই ও অসুবিধা বোধ করে— একদম চুপ করে যায়। আর ওর চুপ করে যাওয়াটা দেখেই অন্যেরা বোঝে— রুথ্ এর অসুবিধা হচ্ছে। তখন ওকে আবার সেই জায়গাটা ইংরেজী করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। রুথ্ পরিস্থিতির সঙ্গে খুব সুন্দর মানিয়ে নিতে পারে।

এই অসময়ে রুথ্‌কে একা দেখে বুলু একটু অবাকই হল। ও ভেবেছিল হয়ত পিওন এসেছে কোন রেজিস্টার্ড চিঠি নিয়ে কিংবা মা হয়ত পাঠিয়েছে কাউকে কোন খবরটবর দিয়ে।

গোগো স্কুল থেকে ফিরলে বুলু আগেই বুঝতে পারে— ওর কলিংবেল বাজান, দরজা ধাক্কা দেওয়া এবং চিৎকার করা সব একসঙ্গে শুনে।

কিন্তু রুথ্-এর আসাটা ও আন্দাজ করতে পারেনি। খারাপও লাগল না। কেননা, একা একা রুথ্-এর সঙ্গে ও একটু ইংরেজী বলতে পারে নিঃসংকোচে। ভাল বলতে পারে না বলে, অন্য সকলের সামনে বুলু একটু আড়ষ্ট হয়ে থাকে। তাছাড়া নিখিল অফিস থেকে না ফেরা পর্যন্ত বুলুকে ত প্রায় চুপচাপই থাকতে হয়। বেরুতে ত আর পারে না। কাজ করতে করতে কথা বলার, গল্প করার একটা লোক পেলে খারাপ লাগে না। রুথ্ ত এ বাড়িতে ভীষণ ফ্রী আর এটা-ওটা নিয়ে খুব গল্পও করতে পারে।

—কি গো, কি ব্যাপার। হঠাৎ একদম দুপুর বেলা একলা চলে এলে যে! এসো, ভেতরে এসো। বুলু দরজাটা খুলে বিস্ময়ের সঙ্গে একরাশ আন্তরিকতার হাসি ছড়িয়ে দিল।

রুথ্ মাথাটা নীচু করে দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বলল— সরি বুলু, আনটাইমলি এসে, মনে হচ্ছে তোমাকে ডিস্টার্ব করলাম।

বুলু ভেতর দিকে যেতে যেতে, ওর হলুদ লাগা হাতটা কাপড়ে মুছে নিল। রুথ্ এর একটা হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে টানতে টানতে বলল— রুথ্, এটা কি ঠিক হচ্ছে? তুমি আবার সেই বিলিতি ফর্মালিটি করছ। আমার এখানে তোমার আবার টাইম্‌লি, আনটাইম্‌লির কি আছে?

রুথ্ চোখ থেকে ঢাউস কালো চশমাটা খুলে ফেলল। ওটা ব্যাগের মধ্যে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল— অ্যাকচুয়ালি আমি বাড়িতে বসে বসে বড্ড বোর ফিল করছিলাম। প্রশান্ত ত জানই ওর সেই সব টিম নিয়ে বীরভূম গেছে। বাড়িতে পিসীমা-পিসেমশায়ের সঙ্গে আমি আর কি গল্প করব। তারপরেই গলার সুর পালটে জিজ্ঞেস করল— আচ্ছা, নিখিল এর মধ্যে আর যায়নি কেন বলত?

— ওর কথা আর বোলো না। কোথায় যায়, না যায় আমি কি আর সব জানি।

— তুমিও ত যেতে পার মাঝে মাঝে গোগোকে নিয়ে।

— আমি সংসার করছি।

বুলু রান্নাঘরের মধ্যেই একটা ছোট টুল দিল রুথ্‌কে বসতে। ওর রান্নাঘরটা বেশ প্রশস্ত আর খুব পরিচ্ছন্ন। সাংসারিক ব্যাপারে বুলু ভীষণ গোছান গৃহিণী আর রান্নাঘরটাই

যেন তার প্রমাণ। সব সময়ই রান্নাঘরটা দেখে মনে হবে যেন আগে ব্যবহৃত হয়নি। কোথাও এতটুকু বাড়তি জল কিংবা কুটনোর খোসা কিচ্ছু পড়ে নেই। ছাদে দেয়ালের কোণায় একটুও ঝুল লেগে নেই। দেয়ালের সঙ্গে লাগান আলমারিটার মধ্যে ডাল, মশলাপাতির কৌটোগুলো সুন্দরভাবে পাশাপাশি সাজান। ওগুলোর কোন্‌টার মধ্যে সরষে, কালো জিরে, কিংবা মটর ডাল আছে— সব বুলুর নখদর্পণে। রান্নার জন্য একটা উঁচু বেদীমত করা আছে— একপাশে গ্যাস সিলিন্ডার, কয়লা ব্যবহার করা বুলু ছেড়েই দিয়েছে। রান্নাঘরের জানালাগুলোতেও খুব মিহি জাল লাগিয়ে নিয়েছে— যাতে পোকামাকড়, মাছি ঢুকতে না পারে। কিন্তু আলো বাতাসটা আসে।

রুথ্‌-এর জন্য বুলু একটু কফির জল চাপিয়ে দিল। রান্নাবান্নার জিনিসপত্র এদিক ওদিক খুটখাট করতে করতে বলল—

—আমার কথা আর বোলো না। সংসারের সবদিক দেখতে গিয়েই আমার সময় চলে যায়। তার ওপর কাল থেকে আবার গোগোর পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। নিখিলও কয়েকদিন থেকে কি-সব অফিসের কাজে একটু বেশী ব্যস্ত। আমার আর নিঃশ্বেস ফেলার সময় নেই।

কথা বলতে বলতে বুলু কাজও করে যাচ্ছিল। ও ধনেপাতা দিয়ে রান্না করা পাবদা মাছের ঝোলটা কাঁচের ট্রেতে তুলতে তুলতে বলল— তার চেয়ে তুমিই তো আমাদের এখানে চলে আসতে পার যে কটা দিন প্রশান্তদা না ফিরছে।

রুথ্‌ ওর কাজকর্ম আর রান্নাঘর খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলল— তাহলে তো দারুণ হয়। গ্র্যান্ড! গলার স্বরটা একটু পালটে আবার বলল— তোমাদের এখানে এলে আমার আর যেতেই ইচ্ছা করে না।

বুলু কফির জলটা নামিয়ে ফেলল। রুথ্‌কে জিজ্ঞেস করল— এখন কি খাবে বল, কফির সঙ্গে। দুপুরে কিন্তু আর ফিরতে পারবে না। আমি আজ সারা দুপুর তোমার সঙ্গে ইংরেজী বলা অভ্যাস করবো।

বুলু, তোমার মনটা সত্যি ভীষণ সরল। আমাকে বড্ড বেশী আপন করে নিয়েছ। মনে হচ্ছে না নিলেই ভাল হত।

জিজ্ঞেস করছ কি খাব? কিন্তু কি করে বলব বল তো সত্যি কথাটা! কি করে তোমাকে বলব যে আমার ভয়ানক ক্ষিদে। ভীষণ খেতে ইচ্ছে করে যখন তখন। আমি তো আর তোমাকে সোজাসুজি বলতে পারি না যে আমি খাওয়ার জন্যই এই অসময়ে তোমার এখানে এসেছি। প্রশান্ত থাকলে হয়তো একটু সুবিধে হত কিন্তু ইদানীং ওর কথা আমি ছেড়েই দিয়েছি প্রায়। আমার এত ক্ষিদের কথা ওকেও আমি বলতে পারতাম না। আর সেখানে ওর পিসীমার কাছে বারবার খাওয়ার কথা বলা তো অসম্ভব। আর লুকিয়ে যে কিছু খাব, সে সাহস আমার নেই।

কিন্তু তুমি তো দেখছি শুধুমাত্র কয়েকটা সল্টেড বিস্কুট আর ঘরের তৈরী একটা সন্দেশ দিচ্ছ। সন্দেশটা নিখিলের খুব প্রিয় খাবার, তাই না? সত্যি, তোমরা পার বটে। কিন্তু বুলু, তোমাকে তো বলতে পারছি না— ওই খাবার আমার কাছে কিছুই না। খুবই সামান্য। ঐ তো তোমার আলমারির ভেতরে কয়েকটা ডিম বার করে রেখেছ ফ্রিজ থেকে। বুঝতে পারলে না বোধ হয় তোমাকে ডিমের দাম জিজ্ঞেস করে একটা হিন্ট্‌ দিলাম তুমি তো একটা ডিমও দিতে পারতে আমাকে ফ্রাই করে।

অবশ্য বুঝবেই বা কি করে? দিয়েছ, এই অসময়ে তাই যথেষ্ট। দুপুরে ভাত খাওয়ার আগে তোমরা কখনও কিছু খেতে চাও না।

কফিটা দাও বুলু, আর কতক্ষণ ওটা চিনি দিয়ে স্টার করবে? যা হয়েছে, দাও। ওটার অনেক ফুড ভ্যালু আছে। কারণ, অনেকটা দুধ ওতে দিয়েছ আমি দেখেছি। থ্যাঙ্ক য়্যু।

বুলু, এইমাত্র তুমি যখন নিচু হয়ে জাগে করে জল নিলে, আমি তোমাকে পিছন থেকে আর একবার ভাল করে দেখলাম। তুমি কি বুঝতে পারো, আজকাল আমি তোমাকে কিরকম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। তোমাকে দেখেই বোঝা যায়, তোমার বুক, পেট এখন কিরকম ফ্ল্যাবি; কোমর আর হিপটা একদম সমান। কোন কার্ভেচার নেই। তবে, মুখটা তোমার সত্যিই সুইট। বোধ হয় আরও সুইট লাগে তোমার কপালের ওই বড় লাল টিপটার জন্য। খুব পান খাওয়া ধরেছ আজকাল। সন্ধ্যার সময় তো দেখি বেশ সেজেগুজে থাক। নিখিলের ভাল লাগে? কতদিন এরকম একটানা ভাল লাগতে পারে?

নিখিল তো দিব্যি স্লিম আর স্মার্ট। তাও কি তোমাকে ওর খুব ভাল লাগে? তোমাদের রাত্তিরে বিছানার সম্পর্কটা কি এখনও হট? তোমার মধ্যে নিখিল কি পায় বল তো? বাইরে' থেকে দেখে অবশ্য তোমাদের রিলেশানটা অ্যাপারেন্টলি ভালই মনে হয়। না হওয়ারও কারণ নেই। নিখিল তো ভালই আর্ন করে। অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার। মাত্র একটি বাচ্চা।

প্রশান্ত যদি আর একটু প্র্যাকটিক্যাল হত ভাল হত। তাহলে হয়ত আমাদের ভেতরের সত্যিকারের সম্পর্কটা এরকম জলে ভেসে থাকার মত হত না। অবশ্য আমি বুঝতে পারি, ওর টেম্পারামেন্টটাই ওইরকম। সম্ভবত ইংলন্ডে একটা ফাংসানে দেখে, ওকে আমার সেই কারণেই তখন ভাল লেগেছিল। শুধু তাই বা কেন, ব্যক্তিগত ব্যাপার সব জেনেও, আমিই ওকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়েছিলাম। আমরা বড্ড হুইমজিক্যাল।

বুলু আলমারিটা বন্ধ করে দিল। রুথ্‌কে হাত ধরে টেনে তুলল।

— এই চলো, ঘরে গিয়ে বসি। রান্নাঘরের কাজ শেষ। আচ্ছা, তুমি কি স্নান করে এসেছ? তোমার গরম জল লাগবে?

রুথ্ বলল, না, আমি স্নান করব না। বেটার তুমি সেরে নাও। আমি একটু ম্যাগাজিন ওলটাই আর তোমাদের অ্যালবাম দেখি।

একটু চুপ করে থেকেই ও আবার বলল, এই, তোমাদের টেলিফোনটা ঠিক আছে?

— দেখ, ও কখন ঠিক থাকে, কখন খারাপ হয় কেউ জানে না।

গোগোর স্কুল থেকে ফিরে আসার সময় হয়ে গেছে। স্নানটা করে নিতে পারলে ভালই হয়। একটা কাজ সারা হয়ে যাবে।

বুলু আলমারি থেকে শাড়ি ব্লাউজ বার করে নিল। একটা অ্যালবাম রুথ্‌কে দিয়ে বলল— এটা দেখ। আমাদের বিয়ের সব ছবি আছে এটাতে।

বাথরুমের দিকে যেতে গিয়ে ও আবার ফিরে এলো কি মনে করে। রুথ্ ওদের বিছানায় আধশোয়া হয়ে একটা ম্যাগাজিন ওলটাচ্ছিল। বুলু আবার এসে বলল— এই, তোমার যে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা ছিল, গিয়েছিলে? কি বলল?

রুথ্ ম্যাগাজিন থেকে চোখ তুলল। উঠে বসে বলল— ও ইয়েস, তোমাকে বলাই হয়নি। বিশেষ কিছু না, তবে বেশ অ্যানিমিক। কয়েকটা রুটিন ইনভেসটিগেশন করতে বলেছেন আর দুএকটা আয়রন, ভিটামিনস এইসব মেডিসিন দিয়েছেন।

একটু থেমে আবার বলল— আসলে আমিই একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম, এত মাথা ধরছিল কয়েকদিন থেকে। তুমি যাও, তাড়াতাড়ি স্নান করে এসো।

হ্যাঁ যাই।— বুলু বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

দেখ রুথ্ তুমি যতই মেমসায়েব হও, আমাদের বাঙালী মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। এই যে তোমার মাথা ধরা, গা বমি বমি করা, ডাক্তারের কাছে যাওয়া, আয়রন, ভিটামিনস্, রুটিন ইনভেস্টিগেশন করা.... সবই কি তোমার একটা বিশেষ অসুস্থতার দিক নির্দেশ করছে না। ওটা কি আদৌ অসুস্থতা।

তোমার অবশ্য বলার উপায় নেই জানি। কেননা, ছোটবেলায় মাম্‌স হওয়ার জন্য উৎপাদন ক্ষমতা নেই আমার জানি। ডাক্তার টেস্ট করে বলেছিলেন, স্পার্ম হেলদি নয়। আরও জানি, ঐ কারণেই প্রশান্তদার আগের পক্ষের বউ— মতি, ওকে ছেড়ে এখন বিকাশ দত্তকে বিয়ে করে ডানলপে থাকে। তুমি অবশ্য এসব জেনেশুনেই প্রশান্তদাকে বিয়ে করেছিলে। কারণ তুমি কোন সময়েই ছেলে পুলে চাও না। অ্যানথ্রোপলজিক্যাল রিসার্চ নিয়েই তোমার কাটিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে। তাছাড়া সে বয়সও তোমার নেই যে নতুন এনার্জি নিয়ে আবার ছেলেপুলে মানুষ করবে। আমরা ভেতরের খবরগুলো জানতাম বলেই ভেবেছিলাম— যাক ভালই হল। প্রশান্তদার পাগলাটে, বাউন্ডুলে জীবনে একটা বৈচিত্র্য এলো।

কিন্তু নাটের গুরুটি কে বল তো? তুমি তো আজকাল অনেকের সঙ্গেই মেশো। প্রশান্তদাও সে ব্যাপারে মোটে বদার করে না। আর উনি তো প্রায়ই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তুমিও এখন আর কম যাও না। তোমার তো স্কুলেরই সেক্রেটারি এবং অন্যান্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের সঙ্গে বেশ দহরম-মহরম। ওর কাছ থেকে আরও জানলাম, তুমি বেশ কয়েকবারই আশিস্ দে, দীনেশ ছেত্রি, দিলীপ চক্রবর্তী, ত্রিপাঠি, তরুণ ঘোষ এদের সঙ্গেও যথেষ্ট ঘুরেছ।

প্রশান্তদা অবশ্য তাতে কিছু মনে করে না। বরং তোমাকে এখানে নিয়ে আসার পরে এবং স্বল্প রোজগারের জন্য প্রশান্তদার যেটুকু অনিবার্য কমপ্লেকস গ্রো করেছে, তাতে তুমি এদিক সেদিক ঘুরে বেড়িয়ে শান্তিতে থাকায়, সেটাই খানিকটা কেটে যায়। আমার তো ধারণা, প্রশান্তদা নিজের অক্ষমতার জন্য, জীবনের একটা অন্যরকম মানে আর ছক তৈরি করে নিয়েছে। কিছুতেই বিশেষ কিছু যায় আসে না।

...এতবার করে কাকে টেলিফোন করছ, রুথ্! ভাবছ, আমি শাওয়ারে জল পড়ার আওয়াজে কিছু শুনতে পাচ্ছি না। তাই না? লাইন পেয়েছ বুঝি? তুমি কি সেই নাটের গুরুটির সঙ্গে কথা বলছ নাকি?

কথা অবশ্য বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমি বাথরুম থেকে সব কিছু শুনতে পাই। ওই তো শুনতে পাচ্ছি, গোগো এসে পড়েছে। নীচে থেকে দরজা ধাক্কা দিচ্ছে। কারেন্ট চলে গেছে বলে বেল বাজাতে পারছে না। তুমি রিসিভারটা রেখে দিয়ে দরজা খুলতে গেলে।

রুথ্, তুমি কিন্তু বড্ড বোকা। ভাবছ আমার স্নান সারতে অনেক দেরী হবে। মোটেই না। আমি খুব তাড়াতাড়ি করেছি, কারণ গোগো আসবে, আমি জানি।

রিসিভারটা পাশে নামিয়ে রেখে দরজা খুলতে গেছ। গোগো তো তোমাকে দেখেই গলা জড়িয়ে ধরবে। সুতরাং তোমার ওপরে আসতে একটু দেরী হবে। আমি একবার রিসিভারে তোমার মত গলা করে ছোট্ট করে 'হ্যালো' বলে দেখি না, চেষ্টা করে নাটের গুরুটি কে?

আমাদের বাঙালী মেয়েদের কিরকম কুচুটে আর কৌতূহলী মন দেখছ?

রুথ্ সিঁড়ি দিয়ে চটি ফটফট করতে করতে নীচে নামছে। বুলু ভেজা চুলের গোছার ওপর তোয়ালেটা জড়িয়ে নিল। পাশে রাখা রিসিভারটা কানে লাগাল। মনে মনে ঠিক করে নিয়ে ঠিক রুথের মত গলা করে বলল— হ্যাল-ও-ও...!

— রুথ্ ড়িয়ার। প্লিজ ফর গড সেক, ডোন্ট বি সো মাচ ইমোশনাল। ইটস্ নাথিং, আই টেল য়্যু— জাস্ট অ্যা ম্যাটার অব ফিউ মিনিটস্ ওনলি টু ইভাকুয়েট ইট। তুমি চুপচাপ বাড়িতে থাক। ডোন্ট কাম্ টু মাই প্লেস। আই উইল সি য়্যু ইন দ্য ইভনিং.....

উত্তেজনা আর ভয়ে মেশান কতকগুলো তোতলান শব্দ। বুলুর ভীষণ চেনা। যেন চিরকালের হাড়েমজ্জার ভেতরে চেনা। বিয়ের পর থেকে বিগত এগারো বছর ধরে ঐ গলার স্বর ওর শরীরের মনের প্রতিটি কণায় ছড়িয়ে আছে। কানের মধ্যে এখনও বাজছে।

বুলুর পা দুটো ভীষণ কাঁপছিল থর থর করে। ঝাপসা চোখের সামনে কিছু দেখতে পেল না। শিথিল হাত থেকে রিসিভারটা ঠক্ করে পড়ে গেল ক্যাডেলের পাশে। পায়ের কাঁপুনিতে মনে হল, নীচে মেঝে নেই।

সিঁড়িতে গোগোর বুটজুতোর ধুপধাপ আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কিসব কথা বলতে বলতে ওপরে উঠে আসছে। বুলু শরীরটাকে অনেক কষ্ট করে বাথরুমের দিকে টেনে ঘোরাল।

জীবনে প্রবেশ

শচীন দাশ

লাইন পার হয়ে প্লাটফর্মে উঠতে গিয়েই হোঁচট খেল শশাঙ্ক। পড়েই যাচ্ছিল, কোনোরকমে সামলে নিয়ে পড়তে পড়তেই পতন থেকে নিজেকে রক্ষা করল। শুধু তাই নয়, যে পাথরটার জন্য সময়ের ব্যবধানে পা তুলতে গিয়ে তার গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, ক্রাচ দিয়ে সে পাথরটা সরিয়ে ধীরেসুস্থে সে প্লাটফর্মে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঠুকঠুক করে খানিকটা এগিয়ে রমলার কাছে গিয়ে হাসিমুখে শুধোল, কী, ট্রেন কটায়! রাজুকে দেখছি না এখনও?

রমলার মাথায় ভেতরে তখনও ঘুষঘুষে আগুন।

আশ্চর্য, এত করে বারণ করল এত বোঝাল তবুও বুঝল না লোকটা। কী দরকার বাপু তাদের সঙ্গে বেরুবার। তার চেয়ে ঘরে বসে থাকলে, থেকে বিশ্রাম নিলে, অথবা দু-চারটে বই পড়ে কাটালে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত, নাকি মাথা হেঁট হয়ে যেত মানুষটার। না ভেবেছে রমলা পারবে না রমলার পক্ষে সম্ভব নয় এসব। কিন্তু অসম্ভব যে নয় সে প্রমাণ তো এরই মধ্যে রেখেছে। শশাঙ্কর অ্যাকসিডেন্টের পর ঘাবড়ে না গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ডাক্তার হাসাপাতাল করেছে। কাজেই আর অসুবিধে কোথায়! ছেলে মেয়েকে নিয়ে বমলা বেরিয়ে পড়ুক না! যত তাড়াতাড়ি বেরুবে তত তাড়াতাড়িই তো ফিরতে পারবে। সোদপুর থেকে শেয়ালদা তো আর পাঁচ ঘণ্টার পথ নয়। তার ওপর ছেলে মেয়েরা কেউ ছোট নয় যে রমলাকেই দেখে শুনে নিতে হবে, বরং ওকেই ওরা নিয়ে যেতে পারবে। কাজেই শুধু শুধু আর কষ্ট করে লাভ কী শশাঙ্কর। কিন্তু তা নয় তা হবে না, সে-ও যাবে সঙ্গে। সে-ও তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে সারাদিন। থেকে থেকে দোকানে ঘুরবে, জিনিস পছন্দ করবে, এটা ওটা বাছবে। রাগে গা-টা জ্বলে উঠেছিল রমলার।

হাঁটতে পারে না, ঠুক ঠুক করে এগোয়, তারওপর এ সময়ে ট্রেনের যা অবস্থা। উঠতে কী পারা যায়! ওঠার মুখেই যত ধাক্কাধাক্কি মারামারি। আর যদিও বা ওঠা গেল, ভেতরে ঢুকলেই দমবন্ধ হওয়ার জোগাড়। একজন আর একজনের গায়ে চিড়ে চ্যাপ্টা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কে কাকে আর দেখে তখন। প্রতিবন্ধী তো দূরের কথা। আর দেখলেও কি কেউ মানে নাকি! টের পেয়ে চুপচাপ অন্যদিকে চোখ ভাসিয়ে দেয়। বা কেউ একটু উদার হলে বড়ো জোর উঠে দাঁড়িয়ে করুণাবশত সিটটা ছেড়ে দেবে। কিন্তু সে সিটে বসার জন্য সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে তো। দিনকাল যা পড়েছে মানুষ এখন ছুটছে। আর একটু একটু করে প্রতিদিনই সমস্যা বাড়ছে। তা বাদে রোজকার অফিস কাছারি, স্কুল-কলেজ ও হাসপাতাল। তা এ অবস্থায় সুস্থ লোকই পারে না তো এমন একজন নড়বড়ে অসমর্থ মানুষ। রমলা তাই অনেক বুঝিয়েছিল। সান্ত্বনাও দিয়েছিল। কিন্তু দিলেও ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি শশাঙ্ক। তার সেই এক কথা, সে-ও যাবে সঙ্গে। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘুরবে। রমলা তাই আর কথা বাড়ায়নি। একরকম নিমরাজি হয়েই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্কও। ধুতিপাঞ্জাবি আগেই পরে বসেছিল। পরে রমলা রাজি হওয়ায় আর দেরি করেনি। খাটের পাশ থেকে ক্রাচ

দুটো তুলে নিয়েই টুকটুক করে দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। রমলার বিরক্তি তবুও যায়নি। বারুদের গায়ে ঘষা খেয়ে একসময় তা ফস করেই জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু বাড়তে দেয়নি রমলা নিজেই। জানে লাভ নেই। এতে চিৎকার চেঁচামেচিই বাড়বে সমস্যার তাতে সমাধান হবে না। শশাঙ্ককেও আর থামানো যাবে না। আগুনটি চেপে রেখে রমলা তাই বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু প্ল্যাটফর্মে উঠেই শশাঙ্কর হোঁচট খাওয়া দেখে আর চাপা থাকল না তা। দাউ দাউ করেই জ্বলে উঠল একসময়।

দাঁতে দাঁত চেপে রমলা বলল, রাজু তো মলিকে নিয়ে আগেই বেরিয়ে এসেছে। আমি দেখছি কোথায় আছে—

আমি কি একবার ঘুরে আসব।

না। কোনো দরকার নেই; তার চেয়ে ওই শেডের তলায় গিয়ে দাঁড়ালেই ভালো হয়—

কথা কাটাকাটা। তার ওপর স্পষ্ট বিরক্তি। কিন্তু রাগ নেই তাতে শশাঙ্কর। বরং হাসিমুখেই এগিয়ে গিয়ে সে শেডের তলায় দাঁড়াল। আর সেই সময়েই এসে পড়ল রাজু। পেছনে পেছনে মলি, মল্লিকা।

রমলা বলল, টিকিট কেটেছিস নাকি। রাজু। আর একটাও কেটেআনতে হবে।

আর একটা মানে...

রমলা ঝাঁঝাঁলো গলায় ঘাড় ফিরিয়ে দেখায়, ওই যে।

রাজু দেখেই চেঁচিয়ে ওঠে, এ কী বাবাকেও আনলে?

আমি আনলাম— রমলার স্বর চাপা। তাতে বিরক্তিও ঝরে পড়ছে, দেখলি না সকাল থেকে কী কান্ডটা করছে...

তাই বলে এমন দেড় পেয়েকে! রাজুর গলায় ক্ষোভ ফুটে ওঠে, এখন সারাদিন এসব হ্যাঁচোর-প্যাচোর করবে কে শুনি। যত্তসব ঝুট ঝামেলা!

ঝুট-ঝামেলা। কথাটা খচ করে লেগে যায় রমলার বুকে। ঝুট-ঝামেলা মানে? আর দেড় পেয়েই বা কী! না হয় আজ অ্যাকসিডেন্টে পা একটা কাটা গেছে শশাঙ্কর, তাই বলে নিজের বাবা সম্পর্কে এ কী কথাবার্তা। রমলার খারাপ লাগল। মুহূর্তেই ভেতরের ক্ষোভটা আইসক্রীমের মতো দ্রুত গলতে শুরু করল।

রাজুর দিকে না তাকিয়েই রমলা বলল, ঠিক আছে ঝামেলা-টামেলা না হয় আমিই দেখব। খুব ইচ্ছে হয়েছে মলির বিয়ের বাজারটা নিজে হাতে করে...

হ্যাঁ দাদা, যাক না সঙ্গে...। কোনোদিন তো বলে না—

মা-র কথার পিঠে কথাটা বলেই ভয়ে ভয়ে তাকায় মলি। খানিকটা লজ্জাও এসে ঘিরে ধরে তাকে।

রাজু বলে, তবে আর কী... তবে তো ঠিক করেই এসেছিস... এখন দেখ না... কটা ট্রেন ছাড়তে হয়।

গজগজ করতে করতে রাজু এগিয়ে যায় আবার। চাপা ক্ষোভে চুলে আঙুল চালিয়ে আবার টিকিট কাউন্টারের দিকে পা বাড়ায়।

তবে পা বাড়ালেও ট্রেন কিন্তু ছাড়তে হল না রাজুদের।

ডাউনে ব্যারাকপুর লোকাল আসছিল। ভিড় ছিল, তবে না-ওঠার মতো নয়। তবু শশাঙ্কর হাত ধরে উদ্বিগ্ন চোখে সেদিকে তাকাতেই শশাঙ্ক বলল, না না আমাকে নয়। আমাকে ধরতে হবে না। আমি ঠিকই উঠে পড়ব দেখে নিও। তুমি বরং মলির সঙ্গে থাক—

মলি এগিয়েই এসেছিল। রমলার গায়ে গা লাগিয়ে। কিন্তু ট্রেন এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই যেভাবে চিলের মতো ছোঁ মেরে সামনের রডটা ধরে ফেলল শশাঙ্ক, আর ধরেই যেভাবে ভেতরে ঢুকে পড়ল তাতে রমলারা কেন রাজু নিজেও চমকে উঠল। আশ্চর্য, ক্র্যাচ দুটো

নিয়ে উঠল কী করে। আর উঠল কী অদ্ভুত কায়দায়। এ বয়সে রাজু নিজেও কি পারবে অমন। ঠিক যেন একটা পাঁকাল মাছ। দেখে শুনে সুযোগ মতো ভিড় গলেই ঠিক দেহটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর মাখনের ভেতরে ছুরি চালানোর মতো ক্র্যাচ দুটোও টেনে নিয়েছে সেভাবে। এমন ভাবে যে কেউ কিছু বলল না. কেউ কোনো অভিযোগও করল না। বরং মলিকে তুলে খানিকটা আনাড়ির মতো উঠতে গিয়ে ধমকই খেল রমলা।

শশাঙ্ক ততক্ষণে ভেতরের দিকে। ওপরের হাতল ধরে এগিয়ে একদম লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পড়েই মলিকে ডেকে নিল। মলির পাশাপাশি রমলাকেও বলল সেখানে চলে যেতে।

কিন্তু মলি গেলেও রমলা আর যেতে পারল না। এক কোণে একটা খোদল মতো জায়গা পেয়ে রাজুর পাশাপাশি চাপা গরমে সেদ্ধ হতে হতে সে ততক্ষণে শশাঙ্কের ব্যাপারেই মন দিয়েছে।

এক ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে শশাঙ্ককে জায়গা দিচ্ছিল। কিন্তু হাসিমুখে শশাঙ্ক তা ফিরিয়ে দিয়ে জানাল, না না আপনি বসুন। আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। কটা আর স্টেশন...

রমলা অবাক। কটা আর মানে। নেই নেই করেও তো এখনও পাঁচটা। তারওপর আছে সিগনাল না পেয়ে যেখানে সেখানে দাঁড়ান। তা এতটা রাস্তা দাঁড়াতে পারবে কী করে মানুষটা। তার চেয়ে অবাক কাণ্ড, কথা কত বলছে দেখ। এত কথা তো মানুষটা বলত না কোনোদিন।

কোনোদিন কী, এই সেদিনও ছিল চুপ। দু-তিন দিন অন্তর একটা দুটো কথা কানে আসত রমলার। তাও কী সংসারের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হল তো বলল, না হলে চুপ। এ দৃশ্য বাড়িতেও যেমন অফিসেও তেমনি। যায় আসে, কাজ করে ঘাড় গুঁজে। আড্ডা নেই, কথা নেই, তাস খেলেও না সে কারুর সঙ্গে। যেমন গেল মুখ নিচু করে নিস্পৃহ দৃষ্টি নিয়ে ফিরলও ঠিক তেমনি। ঠিক সেরকমই নিস্পৃহ ভঙ্গিতে।

বিয়ের পরেই ব্যাপারটা লক্ষ করে অবাক হয়েছিল রমলা। এ কী, মানুষটা কথা বলে না কেন; বোবা নয়তো! বোবা যে নয় সে খবর আগেই পৌঁছেছিল রমলার কাছে। জেনেছিল সে, বড়ো কম কথা বলে শশাঙ্ক। কিন্তু সে কম কথা যে এত কম তা কি ভাবতে পেরেছিল সে। অথচ নতুন বিয়ে, তারওপর এই বয়েস। তা এ বয়েসেই তো কথা বলবে। কখনও চাপা স্বরে কখনও জোরে; অনর্গল এক নাগাড়ে। তা এ লোক যেন সেসবের ধারে কাছেও নেই। কেমন ভাবলেশহীন থমথমে দৃষ্টি।

ভয়ে আর লজ্জায় মুখ তুলতেও পারেনি রমলা। বন্ধুরা খেপিয়েছে। স্কুলের সহ-শিক্ষিকারা আলোচনা করেছে; আর আত্মীয় স্বজনদের মুখেও ছিল চাপা হাসি। শুধু তাই নয়. সেসব তবুও নীরবে সহ্য করে যচ্ছিল, কিন্তু পারল না রাতে পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে। যেন ঠান্ডা এক টুকরো নিষ্প্রাণ কাঠ। রমলা নিঃশব্দে জল ফেলত চোখ থেকে। মাঝরাতে ঘুমন্ত মানুষটার দিকে তাকিয়েও ভাবত আবার, কেন এমন আচরণ এই মানুষের। মনের কোন গোপন অলিন্দে অন্ধকার ঢুকে বসে আছে। সে অন্ধকারের চরিত্রই বা কী। জানলে তার অজ্ঞাতসারে সেখানে পৌঁছে না হয় একবার আলো ফেলার চেষ্টা করত রমলা।

কিন্তু না জানলেও চেষ্টার ক্রটি থাকে না রমলার।

শশাঙ্ককে বোঝার চেষ্টায় সে মানুষটির কাছে বসে। বসে বসে একা একাই বকে মরে। হাসে, গল্প করে। আবার প্রাকৃতিক নিয়মেই রাতের অন্ধকারে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কিন্তু ঘনিষ্ঠ হতে চায় না যেন মানুষটা। সামান্য দু'একবার জেগে উঠলেও আবার সেই নিস্পৃহ ভঙ্গি। রমলা আক্রোশে চুল ছেঁড়ে। আঁচল কামড়ে ধরে। তাবু শশাঙ্কর মনের কোনো হদিশ খুঁজে পায় না। ভাবে কোথায় কোন অতলে পড়ে আছে সেই রহস্যের হাতছানি।

অনার্সে ইতিহাস নিয়ে পড়েছিল রমলা। পরে স্কুলের চাকরিতে জয়েন করে সে ইতিহাস পড়াত। দেশ-বিদেশের ইতিহাসের পাশাপাশি ছাত্রীদের বলত, শুধু সভ্যতার ইতিহাসই নয়

তার পাশাপাশি মানুষের নিজেরও একটা ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসটা জানা দরকার। না হলে মানুষ সম্পর্কে জানাটাই অপূর্ণ হয়ে থাকবে। কিন্তু বিয়ের পরে পরেই বুঝল, শুধু ইতিহাসই নয় যে ধারাবাহিকতা নিয়ে মানুষ আসে পৃথিবীতে সেটাই তার যথেষ্ট নয়, মানুষকে বুঝতে তার ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে তার মনোবিদ্যাটাও জানা দরকার।

এক দুপুরে সে তাই গিয়েছিল স্টাফরুমে, অমিতার কাছে। তাকে বুঝিয়ে তার কাছ থেকেই নিয়েছিল মনোবিদ্যার ওপরে লেখা দু-দুটো বই। কিন্তু মাসখানেক পড়েও যখন দেখল আবার পড়া দরকার তখন অমিতাই এগিয়ে এল একদিন, কী হল কিছু পেলে না বুঝি?

ধরা পড়ে চোখ ছলছল করে উঠেছিল রমলার। ধরা গলায় বলেছিল অমিতাকে বসিয়ে, কী করি বল তো অমিতাদি?

স্নেহসিক্ত গলায় বুঝিয়েছিল অমিতা, ধুর বোকা। এ জন্য মন খারাপ করছিস কেন। অন্য কিছু তো নয়, না হয় লোকটা একটু কম কথা বলে...

কম কী বলছ, কথাই বলে না যে—

বলবে বলবে, একটু ওয়েট কর। বাৎসল্য বলে একটা ব্যাপার আছে তো। ছেলেমেয়ে হোক, দেখবি মানুষটা পাল্টে গেছে।

কিন্তু ছেলে শুধু নয়, মেয়ে মলি হওয়ার পরেও যখন শশাঙ্কর কোনো পরিবর্তন এল না তখন এটাকেই স্বাভাবিক বলে ধরে নিল রমলা। শশাঙ্কর কথা না-বলার দুঃখকে সে ভুলে ছেলে মেয়ের সঙ্গে অনবরত কথা বলে। শুধু ভুলতে পারল না তখনই মাঝে-মধ্যে শশাঙ্কর অফিসের বন্ধু নিখিল যখন এসে দাঁড়াত বাড়িতে।

সত্যি আপনার ধৈর্য আছে বৌঠান। আমার হলে তো আমি বাক্স-প্যাঁটরা সহ বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতাম—

বলে হাসিমুখে রমলার দিকে তাকিয়ে শশাঙ্ককেই দেখত নিখিল।

রমলা বলত, হ্যাঁ তা পারতেন মেয়ে বলেই। কিন্তু আমরা কোথায় পাঠাব বলুন তো!

তা সত্যি— নিখিল তেমনি হেসেই বলত, আপনাদের পাঠাবার একটা জায়গা থাকা দরকার। তবে আমরা কী ভেবেছিলাম জানেন বৌঠান?

কী—রমলা দুরু দুরু বুকে তাকাত। কী জানি কী ভেবেছিল ওরা। আর ভাবনাটা হয়তো এমন যে লজ্জায় মুখ লুকোতেও এবার পারবে না রমলা। তাই অস্ফুট গলায়ই জিজ্ঞেস করল, কী ভেবেছিলেন?

ভেবেছিলাম, এবার শশাঙ্কর হয়তো কথা ফুটবে। ফুটবে শুধু নয়, ফোয়ারা ছুটবে। কিন্তু তা আর পারলেন না বৌঠান—

কথাটায় মৃদু খোঁচা ছিল হয়তো কিন্তু রমলা সেটা সামলে নিত। ভয়টয় কাটিয়ে বলত হেসে, ধুর সে চেষ্টাই করিনি আমি। করব কেন বলুন তো! স্কুলে তো রোজই বকবক করি, এত করি যে বাড়ি ফিরে আর বকবক ভালো লাগে না। তার চেয়ে এইই ভালো। না কী বলুন?

বলে নিজেই তাকিয়েছিল শশাঙ্কর দিকে। কিন্তু না, তাকালেও সে মুখে কোনো ভাবান্তর চোখে পড়েনি, কোনো রকম লজ্জাও ধরা পড়েনি। রমলা ভারি অবাক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তবুও চমকে ওঠেনি। চমকাবার সুযোগও ছিল না। হল এখন, এই এত বছর পরে। শশাঙ্ককে ইদানিং কথা বলতে দেখে। অথচ কথা কী করে বলল শশাঙ্ক। স্বভাব কীভাবে বদলাল শশাঙ্কর। যে ভাবলেশহীন মুখখানা প্রায় সারাজীবন নিচু করেই কাটাল, কোন অজ্ঞাত কারণে তা আবার ওপরে তুলল শশাঙ্ক? রমলা ভাবল। কিন্তু ভাবতে গিয়েও তেমন করে আর ভাবনার ভেতরে মগ্ন হতে পারল না। শেয়ালদা এসে গিয়েছিল; নিজেদের নামার চেষ্টায় আর শশাঙ্ককে নামাবার ইচ্ছেয় সে এক কোণেই দাঁড়িয়ে রইল. তারপর হুড়মুড় করে মুহূর্তেই কামরার সবার নামা

শেষ হলে শশাঙ্কর পেছনে পেছনেই প্ল্যাটফর্মে নেমে রাজুকে বলল, কোনদিক থেকে শুরু করবি রাজু? আগে কোথায় যাবি—

রাজু কী বলতে যাচ্ছিল তার আগেই শশাঙ্ক জানাল, আগে শাড়িগুলো কিনে ফেল তোমরা, তারপর না হয় কস্‌মেটিটক্‌সে যেও।

রমলা হাঁ। রাজুও একটু তেরচা চোখে তাকাল। কিন্তু সেসব কিছু লক্ষ না করে শশাঙ্কই আবাব বলে উঠল, কোত্থেকে কিনবে! শেয়ালদা না কলেজ স্ট্রীট.....।

কলেজস্ট্রীট? সে তো আবার ঠেঙাতে হবে— রাজুর গলায় সামান্য উষ্মা। বললও তেমনি বাঁকা চোরা ভাষায়, না ঠেঙালে এখান থেকে যাবে কী করে! বাসে কি আর ওঠা যাবে এখন!

শশাঙ্ক বলল, কেন বাসের কী দরকার! হাঁটলেই হল... না হাঁটলে কী আর ভালো জিনিস পাওয়া যায়—

কথা শেষ করেই ঠুক-ঠুক করে এগুতে শুরু করে শশাঙ্ক। রমলাও পা চালায়। রাজুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বোঝে, একটা অসন্তোষ যেন তৈরি হচ্ছে ওর ভেতরে। কেননা কথা ছিল, ওর পছন্দ মতো জায়গায় নিয়ে যাবে রাজু। কারণ কী না কলেজ ওর এ-অঞ্চলেই। আর ইউনিয়ন টিউনিয়ন করার দৌলতে এক আধটু জানা শোনাও হয়ে গেছে এ সব দিকে। কাজেই রাজু রাজুর জায়গা মতো নিয়ে যাবে আর মলি ও রমলা পছন্দ করবে। তা এখন যদি শশাঙ্ক বাধা দিতে থাকে সব ব্যাপারেই, তাহলে কী জানি হয়তো বেঁকেই বসবে রাজু। তার চেয়ে যদি শশাঙ্ককে একবার বোঝানো যায় তবে হযতো এমন একটা সম্ভাব্য ঝামেলা এড়ানো যায়। সেসব ভেবেই রমলা বলে, এখানেই দেখি না আগে। পছন্দ না হলে বরং কলেজ স্ট্রীটেই যাওয়া যাবে.....তাছাড়া রাজুর এখানে কোথায় যেন জানাশোনা আছে বলছিল—

তাই নাকি! জানাশোনা আছে। তবে তাই চল না রাজু?

রাজুর দিকে একবার তাকিয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে নিয়ে এবার দ্রুত হাঁটতে থাকে শশাঙ্ক। ঠুক-ঠুক করে হেঁটে প্ল্যাটফর্মের ভিড় কাটিয়ে অবলীলায় বাইরে গিয়ে থামে। রমলাও নিঃশ্বাস ফেলে স্বস্তির। মলিকে নিয়ে শশাঙ্কর পাশাপাশি হাঁটতে থাকে আবার; রাজু থাকে সামনে।

ঠিক বিকেলের আগেই কেনাকাটা সব শেষ। শাড়ি-ধুতি, কস্‌মেটিকস্ থেকে মলির চটি আর ছেলের শার্ট-প্যান্টের পিস সবই হয়ে গেল। ছেলের জুতো পরে কেনা হবে। কেননা পায়ের মাপ চাই। তাই ছেলে এসে একদিন প্রাচীর নিচে দাঁড়াবে ঠিক হয়েছে। আর রাজু গিয়ে তার পছন্দ ও মাপ অনুযায়ী তা কিনে নিয়ে আসবে। তা বাদে সবই মোটামুটি শেষ। জিনিস সবই পাওয়া গেল। না পাওয়ার মধ্যে শুধু ওই এক বেনারসী। ওই শাড়িটা আর কিছুতেই পছন্দ হল না শেয়ালদায়। অনেক দোকান ঘুরল, অনেক শাড়ি দেখল রমলারা। কিন্তু মলির পছন্দ হয় তো রমলার হয় না, আবার রমলার হয় তো মলির হয় না।

শেষে বেরিয়ে এসে শশাঙ্কই প্রস্তাব দেয়, তা হলে আর দেরি না করে চল কলেজ স্ট্রীটেই যাই। ওখানে নিশ্চয়ই পছন্দসই জিনিস পেয়ে যাবে—

কিন্তু এখন! কলেজ স্ট্রীটের কথায় রাজু কব্জি উল্টে ঘড়ির দিকে তাকায়, কটা বাজে খেয়াল আছে? এখন গেলে কিন্তু সাড়ে চারটের ট্রেনটা আর পাবে না বলে দিলাম।

তা না পাই, তার পরেও তো ট্রেন আছে। না হয় একটু ভিড় হবে; কিন্তু তাই বলে বেনারসীটা বাকি থাকবে; সময় তো এদিকে নেইও আর। না না তুই চল... কলেজ স্ট্রীটেই চল রাজু—

বলে ক্র্যাচ দুটো নিয়ে পা বাড়ায় শশাঙ্ক।

একটা অটো আসছিল। পেছন থেকে লোক ভর্তি করে এগিয়ে গোঁ গোঁ করতে করতে শশাঙ্কর গা ছুঁয়ে যাবার মুখেই কায়দা করে শশাঙ্ক আঁচমকা সরে দাঁড়াল।

রমলা চমকে উঠল। ইস্ আর একটু হলেই গিয়েছিল আর কী। একদম চাকাটা উঠে আসত গায়ের ওপরে। এভাবে কেউ হাঁটে। বিশেষ করে এসব রাস্তায়। কই আগে তো এভাবে হাঁটত না শশাঙ্ক। একেবারে একপাশ দিয়ে ফুটপাথ ধরে মাথা নিচু করে পথ চলত। আর রাস্তা যখন পার হত চুপচাপ একদিকে দাঁড়িয়ে থাকত। মোটামুটি খালি হলে তবেই পা বাড়াত। তাতে যদি সময় লাগে লাগুক তবু তো নিরাপদে যাওয়া যাবে। কিন্তু এখন এ-কদিনেই এবাবে পাল্টাল কী করে।

রমলা বলল, কী হচ্ছে কী। এভাবে কেউ হাঁটে। এখুনি তো অটোটা...

কথা শেষ না করে, রমলা তাকাল শশাঙ্কর দিকে। শশাঙ্ক বলল, না, না ভয় নেই। আগে চলতে জানতাম না, তাই টিপ টিপ করে হাঁটতাম। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রাস্তা পার হতাম। কিন্তু তাতেও তো শেষ রক্ষা হল না। সেই অ্যাকসিডেন্টেই পা একটা কাটা গেল। অথচ এখন... এখন আর সে ভয় নেই রমলা—

নেই মানে! রমলা দুরু দুরু বুকে তাকায়।

শশাঙ্ক হেসে বলে, মানে তখন তো চলতে জানতাম না, তাই অমন মাথা গুঁজে দিতাম! কিন্তু অ্যাকসিডেন্টের পর থেকে...

কথা শেষ না করে হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়ে শশাঙ্ক। রমলার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকায়। গভীর দৃষ্টিতে কী যেন খোঁজার চেষ্টা করে।

রমলা চমকে ওঠে। একটা অস্বস্তি যেন ঢুকে যায় ওর বুকের মধ্যে। মানুষটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল কেন। আর দাঁড়িয়ে অমন গভীরভাবে তাকিয়েই বা কী খুঁজছে ওর মুখে। কিছু কি বলবে! কি বলবে? জীবনের যে অংশটায় সে ছিল প্রায় মূক, এক রকম বধিরই প্রায়, রমলার মুখের আয়নায় নিজেকে দেখে কী সেই অংশে কিছু খোঁজার চেষ্টা করছে!

রমলা বলল, কী হল! দাঁড়িয়ে পড়লে যে শরীর খারাপ লাগছে?

না না রমলা। শরীর আমার এখন ভালোই। খুব ভালো কিন্তু আমি ভাবছিলাম অন্য কথা...

রমলা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে শশাঙ্কই আবার বলে ওঠে, কী কথা জানো ভাবছিলাম, এতদিন আমি কোথায় ছিলাম! তোমার মধ্যে, রাজু আর মলির ভেতরে নিজেকে কেন আবিষ্কার করিনি। এতদিন তবে কী করেছি। কেন রমলা, কেন পারিনি? আর তুমিই বা কেন বলোনি আমাকে?

বলেছি! বলেছি কিন্তু অনেক জানো। কিন্তু সে বলাটা বোধহয় আমার ঠিক হয়নি। চোখ ফেটে প্রায় জল নামে রমলার। সে আরও কী একটা বলতে যায়। কিন্তু তার আগেই রাজু এগিয়ে আসে, কী হল মা— তোমরা দাঁড়িয়ে পড়লে যে! চলো চলো—

হ্যাঁ চল... রাজুর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রমলা শশাঙ্কর দিকে তাকায়; শশাঙ্ক আবার হাঁটতে থাকে। আর সেদিকে তাকিয়ে মুহূর্তেই মনে হয় রমলার, না বলা নয়, বলে বোঝানোও নয়। চেতনার যে অংশটা এতদিন ছিল বালি আর পাথরে চাপা গভীর এক অন্ধকারের অতলে দুর্ঘটনায় পড়ে চেতনার সেই অংশে ধরে ফাটল; আর তাইতেই বালি আর পাথর সব সরে যায় ঝুরঝুর করে। অন্ধকারের অতলে পড়ে আলোর ঝলক। শশাঙ্ক চমকে ওঠে। তার চেতনা মনের লাগাম পেয়ে উঠে আসে ওপরে, তরতর করে। কিন্তু এই বয়সে পা কাটা গিয়েও ক্র্যাচ নিয়ে এত দ্রুত হাঁটে কী করে মানুষটা। শরীর বাধা দেয় না?

একটা জট খুললেও এতদিন পরে আবার নতুন আর একটা জটে আটকে পড়ে রমলা। তবে বিরক্ত হয় না। মনের আনন্দে সেটাই আবার খোলার চেষ্টায় রমলা শশাঙ্ককে ধরার চেষ্টা করে।

শশাঙ্ক হেঁটে যায় ঠুকঠুক করে। বেশ ভালো গতিতে।

তত্ত্বতালাশ

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

নেওয়ার মতো অনেক কিছুই ছিল। অথচ কিছুই নেয়নি। শুধু সাজানো গোছানো ঘরটাকে একেবারে তছনছ করে রেখে গেছে। স্ট্যাণ্ড থেকে রঙীন টিভি মেঝেতে নামানো। টেলিফোন এমনভাবে টেবিলের তলায় লটকে আছে যেন কেউ তাকে ফাঁসি দিয়েছে। সোফা আর ডিভানে সাজানো ডজন খানেক বাহারী কুশন স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে আছে যেখানে সেখানে। বাবলুর প্রিয় টু-ইন্-ওয়ানটাও মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার পিঠে হুমড়ি খেয়ে আছে মিহিরের শখের ভিসিপি। যাদুঘর থেকে কেনা শ্যামলীর অবলোকিতেশ্বর দু-টুকরো। শ্যামলীর সাধের সংগ্রহ ছোট ছোট পিতলের শোপিসগুলোকেও যততত্র ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। দেখে মনে হয় কেউ যেন হিংস্র আক্রোশে এলোপাথাড়ি ঘেঁটেছে শৌখিন ঘরটাকে।

মিহিরের মাথা ঝিমঝিম করছিল। অফিস থেকে হঠাৎ ফিরে ঘরের এই দশা দেখলে কারই বা মাথা সুস্থ থাকে। তবু কপাল ভাল, অন্য ঘর দুটো রক্ষা পেয়ে গেছে। মিহিরের ঘর আর বাবলু ঝুম্পার ঘর রোজ যেমন থাকে তেমনই তালা বন্ধ।

আশ্চর্য! এ কেমন ধারার চুরি করতে আসা!

মিহির হতভম্ব মুখে বেতের মোড়াটা টেনে বসল। এই মুহূর্তে বাড়িতে পরিবারের সদস্য বলতে সে ছাড়া আর কেউ নেই। শ্যামলী অফিসের পর কোথায় যাবে বলে গেছে। তার আজ ফিরতে রাত হবে। ঝুমাও বাড়ি নেই। থাকেও না এ-সময়ে। সামনের বছর হায়ার সেকেন্ডারি, স্কুল ছুটির পর তিন-চার জন বন্ধুর সঙ্গে সে টিউটোরিয়ালে চলে যায়। ফিরতে সেই সন্ধে। আর বাবলুর তো এখন বাড়িতে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। কলেজে ঢোকার পর থেকেই উড়তে শিখেছে ছেলে। কলেজে আড্ডা। কলেজের পর আড্ডা। তারপরও আড্ডা। শ্যামলী আবার তার আদরের ছেলেকে রাত নটা অবধি বাইরে থাকার অনুমতিও দিয়ে দিয়েছে।

মিহিরেরও এ-সময়ে থাকার কথা নয়। আজই হঠাৎ দুপুরবেলা শরীরটা একটু খারাপ লাগায় ট্যাক্সি নিয়ে সোজা বাড়ি চলে এসেছিল। কিন্তু এসেই যে এরকম একটা দৃশ্য দেখতে হবে কে জানত!

পুলিশ অফিসার এখনও ঘুরে ঘুরে দেখছে ঘরটাকে। হঠাৎ ঘুরে প্রশ্ন করল। — তাহলে শুধু এই মেয়েটাই বাড়িতে একা ছিল বলছেন? মানে আপনার স্ত্রী বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে?

হ্যাঁ, তাই তো থাকার কথা। মিহির উঠে দাঁড়াল, — আমার স্ত্রীর সরকারি চাকরি, একটু দেরী করেই কাজে বেরোয়। তার আগে আমার ছেলেমেয়ে বেরিয়ে যায়।

অ। তা এই মেয়েটা আপনাদের এখানে চব্বিশ ঘণ্টাই থাকে?

হুঁ। ঘরের টুকটাক কাজের জন্য রাখা হয়েছে আর কি। রান্নায় হেল্প করা। ঘরদোর পরিষ্কার। চা-ফা বানানো। অন্য ভারী কাজের জন্য আরেকটা লোক আছে। ঠিকে। সে আমার স্ত্রী থাকতে থাকতেই কাজ সেরে চলে যায়।

কথাটা বলে মিহির আড়চোখে তাকিয়ে নিল ঘরে ভিড় জমানো কৌতূহলী প্রতিবেশীদের দিকে। যেন তাদেরই শোনাল কথাটা। জানুক সকলে মিহিররা হৃদয়হীন নয়। কম বয়সী মেয়েটাকে তারা মোটেই পশুর মতো খাটায় না।

পুলিশ অফিসার আবার প্রশ্ন করল,— এ মেয়ে কদ্দিন ধরে আছে আপনাদের কাছে?

মিহির বলল, — নতুনই বলতে পারেন। মাসখানেক হল এসেছে।

রাখার আগে ভাল করে খোঁজখবর করেছিলেন?

মোটামুটি। আমার শালীর বাড়িতে এক বুড়ি কাজ করে সেই দেশ থেকে এনে দিয়েছিল। তার গ্রাম সম্পর্কের নাতনি না কি যেন হয়। গরিবের মেয়ে। বাপ মরে গেছে...

ব্যাস? এইটুকু রেফারেন্সেই একটা মেয়ের হাতে সংসার ছেড়ে দিলেন? যার কাছে সারাদিনের জন্য বাড়ি ছেড়ে সকলে বেরিয়ে যাচ্ছেন, সে কেমন, তার পাস্ট হিস্ট্রি কি দেখে নেবেন না? পুলিশ অফিসারের গলায় আলগা ধমক,— এত করে আপনাদের বলা হয় নতুন লোক রাখলে থানাতে ইনফরমেসান দিয়ে রাখুন, ছবি দিন, ঠিকানা দিন, আপনারা কিছুতেই কথা শোনেন না! এই ক্যালাস্‌নেসের জন্য চারদিকে চুরিডাকাতি কত বেড়ে যাচ্ছে জানেন?

মিহির ঢোক গিলল,— এই মেয়েটা কিন্তু একদমই হাবাগোবা। সত্যিই একেবারে গ্রাম থেকে এসেছে, কলকাতার কিছুই চেনে না।

বাহ্, তাতেই একজনের চরিত্র পড়া হয়ে যায়? দশাসই চেহারার ভদ্রলোক বেশ বিরক্ত এবার, জানেন গ্রাম থেকেই আজকাল বড় বড় ডাকাতের গ্যাঙ তৈরি হচ্ছে?

কথাটা ভুল নয়। যেখানে অন্ন নেই, যেখানে অভাব বেশি, সেখান থেকেই তো অপরাধ জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবু মিহির তর্কের খাতিরেই তর্ক করে ফেলল,— আমার শালীর বাড়িতে যে কাজ করে সে কিন্তু খুব বিশ্বাসী। দশ বছর আছে।

হাহ্। দশ বছর! পুলিশ অফিসারের স্বরে বিরক্তি থেকে ব্যঙ্গ,— বিশ্বাসের সঙ্গে সময়ের কোনো সম্পর্ক নেই মশাই। বাইরের লোকেই বলুন, আর ঘরের লোক, বিশ্বাস ভাঙতে এক সেকেণ্ড সময় লাগে না। এই তো ভবানীপুরের কেসটার দেখলেন না পনেরো বছরের বিশ্বাসী চাকর বুড়োবুড়ি দু-জনকেই খুন করে দিল!

মিহির চুপ করে গেল। সত্যিই তো, বিশ্বাস শব্দটা এখন ক্রমশই দুর্লভ। জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই।

পুলিশ অফিসার বলল, আরেক বার মেয়েটাকে ডাকুন তো মশাই। সত্যি কথাটা বার করা যায় কিনা দেখি।

বেস্পতিকে ডাকতে হল না, পাশের ফ্ল্যাটের মিসেস রায় তাকে টানটে টানতে নিয়ে এসেছে। ষোল বছরের টলটলে যুবতী। খুব রোগা হলেও মুখে একটা আলগা শ্রী আছে মেয়েটার। মাসখানেক শহরের জল পড়ে তার কালো রঙ বেশ উজ্জ্বল এখন। ঝুম্পার একটা পুরনো সালোয়ার কামিজে এই ক্লিন্ন মুহূর্তেও এক অন্য ধরনের সৌন্দর্য ফুটে আছে তার শরীরে। তীব্র ভয়ে ঠকঠক কাঁপছে মেয়েটা।

পুলিশ অফিসার একবার অপাঙ্গে দেখে নিল তাকে, তারপর হঠাৎই হুঙ্কার ছাড়ল, অ্যাই ছুঁড়ি, এখনও বল কাকে ঘরে ঢুকিয়েছিলি? নইলে এমন মার মারব...

মিহির এসে মুখের বাঁধন খুলে দেওয়ার পর মেয়েটা চোখ খুলেছিল। না, ঠিক তখনও চোখ খোলেনি। আশপাশের ফ্ল্যাটের মহিলারা বেশ কয়েকবার জলের ঝাপটা দিয়েছিল তার মুখে। চোখ খুলে প্রথমে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর সে কী ডুকরে ডুকরে কান্না!

এখন আর কাঁদছে না বেস্পতি। তার কালো গালে খড়ির দাগের মতো জলরেখা শুকিয়ে আছে শুধু।

অফিসার চিৎকার করে উঠল, কি হল কি? চুপ মেরে আছিস যে? তোর কোন্ নাগর এসেছিল ঘরে?

বেস্পতি কি চমকে উঠল সামান্য? বোঝা গেল না। ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে বাঁ-পায়ের আঙুল ঘষছে।

তোর নাগর কিছু না নিয়েই পালাল যে? সুবিধে হল না?

বেস্পতি চুপ।

মিহির অধৈর্য ভাবে বলে উঠল, কিরে, বল কিছু। জবাব দে।

এতক্ষণে বেস্পতি চোখ তুলেছে। মিহিরের দিকেই তাকাল, বলেছি তো।

আবার বল। প্রথম থেকে বল।

আমি কাউকে দরজা খুলে দিইনি। বেস্পতির স্বর নতুন করে কাঁপছে, আমি জানি না কি করে লোকটা ভেতরে এসেছিল।

মারব তিন থাপ্পড়। অফিসারের গর্জনে ফ্ল্যাটটাই কেঁপে উঠল যেন, বন্ধ দরজা আপনা-আপনিই খুলে গেল, না? ফাজলামি হচ্ছে?

সত্যি বলছি আমি খুলিনি। লোকটা ভেতরে ছিল।

তার মানে বলতে চাইছিস্ এ বাড়ির লোকরাই ভেতরে লোক রেখে গেছিল?

বেস্পতি মুখ নামাল, মামি বেরিয়ে যাওয়ার পর লোকটা এসে আমার মুখ চেপে ধরল।

তারপর?

আমি ছাড়াবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। আমার মাথায় জোরে মারল লোকটা। তারপর কিছু আর মনে নেই।

কি রকম দেখতে ছিল লোকটা?

বললাম তো।

আবার বল্।

সুন্দরপানা। স্যুটবুট পরা। হাতে ব্যাগ ছিল।

কে লোকটা? আগে দেখেছিস?

বেস্পতি দু-দিকে মাথা নাড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসার আবারও গর্জে উঠেছে, লোকটা তোর হাত বাঁধল না, পা বাঁধল না, শুধু মুখ বেঁধে রেখে গেল, অ্যাঁ? তুই কি আমাদের পাঁঠা ভেবেছিস? সেই সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে তিনটে, পাঁচ ঘণ্টা অজ্ঞান ছিলি তুই! চ, বিশ্বাস করতে বলিস এ কথা? চল্, থানায় চল্। তোর কাছ থেকে কি করে কথা বার করতে হয় দেখছি।

পুলিশ অফিসার তার নিজস্ব ভঙ্গিতে চিৎকার করে চলেছে, বেস্পতি হঠাৎ একটা আজব কাণ্ড করে বসল। আচমকাই মিহিরের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছে— মামাগো, আমাকে বাঁচাও গো। ও মামাগো, আমি কিছু জানি না গো।

মিহিরের এখনও সব কিছু কেমন ধন্দ লাগছে। তিনটে, সওয়া তিনটে নাগাদ বাড়ি ফিরেছিল সে। বেশ কিছুক্ষণ বেল্ বাজিয়েও বেস্পতির সাড়া না পেয়ে সে যখন নিজের চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে, তখন বেস্পতি বাথরুমের সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। মুখ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তবে হাত পা সত্যিই খোলা ছিল মেয়েটার। আর খোলা ছিল বাথরুমের পিছনের দরজাটা, যেটা সচরাচর বন্ধই থাকে। ঝাড়ুদারনি সপ্তাহে

একদিন বাথরুম পরিষ্কার করতে আসে, সেদিনই একমাত্র ওই দরজা খোলা হয়। হ্যাঁ, তখনই মিহির তন্ন তন্ন করে দেখে নিয়েছিল সব কিছু। ডাইনিং টেবিলে বা ফ্রিজের দিকে কেউ যায়নি। রান্নাঘর বাথরুমেও যেভাবে যা থাকে ঠিক সেই ভাবে রয়েছে। ঘর দুটোর তালাতেও হাত পড়েনি। শুধু তাণ্ডব চলেছে বাইরের ঘরেই। কেন এমন হল? না, সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই। বেস্পতিকে অসংখ্যবার জেরা করেও। মেয়েটা কি তাহলে একেবারে ঝানু মিথ্যেবাদী? পাড়াপ্রতিবেশী, মিহির, এমনকি পুলিশের কাছেও সাজিয়ে বলতে জিভ কাঁপছে না?

তবু মিহিরের কেমন যেন একটু মায়াও হচ্ছিল মেয়েটার ওপর। তার পায়ের ওপর পড়ে মেয়েটা হাপুস নয়নে কাঁদছে, মামাগো, আমাকে পুলিশে দিও নি। মামাগো, আমি কিছু করিনি গো।

মিহির চিন্তা করতে একটুক্ষণ সময় নিল। এক মাস ধরে মেয়েটাকে দেখছে, সেরকম কোনো বেচালপনা লক্ষ করেনি একদিনও। শান্ত নিরীহ স্বভাব। যে যা হুকুম করছে ঘাড় গুঁজে তামিল করে যাচ্ছে। বাবুল জল চাইল, সঙ্গে সঙ্গে জল এনে দিল। শ্যামলীর মুখের কথা খসতে না খসতে রান্নাঘরে দৌড়চ্ছে। ঝুম্পার পায়ে পায়ে ঘুরছে সারাক্ষণ। ঝুম্পার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে, বইখাতা গুছিয়ে দিচ্ছে। সপ্তাহে একদিন রাত্তিরে মাথায় তেল দেয় ঝুম্পা, বেস্পতির কী আগ্রহ সেই মালিশ করাতে। দোষের মধ্যে মেয়েটার টিভি দেখার নেশা খুব। তা সে আজকাল কে না দেখে। তার মধ্যেও উঠে যায় হাজার বার। চা করে। আটা মাখে। দুধ জ্বাল দেয়। সেই মেয়ে এত সপ্রতিভ হয়ে মিথ্যে বলতে পারে? সুদূর কাকদ্বীপ থেকে পেটের জ্বালায় কাজ করতে এসেছে, মাঝে মাঝে বাড়ির জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে, এমন একটা সরল মেয়ে এর মধ্যেই কলকাতায় প্রেমিক জুটিয়ে ফেলবে, এও কি সম্ভব?

পুলিশ অফিসারকে একটু আলাদা ডেকে নিয়ে গেল মিহির, আপনার কি সত্যিই মনে হয় ও মিথ্যে কথা বলছে?

অফকোর্স। রাশভারী ভদ্রলোকের চোখে সন্দেহের ঝাঁঝ, এসব মেয়েদের আপনারা চেনেন না, এদের দল থাকে, সুযোগ বুঝে...

আমি বলছিলাম কি। মিহির মাঝপথে থামিয়ে দিল ভদ্রলোককে, আমাদের যখন কিছুই চুরি যায়নি, তখন ওকে আর থানায় নিয়ে গিয়ে কি লাভ?

না, ওকে থানায় নিয়ে যাওয়াই দরকার। ওর পেছনে সত্যিই কোনো গ্যাং আছে কিনা জানতে হবে।

হয়তো মেয়েটাকে পুলিশর হাতেই তুলে দেওয়া উচিত, তবু কেমন যেন দুলে যাচ্ছিল মিহির। ষোল বছরের একটা সোমত্ত মেয়েকে পুলিশ তুলে নিয়ে গেলে অনেক অঘটনই ঘটে যেতে পারে। দিনকাল মোটেই ভাল নয়। হয়তো থানার লকআপে...! মিহির তখন কি জবাব দেবে বেস্পতির বিধবা মাকে? নিজের বিবেকের কাছেও কোনো উত্তর আছে কি! তাছাড়া শ্যামলীরা কেউ বাড়ি নেই, তারা কি সিদ্ধান্ত নেয়।

মিহির আমতা আমতা করে বলেই ফেলল, আমার মনে হয় আমরা ওকে বরং ছেড়ে দিই। আজকেই আমি ওকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।

কথাগুলো বলে মিহির ভয়ে ভয়ে তাকাল পুলিশ অফিসারের দিকে। নাহ্, ভদ্রলোকের সেরকম কোনো সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হল না। মিহিরকে খানিকক্ষণ সরু চোখে দেখে নিয়ে বলল,— তাহলে কেস্ লিখব না বলছেন?

না... মানে...

বুঝেছি। মেয়েটাকে তাহলে আজকেই সরিয়ে দিন। এরপর আর কিছু হলে আমরা কিন্তু দায়িত্ব নিতে পারব না।

মিহির দেখল বেস্পতির কান্না থেমে গেছে। গাঢ় কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে মিহিরের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

মিহির চোখ ঘুরিয়ে নিল।

ঝুম্পা জিজ্ঞাসা করল, বেস্পতিকে ওভাবে মুখ বাঁধা অবস্থায় অজ্ঞান পড়ে থাকতে দেখে তুমি নার্ভাস হয়ে যাওনি বাবা?

মিহির মৃদু হাসল, তাতো একটু হয়েছিলাম। বেল বাজালেই রোজ মেয়েটা দৌড়ে এসে দরজা খুলে দেয়, হাত থেকে ব্রিফকেস নিয়ে নেয়... প্রথমে ভেবেছিলাম ঘুমোচ্চে। তারপর খুলে দেখি...

রাত অনেক হয়েছে। প্রতিবেশীদের আলোচনার ঝড় থেমে গেছে অনেকক্ষণ। বেহালা থেকে মিহিরের ভায়রাভাই এসে নিয়ে গেছে বেস্পতিকে। এখন খাবার টেবিলে নতুন করে শুরু হয়েছে গবেষণা।

শ্যামলী বলল, বাদমাইশি। সব এই মেয়েটার বদমাইশি। অজ্ঞান হয়েছিল না ছাই। ভান করে পড়ে ছিল। ওই নির্ঘাৎ কাউকে বাথরুমের দরজা খুলে দিয়েছিল। যে কোনো কারণেই হোক কাজ হাশিল করতে না-পেরে পালিয়েছে লোকটা। মেয়েটাকে পুলিশের হাতেই তুলে দেওয়া উচিত ছিল। তোমার ছেড়ে দেওয়াটা মোটেই ঠিক হয়নি।

মিহির ভুরু বেঁকাল, তুমি এত শিওর হচ্ছ কি করে?

আশ্চর্য! একটা লোক ভেতরে ঢুকে ওর মুখ বাঁধল, মেরে অজ্ঞান করে দিল, অথচ হাত পা বাঁধল না, এটা হয়? এতো জানা কথাই মেয়েটা জ্ঞান ফিরলে প্রথমে মুখ খুলে ফেলবে। এতক্ষণ ধরে ও অজ্ঞান হয়েছিল, এটাও সম্ভব হয়। তাহলে ও মুখ খুলে লোক জন ডাকেনি কেন? আমি বলছি গোটা ব্যাপারটাই সাজানো।

ঝুম্পা বলল, রাইট। মা বেরিয়ে যাওয়ার পরই লোক ঢুকেছে এটা সম্পূর্ণ বাজে কথা। আমাব মনে হয় লোক বাবা আসার ঠিক আগেই এসেছিল। বেস্পতিই ডেকেছিল তাকে। বাবার বেল শুনেই লোকটা পালিয়েছে। মানে বেস্পতিই তাকে পালাতে বলেছে। বেস্পতি তো আর জানত না বাবা তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। হিসেবে গণ্ডগোল করে ফেলেছে আর কি।

শ্যামলী বলল, ওই আলাভোলা মেয়ের পেটে এত শয়তানি ছিল। আগে একটুও বুঝতে পারলাম না!

বাবলু আয়েস করে রুটি মাংস চিবোচ্ছিল, অনেকক্ষণ পর পাকা গোয়েন্দার মতো বলে উঠল, দাঁড়াও। অত সহজে একে একে দুই কোরো না। ধরে নিলাম একটা লোককে ও দরজা খুলে দিয়েছে, ঠিক? লোকটা বাথরুম দিয়ে ভেতরে ঢুকল, আমাদের ঘর দুটো বন্ধ দেখে ড্রয়িংরুমে গেল, ওকে? কিন্তু ড্রয়িংরুমে গিয়ে লোকটা ছোট ছোট খেলনাগুলোকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলবে কেন? কুশনগুলোকে নিয়েও-বা কেন খেলা করবে? তার তো কাজ একটাই ছিল। হাতের কাছে ভি সি পি রয়েছে, টু ইন ওয়ান রয়েছে, ঘড়ি রয়েছে, এগুলো নিয়ে মানে মানে কেটে পড়া।

ঝুম্পা হি হি হেসে উঠল, তুই কি বোকারে দাদা।

কেন? বোকা কেন?

বারে, এটুকু বুঝতে পারছিস না, বাবা এসে গেছে বলেই তো কিছু নিতে পারেনি। এটাই তো ন্যাচারাল।

না। ন্যাচারাল নয়। বাবলু রীতিমত গম্ভীর, বাবা এসে বেল বাজিয়েছে, দু-চার মিনিট ওয়েট করেছে, এর মধ্যেই লোকটা হ্যাড গট এনাফ টাইম। ইজি সে অন্তত ভি সি পি বা টু-ইন-ওয়ানটাকে হাতে করে নিয়ে যেতে পারত। আর বাথরুমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলে বাবা কেন, কেউই কিছু ধরতে পারত না।

শ্যামলী বলল, সে সময়ে লোকটা হয়তো বেস্পতির মুখ বাঁধছিল।

নো। ফাঁকটা তোমরা বুঝতেই পারছ না। বাবলু খাওয়া শেষ করে উঠে পড়েছে। বেসিনে গিয়ে হাত ধুল। মুখ মুছতে মুছতে আবার সাজাল তার যুক্তিদের, তোমাদের কথা ধরতে গেলে বলতে হয় চোর নয়, কোনো পাগল এসেছিল। ড্রয়িংরুমটা তোমরা ভাল ভাবে লক্ষ্য করেছিলে? ঘরটাকে যেভাবে লণ্ডভণ্ড করা হয়েছে তাতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগেছে। চোর চুরি করতে এলে আগে টিভি, ভি সি পি, টেপ, এগুলোকেই নেওয়ার জন্যই খুলে ফেলবে। অকারণে সেগুলোকে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দেবে না। মার অবলোকিতেশ্বর দু-টুকরো করার পেছনে কি যুক্তি আছে? শোকেস থেকে ক্ষুদে ক্ষুদে ফালতু জিনিসগুলোকে বার করেই বা ঘর জুড়ে ছড়াবে কেন? এগুলো কি অযথা সময় নষ্ট নয়?

ঝুম্পা বলল। — হয়তো ওগুলো সরিয়ে আমাদের ঘরের চাবি খুঁজছিল।

এই তো নিজের কথায় নিজেই আটকে গেলি! বাবলু হাসছে বিজ্ঞের মতো, বেস্পতিই যদি লোক ঢুকিয়ে থাকে, তাহলে বেস্পতি ভাল মতোই জানে আমরা বাড়িতে কেউই ঘরের চাবি রেখে যাই না। ও রোজই দেখে যে-যার ঘর লক করে আমরা চাবি নিয়েই চলে যাই। তবে চাবি খুঁজে লোকটাকে সময় নষ্ট করতে দেবে কেন?

হুঁ। সেটাও ঠিক। ঝুম্পা মাথা নাড়ল, আমরা চলে যাওয়ার পর বেস্পতি সোফা ডিভান সবই তো ঝাড়ে। ও ভাল মতোই জানে ওখানে চাবি থাকে না। তাহলে কুশনগুলোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলার মানে কি?

ঠিক। ঠিক কথাই। মিহির শ্যামলীর দিকে তাকাল, আমার মনে হয় কেউই আসেনি। মেয়েটা নিজে নিজেই করেছে সব কিছু। মানে গোটা নাটকটাই।

শ্যামলী বলল, তাই আবার হয় নাকি!

হবে না কেন? হতেই পারে। মেয়েটা হয়তো সাইকিক কেস। নিজেই নিজের মধ্যে ভয় তৈরি করে। এসব কেসে মানুষ টোটাল অ্যাবনরমাল হয়ে যায়। সে তখন কি করছে নিজেও জানে না। হতে পারে বেস্পতির অ্যাড্রিনালিন সিক্রিয়েশন তখন এত বেশি হতে শুরু করেছিল যে সেই সিক্রিয়েশানের ঘোরেই নিজে নিজের মুখ বেঁধেছে! মানে ওর মনে হয়েছিল কেউ ওর মুখ বাঁধছে! বাইরের ঘরটাও লণ্ডভণ্ড করার সময় ও ভাবছিল ব্যাপারটা কোনো গুণ্ডা এসে করছে! তারপর হয়তো টলতে টলতে গিয়ে বাথরুমের দরজাটা খুলে দিয়েছে!

ঝুম্পা বলল, বাথরুমের দরজাটাই খুলল কেন? কেন মেইন দরজা খোলেনি?

মিহির বলল, এটাও একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার! মেন দরজা দিয়ে সব সময় লোক আসা যাওয়া করে, সে তুলনায় বাথরুমের দরজাটাই তার বেশি সেফ্ আর সিকিওরড্ মনে হয়েছে।

বাবলু ফিরে এসে চেয়ারে বসল, না বাবা। তোমার থিয়োরি পুরোপুরি মেনে নেওয়া গেল না। বেস্পতি যদি সাইকিক কেসই হবে, তবে এতদিনে তার কোনো সিম্পটম্

দেখা যায়নি কেন? ও তো একা বাড়িতে থাকতে খুব একটা বেশি ভয় পেত বলে মনে হয় না।

হয়তো পেত। তোরা জানিস না। মিহিরের আচমকা রাগ উঠে গেল। সেই দুপুর থেকে একটা ঘটনাকে চটকানো চলছে তো চলছেই। মেয়েটাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, বাড়ির একটা আলপিনও খোয়া যায়নি, ব্যস, চুকেই তো গেছে সব। এখন আর এত অভিজ্ঞ মতামতের কি দরকার?

রাগ রাগ মুখেই মিহির বলল, থাক হয়েছে। বারোটা প্রায় বাজে, এবার সব শুয়ে পড়ো।

সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলী তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়েছে তার দিকে, কেন? থাকবে কেন? বাড়িতে একটা এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল, তা ভাবতে হবে না?

ভেবে কি হবে? মিহির প্রায় ভেংচে উঠল এবাব, ভেবে কি সমাধান হবে কিছু? হলেও বা করবে কি? একটা ষোল বছরের মেয়েকে পুলিশের হাতে তুলে দেবে?

পরিবেশ গম্ভীর হয়ে উঠছে ক্রমশ। শ্যামলী আর কোনো কথা বলছে না। টেবিল থেকে খাবার তুলছে ফ্রিজে। বাবলু দাঁত মাজার জন্য ব্রাশে পেস্ট লাগাচ্ছে। ঝুম্পা উঠে গেল বাথরুমের দিকে।

বাথরুমে ঢুকেও আচমকা ছিটকে বেরিয়ে এসেছে ঝুম্পা।

শ্যামলী চমকে তাকাল, কি হল?

ঝুম্পার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, বাথরুমে কেউ আছে মা!

যাহ্। কে আবার থাকবে?

হ্যাঁ আছে। আমার ভয় করছে। মা তুমি এসো। আমি একা একা বাথরুমে যাব না।

শ্যামলী আর মিহির মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, বাবলু হো হো করে হেসে উঠল, দুর পাগল!

ঝুম্পা তবু কাঁপছে, আমার মনে হয় সকালেও কেউ ঢুকে এসেছিল। হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।

তুই কি করে জানলি?

বেম্পতি মিথ্যে কথা বলবে না। ও খুব ভাল মেয়ে। আমি জানি।

মিহির উঠে ঝুম্পার কাছে গেল। এরকম একটা ঘটনাতে মানুষের মনে ভয় আসতেই পারে। তাছাড়া ঝুম্পাটা এমনিতেই এত নরম মনের! মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মিহির বলল, বোকা মেয়ে। বাথরুমের দরজা যদি কেউ খুলে থাকেও, ভেতরে যে ছিল সেই খুলেছে।

ঝুম্পা বিড়বিড় করে উঠল, সেই লোকটাই ওই দরজা খুলে পালিয়ে গেছে।

বাবলু আবারও শব্দ করে হেসে উঠল, হ্যাঁরে, আমি খুলেছিলাম বুঝলি? আমি। আমি। বোকা বেম্পতিকে ভয় দেখানোর জন্য।

বাবলু হাসছে, ক্ষ্যাপাচ্ছে বোনকে, ঝুম্পা কিন্তু একটুও হাসছে না। তার ভীতু চোখ কেমন ধারালো হয়ে উঠছে ক্রমশ, ঠাট্টা করিস না দাদা, সত্যি করে বল তো, তুইই সেই লোকটা নোস্ তো?

বাবলু হাসছে তবু, হতেও পারে।

হতেও পারে না, হয়েছিল। ঝুম্পার স্বর সহসা ভয়ঙ্কর রকমের নির্দয়— বাথরুমের দরজা নয়, তুই হয়তো চাবি খুলে মেন দরজা দিয়েই ঢুকেছিলি?

বাবলু এবার যেন থমকেছে একটু, কি করে বলছিস?

তোর বেম্পতির ওপর নজর ছিল। আমি জানি। তুই বেম্পতিকে বিরক্ত করার চেষ্টা করতিস।

ভ্যাট্।

ভ্যাট্ নয়, আমি দেখেছি তুই একদিন ইচ্ছে করে বেস্পতির হাত চেপে ধরেছিলি।

বাজে কথা। বাবলু হাসার চেষ্টা করছে, হাসি ঠিক ফুটছে না তার মুখে— বলতে চাস আমিই বেস্পতির মুখ বেঁধে রেখেছিলাম?

কি করেছিলি তুই ভাল জানিস।

আমি এসে নিজেদের ঘরে নিজে লণ্ডভণ্ড করেছি?

হয়তো ওটাই তোর শো! সকলকে মিসগাইড করার জন্য। তোর নাম বেস্পতি হয়তো লজ্জায় বলতে পারেনি!

বাবলু হতচকিত হয়ে গেছে। স্তম্ভিত মিহির শ্যামলীও। মাথার ওপর পূর্ণ গতিতে পাখা ঘুরছে, তবু ভাদ্রের গুমোট ঝাঁপিয়ে এল ঘরে।

মিহির বেশ খানিকক্ষণ পর কথা বলল, বাবলু ঘরে যা। এখানে আর ভ্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।

বাবলু চোখ তুলল। বুঝি বাবা মার কাছ থেকে এ ধরনের কোনো কথা শোনার জন্যই থমকে দাঁড়িয়েছিল সে। ঝুম্পাকে দেখল একবার। মিহিরকে দেখল। তারপর চোখ শ্যামলীর দিকে স্থির, মা, তুমি ঝুম্পার কথা বিশ্বাস করছ?

শ্যামলী চুপ!

বাবলু বলল, ও আমার নামে চার্জ আনছে। অ্যাবসোলিউট্লি নোংরা চার্জ। আমি যদি বলি ও নিজের দোষ ঢাকার জন্যই...!

দোষ! কি দোষ! ঝুম্পা পলকে ফণা তুলেছে।

বাবলু ঝুম্পাকে আমল দিল না, শ্যামলীর দিকেই তাকিয়ে আছে— তোমরা কি জানো কেউ বাড়িতে না থাকলে ঝুম্পা কি করে? এক-একদিন এক-একটা বয়ফ্রেণ্ড নিয়ে আসে বাড়িতে। বয়ফ্রেণ্ডদের নিয়ে ঘর বন্ধ করে দেয়।

ঝুম্পা চেঁচিয়ে উঠল, লাই! ড্যাম লাই।

বাবলু নির্বিকার— বেস্পতি আমাকে বলে ফেলেছিল মা। আরও শুনবে? ঝুম্পা সেটা জানতে পেরে বেস্পতিকে লাথি মেরেছিল।

ঝুম্পা আবারও বলল, মিথ্যে কথা।

মিহিরের মাথা ঝিমঝিম করছিল। ঠিক সেই দুপুর বেলার মতো।

মাথা চেপে মিহির ঘরে চলে এল। একটা বিশ্রী অবসাদ আচ্ছন্ন করে ফেলছিল তাকে। চোখে হাত চেপে শুয়ে রইল চুপচাপ।

শ্যামলী এল আরও খানিকক্ষণ পর। থমথমে মুখে ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসেছে। আয়নায় দেখছে নিজেকে।

কথা বলতে গিয়ে মিহিরের গলা ঘড়ঘড় করে উঠল, হল তো শিক্ষা! এবার অন্তত ছেলেমেয়েদের দিকে একটু নজর দাও।

শ্যামলী কথা বলল না।

মিহির বলল, শুনছ আমার কথা? এবার নিজের ফুর্তিফার্তাগুলো কমাও।

শ্যামলী ঝট করে ঘুরল, আমি অফিসে ফুর্তি করতে যাই?

অফিসের পরও তুমি বেশির ভাগ দিন বাড়ি ফেরো না।

সে তো তুমিও ফেরো না। তোমার ক্লাব আছে। আড্ডা আছে।

আমার কথা আলাদা।

কিসের আলাদা? দেরি করে বাড়ি ফেরার অধিকার একা তোমাদের? ছেলেদের? আর ছেলেমেয়েদের দায়দায়িত্ব, সংসার সামলানোর কাজ, সব আমার? আমারও বাইরে কাজ থাকতে পারে।

থাক্। কাজ দেখিও না। মিহির দুম করে ধৈর্য হারিয়েছে, অফিসের পর তুমি কোথায় কি করে বেড়াও আমার জানা আছে।

শ্যামলীরও গলা চড়েছে, — দ্যাখো, তুমি আমাকেঁ অপমান করছ।

অপমান এতদিন করিনি। ভদ্রতার খাতিরে চুপ করে ছিলাম।

কি বলতে চাইছ?

মিহির বহু কষ্টে সংযত করল নিজেকে, গলা নামাল, তোমাকে আমি তিন দিন এস্‌প্ল্যানেডে দেখেছি। কে ছিল তোমার সঙ্গে? তোমার সেই পুরনো প্রেমিক, তাই না?

শ্যামলী মূক হয়ে গেল।

মিহির আবার তীর হানল, দ্যাখো, তোমাকে একটা স্পষ্ট কথা বলে দিচ্ছি। তুমি যা খুশি করে বেড়াও, আমার দেখার ইচ্ছে নেই। জানারও রুচি নেই। শুধু বলে দিচ্ছি আমার ছেলে-মেয়ে যদি নষ্ট হয়ে যায় তোমাকে আমি ক্ষমা করব না।

থাক। শ্যামলীর কথা ফুটেছে এতক্ষণে, — রুচি তুমি দেখিও না। বাবলুরই একা নজর ছিল বেস্পতির ওপর, না? তোমার চোখ আমি দেখিনি? ভুলে গেছ একদিন রাত্তিরে বাথরুম যাওয়ার নাম করে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলে বেস্পতিকে? মেয়েটা ঘুমোচ্ছিল? গা থেকে কাপড় সরে গেছিল? কেউ দেখেনি ভেবেছ?

মিহির গুম হয়ে গেল।

শ্যামলী বলল, ছেলের আর দোষ কি! যেমন বাপ, তেমনই তো হবে ছেলে!

মিহির বলতে যাচ্ছিল, হ্যাঁ যেমন তোমার মেয়েকে দেখে তোমাকে চেনা যায়! বলল না।

মিহির বুঝতে পারছিল শুধু তার বাইরের ঘর নয়, তার অন্দরমহলটাকেও আজ তছনছ করে দিতে চাইছে কেউ।

কে সে? কোনো বাইরের চোর? নাকি ওই উটকো উড়ে এসে জুড়ে বসা কাজের মেয়েটা? নাকি শুধুই একটা ভয়? একটা মনস্তাত্ত্বিক ভয়?

মিহির জানে না।

নদীর নাম বহতা

জয়া মিত্র

আজ কনকলতা রিটায়ার করলেন। ডি আই অফিস বলেছিল ইচ্ছে করলে এক্সটেনশন নিতে পারেন তিনি। 'ইচ্ছে করলে' কত সহজে বলে মানুষ। যেন নির্দিষ্ট কোনও মানে নেই কথাটার। তাঁর ইচ্ছে আছে কিনা সে কথা জানবে কে? কাকে বা বলবেন?

মনে পড়ছে নাকি এত বছরের সহকর্মীদের কথা? তার চেয়েও অনেক বেশি করে চোখের সামনে ভেসে উঠছে না ছাত্রছাত্রীদের গোলগাল কালো চকচকে মুখগুলো আর তাদের বাপমায়েদের নিরাশ দুঃখভরা সব চেহারা? তারা বেশ জোর দিয়েই বলেছিল, ও দিদিমনি, তুমাকে আমরা ছাড়ব নাই। আমাদের গাঁয়ে জমি দিব, ইস্কুল কইরে দিব, তুমার ঘর কইরে দিব— তুমি থাকো। তুমি গেলে আমাদের ছেলাগুলানের আর লিখাপড়ি হবে নাই।

তবু থাকতে পারলেন কই! শরীরের ক্ষমতা আর মনের ইচ্ছার মধ্যে অনেক তফাত হয়ে গেছে। ওই ছাত্রছাত্রীদেরই একজনের বাবা এই সাত কিলোমিটাব রাস্তা পার করে আজ কনকলতাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসেছে। কনকলতা জানেন ওই মানুষটিকে ভাড়া দিতে পারবেন না। দেওয়া যায় না। দিতে গেলে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক তাকে মুছে ফেলে এক মুহূর্তে ওকে শুধুমাত্র রিক্সাওয়ালাই করে ফেলতে হয়।

বাড়ির সামনে রিক্সা থামতেই পুত্রবধূ রঞ্জা বেরিয়ে এল। সে হাত থেকে জিনিসগুলো নামিয়ে নিলে কনকলতা রিক্সা থেকে নামেন। নামবার সময়ে এবং উঠতে, হয়ত উঠতে আরও বেশি, অবধারিত ভাবে ভুলে যাবেন কোন পায়ের হাঁটুতে ব্যথা। অন্যমনস্ক ভাবে সেই পা-টাই এগিয়ে দেবেন, তার পর শরীরের ভার রাখতে গিয়ে হাঁটুতে এমন খচ করে লাগবে যে উপুড় হয়ে পড়ে যাবার জোগাড় হয়। আজ রঞ্জা ধরে ফেলল। বিষুণ নিজেও রিকশা ছেড়ে এগিয়ে এসেছিল। ব্যথাটা সামলে নিয়ে তাকে ঘরে আসতে বললেন। একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল বিষুণ। কনকের ভাল লাগল। এইটুকু একদিনে হয়নি। কখনও কোনও দরকারে বাড়িতে এলে কিছুতেই ঘরে ঢুকত না এরা, যদি বা ঢুকত তা হলে পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরের উঠোনে। মাটিতে বসতে বারণ করলে, মোড়া বা জলচৌকি এগিয়ে দিলে আড়ষ্ট হয়ে বরং দাঁড়িয়েই থাকত।

অথচ তিনি তো কখনও করুণা করে বা কোনও সমাজ সংস্কারের নাম নিয়ে সে সব করেননি। সহজ ভাবেই এই সব লোককে অন্য অতিথি বা গৃহাগতদের থেকে আলাদা করে দেখতে পারতেন না। কোনওদিনই পারেন না। রঞ্জা চা জলখাবার করে আনল। কনকলতা তার সঙ্গে বিষুণের পরিচয় করিয়ে দিলেন। বিষুণ প্রশ্ন করে— আর নাতি রাজাটি?

— আজ ঘরেই। আম্মার জন্য এতক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল।

— হঁ, ইবার তো মা আমাদিগে ছাইড়লেন, নাতির কাছে রইবেন দিনভরই। বিষুণের গলা ধরে আসে।

কনকলতা বলেন, মায়ে কি ছেলেমেয়েকে ছাড়ে বিষুণ? বুড়ো যে হয়েছি, তাই আর রোজ যেতে পারব না বাবা।

বিষুণ যুক্তি বোঝে। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে,— হঁ, সিটো ঠিকেই বটে। আমরাই আসব মা, দেইখে যাব আইসে।

খানিকক্ষণ বসে চলে যায় বিষুণ। যাবার আগে প্রণাম করে। বড় অস্বস্তি, তবু বাধা দেন না কনকলতা। হাতজোড় করে এই প্রণামটি তিনি মনে মনে নিজের ঠাকুরকে উৎসর্গ করে দেন। বাধা দিলে ওরা ভারী সংকুচিত হয়। ফরসা কাপড় পরা, পাকা ঘরে বাস করা, উঁচু জাতের লোকেদের থেকে অনেকখানি দূরে থাকার যে স্মৃতিময় সংস্কার, নিমেষের মধ্যে তা পুনরুজ্জীবন পায়।

মনে আছে এ শহরে যখন প্রথম এসেছিলেন, কাজের বউটি নিজেই বাসনপত্র মেজে রান্নাঘরের সামনে বারান্দায় উপুড় করে দিয়ে তাঁকে বলেছিল, এ গুলা ধুয়ে তুলে লিও।

কনকলতা অবাক হয়েছিলেন, তুমি পরিষ্কার জল দিয়ে ধোওনি?

— হঁ, ধুয়েছি। বাবুঘরের লোকেরা আমাদের মাজা বাসন রান্নাঘরে লেয় না।

— তা হোক, আমি ও সব মানি না। তুমি নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, পরিষ্কার করে কাজ করবে, তা হলেই হল।

কতদিন হয়ে গেছে সে সব কথা।

বাইরের কাপড় পাল্টে ভেতরের ঘরে এসে বসেন কনকলতা। এক ঘটি জল খান। বুবুন এতক্ষণে কাছে এসে বসে। বসেই তার চোখ যায় পাশের টেবিলে রাখা জিনিসপত্রের দিকে। সেগুলো নামিয়ে আনে, এগুলো কী আম্মা?

রঞ্জাও এসে দাঁড়ায় কাছে।

— খোলো তুমি, দেখো কী আছে।

বুবুন আর রঞ্জা মিলে খোলে রঙিন কাগজে জড়ানো ভারী বইয়ের প্যাকেটটা। মহাভারত, কাশীরাম দাসের। একটা ছাতা, একটা চাদর খদ্দরের।

কনকলতার হাতে একে একে এনে দেয় বুবুন। তাঁর গলার কাছে কী ঠেলে ওঠে। তাঁর সহকর্মীরা, তাঁর ছাদখোলা দেওয়াল জানলা ভাঙা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা! ষোল বছরে একটা কাজ ওরা করেছে তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে। তাঁকে কিচ্ছু না জানিয়ে।

— খোকা?

— এসে পড়বে এখুনি। বলেছিল স্কুটারে কী হয়েছে, দোকানে দেখিয়ে নিয়ে আসবে। ঘরের কোণে নিচু টেবিলে ছোট ডিশে কটা শিউলিফুল আর দূর্বা সাজিয়ে রেখেছে রঞ্জা। ফুল কটা শুকিয়ে ন্যাতা হয়ে গেছে। এখনও বর্ষা, তাঁর এই গাছটা অনেক আগে থেকে ফুল দিতে শুরু করে। প্রতি বছর বর্ষায় আগের বছরের বীজে ফোটা চারায় বাগান ছেয়ে যায়। অনেক বিলিয়ে দিয়েছেন, এ পাড়ায় এখন অনেক বাড়িতে শিউলি গাছ। তাঁর রুক্ষ লালমাটির গ্রামের স্কুল, সেখানকার ছেলেমেয়েরা ক্লাসে পড়ত 'শিউলির ডালে কুঁড়ি ভরে এলো'— কোনওদিন শিউলি গাছ শিউলি ফুল চোখে দেখেনি। বাগান থেকে প্রায় শ'খানেক চারা এ পর্যন্ত তিনি নিয়ে গিয়েছেন। সারা গ্রামে লাগিয়েছিল ওরা। সব বাঁচেনি, তবু অনেক বেঁচে গেছে। এ বছরও মুখস্থ কবিতার পড়া দেবে ওরা 'শিউলির ডালে কুঁড়ি ভরে এলো/টগর ফুটিল মেলা'।

বুবুন বইটার আয়তন দেখে স্পষ্টতই অবাক হয়েছে।

— এটা কী বই আম্মা?

— এটা দাদা, একটা খুব পুরনো মস্ত বই।

—পুরনো নয়, আম্মা, নতুন বই।

— হ্যাঁ দাদা, নতুনই।

— এতে কী আছে আম্মা? গল্প আছে কি, নাকি খালি পড়ার বই?

— গল্পও আছে! খুব লম্বা একটা গল্প।

— ফাইটিং আছে?

রঞ্জা ধমকে ওঠে, হ্যাঁ, সব কিছুতেই খালি ফাইটিং থাকবে। বুবুন মায়ের কথায় কান দেয় না, বানান করে বড় বড় লেখা নামটা পড়ে ফেলে, ও আম্মা, এর নাম মহাভারত? আমি তো মহাভারত জানি, আমি টিভিতে দেখেছি, খুব ফাইটিং ঢিসুম ঢিসুম... এটা তো বই গো আম্মা।

কনকলতা এই মুহূর্তে ঠিক করতে পারেন না কী করে বুবুনের কথার ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন। আবছা আবছা মনে পড়ে তিনি এ বই দেখেছিলেন কি বুবুনের বয়সে? নাকি তার চেয়েও ছোট ছিলেন? কবে থেকে যে ঠিক করে মনে পড়ে না, জ্ঞান হবার সময় থেকেই তো দেখেছেন এই স্থূলবপু বই, ওপরে গীতার কৃষ্ণার্জুনের ছবি, ব্যবহারে ব্যবহারে মলিন চেহারা। কিন্তু প্রতিদিন সেই ব্যবহৃত, প্রায়-জীর্ণ বইটির পাশে জলচৌকিতে দু'তিনটে টাটকা ফুল। হয়তো টগর না হলে কলকে কোনওদিন বা একটি গন্ধরাজ আর একটি তুলসিপাতা। মা যখন তাঁর গোপালকে ফুল দিতেন অমনি ফুল রেখে প্রণাম করতেন এই বইটিকে। দুপুরবেলা সব কাজ সেরে খোলা চুলের ডগায় একটি গিঁট দিয়ে জলচৌকির সামনে পিঠ সোজা করে বসে একমনে গুনগুন করে পড়ে যেতেন। ঘণ্টাখানেক পড়তেন রোজ। রোজই অমন সটান সোজা বসা। সেই মা, সোজা হয়ে হাঁটতে পারতেন না শেষ বয়সে। কোমর থেকে দু'ভাঁজ হয়ে গিয়েছিল পাতলা শরীরটা। বসে থাকতে পারতেন না।

রাত্রের রান্নাবান্না শুরু করবার সময় হয়ে গিয়েছে। তিনি আর রান্না করেন না এখন জোগাড়যন্ত্র করে দেন, তরকারি কেটে গুছিয়ে দেন। রান্না করতে ইচ্ছে করে। খোকাকে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াতে। খোকা বরাবর মায়ের হাতের রান্না ভালবাসত। এক একসময় মনে হয় রঞ্জাকে বলবেন, রান্নাটা করতে তো খাটনি বেশি নয়, বরং কেটে ধুয়ে গুছিয়ে দিলে তিনিই করে নিতে পারেন। কিন্তু বলেন না। থাক, এখন তো ওদের সংসার, করুক। রঞ্জা অবশ্য খুব ভাল মেয়ে। তিনি নিজেই আস্তে আস্তে একে একে সংসারের সব দায়িত্ব হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছেন। নিজের কাছে কি সহজ হয়েছিল সেই ছাড়া? হয়নি। কত বছর ধরে পাখির মায়ের মতো একটি একটি কুটো জড়ো করে গড়ে তুলেছেন, তিনি তো সাজানো সংসার হাতে পাননি বউ হয়ে এসে। বিয়ের আগেও কোনওদিন শশিশেখরের ঘরপরিবারের টান ছিল না। জঙ্গলে পাহাড়ে চাকরি করেছেন, ক্যাম্পে ক্যাম্পে রাত কাটিয়েছেন। মিলিটারির ইঞ্জিনিয়ার, সে তো মিলিটারিই। সে সব জায়গায় কনকলতা যাননি কখনও। ডিব্রুগড় কি তেজপুর এ রকম শহর অঞ্চলে হয়ত কখনও দু-একবার নিয়ে গিয়েছেন স্বামী। নতুন নতুন সুন্দর জায়গা, সেই মানুষটির কাছাকাছি থাকা, খুব ভাল কেটেছিল সেই সামান্য কটি দিন। হয়তো আরও ভাল লাগত যদি ছুটির পর বাড়ি ফিরে এসে একেবারে বাড়ির হয়ে থাকতেন শশিশেখর। কিন্তু তা

হত না। ওই সব শহর অঞ্চলে থাকবার সময়ে যেমন ধরা-বাঁধা কোনও অফিস থাকত না শশিশেখরের, একেবারে ছুটিও থাকত না। বাংলোতে বা গেস্ট হাউসে থাকাও যেন কেমন অফিস-চাকরির আবহাওয়ার মধ্যেই থাকা। আর সন্ধ্যার পর নিয়মিত ক্লাবে যাওয়া। এইটেই সবেচেয়ে খারাপ, সবচেয়ে ভীতিকর ছিল কনকলতার কাছে। আনন্দ-উৎসব তাঁরও ভাল লাগত, অসাধারণ ভাল গান গাইতে পারতেন, কিন্তু সে গান নাচ সেই আনন্দের চেহারা একেবারে আলাদা। ক্লাবের চলাফেরা কথা কৌতুক পানফুর্তি কোনও কিছুই এতটুকুও ভাল লাগাতে পারতেন না তিনি। এ কথা সত্যি, শশিশেখর কখনও সেভাবে রাগ করেননি তার ওপব কিন্তু স্পষ্টতই ক্ষুণ্ণ হতেন। অবশ্য কদিনই বা আর! আবার তো ফিরে আসতেন নিজের সংসারে, যেখানে সম্বচ্ছরে একমাস কি কুড়িদিনের অতিথি হয়ে আসতেন শশিশেখব। সে কটা দিন রোজই উৎসব। কত রাত্রি পর্যন্ত উঠোনে চাঁদের আলোয় বসে একের পর এক রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনানো, ছোট্ট সুগত বাবার কোলে বসে থাকত। তাঁর প্রিয় গান ছিল 'তাই তোমাব আনন্দ আমার পব'। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সুগতও গাইত 'তোমায় নইলে ত্রিভুবনেব সব'। আব কত গল্প! আশ্চর্য সব জায়গার! অদ্ভুত সব ঘটনার!

বছরে একমাস করে জুড়লে হতো ঠিক এক বছবই হবে। বুলবুলি আট বছরের যখন শশিশেখর গেলেন। আর কেমন সেই যাওযা। অতদূবে বিজনে ও রকম কেউ যায়? শেষবাবের চোখের দেখাও দেখেননি কনকলতা। ধস নামা জাযগায় তাড়াতাড়ি তৈবি রাস্তা ইন্সপেকশন করতে গিযেছিলেন, গাডওয়াল হিমালয়েব ভিতরে কোথায়। ঠিক তখুনি নতুন ধস নামে। ছ'সাতজন কর্মী সমস্ত যন্ত্রপাতিসুদ্ধ সকলকে নিয়ে নেমে যায় কত হাজার ফুট নীচের পাতালে, সামান্য দূরে দূবে থাকা লোকজনেব স্তম্ভিত চোখের সামনে। প্রথমে টেলিগ্রাম, তারপর চিঠি এসেছিল তাঁর কাছে। তাঁর দাদাবা এসেছিলেন খবর পেয়ে। সেই মাত্র একবারই তিনি নিজের ছেলেমেযে ছেড়ে একা গিয়েছিলেন দাদার সঙ্গে হরিদ্বার, সেখান থেকে মিলিটাবি জিপে রুদ্রপ্রয়াগ, সেখান থেকে আরও ভিতরে। ওই বিশাল হিমালয় দেখেছেন আব কেবলই মনে মনে ভেবেছেন— এত বড় তুমি, তোমাকে কি মানায় আমাকে ধ্বংস করা? যাকে তুমি টেনে নিলে তোমার কাছে সে কতটুকু? কিন্তু আমার সংসারে সেই যে ছিল অবলম্বন। মুহূর্তে মুহূর্তে ওই বিশাল পর্বতমালা যেন বুঝিয়ে দিয়েছিল মানুষের দুঃখ, মানুষের হাহাকার কত অকিঞ্চিৎকর তার সামনে! আয়তনে,কালে উপস্থিতিতে মানুষ তার সব সুখ সব দুঃখ নিয়ে কতটুকুমাত্র এই প্রকৃতির! অথচ সেই অস্তিত্বটুকুর মধ্যে কত তার স্বপ্ন কত আকাঙ্ক্ষা কত বা হতাশা, দম্ভ, রক্তপাত।

আর ফিরে আসবারও কতদিন পর শ্রদ্ধাপূর্ণ এক চিঠিব সঙ্গে এল রসিদ। যে মানুষটি চলে গেছেন এক কাপড়ে, তাঁর নিত্য ব্যবহারের সমস্ত জিনিস, আসবাব, পোশাক, কাগজপত্র বড় বড় কালো সেই মিলিটাবি ট্রাঙ্কে ভরে রেলওয়ে বুকিং-এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর কাছে।

আর এসেছিল চাকরির প্রস্তাব। ফোর্ট উইলিয়াম স্কুলে, সমস্ত সুযোগ নিয়ে শিক্ষিকার কাজ নিতে পারেন তিনি। ছত্রিশ বছর বয়সী কনকলতা ঠিক করেছিলেন ছেলেমেয়েকে নিয়ে আর ওই আবহাওয়ায়,ওই জীবনযাত্রার কাছাকাছি নিয়ে যাবেন না।

রয়ে গেলেন বাংলাদেশের প্রান্তবর্তী এই শহরেই। ধুলোটে রুক্ষ এই শহর কিন্তু তাঁকে, তাঁর ছেলেমেয়েকে ভালবাসা দিয়েছে অনেক। সহমর্মিতা দিয়েছে, ভরসা দিয়েছে। খুব

কঠিন দিনেও একা ছাড়েনি। সেই তাঁর চাকরি-জীবনের শুরু। খোকা এগারো, বুলবুলি আট। তখন ছিলেন শহরেরই স্কুলে।

ছাদে ক্যাম্পখাটে শুয়ে থাকতে থাকতে কখন যে চোখ লেগে গিয়েছিল জানতেই পারেননি কনকলতা। খোকার ডাকে খানিকটা চমকে জেগে ওঠেন, তখনই বুঝতে পারেন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি। খোকা একটু উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে। ছেলের হাতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ান।

— কখন এসেছিস?

— এই একটু আগে। রঞ্জা বলল তুমি ছাদে শুয়ে আছ। অসময়ে শুয়ে আছ কেন? শরীর ঠিক আছে?

— হ্যাঁরে, এমনি শুয়েছিলাম।

নীচে এসে বসামাত্র বুবুন উঠে এসেছে পড়া ছেড়ে— বাবা, আম্মাও আজ অ্যাতো মোটা বই এনেছে স্কুল থেকে। আম্মাকেও রোজ পড়া করতে হবে কিন্তু।

— হ্যাঁ দাদা, হবেই তো। তুমি রোজ স্কুলের পড়া শেষ করে আমাকে পড়াবে— পড়াবে তো?

বুবুন একটু গম্ভীর হয়ে চিন্তা করে। একে একে বাবা মা আম্মা সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চায় কথাটা সত্যি না ঠাট্টা।

রঞ্জা বুবুনের কাছে বসে কিছু সেলাই করছিল। কনকলতা বারান্দায় রাখা নিজের চেয়ারটাতে এসে বসলেন। এই এক নেশা, একটি ছোট কৌটো ভরা তামাকপোড়া ছাই, তাই দিয়ে বারে বারে দাঁত মাজা। আগে কেবল রাত্রে একবার মাজতেন, সেইটে বেড়ে বেড়ে এখন দিনে অনেকবার হয়ে যায়। মনে কোনও ভার পড়লেই একবার একটু মাজতে ইচ্ছে করে। নিজেই কত সময় মনে মনে হাসেন, দ্যাখো কান্ড, পাছে অভ্যেস হয়ে যায় ভয়ে একটা অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট দুদিনের ওপর তিনদিন খাইনি আর কোত্থেকে কিনা—

খুব দাঁতের যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছিলেন একসময়, তখনই স্কুলের কে যে ধরিয়েছিল অভ্যাসটা! এটা নাকি দাঁত ব্যথার অব্যর্থ ওষুধ। দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঘরে রেখে দাঁত তোলাবার সাহস হত না। মনে হত যদি খুব রক্ত পড়ে কোনও ইনফেকশন হয়ে মরেই যান যদি, ওদের দুজনের কী হবে? কে দেখবে ওদের? সেই ছত্রিশ বছর বয়স থেকে নিজের আর সমস্ত পরিচয় ভুলে কেবল মা হয়েছিলেন কনক। আর কে থাকবে— তাঁকেই মা বাবা শিক্ষক সব হতে হত। সন্ধ্যাবেলা ওদের কাছে বসে ওদের পড়াবেন বলে সারাদিন কোনও পরিশ্রমকে পরিশ্রম বলে জ্ঞান করতেন না। স্কুল থেকে ফিরে এসে পা পেতে দাঁড়াতেন না কোথাও। সন্ধ্যার আগে রাত্রের খাওয়ার ব্যবস্থা সেরে রাখতেন। নিজেদের পড়া ওরা নিজেরাই করত, কখনও হয়ত একটা কিছু প্রশ্ন নিয়ে আসত। কিন্তু সমস্ত সময়টা কনক শান্তভাবে হয় একটা বই না হলে সেলাই বা বোনা কিছু একটা হাতে করে ওদের কাছে বসে থাকতেন। তাঁর একটু চাপা স্বভাবের জন্য ছেলেমেয়েকে কাছে টেনে জড়িয়ে ধরে কখনও আদর করতে পারেননি, কিন্তু মনে হত এই কাছে বসে থাকাটুকু যেন তাঁর আদর হয়ে ওদের স্পর্শ করে। মনে হত, যখন ওরা বড় হবে যখন নিজেদের সংসার করবে তখন এই সব সন্ধ্যার শান্ত স্মৃতি ওদের মনে থাকবে। কী জানি, এতদূর কি ভাবতে পারতেন তখন? তখন তো প্রতিটি দিন একা একা এক লড়াই। কতজন পরামর্শ দিয়েছিল, মাথার ওপর বাবা নেই, হোস্টেলে

দিয়ে দাও ছেলেমেয়েকে। তিনি ভেবেও দেখেননি প্রস্তাবটা। বাবা নেই বলেই তো আরও বেশি করে নিজের কাছে রাখতে হবে ওদের। ডাক্তার ভাসুরও খোকাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন নিজের কাছে বম্বেতে। সুগত ঘরে কনকলতার বিছানা করছিল। শেষ করে কাছে এসে বসল। মাথাটা তাঁর চেয়ারের হাতলে রাখার ছল করে গায়ে গুঁজে দিয়ে। ফর্সা ঘাড় পিঠ বাহু হাতের নীচে দিকটা রোদে পোড়া তামাটে। বড় রোগা ছেলেটা। গেঞ্জির ভেতর থেকে শিরদাঁড়াটা ভেসে উঠেছে। কব্জিগুলো দেখলে মাঝে মাঝে চিন্তা হয়। বাবার রঙ পেয়েছে, গড়ন-গঠনও বাবার মতো, কিন্তু স্বাস্থ্যটা পাযনি। কোথা থেকে থাকবেই বা ওর স্বাস্থ্য? খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন দুজনেই। তারপর সুগত জিজ্ঞাসা করে, স্কুলে কী হল আজ সেই কথা। তোমাকে তো একেবারে রীতিমতন আচার্য সংবর্ধনা দিয়েছে দেখি। ছাতা-চাদর—

— দ্যাখ না, হৃষিকেশ আর প্রদীপ তো কেঁদেই ফেলল! হরেনবাবুও এমন চোখ ছলছল!

— আর পড়ুয়ারা?

— পড়ুয়াদের থেকে বেশি তো তাদের মা-বাপেরা। বড় ভাল রে মানুষগুলো। বাসরাস্তা পর্যন্ত সব চলে এসেছে বাচ্চাকাচ্চা কোলে নিয়ে— শেষে বাসে তো আসতেই দেবে না, বিষ্ণু রিক্সা করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল।

— আর তুমি! তুমি কাঁদছিলে তো? আবহাওয়াটা ভারী হয়ে যাচ্ছে দেখে মাকে খ্যাপাবার মতো করে বলে সুগত।

— এ হে হে— বুড়ি মেয়ে কাঁদছিল— এ এ—

এমন গোলমাল জুড়ে দেয় লজ্জায় পড়ে যান, কনকলতা,যাঃ আমি কাঁদিনি।

ততক্ষণে হাসি-হাসি মুখে রঞ্জা এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে, কেন মাকে বিরক্ত করছ!

ঠাকুরকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেন কনক। তারপর শুতে যান। চশমাটা চোখে দিয়ে বালিশের পাশে রাখা বইটি হাতে নেন। দেখে নেন খাবার জল, মশারির গায়ে বেডসুইচ, বালিশের নীচে টর্চ সব ঠিকঠাক আছে কিনা। জানেন থাকবে, তবু ওই দেখে নেওয়াটুকু অভ্যেস। হাতের বইটি চোখের সামনে খুলে ধরেন। সুলেখা স্যানালের 'নবাঙ্কুর'। আগে কোনওদিন নাম শোনেননি এই লেখিকার, কিন্তু ভারী ভাল লাগছে। একটি গ্রামের মেয়ের ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠার গল্প। গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ করে পিসির সঙ্গে চলে যাচ্ছে মাকে ছেড়ে, শহরের স্কুলে ভর্তি হবার জন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা বই। কিন্তু এখনও কি খুব একটা পাল্টেছে ছবিটা? মনে পড়ে এই শহরের যে স্কুলে প্রথম চাকরিতে ঢুকেছিল, ক্লাস এইট পর্যন্ত ছিল সেই স্কুল। অবাঙালি মেয়েদের স্কুল। তিনি পড়াতেন জিওগ্রাফি আর ইংরিজি। দুটোই ভয়ের সাবজেক্ট। কিন্তু কেমন করে যেন ধীরে ধীরে সেই ছোট ছোট ফুটফুটে মেয়েগুলি তাঁর পরম ভক্ত হয়ে পড়ল। এমনকি তাদের বাবারা। বাবারাই কেবল— কেননা গার্জেন হিসেবে কারও মাকে আসতে দেখেননি কোনওদিন, আলাদাভাবে সমীহ করতেন কনকলতাকে। অন্য লেডি টিচাররা ওদেরই সম্প্রদায়ের এবং প্রায়ই পারিবারিক ভাবে পরিচিত। কনকলতা বাইরের, কনকলতার মধ্যে এক রকম শান্ত দূরত্ব ছিল, হয়তো সে জন্যই সেই বিশেষ মর্যাদা। কারণ যাই হোক, ওটুকু তিনি বোধ করতেন। আর তাই বোধহয় সম্ভব হয়েছিল সেই আপাত অসম্ভব ঘটনা। বেশ মনে আছে আজও,

ছটি মেয়ে ক্লাস এইটের ইয়ার্লি পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করল। পরদিন স্কুলে দেখেন তারা ক্লাস টুর সিঁড়িতে সারি দিয়ে বসে আছে চোখ-ভর্তি জল নিয়ে। কী ব্যাপার! হেডমিস্ট্রেস মিসেস শ্রীবাস্তব পর্যন্ত অবাক। তাদের আকুল প্রার্থনা— বহিনজি, হম লোক তো পাশ হুয়ে হ্যায়, তো হম লোগোঁকো অওর পড়নে দিজিয়ে... তাঁদের সকলেরই কষ্ট হয়েছিল মনে। বিশেষত ওদের নিজেদের সম্প্রদায়ের শিক্ষিকাদের ভয় বা অস্বস্তি বোঝা যাচ্ছিল, একজনের সকরুণ প্রশ্রয়ও প্রচ্ছন্ন ছিল না।

সত্যিই, এই যে বাড়িতে ঢুকে যাবে মেয়েগুলা, বিশ্বের প্রত্যেকটি দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে ওদের মুখের উপর। অথচ এরা মনোযোগী, ভাল ছাত্রী। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর সেদিনকার মতো মেয়েদের বুঝিয়েসুঝিয়ে বাড়ি পাঠানো হয়। তারা গেল, কিন্তু বলে গেল কাল আবার আসবে। মেয়েরা যেতে সেক্রেটারি এলেন, প্রেসিডেন্ট এলেন। তাঁদের কাছে আর্জি রাখা হল। প্রথমে তো তাঁদের এককথা— ক্যা হোগা পাস করকে। ঘর মে রহেগি, নৌকরি তো নহি করনা হ্যায়—

অবশ্য মিসেস শ্রীবাস্তব নিজে চুপ করে থাকলেও সুষমা দেবী মিসেস সিংয়ের মতো সিনিয়র টিচাররাও বলেছিলেন মেয়েদের পক্ষ নিয়ে। কনকলতা চুপ করেই ছিলেন। বৃদ্ধা প্রেসিডেন্ট বললেন, আপ কুছ কহনা নহি চাহতি? মেয়েরা তো আপনার কথা খুব শোনে।

কনকলতা বলেছিলেন, দেখুন লেখাপড়া শিখতে থাকলে একটা নিয়মে পাস করবে। কিন্তু পাস করাটা তো দোষের নয়। আমার মত যদি জানতেচান, পাস করাটাই পড়াশুনোর সব নয়। এতবড় পৃথিবীতে মানুষ এসেছে, কত সুন্দর তাব জীবন, কেবল লেখাপড়া শিখলেই সে এসব কথা বুঝতে পারে। বোঝে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ। নিজে নিজে চিন্তা করতে পারা তো সব মানুষেরই দরকার—

শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিল স্কুল কমিটি। মেয়েরা ক্লাস করতে থাকুক, তাঁরা চেষ্টা করবেন পরীক্ষা দেবার পারমিশান পাবার। তবে একটা কথা খুব পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন, নতুন কোনও টিচার কিন্তু তাঁরা নেবেন না এই নতুন ক্লাসের।

নীলম, সরস্বতী, বিনীতা, রেখা আরও কী যেন দুটোর নাম— সেই ছটা কৃতজ্ঞ ঝলমলে মুখ, একজন টিচার আর কী আশা করতে পারেন এর চেয়ে বেশি? দুজনই টেস্টে অ্যালাউ হয়ে পরীক্ষা দিয়েছিল। বিনীতাটা বোধহয় পাশ করেনি, নীলম আর রেখা হাই সেকেণ্ড ডিভিশন পেয়েছিল। তার চেয়েও বড় মুক্তি তো ওরা পেয়েছিল! ছাত্রী থাকবার, পড়বার অধিকারের মুক্তি।

সকালে— খুব সকালে ওঠেন কনকলতা। এ তাঁর চিরকালের অভ্যাস। খুব ছোটবেলায় সেই যে মা উঠতেন অন্ধকার থাকতে, তখন একটি পাখিও ডাকত না, তারপর কখন উঠে পড়তেন বাবা, বাবার গানের আওয়াজ কানে যেতেই ঘুম ভেঙে যেত। কত ভোর থাকত তখন! তাও উঠে দেখতেন মায়ের স্নান সারা। নিজেও এতদিন স্নান করেছেন ভোরবেলা। ইদানীং একটু ভয় হয়। বয়স হচ্ছে শরীরের। অনেক ঝড়ঝাপটা সহ্য করেছে এ। এখনও তেমন রোগ বলতে কিছু নেই তাঁর— প্রেসার না, ব্লাডসুগার না। এই ক'বছর ধরে কেবল হার্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে কিছুটা। মোটামুটি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন কনকলতা। অসুখ করে পড়ে থাকাকে বড় ভয় তাঁর। তাঁর ভোর তাঁর মায়ের শান্ত ভোর তো ছিল না! যখন ছেলেমেয়ে ছোট ছিল— রান্না, ওদের স্কুলের টিফিন, নিজের টিফিন শেষ করে সংসারের উনকোটি হাজারটা কাজ সেরে খোকা-বুলবুলিকে খাইয়ে নিজে খেয়ে দশটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হত বাড়ি থেকে। তারপর কতদিন গেল, খোকা ছিল না তাঁর সংসারে—

এখন রাত থাকতে ওঠেন না। আলো ফুটে যায়। ডাকেন না ওদের। থাক, ঘুমোক একটু। উঠোনে শিউলি গাছের গা বেয়ে যুঁইয়ের একটি লতা। এক ফালি মাটিতে কটা দোপাটি গত বছরের বীজ থেকে উঠেছে। এখানেই শীতে গাঁদা ফুটবে। রঞ্জা করে এসব। ওর বাগানের শখ। ছোট ছোট কয়েকটা টবে নানারকম ক্যাকটাস। ভোরে ফুলের গন্ধ পেলে আজও প্রায় প্রতিদিন নিয়ম করে বুলবুলির কথা মনে পড়ে। কিছুতেই ভোরে উঠতে চাইত না, ভারী ঘুমকাতুরে ছিল। কিন্তু তিনি স্নান সেরে এসে উঠোনের দিকে বারান্দায় সিঁড়িতে বসে গান গাইতেন যখন, ঠিক উঠে চলে আসত। ঘুমঘুম চোখ, গায়ে বিছানার গরম। এসে গা ঘেঁষে বসত। স্কুলে পড়ত তখনও। সেটা এ বাড়ি নয়। এর চেয়ে অনেক বড় ছড়ানো জায়গা ছিল সে বাড়িতে। ভাড়াবাড়ি ছিল। শশিশেখর যাবার পর তাঁর প্রাপ্য যেসব টাকাপয়সা এসেছিল, তা দিয়ে এই বাড়ি কিনে কিছুটা রি-মডেলিং করে নেওয়া হয়। ভাসুর নিজে দেখে সমস্ত কিছু করিয়েছিলেন।

এখনও সকালবেলা জামাকাপড় পাল্টে, ঠাকুরপ্রণাম করে একটি সুগন্ধি ধরিয়ে দিয়ে সকালের শান্ত আকাশের নীচে বারান্দায় কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগে কনকলতার। বাতাসে একটু ঠাণ্ডা আভাস। বেশ বৃষ্টি হয়েছে কদিন ধরে।

রঞ্জা উঠে পড়েছে, ওদের বাথরুমের জলের শব্দ পাচ্ছেন। এবার রান্নাঘরে গিয়ে প্রথমেই চা করবে। এই একটি জায়গাতেই এখন ওদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন কনক। গ্যাস ধরাতে পারেন না। চেষ্টা করলে কি আর পারতেন না? ভেতর থেকে চেষ্টা করার ইচ্ছেটাই যেন কমে আসছে। মনে হচ্ছে থাক, অনেকদিন তো তুমি শিখেছ, করেছ, চালিয়ে নিয়েছ— এবার থাক। একেই কি ক্লান্তি বলে? তিনি কি বুড়ো হয়ে গেছেন? কী জানি, সে কথা খেয়াল করবার সময় পেলেন কখন? কেবল যেন দেরি না হয়ে যায়— এই উর্ধ্বশ্বাস তাড়াহুড়ো করতে করতেই তো সব সময় চলে গেল। চা নিয়ে এল রঞ্জা। চেয়ারের পাশে ছোট টুলের ওপর রাখল। প্রতিদিনের মতো একই কথা জিজ্ঞেস করল, সকালের জলখাবার কী হবে মা?

— কী করবে দ্যাখো। রুটি তো করতেই হবে, কিছু ভাজা বা তরকারি করে দাও। চলো আমি কেটে দিচ্ছি।

এখন না। এখন বোসো। ভাত ডাল রুটি হয়ে গেলে আমি বলব, আজ তো তাড়া নেই—

সকালের দিকে খুব তাড়া থাকে। সুগত বেরোবে সাড়ে আটটায়, ভাত খেয়ে লাঞ্চ প্যাকে টিফিন নিয়ে। বুবুনের স্কুলের রিকশাও আসবে ওরকম সময়েই। সে এখন রুটি খেয়ে যায়। দুটোয় ছুটি হয়, তারপর ফিরে ভাত খায়। নটা থেকে দুটো— কীরকম অদ্ভুত স্কুল আওয়ার্স এইটুকু বাচ্চাদের, ভেবে পান না। আড়াইটেয় বাড়ি ফিরে শান্ত হয়ে ভাত খেতে খেতে তিনটে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে ক্লান্তিতে। সামনের বছর থ্রি হবে, এগারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত স্কুল হবে। সে একরকম ভাল।

তাঁর কোঁয়ারডি গ্রামের সরকারি প্রাইমারি স্কুলে প্রথম যখন গেলেন, এক-একদিন বাড়ি ফিরে খাবারের থালার সামনে বসতে পারতেন না। সারি সারি ভাত না খাওয়া কচি মুখ ভেসে উঠত চোখের সামনে। চিরকাল টিফিনে খান-দুই আটার রুটি, একটু তরকারি, একটা কলা বা লেবু নিয়ে যাওয়া তাঁর অভ্যাস। সকালে নাকেমুখে গুঁজে খেয়ে বাস ধরতে বেরোনো আর তিনটেয় স্কুল ছুটি হলে সোয়া চারটেয় বাড়ি— মাঝখানের এই এতখানি সময় না খেয়ে থাকলে শরীর অস্থির করত। কিন্তু আপনিই বন্ধ হয়ে গেল টিফিন নিয়ে যাওয়া। দিনে তিন বার খাওয়া, ছেলেমেয়ের সামনে যত্ন করে খাবার

থালা ধরে দেওয়া— যেন কী রকম অপরাধী মনে হত নিজেকে। প্রথম প্রথম দেখেছেন বাচ্চারা আসে না স্কুলে। দুজন মাস্টারমশাইও এগোরাটা নাগাদ একবার আসেন, একটু ঘোরাফেরা করে সামনে পড়া দুচারজনকে— কী রে, ছেলাগুলাকে ইস্কুলে পাঠাস নাই কেন? বলে চলে যেতেন। বসার জায়গাও ছিল না। কয়েকটা খুঁটি পুঁতে ওপরে একটা টিনের চৌচাল, একটা যেমন-তেমন টেবিল, আর হাতলঅলা কাঠের চেয়ার একটি।

কোঁয়ারাডির মোড়ে বাস দাঁড়ায় না। বাঁকুড়াগামী এক্সপ্রেস বাস তাঁকে যেখানে নামিয়ে দিয়ে যেত, সেখান থেকে টানা রাস্তা ধরে প্রায় কুড়ি মিনিট হেঁটে কোঁয়ারডি পৌঁছতেন। সাড়ে দশটায় পৌঁছে প্রথম দুদিন তিনি প্রায় একাই বসে ছিলেন সেই চৌচালার চেয়ারে, হাতে একটা বোনা নিয়ে। দ্বিতীয়দিনে আলাপ হল হেডমাস্টার হরেনবাবুর সঙ্গে। মধ্যবয়সী পাকানো চেহারার ছোটখাটো মানুষ। এ অঞ্চলের তুলনায় বেশ ফর্সা রঙ, যদিও রোদে পোড়া তামাটে। তিনি যে কনকলতার আসার খবর পেয়েই এসেছেন সে কথা বলে বোঝা গেল। সম্ভবত খবর দিয়েও এসেছেন, খানিকক্ষণের মধ্যেই অন্য শিক্ষক হৃষিকেশও হাজির। এই তিনজনেই ছিলেন তখন তাঁরা। রেজিস্ট্রার খাতা হরেনবাবু সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে যান, যেদিন আসেন, সঙ্গে নিয়ে আসেন। স্কুলে যে খাতা রাখার কোনও জায়গাই নেই।

দ্বিতীয়দিন এসে দু-এক কথার পর কনকলতাকেও বুঝিয়েছিলেন হরেনবাবু, দেখুন দিদিমণি, সরকারের যা নীতি সে তো মানতেই হবে। খাতায় একশো ছয়ের মতো ছেলেময়ে আছে। এরা ইস্কুলে আসবে না, পড়বেও না। এদের চোদ্দপুরুষে কেউ কখনও 'ক' পড়েনি। আপনি ঘরসংসার ফেলে শহর থেকে এখানে এসে একা একা বসে রইবেন তার কিছু দরকার নাই। হপ্তায় একদিন এলেই চলবে।

একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন কনকলতা। তারপর খুব স্থিরভাবে বলেছিলেন, এটা আমি মানব না মাস্টারমশাই। এই গ্রামের বাচ্চাদের পড়ানোর জন্য আমি মাইনে নেব অথচ স্কুলে আসব না— পড়াব না তা কী করে হবে?

হরেনবাবু তাঁর কথাটা তখনও ধরতে পারেননি। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, কোনও অসুবিধা নাই, এরা কমপ্লেন-টমপ্লেন করে না। নিজেরাই ছেলে পাঠায় না। ওদের ছেলেরা পড়া করলে গরু বাগালি করবে কে?

— মাস্টারমশাই, যাতে ওরা স্কুলে আসে, পড়াশুনো শেখে সেজন্যই তো গ্রামে স্কুল হয়েছে। আমার ছেলেমেয়ে জানবে যে তাদের মা স্কুলের টিচার অথচ স্কুলে যায় না— তারপর তারা নিজেরা কী শিখবে? আমি তাদের কী শেখাব বলুন?

এই সময়টা আর বসবার সময় নয়। খোকা এই যে বেরোয়, তার ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে। ওদের খাবারটা তিনি বেড়ে দেন। খেতে খেতে হঠাৎ মুখ তুলে সুগত জিজ্ঞাসা করে, মা, বুলবুলি চিঠিপত্র দিচ্ছে না?

— না, বেশ কিছুদিন হল খবর দেয়নি। অবশ্য লিখেছিল টিমের সঙ্গে উড়িষ্যা অন্ধ্রপ্রদেশ যাবে। এই আজকালের মধ্যে কলকাতায় ফিরবার কথা।

— বাবলি?

— বাবলি আছে অঞ্জনের কাছেই। সে তো সকালেই অফিসে বেরোয়, ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে। কী যে করে অতটুকু মেয়েটা।

সুগত আর কথা বলে না। তাড়াহুড়ো করে খাওয়া শেষ করে। রঞ্জা দুজনের টিফিনবক্স টেবিলে নামিয়ে দিয়ে বুবুনের জুতো-মোজা গোছাচ্ছিল।

এরা বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বাড়িতে একেবারে ঝড় বইতে থাকে। অবশ্য সুগত নিজের জিনিসপত্র পরিপাটি করে নিজেই গুছিয়ে রাখে, কিন্তু বুবুন একাই একশো। ঠিক এই সময় ওর মুহূর্তে মুহূর্তে খেলা আসে— মুখে জল নিয়ে কুলকুচো করে কতদূর থেকে বেসিনে ফেলা যায়, এক পায়ে মোজা পরে ছুটে চলে যাবে পোকা দেখতে— কোনওমতে ওকে তৈরি করে ঠেলে স্কুলের রিকশায় তুলে দেওয়া পর্যন্ত। একবার রিকশায় উঠে বসলেই যেমন শান্ত তেমনই লক্ষ্মী ছেলে। স্কুলে খুব সুনাম ভাল ছেলে বলে।

এতদিন এরপরে তাঁর নিজের তৈরি হবার কথা। রঞ্জাকে জলখাবার গুছিয়ে দিয়ে রান্নাঘরের কিছু আরও টুকিটাকি শেষ করে সাড়ে নটার মধ্যে খাওয়া। তিনি তাড়াহুড়ো করতে পারেন না এখন আর। দশটায় বেরিয়ে বাস ধরে স্কুল।

আজ কী রকম অদ্ভুত লাগছে। আর স্কুল যেতে হবে না তাঁর। বাসে সেই সব পরিচিত মুখ, গ্রাম, ছাত্রছাত্রীরা। আজও স্কুল বসবে। তাঁর নিজের ক্লাসের ছেলেমেয়েগুলো ফাঁকা বসে থাকবে। বসে তো থাকবে না, গোলমাল লাফালাফি করতে থাকবে। এ বছর ওঁর ক্লাসে— ক্লাস ওয়ান আর টুতে ভর্তি হয়েছিল চুরাশিটা বাচ্চা। যেটা স্পষ্ট কথা বলতেও শেখেনি সেটাকেও এনে তার মা কিংবা বাপ বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে, 'একটুকু শিখে নিক দিদিমণি, তুমি চলে গেলে কে আর আমাদের ছেলেকে যতন করে শিখাবেন!'

যত তিনি বলেছেন— তোমাদের স্কুল, তোমাদের সুবিধা-অসুবিধা মাস্টারমশাইদের কাছে বলবে এসে— কেউ কিছু বলে না সত্যিই, কিন্তু তিনি জানেন, এরা বেশির ভাগই হরেনবাবুর খাতক। দিন অনেক পাল্টেছে এই পনেরো-ষোলো বছরে, হরেনবাবুরও সত্যিই অনেক বদল হয়েছে, তবু এরা ভয় পায়। একে মহাজন তায় ব্রাহ্মণ— এই সব ভয় যে অনেক অনেক পুরনো। ষোলো বছরে কি তার শিকড়সুদ্ধ ছেঁড়া যায়?

খোকার জামাগুলো ধুতে দেওয়ার জন্য বার করে রেখেছে রঞ্জা। পকেটগুলো দেখে নেন একবার। জামাগুলোয় খোকার গায়ের গন্ধ। এখনও যখন এঘর ওঘর করে, কথা বলে মাঝে মাঝে— স্বপ্নের মতো লাগে তাঁর। ভাবতে পারেননি আর ও ফিরে আসবে এই ঘরে, 'মা' বলে ডাকবে আবার, আবার ওর মুখে খাবার ধরে দিতে পারবেন।

সবে হায়ার সেকেণ্ডারি দিয়েছে ছেলে, সতেরো পুরো হয়নি তখনও— হঠাৎ রাত্রিবেলা পুলিশ এল বাড়িতে। ভয়ের চেয়েও বেশি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। হঠাৎ ঘুম ভাঙা বুলবুলি সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর পেছনে। পরে যেসব ঘটনা শুনেছেন, তার তুলনায় ভদ্র ব্যবহার করেছিলেন সেদিনের অফিসারটি। বলেছিলেন— আপনাকে আমরা চিনি। কিন্তু আপনি জানেন না কী দিনকাল পড়েছে, কী অবস্থা চলছে চারপাশে। কমবয়সী বুদ্ধিমান ছেলেদের ভুল রাস্তায় পাঠিয়ে দিচ্ছে কিছু নেতা। আপনার ছেলে কোথায় যাচ্ছে, কাদের সঙ্গে মিশছে আপনি জানেন না— আমরা জানি। ছেলেকে এসব সঙ্গ ছাড়িয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিন এখান থেকে। নাহলে এরপর অবস্থা খারাপ হয়ে দাঁড়াবে।

তবু কনকলতা দৃঢ় ভাবে ভাবছিলেন, কোথাও কিছু একটা ভুল হয়েছে পুলিশের। কিন্তু খাটের ওপর থেকে খোকার বিছানা তুলে ফেলল ওরা। তাক ও পড়ার টেবিল ঘেঁটে তুলে নীচে ফেলল। কনকলতা দেখলেন— বই, অজস্র চটি-চটি বই, কার্বন পেপার, চিনের নেতা মাও সে তুং-এর একটা ছবি। খোকা বাড়িতে ছিল না। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, দিনতিনেকের জন্য সে গিয়েছিল রাঁচিতে বন্ধুর বাড়ি— তাঁকে বলেই গিয়েছিল।

কিন্তু বাড়িতে তাঁর গায়ের কাছাকাছি থেকেও না বলে এত দূর চলে গেছিল খোকা, এই বোধই তাঁকে স্তম্ভিত করে রেখেছিল, সব কিছু গুটিয়ে নিয়ে আবার কিছু সদুপদেশ দিয়ে পুলিশ চলে যাওয়া পর্যন্ত। তারপর ধীরে ধীরে যেন বিপদটা দেখতে পেয়েছিলেন। মনে হয়েছিল, কাপড়ে আগুন ধরে গেছে আর সেই আগুন নিয়েই তিনি ছুটছেন কোনও নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। কিসের মধ্যে গিয়ে পড়েছে তাঁর শান্ত ছেলেটা যে, প্রকারান্তরে এ রকম করে ভয় দেখিয়ে গেল পুলিশ? এই মাঝরাত্রে তাঁর ঘর সার্চ করে বইপত্র তুলে নিয়ে গেল? এসব কীসের বই? তিনি এত নিশ্চিন্তে ছিলেন যে একবারের জন্যও মনে আসেনি, খোকা এমন কিছু করছে যা তিনি জানেন না? বুলবুলি কাঁদছিল আর তাঁর পিঠে হাত বোলাচ্ছিলেন।

— ও মা, দাদা কোনও খারাপ কাজ করেনি মা! দাদারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ভালর জন্য যুদ্ধ করতে চায়।

— তুই জানতিস! তোকে দাদা বলেছিল?

কাঁদতে কাঁদতে মাথা নেড়েছিল সে।

— কোথায় যায় দাদা? কাদের সঙ্গে মেশে?

— তা আমি জানি না। কিন্তু দাদা অনেক বই পড়ে। তুমি যখন থাকো না তখন এক-একদিন দাদার বন্ধুরা আসে, সবাই কথা বলে, আলোচনা করে। দাদা বিকেলে গরিব লোকেদের বস্তিতে গিয়ে এই সব শেখায়।

— তুই আমাকে আগে বলিসনি কেন?

— দাদা বারণ করেছিল। বলেছিল সময়মতো আমি নিজেই মাকে বলব। মা রাগ করবে না।

সকাল হয়েছিল। কী ভারী সকাল! আশপাশের বাড়ি থেকে লোকজন এসেছিল খবর নিতে। শহরের এক প্রান্তে কনকলতার বাড়ি। পাড়ায় দু-চারটে পাকাবাড়ি থাকলেও সাধারণ কিছুটা গ্রামীণ লোকজন, গ্রাম ধরনের মাটির বাড়িই বেশি। তাদের সেই খবর নিতে আসার মধ্যে কৌতূহলের চেয়ে বেশি ছিল উৎকণ্ঠা। ভেতরে যাই হোক, নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন কনক।

আবেগকে বাইরে প্রকাশ করায় তাঁর চিরকালই এক ধরনের অক্ষমতা। যতখানি পারেন, সবার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। সেদিনও স্কুলে গিয়েছিলেন তিনি। কাজের বউটি এসেছিল। বাইরে থেকেই হয়তো শুনে এসেছিল সে। সুগতর ঘরের ছড়ানো জিনিসপত্র সযত্নে তুলে গুছিয়ে রাখল।

স্কুল থেকে ফিরতে বুলবুলি বলেছিল, মা সরমাদি আজ সারাদিন আমার কাছে ছিল। অন্য বাড়ির কাজ শেষ করে এসে এখানেই বসে ছিল। বুলবুলির কীসেব একটা ছুটি চলছিল সে সময় কয়েকদিন।

— সরমা খেয়েছে দুপুরে?

— বলল খেয়ে এসেছে। আমি কত বললাম আমার সঙ্গে খেতে, খেল না।

সরমা বলল, আমি ওই দু'তলা ঘরে দুপুরে ভাত খাই, উয়াদের গোহালের কাজ করি। সন্ধ্যাবেলার মুখে আঁধারে এসেছিল বাড়ির ঠিক পেছনে যারা থাকে, সেই চাষী বউ। ওরা দরকার-অদরকারে অসে। ঘুঁটে বিক্রি করতে, ছাদে নিজেদের ধান শুকোতে দিতে, বাচ্চাদের অসুখ-বিসুখে। সেদিন এসে হাতের ঝুড়ি নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে বলে গিয়েছিল, অ মা, যদি কোনও দিন খোকা ঘরে রইতে পুলিশ আসে, তুমি দরোজা

খুইলবার আগে পাঁচিল পার কইরে আমাদের ঘরে পাঠায়ে দিও, আমরা রাখে লিব, তুমার ছেলে বইলে পাঠায়েছে। আমরা হইতে তুমার কুনও ডর নাই মা।

পরদিন সুগতর ফেরার কথা ছিল। ছুটি নিয়ে এসেছিলেন স্কুলে। ভেতরে ভেতরে খুব অস্থির মন। অন্যদিনের মতোই কাজকর্ম করেছেন কিন্তু থর্‌থর্‌ করে কাঁপছিল ভেতরটা। এতটুকু শব্দে চমকে উঠেছিলেন। কী হতে যাচ্ছে তাঁর সংসারে? কী হবে? যে খোকা-বুলবুলি ছাড়া তিনি নিঃশ্বাস নেননি কোনওদিন, সেই খোকা কি দূরে চলে যাবে? তাকে পাঠিয়ে দিতে হবে কোথাও?

সুগত ঘরে ঢুকেই অস্বাভাবিকতা বুঝতে পেরেছিল। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই কাঁদতে শুরু করেছিল বুলবুলি। সুগত দুহাতে জড়িয়ে ধরেছিল মাকে। কখন এত লম্বা হয়ে গেল!

— মা, তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ?

না, রাগ করবার কথা তো একবারও মনে পড়েনি তাঁর। শুধু ভয় হয়েছিল, উৎকণ্ঠা হয়েছিল।

খেয়ে উঠে সারাটা দুপুর ধরে মায়ের পাশে শুয়ে সুগত মাকে বুঝিয়েছিল তাদের— তার আদর্শের কথা।

— কিন্তু, তোরা যা চাইছিস সে তো ভাল জিনিস,তার জন্য পুলিশ ধরবে কেন?

— মা, তুমি তো নিজেই দেখেছ, যাদের হাতে ক্ষমতা আছে তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলে চিরকাল পুলিস ধরে। জেলে দেয়। ব্রিটিশ আমলেও দিত, এখনও দেয়।

দেখেছেন তো কনকলতা অনেক কিছুই, কিন্তু সেই সব কিছু যে তাঁর নিজের ঘরে, নিজের রক্তের মধ্যে নিয়ে বুঝতে হবে তা যে কোনওদিন ভাবেননি! ব্রিটিশ আমলের হামলা, পুলিসি অত্যাচার দেখেছেন নিজের বউদির বাপের বাড়িতে। স্বাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষক আন্দোলন, ট্রামভাড়া বাড়ানোর বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা শুনেছেন। চোখে দেখেছেন এই সেদিনের খাদ্য আন্দোলন। কিন্তু সবদিক থেকে আড়াল করে রাখা তাঁর শান্ত সংসারে যে এসে লাগবে সেরকম কোনও আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ধাক্কা, সে সম্ভাবনা তাঁর মনে এক মুহূর্তের জন্য আসেনি। সেরকম কোনও আন্দোলনই ভেবেছিলেন তিনি, তখনও কল্পনা করতে পারেননি কী বিশাল উতালপাথাল হবে দেশজুড়ে আর কী বর্বর হিংস্রতায় কম বয়সী ছেলেমেয়েদের মুখোমুখি দাঁড়াবে দেশের মালিকরা, তাদের পাহারাদারেরা। সেদিন তখনও তিনি এসব কিছুই ভাবতে পারেননি। ভাগ্যিস পারেন নি।

সুগত বুঝিয়েছিল, মা, বাড়িতে থাকলে পুলিস আবার আসবে, ধরে নিয়ে আটকে রাখবে। তাতে তো কোনও লাভ নেই! আমি অন্য জায়গায় থাকব।

— কোথায় থাকবি তুই?

— কত জায়গা মা, এই সারাদেশই আমাদের জায়গা। আমার জন্য চিন্তা কোরো না, আমি ঠিক খবর দেব।

আজ মনে করতে পারে না কেমন করে কেটেছিল তার পরের দিনগুলো। কদিনের মধ্যেই বাড়ি ছাড়ল খোকা। কিচ্ছু নিয়ে গেল না সে। তারপর থেকে শুরু হল পুলিস আসা। কতবার যে মধ্যরাতে বিপুল, রূঢ় ধাক্কা পড়েছে দরজায় তার গোনাগুনতি ছিল না। তখন আর কোনও ভদ্রতা ছিল না। সার্চ করার নামে রান্নাঘরের জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলেছে উঠোনে, বাগানের ফুলগাছ উপড়ে দিয়েছে, ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে শেলফের বই. এত বই কীসের বাড়িভর্তি? এই মন্তব্য একাধিকবার শুনেছেন তিনি। পুলিসের বুটের

তলায় পড়ে থেকেছে রবীন্দ্ররচনাবলী কালিদাস বার্ট্রাণ্ড রাসেল। অনেকবার তিনি বলেছেন, আপনারা তো জানেন বাড়িতে থাকে না আমার ছেলে। উত্তরে শুনেছেন, কীভাবে মানুষ করেছেন যে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়? সেই তো। সেকথার জবাব দিতে হবে উর্দিপরা এই লোকটিকে যে মাঝরাত্রে গৃহস্থালি তছনছ করে দিয়ে মায়ের বয়সী এক শিক্ষিকার সঙ্গে ধমকে কথা বলার মতো চাকরি করে।

মাঝে মাঝে আচমকা পাঁচমিনিটের জন্য এক-দুবার এসেছে খোকা গ্রামের লোকেদের মতো ছোট ধুতি শার্ট পরা, মুখে দাড়ি, কোটরে বসে যাওয়া চোখ। যা ঘবে থেকেছে হাতে ধরে দিয়েছেন কনকলতা আর মুখে বার বার কেবল বলেছেন, শিগ্‌গিরি চলে যা!

সেই চার-পাঁচ মিনিটের প্রতিটা মুহূর্তকে মনে হয়েছে ঘাতক। কেবল মনে হয়েছে, এই বুঝি ধাক্কা পড়ল দরজায়। এক-একবারে বুকের মধ্যে কেটে বসেছে সেই শুকনো মুখ আর মায়ায় ভরা হাসি। রোগা হাত দুটো দিয়ে মাকে একবার জড়িয়ে ধরা। বোনের মাথায় হাত দেওয়া। 'ভেবো না মা, আমাদের সবাই খুব ভালবাসে।' সেকথা তিনি এতদিনে জেনেছেন খানিক। সাধারণ লোকজনের কথাবার্তায়, ব্যবহারে। স্কুল যাবার পথে বাসে একদিনও দাঁড়িয়ে যেতে হয় না, কোনও দোকানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয় না, পথে ঘাটে দু-একবার কারও চাপাগলা কানে এসেছে, 'সুগতদার মা'। প্রথম প্রথম বুলবুলি বাড়ি থেকে কোথাও বেরতো না। বেরোলে সাদা পোশাকে পুলিসের লোক যেত পেছনে। সোজা স্কুল যেত আর ফিরত মেয়ে। ধীরে ধীরে নাচের স্কুলে যাওয়া শুরু করল আবার। কনকলতা ভয় পেলে বলত, আমি তো দাদার বোন মা, কেন ঘরে ঢুকে বসে থাকব? আমি তো লুকিয়ে কোথাও যাচ্ছি না। কিংবা হেসে বলত, ভয় পেও না মা, দু'দুটো বডিগার্ড থাকে সঙ্গে, আমাকে ঠিকঠাক বাড়িতে ঢুকতে দেখা ওদের চাকরি।

স্কুল থেকেও খবর নিয়ে ফিরত মাঝে মাঝে। ততদিনে খোকার সাথীদের দু'চারজনকে চিনে গেছেন তিনি। কোন কোন মায়ের বুক খালি করে এসেছে এরা! এমন সব চোখ জুড়োনো ছেলে, এমন হাসিমুখ, এমন মমতাভরা কথা। সব কজন যেন একইরকম মনে হয়।

পেট ভরাবার ব্যবস্থা করা, একবেলা হলেও কী করবে তারা, দিদিমণি বলে দিক। আরেক সমস্যা অসুখ। কনকলতা দেখতেন স্বাস্থ্যের কোনও নিয়ম কোনওভাবেই জানে না এরা, কেবল দারিদ্র্য নয়, জানেই না। খাবারটা ঢাকা দিয়ে রাখা বা হাত ধুয়ে খেতে বসার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে বেশ অনেকদিন লেগেছিল। গ্রামসুদ্ধু ছেলে মেয়ে বুড়ো দাঁত মাজে তামাক দিয়ে। লালচে রঙের চট্‌চটে কী একটা জিনিস, উগ্রগন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে, সকলেরই মুখে সেটা, যে বাচ্চাটা মায়ের কোলে, তারও। তামাক খুব দ্রুত নেশা তৈরি করে। বহুদিনের পুরনো অভ্যেস যাদের তারা নিজেরা চেষ্টা করলে হবে না ধরে নিয়ে ওই সকালবেলা বসে বসে কনকলতা ওদের বোঝাতেন বাচ্চাদের নিমের কি বাবলা গাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজতে শেখানোর কথা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভ্যাসের কথা, যে কোনও পাত্র মাটি থেকে তুলে খাবার জলের কলসীতে ডুবিয়ে দিতে নেই, বাচ্চাদের পেচ্ছাপের কাঁথা জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হয়, ভাতের হাঁড়ির ঢাকা বা হাতাটা সটান মেঝেতে রেখে দিতে নেই— এই সব হাজার সংসারী টুকিটাকি নিয়ে কনকলতা ওদের সঙ্গে কথা বলতেন। তাঁর আশপাশের শিক্ষিত বা শহরের লোকজনকে কোনও কথা বোঝাতে বা মেনে চলাতে যত সময় লাগে, তিনি খেয়াল করতেন এরা এই সব কথা তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি শোনে। ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছিল স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। তাদের দাঁত নখ চোখ পরিষ্কার থাকছে এবং শ্লেট পেন্সিল প্রায় নিয়মিত ক্লাসে

নিয়ে আসছে। এখানে অন্যান্য স্কুলের মতো নিয়ম চলে না। লেখায় আগ্রহী মেয়েটি হঠাৎ কদিন স্কুলে না এলে খোঁজ করতে হয়। প্রায়ই দেখা যায় তার মা একটি নতুন সন্তানের জন্ম দিয়েছে, সে তার সাত বা আট কি দশ বছরের যথাসাধ্য ক্ষমতা দিয়ে মায়ের সাহায্য করছে। কখনও ভাই বা বোনকে কোলে নিচ্ছে, কখনও কাপড় কাচতে যাচ্ছে, মা ঘরের অন্য কাজ করতে থাকলে নতুন বাচ্চা পাহারা দিচ্ছে। সে হঠাৎ শেষ ঘণ্টা দুটোয় যদি ক্লাসে আসবার অবসর পায়, তাকে আসতে দিতে হয়। দুই ভাই মিলে গরু চরায়, গরু পিছু বছরে চল্লিশ কিলো ধান পায়। কখনও একভাই স্কুলে আসে, কখনও অন্যজন। প্রথমদিকে আষাঢ় মাসে আর অঘ্রান মাসে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা খুব কমে যেত। এই সময়ে ক্ষেতে ক্ষেতে ধানের রুয়ান আর কাটাই চলে যথাক্রমে, বড়রা সব সেই কাজে চলে যেত ভোরবেলা আর যতটুকু সম্ভব সংসার সামলানো, ছোটবোনদের খেতে দেওয়া, ঘরের মুরগি বা ছাগলদের খেয়াল রাখা, এসব করতে হত যাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রী হওয়ার কথা তাদের। কিন্তু ওদের নিজেদের আগ্রহ বেড়ে ওঠার কারণে মোটামুটি সারা বছরই ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার সন্তোষজনক, এমনকি কখনও কখনও তার চেয়ে একটু বেশিই। বাড়িতে অশান্তি হলে, ভয় পেলে, ব্যথা পেলে বাচ্চারাও ক্লাসে কনককে বলত সে সব কথা। এই শেষদিকের ছাত্রছাত্রীরা আর দিদিমণি বলত না, বলত মাসিমা। এদের অনেকেরই মা-বাবারা তাঁর ছাত্রছাত্রী ছিল। ছোটখাটো অসুখ-বিসুখে নজর লাগা বাণ মারা নিয়ে অশান্তিতেও কনককে বহুবার মধ্যস্থতা করতে হয়েছে। এ ব্যাপারে অবশ্য গ্রামের সাধারণ লোকেদের শুধু নয়, দুই গ্রাজুয়েট শিক্ষকেরও বিশ্বাস একই রকম দৃঢ় ছিল। বহুবার অনেক কথা আলোচনা কখনও বা বই পড়তে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁরা একটা মাঝামাঝি জায়গায় এসেছিলেন। কনকলতাও জোর করেননি কখনও। নিজেদের সুখদুঃখ সমস্যা নিয়েও তাঁরা কথা বলতেন নিজেদের মধ্যে। হরেনবাবুর সংসারের অবস্থা ভাল। যথেষ্ট জমি, গরু, বসতবাড়িতে দুটো ঘর পাকা করিয়েছেন। সারাবছর নানা জায়গায় পুজোপালায় পুরোহিত হবার ডাক পড়ে তাঁর। কিছু টাকা সুদে খাটান গ্রামের লোকদের কাছে। কিন্তু মনে শান্তি নেই তাঁর, স্ত্রী চিররুগ্ণ। কনকলতা দেখেছেন হরেনবাবুর স্ত্রীকে। বাড়ির দুর্গাপুজোয় অনেক আগ্রহ করে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, কনকলতা এসেছিলেন খোকা আর বুলবুলিকে সঙ্গে করে। অসম্ভব খুশি হয়েছিলেন হরেনবাবু। তখনই দেখেছিলেন ফর্সার চেয়েও বেশি সাদা মানুষটি, চারিদিকে ছড়ানো সংসার নিয়ে নাস্তানাবুদ। ছুটির পর স্কুলে এসে হরেনবাবুকে বলেছিলেন ডাক্তার দেখাতে স্ত্রীকে। তাবিজ কবচ জলপড়া অনেক কিছু করেও ফল হয়নি অথচ শহরের ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না মহিলা। শেষে কথাবার্তা ঠিক করে একদিন কনকলতা নিজে ওঁদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন ডাক্তার কোনারের কাছে। তাঁর আন্দাজ ঠিকই ছিল। গ্যাসট্রিক-এ ভুগছিলেন রুগী। খাওয়াদাওয়ার কড়া নিয়ম বেঁধে দিলেন ডাক্তার। অনেক সেরেছিলেন হরেনবাবুর স্ত্রী। আনন্দের ঘটনাও ঘটেছে— হায়ার সেকেণ্ডারিতে ফার্স্ট ডিভিসন নিয়ে পাশ করল হৃষিকেশের বড়ো ছেলে। কী যে খুশি আর কত গর্বিত মুখ হৃষিকেশের। সেই স্কুল। কত সমস্যা আর কত ছোট ছোট সার্থকতার স্মৃতি। বছরের পর বছর, প্রচণ্ড বর্ষায় ক্লাস করা যাচ্ছে না, ইস্কুলের ঘরময় জল, পাশে শ্যাম মাহাতোর বাড়ি ডেকে নিয়ে গেছে মাহাতোর বুড়ি মা। ছাত্রছাত্রী মাস্টার দিদিমণি সবসুদ্ধ। পড়া হয়নি, গল্প বলা হয়েছে, বাচ্চারা গেয়ে শুনিয়েছে ওদের ভাদুর গান, হাসির গান, নানারকমের ছড়া। গরমের সময় স্কুল বসত সকালে। এগারোটায় যখন বাস স্ট্যাণ্ডে এসে নামতেন, গরম বাতাসে মনে হয় রক্ত পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। চিন্তা

হত এত গরমে বুলবুলি সাবধানে আছে কিনা। গরমের ছুটিতে এসেও পুরোটা থাকত না, নাচের ক্লাস বাদ পড়ে যায়। ততদিনে রঞ্জা এসেছে। খোকাদেরই সঙ্গী ছিল ও। কলকাতার মেয়ে।

ওর মাকেও দেখেছেন। শান্ত। বড় বড় ছেলেরা, তাদের বউরা আছে সংসারে। রঞ্জার জন্য দুশ্চিন্তায় ক্ষয়ে যেতেন, শান্তি পেয়েছিলেন রঞ্জার ঘরসংসার দেখে। রঞ্জা এক-একবার এসে দেখে যায়। হয়ত বসেই আছেন বাবান্দার চেয়ারে অনেকক্ষণ, কিংবা বসার ঘরের চৌকিতে। এক-একবার মনে হয়, গরম কাপড়ের ট্রাঙ্কটা বার করে গোছালে হয়। শেষে সেও ইচ্ছে হয় না। আগের রাত্রের বইটা হাতে নিয়ে শুলেন গিয়ে। মেয়েদের বেশি জেদ ভাল নয়। ভাল বলে না কেউ। কিন্তু কনকলতা ভাবেন, কেন নিয়মটা বরাবরই এরকম যে, যা কিছু ছাড়ার সব মেয়েদেরই ছাড়তে হবে। একটা মেয়েকেই কেন সংসারের দাবি অনুযায়ী নিজেকে বদলে নিতে হবে? বেশির ভাগ মেয়ে সেটাই করতে অভ্যস্ত, তারা বিয়ে হয়ে গেলে নিজেকে স্বামী কি শ্বশুরবাড়ির পছন্দমতো বদল করে নেবে, এরকম ভেবেই রাখে। কিন্তু যারা তা করতে চায় না? যাদের পছন্দ-অপছন্দ বড্ড পরিষ্কার? তাদের কেবলই খোঁচা খেতে হয়, ঠোকর খেতে হয়। তিনি নিজেও বুঝতে পারেন না একটা মেয়ের নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া কি খারাপ? বিশেষত যখন সে মা হয়ে যায়? নিজের বেলায় তাঁর মধ্যে কোনও দ্বিধা কোনও প্রশ্ন আসেনি। এটা তাঁর কাছে স্বতঃসিদ্ধ যে ছেলেমেয়েরা এসে গেলে একটি মেয়ে কেবলমাত্র মা-ই হয়ে যায়। সন্তানদের জন্য ছাড়া তার আর কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু যদি কেউ সেরকম করে না ভাবে? বুলবুলিকে নিয়ে স্বস্তি নেই তাঁর। ও যে কোনও খারাপ কাজ করছে কিংবা উচ্ছৃঙ্খলতা করে মেয়েকে ছেড়ে খেয়ালখুশিতে সময় কাটাচ্ছে তা নয়। ওর কেবল নাচ। এই নাচের বাইরে সংসার আর কোথাও কিছু নেই ওর। নাচ রাখতে পারবে না ভয়ে বিয়ে করতে চায়নি, যখন তাঁকে সবাই তাড়া দিচ্ছিল, উপদেশ পরামর্শ দিচ্ছিল বুলবুলির বিয়ে দেবার জন্য। মেয়ে সেই কলেজ থেকেই তো কলকাতায়। বিয়ে করল দেরি করে, নিজেরাই পরস্পরকে পছন্দ করে। কোথায় ওর নাচ দেখে অঞ্জন নাকি এমন মুগ্ধ হয়েছিল যে যেখানেই নাচ হত সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হত। শেষে মন-বোঝাবুঝি করে বিয়ে। অঞ্জনের বাড়ির সম্পূর্ণ অমতে। মঞ্জীর জন্মেছে বুলবুলির বত্রিশ বছর বয়সে। আর তারপর থেকেই ওদের মধ্যে চাপা অশান্তি। বুলবুলি বলে না কোনওদিন, কিন্তু ওদের দেখে একটা খটকা জাগত মনে, সে কথাও জিগ্যেস করতেন ওদের সেই দুচার মিনিটের ফাঁকে। হ্যাঁরে মানুষ খুন করিস তোরা?

— ও মাসিমা, গরিব লোকেরা যে রোজ খুন হয় তখন তো কোনও খবরের কাগজ খবর লেখে না? যাদের আমরা মারি সবাই জানবেন অনেক অনেক অনেক লোককে মেরেছে। আর তারপর একদিন রাতদুপুরে বাড়িতে ঢুকে পুলিসদের আনন্দ উল্লাস— ধরা পড়েছে সুগত গুপ্ত এতদিনে...

ধড়মড় করে উঠে পড়েন কনকলতা। গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছে। ডাকবেন রঞ্জাকে? খোকাকে? স্বর বেরোচ্ছে না গলা দিয়ে। টর্চটা জ্বালবার চেষ্টা করেন, আঙুলে জোর নেই। বেডসুইচটা খুঁজতে গিয়ে সাইডটেবিল থেকে জলের ঘটিটা মেঝেতে পড়ে যায়। সুগত পাশের ঘর থেকে প্রায় ছুটে আসে। ডাকে, মা? নিঃশব্দে বুকের ওপর রাখা খোকার মাথায় হাত বোলান কনক। অনেক পুরনো হয়ে যাওয়া জল খোকার দু'হাতের তাপে গলে চোখ দিয়ে গড়িয়ে আসে।

শরীর যে এত ভেঙে গেছে, এত ক্লান্তি জমেছে ভেতরে, এ যেন আগে বোঝা যায়নি। কেবলই ঘুম পায় কনকলতার। ঘুম আসে না তবু শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। সেইসব অন্ধকার পাথুরে দিনগুলোয় স্কুল যাওয়া একদিনও বন্ধ করেননি তিনি। ধরা পড়ার প্রায় দশদিন পর যেদিন খোকাকে কোর্টে নিয়ে এল, তাঁকে যেতে দিল না বুলবুলি। দাদার জামাকাপড় কিছু খাবার নিয়ে সে নিজেই গেল। কিন্তু কনকলতা তো না গিয়ে পারেননি। তাঁকে তো দেখতেই হবে কী করেছে তাঁর তিলতিল করে বড় করা খোকাকে।

দেখলেন দূর থেকে। দাঁড়াতে পারছে না উঠে, দুপাশের লোকেরা তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ঝিমিয়ে পড়া চোখে সামনের ভিড়ে কী খুঁজছিল, বুলবুলিকে দেখতে পেল। তাঁকে দেখেনি। তিনিও আরও দাঁড়াননি। বুলবুলি ফিরবার আগে স্নান করে রান্নাঘরে ঢুকেছেন। দু'জনে দু'জনকে ফাঁকি দেবার জন্য খাবার নিয়ে বসেছেন। উঠে গেছেন। বুলবুলি তাঁর কোলে মুখ গুঁজে কেঁদেছে, তিনি কাঁদেননি।

সেই সময় থেকেই বুকের ব্যথা শুরু হয়েছিল। ধীরে ধীরে অসুস্থতা বাড়ছিল। জা ভাসুর এসেছিলেন খোকার খবর পেয়ে। তাঁর শারীরিক অবস্থা দেখে ভাসুর চিন্তিত হয়েছিলেন। এই প্রকাশরহিত মানুষটি সর্বদা পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন বিপদের সময়। তখনই একবার এমন মনে হয়েছিল, যখন শশিশেখরের মৃত্যুর পর এই নিঃসন্তান মানুষ দুটি খোকাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তখন দিয়ে দিলে হয়তো এরকম হতো না। কিন্তু কীরকম হত? তাঁর খোকার মতো হত কি? গুছিয়ে কিছুই যেন বোঝা যায় না। কেস কোর্টে উঠলে যেন তাঁকে অবশ্যই খবর দেন কনক, এই বলে ভাসুর ফিরে যান জাকে নিয়ে। তাঁদের পরামর্শেই বুলবুলিরও সায় ছিল, বিশ্রাম দরকার কনকলতার। বারে বারে সে বলেছিল স্কুল ছেড়ে দিতে। তাকে বোঝান কনকলতার পারিবারিক ডাক্তার, ডাক্তার কোনার। বহুদিন ধরে এই পরিবারে আসাযাওয়া তাঁর, শশিশেখর ছিলেন যখন থেকে। ছেলেমেয়েদের ধাত যেমন বোঝেন তিনি, কনকলতাকেও যে বোঝেন খানিকটা সেটা দেখা গেল যখন বুলবুলিকে জোর দিয়ে বলেন মায়ের স্কুল যাওয়া বন্ধ না করতে। বলেন ওই স্কুল আছে বলে স্থিরভাবে সহ্য করতে পারছেন উনি, স্বাভাবিক জীবনযাত্রার কাছাকাছি আছেন। স্কুল না থাকলে একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়বেন। প্রতি সপ্তাহে এসে খোঁজ নিয়ে যেতেন ডাক্তার কোনার। সত্যিই সেই সময়টা যেন স্কুল দিয়েই ভরা। বুলবুলির ফাইনাল ইয়ার। গ্রামে বাচ্চারা ততদিনে দিব্যি রপ্ত হয়ে গেছে স্কুলে আসায়। প্রথমবারের যেসব ছাত্রী ছিল তারা ক্লাস ফোর পাশ করেছে অনেকদিন। বেশ ক'জনের বিয়েও হয়ে গেছে। আর স্কুলের ঘর তৈরি হয়েছে। মাটির গাঁথানি দেওয়া ঘর, গ্রামের লোকেরাই গড়েছে নিজেদের হাতে। দু'জোড়া দরজার আর দু'জোড়া জানলার পাল্লা পাওয়া গিয়েছিল অনেকবার ডি. আই অফিস আর পঞ্চায়েত অফিস করে। হরেনবাবুই করেছিলেন ছুটোছুটি। হেডমাস্টার হিসাবে মান্য পান তিনি, উল্লেখ করেন আমাদের স্কুল বলে। সত্যিকারের ভাল ছেলে ওই হৃষিকেশ। ওরও জমি আছে পাশের গ্রামে। প্রথম দিন কথা শুনে পরদিন কনকলতা আসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌঁছেছিল সে। বলেছিল, দিদি, আপনি শিক্ষা দিলেন আমাকে। আমি কোনও দিন ভাবি নাই এমন করে। তিনটে ছেলে আছে আমার, তাদের শিখাই লেখাপড়া করো, বড় হও, লোভ কইরো না। কিন্তু কোনও দিন মনে আসে নাই যে আমি নিজে কতবড় অন্যায়টি করছি, কীসে ভাল হবে আমার ছেলেরা?

ভারী আন্তরিকতা ছিল ছেলেটির কথার মধ্যে। ক্লাসে পড়াতও খুব ভাল। মারধর করত ছেলেদের প্রথম প্রথম, তারপর সেটা ছাড়ল। ছড়ি এনে রাখত, মারব বলত,

কিন্তু ওই মুখে প্রচণ্ড ধমকাধমকি পর্যন্তই। একদিন বারবার বলে দেওয়া পড়া বলতে না পারায় একটা ছেলেকে চড় মেরেছিলেন কনকলতা। পড়ে গিয়েছিল ছেলেটা, বসিয়ে দিতে তাকিয়ে ছিল একদৃষ্টে। অন্য বাচ্চারা বলেছিল— খায়নি ও। সেই একদিন, আর কখনও হাত তোলার কথা চিন্তা করেননি। অভাবের সঙ্গে আরও কতবকম যে সমস্যা এদের। বাসের সময়মতো এসে স্কুল শুরুর প্রায় আধঘণ্টা আগে পৌঁছতেন কনকলতা, হেঁটে আসতে আসতে দেখা যেত দূরে মাঠের মাঝখানে একটা ছোট পাহাড়। এদের ভাষায় বলে ডুংরি। শীতলপুরের ডুংরি ওটা। কেন একদিন মনে হয় যেন ওটাও মাঠের ওপর গুঁড়ি মেরে বসে আছে তিনি আসবেন বলে। আধঘণ্টা আগে পৌঁছে তিনি বসতেন স্কুলবাড়ির দাওয়ায় আর তখন তাঁর কাছে এসে বসত গ্রামের বউরা। কখনও বুড়িরাও। হাজার সমস্যা তাদের। তার মধ্যে সবেচেয়ে বড় সমস্যা নেশা। গ্রামের মধ্যে ভাটিখানা নেই কিন্তু পাশের গ্রামেই আছে। বাস রাস্তার উপরে। সারাদিন রিকশা টেনে হোক, জন খেটে কি চাল ছাওয়ার কাজ করে যা পয়সা উপার্জন করে প্রায় প্রতিটি পরিবারের পুরুষরাই সেটা খরচ করে আসে এই দেশি মদের দোকানে। গ্রামের মধ্যেও দু'চার জন হাঁড়ি করে এনে বিক্রি করে। বউদের মারধর করা নিত্যদিনের ব্যাপার। কনকলতা দেখে অবাক হতেন মার-খাওয়া নিয়ে বউদের নালিশ অপেক্ষাকৃত কম, যেন ওটাকে বিবাহিত জীবনের একটা অংশ বলে ওরা ধরেই নিয়েছে। নেশা নিয়ে নালিশের প্রধান কারণ খালি হাতে বাড়ি ফেরা। বাচ্চাদের খাবার জোটানোর পুরো দায়িত্বটাই মায়ের, কিন্তু সত্যিই তো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় দিনে চারটে কি পাঁচটা পেট রোজ ভরাট করার।

চোখের প্রতিটি চাউনি প্রতিটি বাঁক চেনেন। তিনি বুঝতে পারেন সুখে নেই বুলবুলি। তিনি নিজের মতো করে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন দু'একবার কিন্তু মেয়ে সে কথা মানতে রাজি নয়। সে কেবল বলবে, ও তো আমার নাচ দেখেই বিয়ে করেছিল। তাহলে সেই নাচ আবার ছাড়তে বলছে কেন? আমি তো বিয়ের আগেই বলেছিলাম নাচ ছাড়বো না। কিন্তু মঞ্জীর যে এখনও খুবই ছোট। বাবা-মার জেদা-জেদিতে তার আর কোনও ভাগ নেই। একা পড়ে থাকা, আয়ার কাছে থাকা ছাড়া। বুলবুলির কথা হল, আমি যখন কলকাতায় থাকি তখন তো অঞ্জনকে মেয়েকে দেখতে হয়না, বছরে দুবার কি তিনবার আমি বাইরে গেলে ও মেয়েকে সময় দেবে না কেন? ও যদি অফিসের ট্যুরে যেত আমি কি মঞ্জীরকে দেখতাম না?

এসব কথার উত্তর কনকলতা জানেন না। তিনি কেবল চুপ করে থাকেন আর কষ্ট পান। কত যত্নে, কত কষ্টে বড় করেছেন ছেলেমেয়েদের, তারা কেন বড় হয়ে এতরকম কষ্ট পায়? তাঁর নিজের ভিতরে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে। তবে কি এটাই নিয়ম যে চিরকাল সব বাবা-মা চাইবে তাদের সন্তান যেন জীবনে কোনও কষ্ট না পায়, অথচ প্রতিটি মানুষই বড় হয়ে উঠে তাদের নিজেদের জীবনে দুঃখকষ্ট পাবে? তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না বাবার, মায়ের? ভালবাসা, নিজেকে উজাড় করে দেওয়া ভালবাসা কি তাহলে কোনও কাজেই লাগে না?

কত যে খুঁটিনাটি কাজ থাকে সংসারে। সবই তাড়াহুড়ো করে করবার নয়, সময় নিয়ে খুঁটিয়ে করবার কাজ। বহুদিন ধরে বাকি পড়ে থাকা সব কাজ। তাকের বইগুলো নামিয়ে বাছবেন ভাবছেন কদিন ধরেই। সাজানো সারির মাঝে মাঝে ফাঁক। কে নিয়েছে, ফেরত দিয়েছে কিনা জানেন না তিনি। একটু একটু রাগ হয়।

সারাজীবনে কোন শখকে প্রশ্রয় দেননি কখনও। পোশাক পরিচ্ছদের চাকচিক্য অলঙ্কার এ সবের কথা তো চিন্তাই করেননি। খোকা-বুলবুলিকেও দামী পোশাক প্রায় কখনও পরাননি। শুধুমাত্র নিজে পছন্দ করতেন না বলে এমন নয়। ওরা যেন বুঝতে শেখে, কোন দেশের ওরা ছেলেমেয়ে। একই কারণে যখন ওরা বেশ ছোট ছিল, অনেক সময় শীতের দিনে ওদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন স্কুলে। দুই ভাইবোনে খুব ভালবাসত সেই যাওয়াটা। একে মায়ের সঙ্গে যাওয়া মায়ের স্কুলে, যে স্কুলে মা সারাদিন থাকে, তা ছাড়া শীতের হালকা রোদ ওঠা সকাল থেকে দুপুর অবধি খোলা মাঠ, তীব্র শীতে নাক লাল করে দেওয়া হাওয়া, ছোলা, মুগ মটরের ক্ষেত, একগুচ্ছ সমবয়সী বাচ্চা— দুজনে একেবারে মেতে উঠত। ওদের ছোট হওয়া জামাপ্যান্ট কনকলতা তাঁর স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য নিয়ে আসতেন। সেটা প্রায়ই স্কুলের আর ঘরের দূরে থাকা ছেলেমেয়েদের মধ্যে একরকম সেতু হত। দু-একবার দেখেছেন জামা বা প্যান্ট কোনওভাবে ছিঁড়ে ফেললে দু'ভাইবোনই খুব অপরাধী হত, মা এই জামাটা যাকে দেবে, ছেঁড়া বলে তার কত দুঃখ হবে না?

বেড়াতেও যাননি তেমনভাবে কখনও। শশিশেখর থাকতে ছেলেমেয়েরা বড় ছোট ছিল আর যখন ছেলেমেয়ে বড় হল, শশিশেখর রইলেন না। শখ বলতে সঙ্গী এই বইগুলো। অতি সংযমে মাস চালিয়ে প্রতি মাসে একটা, ক্বচিৎ কখনও দুটো বই নিয়মিত কিনে এনেছেন। তাও হয়ত নিয়মিত কেনা হত না বলাই ছাড়া। এ শহরে যখন প্রথম এসেছিলেন, সেই পুরনো পাড়ার প্রতিবেশী ছিল বলাইরা। স্টেশনারী দোকান ছিল বলাইয়ের বাবার। তিনি স্কুল যাওয়া আসার পথে প্রায়ই দেখতেন ছোট ছেলেটি বাবার পাশে চেয়ারে বসে আছে দোকানের মধ্যে। তাঁর কেমন অস্বস্তি হত। ভাবতে ভাবতে শেষে একদিন জিজ্ঞসা করেই ফেললেন, স্কুলে যায় না ছেলে?

এক মহিলার মুখের প্রশ্ন বলেই বোধহয় একটু অপ্রস্তুত হয়েছিলেন ভদ্রলোক, না মানে—ফোর পর্যন্ত পড়েছে— তারপর আর কি— এই মানে দোকানেই নিয়ে আসি, বুঝলেন, কাজকর্ম দেখুক শিখুক— একদিন তো ওকেই বসতে হবে এখানে। তবু একটা ছোট ছেলে দিনরাত ওই একটা দোকানের মধ্যে বসে বুড়োদের মতে হিসেব কষবে এটা ঠিক সহজভাবে নিতে পারেননি।

আবার কথা বলেছিলেন বলাইয়ের বাবার সঙ্গে। ব্যাপারটা এই দিক দিয়ে ভেবে দেখেননি মানুষটি। সত্যি ছেলেকে ভর্তি করে দিলেন স্কুলে। সেই ছোট বলাই মাঝে মাঝে আসত। সুগতর সঙ্গে খেলত, সুগতর ছবি আঁকার খাতা ছবির বই দেখত মাঝে মাঝে। কখনও বা তাক থেকে লাইফ টাইমস লাইব্রেরির বড় বড় বইগুলো নামাত সুগত ছবি দেখার জন্য। বলাই ভয় পেত— এই, বই নামাচ্ছ? তোমার মা বকবে না?

বই দেখলে তো মা বকে না।

যদি নষ্ট হয়ে যায়?

নষ্ট হবে কেন? যত্ন করে দেখতে হবে। আর সেই সময়েই নিজের গুরুত্ব আর গাম্ভীর্য জাহির করত খোকা। যখন আমি বড় হব, এই সব ইংরেজি লেখা নিজেই পড়ব। সারাদিন ধরে পড়ব।

স্কুলে পড়তে পাওয়া আর সুগতর সেই ছোটবেলাকার বন্ধুত্ব মিলিয়ে কী মনে হয়েছিল বলাইয়ের, যখন খোকা ছিল না সেই সময়ে অনেকে আসা বন্ধ করলেও বলাই সে সময় প্রায় নিয়মিত আসত। হয়তো বিশেষ কিছুই বলত না, চুপ করে বসে থাকত, খুব সাধারণ সুবিধা-অসুবিধার খবর নিত, এইটুকুই। বাবার ইচ্ছেমতো দোকানও করেছে

বলাই। দোকানের কাউন্টার আরও বাড়িয়ে স্টেশনারির সঙ্গে একদিকে কিছু বইপত্রও রাখছে। প্রত্যেক মাসে ওই একদুটো বই এনে দেয় কনকলতাকে। নিজের দোকানে বলাই রাখে প্রধানত স্কুল কলেজের বই কিন্তু কনকলতার জন্য কলকাতারই বড় প্রকাশনাগুলোর ক্যাটালগ নিয়ে আসে। জীবনের অনেক একাকিত্ব, অনেক অসহ্য দুঃখে তাঁর সঙ্গী হয়ে থেকেছে বইগুলো। শেল্‌ফের মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা দেখে একটু বিরক্ত হল তাই।

কলিংবেল বাজল। দরজা খুলে দেন কনকলতা। ডাকপিওন। রঞ্জার চিঠি। ঠিকানার হাতের লেখা দেখে মনে হয় ওর বড় বউদি। 'রিডার্স ডাইজেস্ট' পাঠিয়েছে তাদের নতুন ডিকশনারির চক্‌চকে বিজ্ঞাপন। চিঠি। তাঁর নামের খাম। বুলবুলির, কদিন ধরেই মন অশান্ত মেয়েটার জন্য। আজই একটু আগে বার করেছেন গতবছরের বেঁচে যাওয়া কিছু উল। যখন এসেছিল বলে গিয়েছিল, মা, আমাকে এবছর একটা হাতকাটা স্কিউই বুনে দিও তো। বাইরে কোথাও গেলে খুব শীত করে। আসলে শীত করাটা ছুতো। ওরকম করে মায়ের কাছে আবদার করা। হায়দ্রাবাদ থেকে লিখেছে— মাগো, আসবার আগে তাড়াতাড়িতে তোমাকে গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারিনি। এবারের ট্যুর ভাল হয়েছে, যেখানেই আমরা প্রোগ্রাম করেছি, সবাই খুব খুশি। কাল এখানে একটা খুব বড় প্রোগ্রাম আছে, তারপর ফেরা। মা, কালকেরটা হয়তো অনেকদিনের জন্য আমার শেষ পারফরম্যান্স, হয়তো শেষবারও হতে পারে। আশীর্বাদ কোরো কাল যেন আমি এমন পারফরমেনস করি যে লোকে অনেকদিন মনে রাখে।

এবারে আসবার আগে অঞ্জনের সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছে। ও আমার সব কথা মেনে নিয়ে একটা অদ্ভুত কথা বলেছে, আমি কলকাতায় পারফরমেনস করলে ওর কোনও আপত্তি নেই কিন্তু বাইরে গেলে আপত্তি। সেই আপত্তিটা কেন জানো? বাবলিকে ও রাখতে পারে কিন্তু এর বন্ধুবান্ধবরা এবং ওর আত্মীয়স্বজনরা (বুঝতে পারলাম 'বন্ধুবান্ধব'টা কথার কথা) নাকি ওকে নানারকম বিদ্রূপ করে। যখন আমি থাকি না তখন ফোন করে সমবেদনা জানায় বেবি সিটিং করতে হচ্ছে বলে, কবে কোন বিয়ে না বউভাতে অনেক লোকজনের মধ্যে ওর বোন নাকি ওকে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করেছিল— 'দাদা তুই মেয়ের ন্যাপি পাল্টাতে পারিস? চিন্তা করো। ওরা সবাই জানে চার বছরের মেয়ের ন্যাপি পালটানোর কথা ওঠে না। কিন্তু অঞ্জন বলছে, এসবে ও ভীষণ হিউমিলিয়েটেড ফিল করে। আচ্ছা মা, মায়েরা তো বাচ্চাদের কেয়ার নিতে কোনওদিনই হিউমিলিয়েটেড ফিল করে না। আর যদিও বা করে, মনে আছে মা, আমাদের টিমের অদিতি ওর নতুন ছেলের পটিতে হাত দিতে ঘেন্না পেত বলে সবাই ওকে ন্যাকা অসভ্য কত কী বলেছিল! কিন্তু অঞ্জন যদি অন্যান্যবারের মতো রাগ করত, মেজাজ দেখাত, আমিও অন্যান্যবারের মতোই গ্রাহ্য না করে চলে যেতাম, এবারে ও তা করেনি। খানিকটা ছোট ছেলের মতো, খানিকটা হেল্‌পলেসের মতো নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে নিয়েছে। বলেছে ও জানে এটা আমার প্রতি অন্যায় করা, কিন্তু সব থেকে নাকি ওর মধ্যে কেমন ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স তৈরী হচ্ছে। ও মনে কোনও জোর পাচ্ছে না, অফিসে ঠিকমতো মন দিতে পারছে না। রাত্রে ঘুমোতে পারে না। একজন লোক সারেণ্ডার করবার পর আর কী করা যায় বলো? তাছাড়া ওকে তো আমি ভালবাসি। প্রচণ্ড ভালবাসি। সুতরাং এই আমার শেষবার বাইরে আসা। আর জান তো মা, এই লাইনেও দারুণ কম্পিটিশন। যখনই আমার একটা শর্ত হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে আমাকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। খুব কষ্ট হচ্ছে মা, তবু তাই করছি যা বেশির ভাগ মেয়ে করে। বুঝতে পারছি কেমন

করে আমরা নিজেদের কাছে হেরে যাই। অঞ্জন খুব খুশি। খুবই খুশি। যেদিন ফিরব ও বাবলিকে নিয়ে আমাকে নিতে আসবে এয়ারপোর্টে। এই প্রথমবার, জানো মা!

তাড়াতাড়ি করে একবার তোমার কাছে যাব। বুবুনকে আদর দিও। দাদাকে রঞ্জাকে ভালবাসা দিও মা। রঞ্জাকে বলো না— সেতার বাজানোটা আবার শুরু করতে।

তোমার বুলবুলি।

সারাটা দিন মনের মধ্যে ভারী হয়ে রইল বুলবুলির চিঠিটা। কী বলবেন তিনি? তিনি নিজেও যে বুঝতে পারেন না কোনটা ঠিক। তাহলে তাঁর শাশুড়ির আমলই কি ভাল ছিল? লেখাপড়া শেখা দূরস্থান, ভাল করে জ্ঞানও ফুটত না, আটবছর পার করামাত্র বিয়ে দিয়ে দেওয়া। তাদের যাই হোক, এত মনে কষ্ট তো পেতে হত না!

স্কুলে একবার 'নীল রং' দিয়ে পাঁচটা করে বাক্য লিখে দেখাতে বলেছিলেন ক্লাস ফোরকে। যামিনী তাঁতি লেখাপড়ায় বেশ ভাল ছিল। সে মেয়ে খাতায় লিখেছিল— 'আকাশের রং নীল। লাল রং নীল রং শাড়ি হয়। আমি শাড়ি পরি না, শাড়ি পরলে বিয়ে হয়। বিয়ে হলে খুব দুক্খ'।

রঞ্জার মা চিঠি লিখেছিলেন। যদি রঞ্জা ছেলেকে নিয়ে এবারে পুজোর সময়ে—

তিনি জানেন রঞ্জা আর খোকা এবার পুজোয় বেড়াতে যাবে ঠিক করে রেখেছে। তিনি বারে বারে বলেছেন তাঁর কোনও অসুবিধা হয় না একা থাকতে। তবু তারা অপেক্ষা করছে বুলবুলি ফিরলে খবর নেবে পুজোর কদিন বুলি এসে মায়ের কাছে থাকবে কিনা। খোকা আজ অফিস থেকে ফিরল একটু আগে। ক্লান্তিতে মুখখানা কালি। বললেন, বুলবুলির চিঠি এসেছে। কনকলতা আর রঞ্জা চা নিয়ে বসেছিলেন, খোকা চা খায় না। বলে দিল, এখন কিছু খাবে না, অফিসে অনেক কিছু উল্টোপাল্টা খাওয়া হয়েছে। তারপর হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, কই মা বুলবুলির চিঠি? সাধারণত তিনি নিজেই দেন, খোকা নিজে থেকে চায় না। এই মুহূর্তে একটা দ্বিধা হল, দেবেন? তারপর মনে হল, থাক জীবনে সব সুখদুঃখই তো ভাগ করে নিয়েছে দু'ভাইবোন। চিঠি পড়ে চুপ করে বাইরের ঘরের চৌকিতে গিয়ে শুল খোকা। মিনিট পনেরো পর হঠাৎ উঠে এসে কনকলতার কাছে বসল, চোখ দুটো লালচে। তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে গেলে মাথা সরিয়ে নিয়ে বলে উঠল, মা, আমাকে আজকে আপিসের কাজে কলকাতা যেতে হবে, তুমিও চলো।

কনকলতা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেন— ওরা নিজেরা একটা ঠিক করেছে, ওদের একটু থিতিয়ে নিতে দে, এক্ষুণি তার মধ্যে গিয়ে পড়াটা ঠিক নয়।

— তার মধ্যে গিয়ে পড়ছি না, চলো আজ রাত্রের ট্রেনেই যাব, কাল রাত্রের ট্রেনে ফিরব। রঞ্জা, মায়ের একটা-দুটো কাপড় গুছিয়ে দাও।

এত তাড়াতাড়ি এরকমভাবে যাবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু খোকা হঠাৎ জেদ করল। একটা কারণেই এলেন কনক, খোকাকে যখন আসতেই হবে, তিনি না এলেও হয়তো ও যেত বুলবুলির বাড়ি। হয়তো কেন নিশ্চয়ই যেত, সেক্ষেত্রে যদি ও কোনও চড়া কথা বলে ফেলত অঞ্জনকে! খোকা তেমন নয়, সারাজীবনে কখনও রাগতে দেখেননি, সবই সত্যি। কিন্তু বোন যে ওর কাছে বড্ড বেশি! তিনি থাকলে অন্তত সেরকম কিছু হবে না। আসবার সময়ে রঞ্জা বলল, মা বাবলিকে বরং নিয়ে এসো সঙ্গে করে।

সেটা করলে হয়। ওরা দুজনে থাকুক ক'দিন।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ঘুম আসে ট্রেনের দোলায়। নীচের বার্থে শুয়েছেন, ওপরেই মিডল বার্থে খোকা। দু'বার তিনবার দেখেছে তিনি জল খাবেন কিনা। জলের বোতল তো আছে কাছেই।

খুব সকালে হাওড়ায় ঢোকে এই ট্রেনটা। ট্যাক্সিতে বসে শ্যামবাজার বলতে শুনে একটু অবাক হন। বুলবুলিরা থাকে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ে।

— আগে সাদার্ন অ্যাভিনিউ যাবি না?

হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে গঙ্গাকে দেখে অভ্যাসে কপালে হাত ছোঁয়ান কনকলতা আর খোকা দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে তাঁকে। হঠাৎ কী রকম ভয় হয় তাঁর— কী রে?

— মাগো, মা কেমন শক্ত হয়ে যাচ্ছে খোকার স্বর। কালকের কাগজে... মা... বুলবুলি অঞ্জন অ্যাক্সিডেন্টে...

কালকের কাগজ! কাগজ তো দেখেন নি কাল, কাগজ আসবার আগেই চিঠিটা এসেছিল।

— খোকা, খোকা, ঠিক করে বল... কী বলবে খোকা? কী শুনবেন?

পরশু দমদম থেকে ফিরবার পথে ভি. আই. পি রোডে সরাসরি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে গাড়ির। অঞ্জন চালাচ্ছিল বুলবুলি পাশে বসেছিল। বুলবুলির সুটকেস দেখে বাসন্তিকা মিত্রের নাম গিয়েছিল কাগজে। কেবল বাবলির কিছু হয়নি। ঝাঁকুনি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

দু'দিন লাগল। হাসপাতাল থেকে ওদের শরীর নিয়ে গিয়েছিল শ্যামবাজার, অঞ্জনদের বাড়ি। গতকাল খোকার অফিসের ফোনে খবর দিয়েছিল ওরা। ঢাকা দিয়ে রেখেছে, বলল খুলে কিছু দেখবার মতো নেই। বুলবুলি নিয়ে যায় নি খোকাকে দেখতে। খোকা নিয়ে এসেছে বুলবুলিকে দেখতে। নেই।

তাই রঞ্জনা বলে দিল বাবলিকে নিয়ে যাবার কথা?

বাবলিকে কাছে পেয়ে সবচেয়ে খুশি বুবুন। যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ বোন। খেলা, হাসি। তবু মাঝে মাঝে দুপুরে ঘুম ভেঙে চুপ করে কনকলতার দিকে চেয়ে থাকে মেয়ে। সন্ধ্যাবেলা চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে শুধোয়, আমার মা কই, আম্মা?

কনকলতা রাত্রির আকাশের তারা চেনান তাকে। সকালে ঘুম ভেঙে তাকালে দেখতে শেখান গাছের নতুন পাতা, কোলের কাছে বসিয়ে ছড়া শেখান। — বলো দিদি, আলো হয়, গেল ভয়।

বয়সের তুলনায় একটু আধো-আধো উচ্চারণ বাবলির— আলো অয় গেল বয়।

বিষকরবী কথা

দেবব্রত দেব

আমার শিয়রে, ডানদিক ঘেঁষে যে জানালা, মনে হয়, সেটা কোনোদিন বন্ধ করা হয়নি। ওই জানালাটার ওপাশ দিয়ে এইমাত্র সেই মেয়েটি চ'লে গেল।

আমার মেয়ের চাইতে বড়জোর বছর আড়াই এগিয়েছে সে।

ক'দিন পর বিশ্বকর্মা পূজা। মেয়েটি স'রে যেতেই আবার সেই খন্ড আকাশ। আকাশে চাঁদিয়াল, লালনীল শৈশবে আমি বলতাম, 'দৈখল-গুড্ডি'।

তখন আমার বুক টনটন্ করে, আর ক'টা দিনই-বা! তবুও আমি আর কন্যা আকাশ আর ঘুড়ি দেখে তলপেট খেলিয়ে গানটা তুলে আনি, সেই গানটা— 'চুড়ি নেহি মেরা/ দিল্ল-ইল্ হ্যাঁয়/ দেখো দেখো টুটে না...' '

আর কী। সমস্ত ঘরময় তখন কুয়াশা ঢুকে পড়ে। আমাকে সে শাসন করে তির্যক বিভঙ্গে। আমি, অমরকৃষ্ণ দত্ত, জানালা দিয়ে আকাশ আর ঘুড়ি দেখি।

আমি তো দুটো সত্যই শুধু বুঝি। পোষা ও পোষমানা জীবনের সত্য হোলো মৃত্যু।

এই কারণেই আমি আগে যা করতাম, এখন তা করি না। মানুষের ব্যবহৃত ভঙ্গি সমূহ থেকে স'রে দাঁড়িয়েছি। তেমন কান্না নেই ব'লে কাঁদি না। মানুষের মতো আনন্দিত হই না ব'লে হাসি না।

এখন আমি অনেকটা ঐ চেয়ারটার মতোই। ওটার বয়স পঁয়তাল্লিশ। ওই যে, আমার শয্যায় বাঁ-দিকে মাঝ-বরাবর দেওয়াল ঠেসান দেওয়া— ওটায় বসলে আমার মাথা এবং পা থেকে দুটো সরলরেখায় সমদ্বিবাহু কোণ সৃষ্টি হয়।

প্রকৃতপক্ষে ওটা আমার বাবার ছিল। ছাপান্ন সালে একবার আমাদের ভূমিতল ডুবেছিল। সপরিবারে বাবা ছাদে পাক্কা একদিন একরাত বৃষ্টিতে ভিজেছিলেন। এই সব কথা প্রাকৃতিক নিয়ম মোতাবেক আমার মনে থাকাই উচিত। কিন্তু, আমার স্মৃতি এখন বিম্বহীন।

এটুকু বলতে পারি, ওই চেয়ারটা বাবা বন্যার জল থেকে ধরেছিলেন। আজ অব্দি কোনো মানুষ এসে বলেনি— আরে! ওটা! ওটা তো....!

বাবা, তিনি অবশ্য আমাকে ঘরের মধ্যে গুঁজে দিয়ে আজো ওই চেয়ারেই বসেন। আমি তাকে স্পষ্টত দেখতে পাই এই শয্যা থেকে। নীরব মধ্যাহ্ন যেমন সহসা বিন্‌বিন্ ক'রে কথা বলতে শুরু করে, বাবাও তেমন।

— 'অমরকৃষ্ণ, তোমার পত্নী কি বিপথগামিনী।' বাবার বাক্য শেষে কোনো প্রশ্ন বা বিস্ময় বা আতঙ্কসূচক ধ্বনি থাকে না।

আমি ঠোঁট না-নেড়ে বলি— 'হয়তো, হে পিতা। হয়তো না।'

সংসার সম্পর্কে বাবার এই টুকুই আগ্রহ। মিটে গেলে, আমি শাখান পাহাড়ে দেও নদের উৎস-গর্জন শুনতে পাই। বাবার এখনকার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তার অদ্ভুত মিল। কবে যে বাবা নদ-নদীর ভাষায় কথা বলতে শিখলেন!

আমি জানি মানুষ নদীর ভাষা শিখবে না। তার প্রয়োজন অপ্রয়োজনের হিসেব বড় নিষ্ঠায় মেলানো হয়। তার চেয়ে, ওই সব অপ্রয়োজনীয় চর্চার চেয়ে সিরিয়াস ছাত্রের মতো এক্সাম্ হলের করিডর হেঁটে হেঁটে আওড়ান— ই ইজ ইক্যুয়াল টু এম্ সি স্কোয়ার।

দুই

বিকেল হবার একটু আগে ছেলেটা এলো। আমাদের ঠিকে ঝি ওর মা। বিকেলের শিফ্‌টে ওর মা খুব কমই আসে। বিশেষ ক'রে, এ-রকম প্রথম শরতে। ছেলেটাব বাপ নির্ঘাৎ এ-সময় বাড়ি ফেরে।

তখন ছেলেটাই হয়ে ওঠার কথা সমস্যা। তাই ফন্দি ফিকির ক'রে ওরা তখন ছেলেটাকে আমার কাছে পাঠায়। এসে, ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই বলে— 'মা-র শইলডা খারাপ মোশা, এই বেলা আইতো না কইছে।'

প্রত্যেকদিনই ছেলেটাকে কিছু দেবো ঠিক ক'রেই রাখি। দিইও, যা হোক কিছু। আজ আমার শিয়রের কাছে উঁচু র‍্যাকটায় এক প্যাকেট বাটার আছে। দুটো সেদ্ধ-করা ডিম, শক্ত হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে।

এক কিস্তি এক্স-রে দিয়ে লোকটা বলেছিল— 'পাশের ঘরে যান গিয়া। ডিম খান বাটার দিয়া।'

আর, ঘরটা ছিল ফাঁকা। ফাঁকা ঘর মানেই হিড়িক্। একসঙ্গে, নানা রকম। ফলে, আমার পূর্ব-পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র সফল হয়ে গিয়েছিল।

আমি অবৈধভাবে বাটারের প্যাকেটটা আর সেদ্ধ-ডিম দুটো ঝট্‌পট্ লুকিয়ে ফেলেছিলাম। তারপর অনেকক্ষণ ওই ঘরে কেউ আসেনি।

আমিও খেলা শুরু ক'রে দিয়েছিলাম। একলা খেলা। আমার খুবই প্রিয় খেলা। ডিম বাটার লুকোনো স্থান থেকে বের করেছি বারবার। দরজায় চোখ রেখেছি। আবার লুকিয়ে ফেলেছি। এ-রকম অনেকবার। বারবার।

তারপর ওরা আমার ভরপেট-এক্স-রে নিয়েছে। বুক থেকে সন্তর্পণে আধাতরল জল সিরিঞ্জ দিয়ে শুষে তুলেছে।

আমি বাড়ি ফিরে আসার পর, সুযোগ বুঝে ওই উঁচু র‍্যাকে সমস্ত সারবস্তু তুলে রেখেছিলাম।

যেন, এক্স-রে প্লেটের ওপর ডিম আর বাটার রেখে এক করতলে ধরা। অন্য হাতে ম্যানড্রেকের মুদ্রা ক'রে ছেলেটার সামনে ধ'রে বললাম— 'নে!'

— 'স-ব!' ছেলেটা আমার চোখে চোখ না-রেখেই বিস্ফারিত হোলো।

— 'সব।' আমি বললাম।

এক খাবলায় নিয়ে নিলো। মেঝেয় বসলো। ডিম খাচ্ছে। শব্দ হচ্ছে— কপ্‌কপ্। তার দাঁতে ঠোঁটে জিভে সাদা-হলুদ। তারপরই বাটারের প্যাকেট। সেলোফেন্ পেপারের মোড়ক মানেই কোথাও একটা উৎস থাকেই। যেখান দিয়ে খুলবে। না-পেয়ে অসহায় চোখে আমার দিকে তাকালো।

— 'ওটা পরে। আমার একটা কাজ ক'রে দিবি?'

ছেলেটা ঠিক নাদুস না-হ'লেও ফর্সা গোলগোল পায়ের গোছ থাই নধর নধর। বুকের পেশি এখনও পোক্ত হয়নি। সামান্য ভারি। এ-ই বারো, বা তেরো, বা মাঝামাঝি কোথাও।

অভিজ্ঞও। ওর মা আরো কয়েকটা বাড়িতেও কাজ করে। সব বাড়িতেই অন্তত একজন অসুস্থ মানুষ, যারা শিক্ষকও, থাকতেই পারে। কেউ কেউ আবার আমার মতো তেচাইল্যা। যার তিনটে চালা হয়ে গেছে, একটাই বাকি চৌচালা হ'তে। মানে, পঞ্চাশ ছুঁই বা ছুঁই না। এমনই কেউ-না-কেউ এইসব ছেলেদের অভিজ্ঞ ক'রে তোলে।

ছেলেটা মেঝে থেকে উঠে এসে আমার শয্যার গা-ঘেঁষেই দাঁড়লো। আমি তো শুয়েই থাকি। পাজামার দড়িও ঢিলেই থাকে। সে তার কচি আঙুল দিয়ে অভিজ্ঞ বিলিবণ্টন করে আমার নাভিমূলে। তারপর, টিভির বিজ্ঞাপনের মতো ঢিলে পাজামার অভ্যন্তরে....যেমন যেমন তাকে শেখানো হয়েছে আর কী....সে ঢুকে যেতে থাকে কামুক অদৃশ্য ক্যামেরার অমোঘ নিয়ন্ত্রণে।

— 'না!' আমি বললাম।

অবাক না-হয়েই হাতটা সরিয়ে পকেট থেকে বাটারের প্যাকেটটা খুলে নিলো ছেলেটা।

— 'এখন না, পরে। আগে আমার কাজটা....' আবার দেখে তার আঙুল এগিয়ে আসছে আমার পেটের রোম ছুঁয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে। আমি বললাম— 'আঃ হা! না! ও-সব না। নে, ধর্!'

তখন, সে খামটা নিলো হাত বাড়িয়ে। এ-পিঠ ও-পিঠ উল্টেপাল্টে দেখলো।

— 'ইডা কী?' বাটারের প্যাকেটটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বললো।

— 'সে তোকে বুঝতে হবে না। ওটা জগন্নাথবাড়ি রোডে....আরে! ওটা পকেটে ঢোকাচ্ছে দ্যাখো! বাটারের প্যাকেটের সঙ্গে লেপ্টে ..না, না ওটা হাতে....হ্যাঁ, এই যে, আলাদা আল্‌তো ক'রে ধ'রে রাখ্।' হ্যাঁ, বলছিলাম, তুই খবরের কাগজের অফিস চিনিস? চিনিস না! আচ্ছা আমি চিনিয়ে দিচ্ছি, শোন্ ওই যে ডানে মুড়লি বাঁয়ে এগিয়ে গিয়ে নাক-বরাবর...' জাদুকরের মুদ্রায় ফিরে গিয়ে বলছি আমি— 'হ্যাঁ, ঐ লাল দালানটায় ঢুকে...'

চ'লে গেল ছেলেটা।

এখন হয়েছে এই, যে কোনো ভুল করলাম কি? ছেলেমানুষ, ও কি কাজটা ঠিকভাবে করতে পারবে?......ঠিক এইভাবে আজকাল আমি ভাবিই না। ও-সব মানুষের বাই। মতিভ্রম।

এ হোলো দিব্যশয্যা।

আমার এ-শয্যায় শুলে কোনো ভ্রম হয় না।

তিন

— 'বিধাতৃ, এক কাপ চা হবে?

— 'হবে। একটু অপেক্ষা করো। আমি চেঞ্জ ক'রে কিচেনে ঢুকছি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর টুং টাং চায়ের কাপ চামচ বেজে গেল। নীরবতা ভেঙে। এবারে বিধাতৃ আসছে। ওর পরণে নির্ঘাৎ নতুন ছাপা-শাড়ি। আমি গন্ধ ও শব্দ, খস্‌খস্ ইত্যাদি শুনতে পাচ্ছি।

এবং চোখ বুজতেই চেয়ার টানার শব্দ। সেন্টার টেবিলে ট্রে রাখার।

— 'খাসা! আ-হ্!'

— 'আজ আনলাম। ভালো না?'

— 'দা-রু-ণ। কোন্ দোকান?'

— 'স্নেভারা। কামান চৌমুহনীর মোড়ে। ও হ্যাঁ, কাল গো টা চারেক কাপ আনতে হবে। আনব্রেক্‌বল্।

আমি চোখ বুজে রয়েছি। ত্রিদিব ও-ঘরে চা খাচ্ছে। ও চা খেলে শব্দ হয়। বিধাতৃর হয় না। স্বৈরিণীরা শব্দহীন চলাচল করে ব'লে শুনেছি। কিন্তু তাদের জীবনভরা শব্দ। এ-সব আমার শব্দহীন ধারণা।

— 'পাপ্পু কই, দেখছি না!'

— 'টিচার না। আজ ইংলিশ।'

— 'সাইকেল নিলো?'

— 'এখন নেয়। আজ নেয়নি। দু'বাড়ি পরেই তো।'

খুব ভোরে ত্রিদিব পাপ্পুকে সাইকেল শেখাতে আসতো। রিক্সাভাড়া ভীষণ বেড়েছে। ত্রিদিব ভাড়া বাঁচায়। আমার সংসারের কত কিছু যে বাঁচায় ত্রিদিব।

আমার সহকর্মী ছিল। ঘুরিয়ে, পরিস্থিতি মাফিক বললে, আমি ওর সহকর্মী ছিলাম।

এখন পাশের ঘরেই ত্রিদিব আর বিধাতৃ টুকিটাকি কথা বলছে। শয্যায় শুয়ে শুয়ে আমি শুনতে পাচ্ছি। এই একটু আগেই ওরা দু'জন অফিস থেকে ফিরেছে। আলাদা আলাদা। বিধাতৃ টেলিফোন্ ভবন। ত্রিদিব এ.জি.। দু'জনেই কেন্দ্রীয় সরকারি। ন'টা-ছ'টা।

আমার আর বিধাতৃর একমাত্র সন্তান পাপ্পু। স্কুল থেকে সে টিচারের বাড়ি চ'লে যায়। ওর পড়ার খুবই চাপ। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়। আমার ইচ্ছে, ও ওর মতন বেড়ে উঠুক। বিধাতৃর অবশ্য অন্য ইচ্ছে। পাপ্পুকে ডাক্তারি বা কম্পিউটার করতেই হবে।

— 'ওর মেঢা কিন্টু আর্টসের দিকে।' ত্রিদিবের মুখে বোধ হয় বিস্কুট-টিস্কুট।

— 'কী জানি! সে তুমি বোঝো।' শেষ চুমুকের পর কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলে বিধাতৃ।

আমি জানি, কাল আমার ই.সি.জি. হবে। আর হ'লেই বিজ্ঞাপনটা বেরুবে কাগজে। তার আগে কিছু একটা ঘ'টে না-গেলেই হয়। সিটিস্ক্যান আগেও একবার হয়েছে। ত্রিদিবই করিয়েছে। আবারও হয়তো হবে। এবারও ত্রিদিবই করাবে। তখন তো ত্রিদিব বেশ আঁটোসাঁটো। আমার মেডিকেল এইডের টাকা নিয়ে প্রথম দিন এসেছিল। সহকর্মিরা তো আসবেই। ও ছাড়া অন্যরাও আসে। এখন কম। এখন শুধু ত্রিদিব। আমি তো দেড়বছর ধ'রে উইদাউট-পে।

প্রভিডেন্ট-ফান্ড এ্যাডভান্স ফর্ম সই করাতে যেদিন ঢুকলো, সেই অব্দি আমার সন্দেহ যথেষ্ট গাঢ় হয়েছে। বিধাতৃ পারবে না। পারবে না, তার কারণ টিভিতে সে-সব দিনে লোহিত কিনারে চলছিল।

বিধাতৃ বলতো— থাক আলো। চলুক টিভি। লোহিত কিনারে-টিনারে আমি দেখি না। এক রাউন্ড হয়ে যাক এই ফাঁকে। এসো। দুপুর থেকেই আজ....এ্যাই, জানো, শিবানী আজ কী করলো....উহ্ দুপুরে বরফে কোন্ ক'রে বাড়ি নিয়ে চ'লে গেল..আহ্..কই! এসো?

বিধাতৃ পারবে! কিছুতেই না। ও তো কামুকী। ঘি আর আগুন ইকুয়াল টু বিধাতৃ-ত্রিদিব।

. বৃহস্পতিবার এলেই, তারপর থেকে আমি সাপ্তাহিক হিসেবেও গোলমাল শুরু করি। আজও সেই একই গোলমাল চলছে।

কারণ বিধাতৃ বৃহস্পতিবার নিয়ম ক'রে পাঁচালি আরতি আর...একটাই গান তার সাপ্তাহিক— 'গুরুদেব দয়া করো দীনজনে/ভবসাগর তারণ কারণ হে'।

বিধাতৃ কেন পারবে! কাজেকাজেই আমি ভীষণ সন্দেহে গল্‌গল ক'রে গলছি তখন ফর্ম হাতে ত্রিদিবকে দেখে।

— 'ত্রিদিব! এই সময়েই কেউ সাদা শার্ট প'রে আসে! লাল শার্ট নেই? তোমার? ত্রিদিব? ছিঃ!' একটানা ব'লে আমি হাঁফাচ্ছিলাম।

গানও থেমে গিয়েছিল ঠাকুরঘরে। বিধাতৃর সব খেয়াল থাকে। মা আমার বড় লক্ষ্মীমন্ত। খাবার পর হাতের কাছে পান রেডি পেয়ে আমার বাবা ভীষণ তৃপ্তি পেতেন। বিধাতৃর ঘোমটা টানা আবছা মুখটা নিচু ক'রে প্রশংসা নেবার ভঙ্গিটা অবিকল গৃহদাহের অচলা।

অচলাই যেন সে। ঘৃণা আর ক্রোধ মিশিয়ে চাপা স্বরে দুই ঘরের মাঝখানের দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়েছিল।— 'ছিঃ! অমর।'

তার ঘোমটা খ'সে সে তখন সাক্ষাৎ রিক্তা। তখন উল্টোরথে সুচিত্রা সেনের ছবির মতো। সৃষ্টি-স্থিতি কাঁপিয়ে দেওয়া সেই ছবিটা, যেটায় ছেলের হাতে মায়ের মৃত্যু ঘটে... আমি ভুলে যাই নাম-টাম।

সবটাই বলা হয়ে যায় এমন সুনির্দিষ্ট চাহনি বোধ হয় পুরুষের অন্তর্গত নয়। ত্রিদিব প্রায় কিছুই ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। শুধু বলেছিল— 'টাকা তো লাগবে। এটায় সই ক'রে দাও।'

আমি তাও বলতে পারিনি। অথচ বলতে চেয়েছিলাম, মেয়েটার দিকে লক্ষ্য রেখো তোমরা। আমার আর কিছু বলার নেই। মনে মনে তো আমি তোমাদের দু'জনেরই গলা টিপেই চলেছি। জোড়া খুন। কিন্তু হচ্ছে না। হয়ে উঠছে না। তোমরা কথা বলতে বলতে... মানে, সাংসারিক কথা, রাজনৈতিক, ডাঙ্কেল, কমিশন, উন্মুক্ত অর্থনীতি— এ-সব যা হোক কিছু নিয়ে কথা বলতে বলতেই.... একটা রিদ্‌ম্‌ও তো লাগে, না কি! ও-ঘরে তোমরা হঠাৎ নিঃশব্দ হ'লে, কিছুক্ষণের জন্য না, দোহাই তোমাদের। আমার লাগে। ভীষণ। আমি তো অসুস্থ। আমি রোগগ্রস্ত। যদিও সময় হয়নি এখনো। সময় না-হলে কেউই যে মরতে চায় না। এ-সত্যটা জানো না তোমরা? জানো না! মেয়েটার পায়ের শব্দ শুনতে পাবে না ওই সময়। জানো তো আজকালকার বাচ্চারা....তোমরা পিয়ানো দ্যাখোনি? যে ছবিটা অস্কার না কী যেন পেলো? কমপক্ষে এই বোধটুকু....

— 'তোমাকে যে কথাটা বলেছিলাম, ভেবেছো?' চিন্তাগ্রস্ত শোনালো বিধাতৃর স্বর।

— 'দাঁড়াও না। আর ক'টা দিন যাক।' ত্রিদিব সামান্য বিরক্তিও চেপে রাখতে পারে না।

আবার চুপচাপ। পাখার শন্ শন্ শব্দ। ওই ঘরের পাখাটা আমি আর্মি ক্যান্টিন থেকে এনেছিলাম। সঙ্গে এক বোতল রাম। রাতে পেটে দু'পেগ পড়েছে কি পড়েনি— এসো এসো। আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না। বিধাতৃ চিবিয়ে ছিবড়ে ক'রেও পুঁইডাঁটা চিবোতে ভালোবাসে। তলপেটের ব্যথাটা খোল্‌সা করতাম না তবুও। ইতর গাধা, মাকাল— তোমার চেয়ে একটা ঘাটের মড়াও...খাটের একপাশে অর্ধবজ্রাসনে বসা ওই ভঙ্গি আমি কতবার যে পিঠের দিক থেকে দেখেছি।

ভীষণ ব্যথাটা ঠিক তার তিনমাসের মাথায় অর্জন করেছিলাম আমি।

— 'ব্যাপারটা স্কুলের।' সরু হয়ে এসেছে বিধাতৃ। একটু পরেই আর কিছুই শোনা যাবে না কিছুক্ষণ।

— হয়ে এসেছে। নেক্সট্ সেশান। আগামী মাসে নিয়ে গিয়ে'.....

আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। ও-ঘরের চলন্ত সিলিং-ফ্যানের শব্দ সহসা বেড়ে গেল।

এখন আর তেমন কিছু হয় না। শরীরী স্থাপত্যে ভিত্ পর্যন্ত নাড়িয়ে দেওয়া আনন্দ না-কি কোনোদিন হয়নি বিধাতৃর। নয় নয় ক'রেও আমাদের বিছানার বয়স বছর দশেক। সপ্তাহে গড়পড়তা তিন। বিধাতৃর মতে খ'চে যাবার জন্যে যথেষ্ট। তবুও হিসেবটা তো এমন—ফিফ্‌টি টু ইন্‌টু থ্রি ইন্‌টু দশ। এ-ক-বা-র-ও না। বিধাতৃ আসলে কাজল দিঘি।

অথচ টেমির দু'বার, তিনবারও। টিন্ এজ্ পেরুতে পেরুতে একদিন কেন যে ভরদুপুরে অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। খুব খুশি হয়েই টেমি আমাকে খাবার বেড়ে দিয়েছে। বারবার জিজ্ঞেস করেছে— 'মৌশা আরেট্টু ইঁচা-গুঁড়ার তরকারি লন? এক হাতা ভাত?' এভাবে বহুকাল আগে একজন বলতো।

মুখটুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখেছি পান-জর্দা সব রেডি। বিছানাও। টানটান। এমন-কি, সাদা চাদরও।

— 'ওটা আবার কেন করেছিস! আমি এক্ষুণি ফিরবো। অফিস না।'

— 'এট্টু জিরাইয়া লন না মৌশা! ভাত তরকারিগুলি এট্টু তল পড়লে পর যাইবেন নে।'

আমার চুলের গোড়ায় গোড়ায় ভীষণ ব্যথা হ'তেই পারে। আমিও চুপচাপ মধ্যাহ্নকে বলতেই পারি— 'দে তো, আমার চুলে হাত চালিয়ে দে দেখি!'

প্রচন্ড বৃষ্টিপাত আমি রুখে দিতে পারিনি।

চুল থেকে কখন আমার পাশে এবং মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখেছি— ইজের ফ্রক্ ইত্যাদির সঙ্গে আমার লুঙ্গি। গড়াগড়িও। গলাগলিও।

টেমির প্রশ্বাসের হাল্‌কা বাষ্প আমার নাকের ডগায়, ভ্রূ-পল্লবে ধাক্কা খেলো। ফিরে গেল না। — 'আমার মা-বাপ নাই। যদি কিচ্ছু হয়!'

আমি আধবোজা। কাক্কেশ্বর কুচ্‌কুচে। ঢিপ্ ক'রে একটা প্রণাম করেছিল টেমি। আমি গ্রহণ করেছি।

তারপর দুপুর গড়িয়ে গিয়ে টেমিকে আবার জায়গা ছেড়ে দিযেছিলাম, নিরাপদ দূরত্বে। আমি আবিষ্কার করেছিলাম, বিধাতৃ একটা জ্বলন্ত আর উন্মুক্ত মোম হাতে আমার অভ্যন্তরে তখনো ঘুরপাক খাচ্ছে।

চেষ্টা করেছি। বহুবার ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করেছি আমার এই নবতম অর্জন। একবার মনে হয়েছে পেরেছি। একবার বুঝতে পেরেছি পারিনি।

কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই হঠাৎ টেমিকে খাব্‌লে বুকের ওপর চেপে ধ'রে, ঝিম্‌ঝিম্ ঝিম্‌ঝিম্। কেঁদেছিলাম, আমি। কেন কে জানে। নিঃশব্দে কেঁপে উঠে তাব গড়ন্ত স্তনের ওপর আমার মাথাটা প্রাণপণে চেপে ধরেছিল সে। পাগলের মতো থুতনি দিয়ে আমার চুল এলোমেলো করেছিল। আর, কেঁদেছিল। কেন কে জানে!

আমার মনের ভিতর একটা ছবি, ভেসে বেড়িয়েছিল। অনেক অনেক দিন আগেকার। ভয়ের প্রভাবে প্রচন্ড জ্বরে আক্রান্ত এক কিশোরের ছবি। একজন মাঝবয়েসী মহিলা শান্ত হাতে কিশোরের তপ্ত কপালে জলপট্টি বদলে দিচ্ছিলেন। এই সব ছবি, পুরোনো ছবি...কেন কে জানে!

টেমির সঙ্গে সে-ই শেষ।

রোগশয্যার প্রথম মাসে, ত্রিদিব তখন দু'বেলাই...সে-সময় টেমি এক সকালে আমার এই ঘরে এসেছিল।

— 'মৌশা!' অসম্ভব শরীরহীন স্বরে ডেকেছিল।

চোখ জ্বালা করছিল আমার। লালও বোধহয়। তখন এমনই সিম্‌টম্। তবু চোখ মেলেছিলাম।

— 'আমি যাই, মৌশা।'

আমি তো নদীর মতো। গোমতী নদীর মতো। সুভাষ সেতু হয়ে যাবার পর যে নদীতে আর বান ডাকে না। শুধু ভাটা। তাকিয়েই ছিলাম।

— 'মাইন্‌ষে শুইয়া থাকলে পাওয়ে ধইরা ভক্তি করন নাই।' মাটিতে হাত ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল— 'আমার ভক্তি লইয়েন, মৌশা।'

পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল টেমি।

আমার মনের ভিতর চারজন মাত্র শববাহক। আমি ছোটমামা জগাদা আর চিন্ময়। চিন্ময় আমি হরিপদকাকু আর মনিজেঠু। আবির জামাইবাবু সন্তোষ আর আমি। ঝুলন্ত দুলন্ত খাটে সাদা কাপড়ে মোড়া, সাদা মশারিতে ঢাকা, এক নারীদেহে কী প্রগাঢ় বৈভব! বৈভব আর সহন! সহন আর রহস্য!

আগুনের পাটকাঠি হাতে আমি বুঝি শূন্য শয্যায় আরও একবারও নিরুচ্চারে বলেছিলাম— 'জলেস্মিন সন্নিধিং কুরু...

চার

চতুর্থ পৃষ্ঠায় ডাবল কলামে বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে। সেল্! সেল্! ভীষণ রকম ভাবেই এবং প্রকৃত অর্থেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে। রিপিট্, মুহূর্তের কোটি ভাগের এক ভাগ— এই এককে হিসেব করলে যতটুকু, ততটুকুও পরস্য নয় এমন ব্যক্তিগত সম্পত্তি। যোগাযোগ...

— 'বিজ্ঞাপনটা তুমি দিয়েছো?' ছোট্ট একটা গ্লাশে ক'রে আমার সকালের ওষুধ এগিয়ে দিতে দিতে বিধাতৃ বললো।

আমি বললাম— 'হ্যাঁ।... আরে! এখানে একটা পুরোনো উল্টোরথ ছিল, বহু পুরোনো, তুমি নিয়েছো?'

— 'না। কী বিক্রি?'

— 'পা-র্-সো-ন্যা-ল্ বিলঙগিংস্। বইটা...এখানেই তো ছিল।' আমি যথাসম্ভব ঘাড় উঁচু ক'রে এদিক-ওদিক দেখলাম।

— 'হয়তো খাটের ও-পাশ দিয়ে তলায়...বাট হোয়াট্ শর্ট অব পার্সোন্যাল্ বিলঙগিংস?'

— 'হ্যাঁ, তলায়ই পড়েছে তাহলে। একবার দেখবে, তলাটা?'

— 'দেখবো। পরে। কী কী?' সামান্য ঝুঁকে পড়েছে এবার বিধাতৃ।

— 'কী নয়! আজ তো আমার দিন। এখন আমি ঠিক বুঝতে পারছি আজ আমার দিন।

— 'যা যা তোমার, এই তো?'

— 'হ্যাঁ। যা যা আমার।' আমি দাঁত চিবিয়ে বললাম।

— 'কী কী তোমার?' সামান্য হাসে এবার বিধাতৃ। আর তার হাসির শব্দ আমার কান-বরাবর এক থাপ্পড় মারে সহসা। আমি গন্ধও পাই। হাসির গন্ধ। ফিল্টার উইল্‌স্। ত্রিদিবের ব্রান্ড।

— 'সব। স-অ-অ-ব!' তারপর ভিতরে ভিতরে যেন বললাম— তু ভি ক্যা ইয়াদ করেগা, প্রেম নাম হ্যায় মেরা— প্রেম চোপরা।

— 'স-ব! মানে, ফ্রিজ-টিভি। মোটর-বাইক। টেপ্-রেডিও। চেয়ার টেবিল আল্না বিছানা বালিশ তোষক— এই বাড়িটা....'

— 'আর মেয়েটা।' বাইরে বলি। ভিতরে অন্য সংলাপ। আব আয়েগা মজ্জা খেল্ কা! আমার জিভ থেকে বোধ হয় রস গড়ালো খানিকটা।

— 'ফর আ চেঞ্জ, তাও! আর?' কৌতুক ঝিল্‌ঝিল্ করলো তার দু'চোখের তারায়। কয়েকবার।

এবার একটু ধন্দে প'ড়ে গেলাম। কী বলতে চাইছে বিধাতৃ। কোন্‌দিক থেকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে আমাকে। এই অব্দি যতটা কথা হয়েছে— বিধাতৃর তো ছিট্‌কে সোজা হয়ে দাঁড়াবার কথা। ওর কি মারাত্মক কোনো প্ল্যান আছে? ফার্‌দার্ ফেটাল্!

কিছুটা বিব্রত চিন্তার স্রোতে ঢুকে পড়তে পড়তেও সামলে নিলাম।

—'আইনসম্মতভাবে যা কিছু আমার, সেই সবই আমার!' একটু গোঁয়ারের ভাষায় বললাম।

— 'তাহলে তো আমিও।' আরো কৌতুক। তার দু'চোখে তো বটেই। এমনকি, তার ঝুঁকে দাঁড়ানোর ফলে অন্তর্বন্ধনিহীন অদৃশ্য কিন্তু আভাসদায়িনী স্তনের দুলুনিতে কৌতুক। ঘাড়ের বাঁ-পাশ একটা লাল্‌চে জড়ুল.....একবার সিপাইজ্বলার স্তব্ধ অভয়ারণ্যে আমার কাঁধে মাথা রেখে হাঁটার সময় একটা কুচুটে বিটকেল পাখি হল্‌দে বটফল ফেলেছিল টিপ্ ক'রে ঐ জড়ুলের ওপর.... ওটায়ও কৌতুক। বাড়িয়ে ধরা ওষুধের গ্লাশেও। বললো—'ধরো, ওষুধটা খেয়ে নাও।' সেই বলার শিল্পেও কৌতুক।

— 'বিষ-টিষ না তো!' আমিও কৌতুক করি। 'আজ আমার দিন। আমি জানি, আজ আমারই দিন।'

— 'না।' সহজ স্বর। তবে ক্লান্ত। অথবা নিপুণ অভিনয়। — 'কী, আমি নই!'

আমি শুনতে না-চাইলে কী হবে! শুনতে পেলাম ঠিক। কী একটা যেন আছে বিধাতৃর বলার মধ্যে, দানার। সে কী। কষ্ট? না-কি বেদনা!

বেদনা শব্দটাকে আমার শরীরের কোথাও ধ'রে রাখতে পারি না কিছুতেই। বামা-শ্যামা যাবই হোক। আমি বেকায়দায়।

সহসাই, সমস্ত জীবনভর যে চ'লে এসেছি এই অব্দি, সবটাই বেকায়দায় মনে হোলো। ধৈর্য ধ'রে ব্যূহটা পরিকল্পনা করেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, আমি যা ভীষণভাবেই অপছন্দ করি, সেই নাতিনাদুস ছেলেটার, যার তেরো প্লাস সুডৌল উরু অভিজ্ঞতায় টস্‌টসে ঈষৎ রক্তবর্ণ ঠোঁট চন্‌মনে আঙুল, সেই ছেলেটা আমার ঢিলে-ক'রে বাঁধা পাজামার ভিতরে ভস্ ক'রে ঢুকিয়ে দিয়েছে হাত।

— 'দাও না সব বিক্রি ক'রে। স-ব। স-অ-অ-ব!'

অপরিচিত বিধাতৃর গলার স্বর। এই স্বর বুঝি অনেকদিন আগে ভীষণভাবে চিনতাম। এখন মনে হচ্ছে, এ তো টেমির গলার স্বর! ঝুঁকে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলছে— 'মাইনষে শুইয়া থাকলে পাওয়ে ধইরা ভক্তি করন নাই..'।

সব ওলটপালট হয়ে যেতে লাগলো। ষড়যন্ত্রটা ব্যূহটা উন্মোচিত হয়ে পড়ছে দ্রুত। প্রতিরোধ খুঁজছি আমি।

— 'দিয়ে দাও না সব। আমরা একটু বাঁচি। এই এতটুকু! আমি, পাপ্পু, ত্রিদিব, তুমি.... আমরা কি বাঁচতে চাইতে পারি না! তুমি?'

গলছে। স-অ-ব। আমি টের পাচ্ছিলাম বিধাতৃর ভাষায় আকুতি ও নিষ্ঠা। প্রতিস্পর্ধী তৃপ্তিকামনা ও অহঙ্কার। এ-সবই ধ্বংসগন্ধী। যে-কোনো সৃষ্টি, মানুষের উৎপাদন বৈভব— সব ধ্বংস করতে পারে। সব শব্দ। শব্দ-শৃঙ্খল।

আমিও এলোমেলো। উন্মোচিত। পরাভূত। ভিতরে জিঘাংসার নদ। এখন মৃত আত্মার পুণ্যস্রোতে পরিণত হ'লে আমি মূক হয়ে রইলাম।

পাঁচ

অনেকদিন বাদে, আজ, এ-ঘরে চায়ের আসর। সেন্টার টেবিলটা চা-গাছের মূল। ভীষণ মূল্যবান। ইতিহাসে এবং সংগ্রহে। এক ক্ষয়িষ্ণু রাজপুরুষ যখন ভাগ্যান্বেষণে ত্রিপুরা ছাড়ছেন, তখন জলের দামে আমিই ওটা কিনেছিলাম বা সংগ্রহ— এ তথ্য আমি ভুলে যেতে চাইছি।

আমার বিছানার পাশে সেই টেবিল। দু'পাশে দুটো চেয়ার। একটায় ত্রিদিব বসেছে। এইমাত্র বহুদিন পর আজ আমি আধা-শোয়া। ত্রিদিব খুব যত্ন ক'রে আমার মাথার দিক, বিধাতৃ পা....ওরাই আমাকে খানিকটা তুলে ধরেছে।

এমন-কি, আজ পাপ্পুর টিচার নেই। ওই তো দূরে মেঝেতে ব'সে...ওকি ছবি আঁকছে? হয়তো। আমি ছবি আঁকার কিছু সরঞ্জাম দেখতে পাচ্ছি।

বললাম— 'কী করছিস তুই, মা।'

বললো— 'দ্যাখাবো। আগে... না, তুমি উঁকি দেবে না একদম!' ব'লেই আরো আড়াল ক'রে বসলো পাপ্পু।

— 'ভালো লাগছে, না অমর!' ত্রিদিব বললো। 'একটু উঠে বসলে আরো ভালো লাগবে। কতদিন উঠে বসোনি তুমি।'

— 'দারুণ!' আমি বলি। 'বিধাতৃ কই?'

— 'চা আনছে। না না, তুমি বেশি নোড়ো না। আরও ক'টা দিন যাক। তারপর। অতিথি, খাবার পর উঠে থালা ধুতে গেলে গৃহস্বামী যেমনভাবে ব'লে ত্রিদিব তেমন ক'রে বললো।

বিধাতৃ চা নিয়ে ঢুকতে চাইছে। পর্দার জন্যে পারছে না। তার দু'হাতেই চা। পর্দাটাও ভারি। ...মনে করতে চাইনি। তবু মনে প'ড়ে গেল, খুব কম দামে পর্দার জন্য দুই থান মিলিটারি ক্যান্টিন থেকে কিনেছিলাম।

— 'পর্দাটা একটু সরাও না!' বিধাতৃ ও-পাশ থেকে বললো।

ত্রিদিব তখন উঠে গিয়ে পর্দাটা সরিয়ে ধরলো। ঢুকতে ঢুকতে বিধাতৃ মুচ্‌কি হাসলো। যেমন হাসতো।

আমি আবার বললাম— 'দারুণ!'

— 'কী?' হাল্‌কা মজলিশী প্রশ্নে বিধাতৃ তাকায়।

— 'চা। তুমি তো বাইক চড়তে জানো, না ত্রিদিব?'

— 'হ্যাঁ।' ত্রিদিব বলে।

— 'তুমি আমারটা... মানে, বলছি, প'ড়েই তো রয়েছে... ওটা চড়তে পারো! কখন আবার জং-টং ধ'রে যায়...।

— 'তা ঠিক।' চায়ে চুমুক দ্যায় ত্রিদিব।

— 'তা-ছাড়া এ-ঘরে টেপ্ রেকর্ডার বা টিভির কী দরকার? ও-ঘরে সব নিয়ে নিও। নাও না কেন। নিয়ে নিও।' আমি ভেঙে ভেঙে বলি।

— 'থা-আ-ক্-না।' কাপ রাখতে রাখতে বলে ত্রিদিব।

— 'কিন্তু এটা... এটা তোমার ভী-ষ-ণ অন্যায় ত্রিদিব!'

ত্রিদিব হাসি-লজ্জা-নম্র চোখে তাকালো আমার দিকে। চোখ সরিয়ে নিলো। আবার তাকালো। এবার বিস্ময়, সামান্য। হাল্‌কা ক'রে প্রশ্নও মেশানো।

— 'না, এ-এ ঘোরতর অন্যায়! তুমি এখানে থাকো-না কেন? এ কি ঠিক কথা! না না, তুমি আজ থেকেই...' আচ্ছা, কী অসুবিধা তোমার এখানে?'

— 'না, অ-সুবিধা আর কী...' শিথিল স্বর থামিয়ে দ্যায় ত্রিদিব!

— 'তাহলে!' আমি বলি।

— 'থাকবো।'

তারপরও আরো বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব হোলো। এখন আমি নতুন ভাষায় অনেক রপ্ত। বিশ্বাস করতে চাই সমস্ত অনন্ত রহস্য। অনিত্য সংসার। কেউই কারো না। কিছুই কারো না। সমস্তই তোমার। তোমার আবার কিছুই না। শব্দটা হোলো— সবাই। আমি না। ওটা ভুল শব্দ।

ফলে হাসলাম। অনেক অনেকদিন পর। একা না। সবাই মিলে। কারণ কথাটা হাস্যকর ছিল বোধ হয়।

কেননা আমি বলেছি— 'আর হ্যাঁ, শোনো ত্রিদিব, লাল শার্ট তোমাকে আর পরতে হবে না। আই উইথড্র!'

— 'তাহলে? কে পরবে লাল।' ত্রিদিব অবাক।

— 'কেন! আমি পরবো!'

তো এই হোলো হাসির কথা। ত্রিবেণী হয়ে গেল হাসির। সঙ্গম। আমি বিধাতৃ ত্রিদিব। কেবল পাপ্পু না।

পাপ্পু ভীষণ ঝুঁকে ব'সে গভীর কোনো ছবিতে মগ্ন। আমি সারাক্ষণই একটা চোখে ওকে ছুঁয়ে থেকে থেকে ভাবছিলাম— অনিত্য হে। অনিত্য হে। হে অনিত্য।

ছয়

রাত।

ও-পাশে আলো নিভেছে। অনেকক্ষণ। মাঝে একবার মিনিট পনেরোর মতো জ্ব'লে নিভেছে।

এখন অন্ধকার।

এ-ঘরে সারারাত আলো জ্বলে। জ্বলছে।

আমার বালিশের পাশে আজ পুরোনো উল্টোরথ নেই। অন্য কী একটা বই। একটু পরে বইটা আমি পড়ত শুরু করবো।

তার আগে একটা হিসেব আছে। মানুষের অঙ্ক ও ভাষায় মিলিয়ে নেওয়া একান্তই দরকারি। তখনই শুরু করেছিলাম, হিসেবটা, এভাবে—

অনিত্য হে, কোন্ সালে চেয়ার ভেসে যাচ্ছিল বানে?

মনে নেই।

আগরতলায় প্রথম স্কুটার কবে এলো?

মনে নেই।

দু'চারটে কথা—লোহিত কিনারে, বা সিটিস্ক্যান, বা যা-হোক কিছু সম্পর্কে সংক্ষেপে বলো।

মনে নেই।

— 'তাহলে বাকি কী রইলো ত্রিদিব?' লোড্‌শেডিং হওয়ার আগেই আমি বলেছিলাম।

— 'ও বাপি, হচ্ছে না। ধু-র্‌। এটা একটা বাজে.....'

পাপ্পু তুলি-টুলি ছুড়ে ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে। এবং ছুটে আমার কাছে। তখন ভীষণ অসহায় দেখিয়েছিল ওইটুকুন ওই মেয়েটাকে। মেঝের দিকে চোখ ফেলে দেখেছি— রঙ একটাই। কালো। কৌটো উল্টে গড়াচ্ছে এখানে ওখানে।

— 'কী হচ্ছে না?' আমি বলেছিলাম।

— 'ছবিটা। হবে না ওটা বাবা। থাক্‌। ফেলে দিয়েছি।' ব'লে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল এবং আমার নাকের ডগায় নাক রেখে— 'আজ আমি তোমার সঙ্গে শোবো। ক-ত-দি-ন শুই না, তোমার গলা জড়িয়ে!'

সাত

হিসেব মিলছে।

হিসেব বলছে, আমি অনেক কিছুই জানি। এত গভীর আমি। আমি ইচ্ছে করলে একটা আগ্নেয়গিরির মুখে ব'সে যুগ যুগ তপস্যা করতে পারি। আমি এতই বিশুদ্ধ।

—হিসেব বলছে।

বলছে— তুমি হুবহু মুকেশের মতোই গাইতে পারো— 'দুনিয়া বানানেবালে/ক্যা তেরে মনমে সমায়ি/কাঁহে কো দুনিয়া বানায়ি।' তুমি, এত মগ্ন এখন।

তুমি এখন বাতাসের সঙ্গে যে-কোনো শর্তে পাল্লা দিতে পারো। এতই গতিবান এখন, তুমি।

হিসেব বলছে— হা অনিত্য।

শুধু তুমি জানতে পারবে না— পুরুষ বা পিতা বা ঔরসের অধিকারী যে, সে কেন পুঁতে রাখে একটা করবীচারা; তার নিজস্ব আঙিনায়?

চমৎকার বিষ হয় ব'লে!

মৌ

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

কদিন ধরে একটা বুড়ো হনুমান বড় জ্বালাতন শুরু করে দিয়েছে। সেদিন দুপুরে বাগানে গিয়েছিলেন চারুনাথ বছরখানেকের দোফলা স্বর্ণময়ীর তদারক করতে। ফিরেছিলেন দুপুর গড়াবার আগেই। ঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন হনুমানটা ঠ্যাং ফাঁক করে তক্তপোশের ওপর বসে আছে। যাকে বলে চোখের দেখা দেখতে যতক্ষণ। ঘরের কোণে রাখা বন্দুকটার দিকে হাত বাড়াতে না বাড়াতেই বিকট দাঁত-মুখ ভেংচে সে চৌকাঠ পেরিয়ে টানা বারান্দার রেলিং-এ গিয়ে বসেছিল। বন্দুক হাতে বারান্দায় এসে তাকে আর দেখতে পাওয়া যায়নি, কেবল দোহারা সুপুরিগাছটা ঘন ঘন দুলছিল। বারবাড়ির মন্দির থেকে পুরোহিত সদানন্দ তখন এদিকেই আসছিলেন বৈকালিকের খোঁজ-খবর নিতে। তাঁর জিম্মায় পঞ্চানন শিব রয়েছেন। নীচের বারান্দায় সরী পা ছড়িয়ে বসে আচার পাহারা দিচ্ছিল আর হাত দিয়ে কাঁচাপাকা চুলে বিলি কাটছিল। ওপরে তার দিকে চোখ পড়তেই সদানন্দ কেমন যেন থমকে গিয়েছিলেন। সরী ঘাড় তোলবার আগেই বন্দুক নিয়ে ঘরে এসেছিলেন চারু।

বড্ড বাড়িয়েছে। এভাবে আর কতদিন সহ্য করা যায়। বাগানটা যেন ওর খাসমহল সম্পত্তি। সময়ে অসময়ে যখন-তখন এসে হাজির হয়, টের পাওয়া যায় না। এমনকি গাছের ডালে পাতায় কোনো টুঁ শব্দটি নেই। নিঃশব্দে কাজ সেরে চম্পট দেয়, বন্দুক কাজেও লাগে না। পুকুরপাড়ের হিমসাগরগুলো প্রায় শেষ করে এনেছে, এবারে নজরে পড়েছে ওদিককার ক্ষীরে বোমবাই, বড় বৈশাখী, জালিবান্ধা, গোপালেধোবা গোলাপখাস —এসবের দিকে। মাঝে মাঝে মনে হয় বেটা বুঝি মানুষেরও এককাঠি ওপরে।

দক্ষিণের শেষ মাথায় জানালার কাছাকাছি একখানা সাবেক কাঁঠালগাছ আছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার ফলনও কমে এসেছে। মাঝের ক' বছর তো কেবল পাতা খসিয়ে আর গজিয়ে কাটিয়ে দিল, ফলের নামে ও-কম্মো। এবারে অনেকদিন পরে গাছের মতি ফিরেছে। ফল এসেছে বিস্তর। গোনাগুনতি দু-পাঁচখানা নয়, একেবারে ঢেলে দিয়েছে যেন। কন্দর্পকান্তি চেহারা সব, দেখলে চোখ জুড়োয়, মন ভালো হয়। মনে পড়ে যায় কত সব মান্ধাতার আমলের কথাবার্তা, কাউকে ডেকে বলা যায় না সেসব। আর কী বাস! চেহারা বলে আমায় দেখসে, বাস বলে আমায় রাখসে। বেটার এদিকেও চোখ পড়েছে।

আর-একখানা উপরি রয়েছে ঐ গাছটায়। রয়েছে আজ বেশ ক'বছর ধরে। প্রকাণ্ড অন্ধকারের চাঙড়ের মতো একখানা মৌচাক ঝামরে ঝুলে রয়েছে গাছের বুক বরাবর। চোখের সামনে সিকি পরিমাণ থেকে বাড়তে বাড়তে চাকটা এই এতখানি হয়েছে। কচি মেয়ের বাড়ের মতো টের পাওয়া যায়নি। বুড়ি গাছের বুকের গয়না যেন ঐ চাক, এ বয়সেও কম মানানসই নয়। সে দিকেও বোধ হয় চোখ গেছে মশাইয়ের।

এইসব ভাবতে ভাবতে চালতের অম্বলটা আলগোছে ভাতের গর্তে ঢেলে নেন চারুনাথ। সামনের আঙুলে করে জিভে ছোঁয়াতেই মুখটা বেশ চনমনিয়ে ওঠে। সরী একটু তফাতে উঁচু হয়ে হাতপাখা নিয়ে বাতাস করছিল। একটা নীল আমমাছি তার গালের ওপরে চোখ পিটপিট করছে, কোনো সাড়া নেই। গালের আর দোষ কী। সরী সম্পর্কে শালী হলে কী হবে, মেঘে মেঘে পঞ্চান্ন-ছাপান্ন হল বৈকি। গতর আছে মেয়েটার। একেবারে ঐ কাঁঠালের মতো থরোথরো ভাব আর কি। আটাত্তর বছর বয়েস হলে কী হবে, মন এখনো কচি আমপাতাটির মতো। চোখের জোর দাপট এখনো দুধের শিশুকে বলে তফাত যাও। সন্ধের ঝোঁকে কেউ পুকুরের ওপারে বসে ছিপ ফেললে এপার থেকে ফাতনার ঠোক্কর টের পেতে কোনো কষ্ট হয় না।

শেষ পাতে খানিকটা ঘন দুধ আর তার সঙ্গে আমসত্ত্ব। সরী খাওয়াতে জানে। জানে জামাইদাদার বয়েস হলে কী হবে, মুখের আর মনের তার এখনো কমেনি।

— আজ সকালে ওরা আবার এসেছিল। —সরী বলে।

— কারা?

— ঐ ব্রহ্মপাড়ার ছেলেরা।

— কী বলছিল?

— বলছিল গ্রামে একটা কেলাব নেই। তাই আপনার কাছে—

— আমি তখন কোথায় ছিলাম?

— পুব বাগানে।

— ওরা এলে সবসময়ে বলবি আমি নেই।

— ওপর ঘরে থাকলে?

— বলবি জানি না।

উঠে পড়েন চারু। শেষকালে ছোঁড়াগুলো এখানে? চারু জানেন, যে-কোনো ব্যাপারেই হোক, গ্রামে লোকজন প্রথমে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াবে। মেয়ের বিয়ে, ক্লাব, হাসপাতাল, যাত্রা থিয়েটার— বাদ নেই কিছু। কিন্তু কোনো ব্যাপারেই নেই তিনি, হাত-উপুড়টিও হতে চায় না। তবুও বেহায়াগুলোর লজ্জা নেই। তবে হ্যাঁ, কাউকে কোনদিন মুখের ওপর না বলে দিতে পারেন না। সে সময়ে চারুনাথ নিজেও ধানাইপানাই কম করেন না। কার কাছে কে চাইছে বোঝা মুশকিল। একথা সেকথা, সুখের মাথা দুঃখের ছাতা, এইসব করে আসল ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়। ওদিককার মানুষ বুঝতেও পারে না কেমন করে সে ভিন্ন কথার চক্করে পড়ে গেল। শেষকালে গোড়ার সুতো ছিঁড়ে খেই হারিয়ে হাঁ করে বসে থাকে। চারুনাথ পুরোহিতকে ডেকে তার হাতে শিবের চন্নামেত্তর দিতে বলেন। শিবের প্রসাদী পুষ্প কখনো-সখনো কপালে জুটে যায় ওদের। তখন আর মনে থাকে না কী জন্যে এখানে আসা আর কীই বা পাওয়া। চারুনাথ জানেন মিষ্টি কথায় কী করে চিঁড়ে ভেজাতে হয়, কী করে দাও-দাও খাই-খাই অশান্তির ভূত ভাগাতে হয়। সরী দরজার আবডাল থেকে কথাবার্তা শোনে। জামাইদাদার কথার নেশার ঘোরে তার সব কাজ সারা হয় না।

কোনো কোনো দিন শিবমন্দিরের চাতালে কোর্ট-কাছারি বসে যায়। চারুনাথ জানেন এ মৌজার মানুষজন তাঁকে বিচার-সালিশিতে বড় মানে। গাঁয়ে তো সকলে জানে শহরের কোর্ট-কাছারি অনেক দূর। সেখানে যাবার আগে চারুনাথের কোর্টে সকলকে একবার আসতেই হয়। তবে হ্যাঁ, কোর্ট বলে যখন কথা, তখন বিনিপয়সায় কিছু হবার নয়। কোর্ট ফি বলে তো একটা কথা আছে। গাঁয়ের মানুষ জমি চেনে অথচ কোর্ট ফি চেনে

না, এমনটি কখনো হয় না। তার ওপর এমনি এমনি তো আর বুদ্ধি ঘাঁটানো যায় না। বুদ্ধির দাম হল টাকা। তা বলে শহরের মতো গলাকাটা কারবার এখানে নেই। ছ্যাকছ্যোব মোক্তারগুলোর চোরা চাউনি নেই। এখানে যা হবার সোজা-সাপটা। এসো, পয়সা ফেলো, বিচার নাও। এক-একটা মামলার আবার শেকড়-বাকড় অনেক। একদিনে মিটতে চায় না। দলিল দস্তাবেজ সব জমা করে নেন। রাতে বসে লম্ফর আলোয় সব কাগজপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হয়। মামলায় মাটি দিতে কখনো কখনো তিন-চার দিন লেগে যায়। এ সময়টা আর কোনো নতুন মামলা হাতে নেবার উপায় থাকে না। হাজার ধরা-করাতেও টলেন না, সোজা হাঁকিয়ে দেন।

অনেক সময় কেউ এসে ধরে সিভিল স্যুট বা টাইটেল স্যুটের তদারকে শহরে যেতে। কাগজপত্র উকিলকে বোঝাতে হবে তো। রিকশায় বসে, বগলদাবায় বন্দুক, পায়ের কাছে ভ্যাবাচ্যাকা মানুষ, চারুনাথ শহরে চলেন। উকিলবাড়িতে খাতির আছে। হাজার ভিড়ভাট্টাতেও তাঁর কথা বলার সুযোগ সবার আগে। উকিলবাবু সবকিছু খতিয়ে বোঝেন। চারু তাঁকে জলের মতো সরল করে দেন গোটা ব্যাপারটা। ফেরার পথে দক্ষিণার সঙ্গে কাঁচাগোল্লার হাঁড়ি ওঠে রিকশায়। দরকারমত আবার উকিল-বদলও হয় যখন প্রয়োজন বোঝেন তিনি। শহরের জোড়া বোয়াল উকিল নিয়ামত আলী আর প্রভাকর সাহা তাঁর কাঁসিদার। শরীর বেজুত থাকলে পার্টির হাতে একখানা চিরকুট ধরিয়ে দেন। বোয়ালমাছ তার সঙ্গে চারাপোনার মতো ব্যবহার করে, হাঁ দেখা যায় না, কানকোয় রক্ত খেলা করে। কারো বাড়ি যান না, কোথাও এক মিনিট বসেন না। তবুও এখানে এই বত্রিশঘরি বাড়িতে বসে সব জানতে পারেন। কেউ কেউ বলে খেতে বসে নাথের নাম করলে দু'হাতে থালা চেপে ধরতে হয়। কেননা নামের গুণে থালার পাখনা গজাতে পারে। তারপর ঐ খাওয়ার গোড়ায় যখন প্যাঁচ লাগে, মামলা জড়ায়, তখন এঁটো হাতেই কপাল ছুঁয়ে বলে— চম্বুক চম্বুক। দু'হাত তুলে ছোটে চারুর আদালতে। চারু মুচকি হেসে বলেন— সরী, আর কদিন বাঁচব সখী? — সরী আবডাল থেকে বলে— বালাই ষাট। জল না খেয়ে বিষম তুলে বলেন— আশি বল্ আশি। ষাট পেরিয়ে গেছি। আর বছর দুই টিকলেই অনেক।

কুয়োতলায় হাতমুখ ধুতে যাবার সময় আড়চোখে দেখেন খড়কের কৌটোটা কুয়োর পাড়ে নেই। তার বদলে সেখানে আধখানা সাবান রাখা আছে। পায়ের বুড়ো আঙুলের রক্ত সঙ্গে সঙ্গে মাথা ছোঁয়। ধামড়ি বিধবা মেয়েছেলের গন্ধ-সাবান মাখতে ভুল হয় না, যত ভুল ঐ খড়কের ব্যাপারে। ঘাড় ঘুরোতেই দেখতে পান সরী আধখানা জিভ বার করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। এবার থেকে খেতে বসার সময় অস্তরখানা নিয়ে বসতে হবে। ওটা এখন কাছে থাকলে শালীর জিভ ঐখানেই থমকে দেওয়া যেত। বেঁচে গেল এ যাত্রা। মেঘলা মুখে লম্বা-হয়ে-থাকা সরীর ছায়াটা পাশ কাটিয়ে বারান্দার কুলুঙ্গি থেকে থেঁতো-করা পান মুখে দেন।

দোতলায় টানা বারান্দার মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি উঠে যেখানটায় ঠেকেছে, ঠিক তার ডানহাতি ঘরখানায় চারু থাকেন। এপাশে আট আর ওপাশে আট—এই নিয়ে ষোলখানা পেল্লায় পেল্লায় ঘর। নীচেও ঠিক ঐরকম ষোলখানা। টানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কুয়োতলা, রান্নাঘর, ফাঁকা গোয়ালের চালা—সবই দেখা যায়। আরও দেখা যায় ছড়ানো উঠোনের মাঝপাঁচিল পেরিয়ে ওপারের পট-মন্দির, শিবের দালান, আর খানতিনেক ঘর, যার একখানায় বুড়ো-কাঠ পুরুত সদানন্দ থাকেন। বাদবাকি দুখানায় সাপখোপের রাজত্ব। নীচের টানা বারান্দার উত্তরে শেষ মাথার ঘরখানা সরীর দখলে। দোতলার সামনে আর

পেছনের গড়ন হুবহু এক। সামনেকার মতো পেছনেও ঠিক অমনি টানা বারান্দা যা নীচে নেই। নীচতলার পেছন দিকটা একেবারে কানা। ওপরের ঐ পেছন দিকের টানা বারান্দায় দাঁড়ালে মনটা কেমন যেন অগোছালো ঘোরঘোর হয়ে যায়। প্রথমেই চোখে পড়ে বিরাট পুকুর যার জলের রঙ পানপাতার মতো তেলতেলে সবুজ। এ রঙের যেন শেষ নেই, কোথায় গিয়ে যে ছুঁয়েছে। আর রয়েছে ঠাসবুনোট আমগাছের রাজ্যপাট। অনেক পেছনে বাঁশঝাড়ের পাহারা যেখানে একফালি আকাশ দখল করেছে সে অবধি নজর নিয়ে যেতে কোনো অসুবিধে নেই। তারপরেই সব ব্যাপারটা কেমন যেন ঘোরালো হয়ে যায়, এক দঙ্গল কালচে সবুজ এসে চোখের ভেতর অব্দি ভিজিয়ে দিয়ে যায়। তখন ওদিক থেকে চোখ উপড়ে আনা বড় খিটকেল কাজ হয়ে পড়ে। চারু আস্তে আস্তে বারান্দার নিচু থামের মাথায় আর জাফরির খোপে হাত রাখতে রাখতে দক্ষিণের শেষ মাথায় চলে আসেন যার মুখোমুখি বুড়ি কাঁঠালগাছ মৌ-এর গয়না বুকে পরে স্থির হয়ে।

ঘরে এসে তক্তপোশে বসতে বসতে মনে হয়, বাগানের দিক থেকে একটা শব্দ এল। বসা হয় না। পাশে শোয়ানো বন্দুকটা নিয়ে জানালার দিকে হেঁটে যান। ভালো করে জরিপ করেও কিছু নজরে পড়ে না, কোথাও কোনো শব্দের নাম নেই। কেবল পুকুরের আঘাটায় একটা ছোট মেয়ে উবু হয়ে বসে কি যেন করছে। এখান থেকে দেখে মনে হয়, মেয়েটা সাঁওতালদের ঘরের। গলা তুলে ডাকেন— অ্যাই? মেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়, তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। কোঁচড় উপচে অনেকগুলো গুগলি জলের পাড়ে পড়ে যায়। মেয়েটা স্থির চোখে চারুকে দেখতে থাকে। সেই ফাঁকে তিনি বন্দুক নিয়ে বিছানায় ফিরে আসেন। মনে পড়ে যায় খাটের তলায় জাঁক দিয়ে রাখা আমের থেকে সতী একবার খান-দুয়েক বিশ্বনাথ জাতের আম খেয়েছিল। শহর থেকে ফিরে গুনতে গিয়ে ধরা পড়েছিল ব্যাপারটা। কে খাবে? ছেলে নেই পুলে নেই, তৃতীয় কোনো ঘরোয়া মানুষ নেই। জিজ্ঞেস করায় সতী সাদা মুখে কবুল করেছিল। চারু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল— এ তোমার বাপের আম নয়। এবারে যখন বাপের বাড়ি যাবে, তখন দুটো বিশ্বনাথের দাম নিয়ে আসবে। সেই থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সতী এ বাড়ির আম মুখে তোলেনি। মুখের পান ফেলতে জানালার কাছে গিয়ে চারু দেখতে পান মেয়েটা কোঁচড়ভর্তি গুগলি নিয়ে আমগাছেদের ছায়া এড়িয়ে বাগান পার হচ্ছে।

ঘরখানা যেন আর একটু বড় হলে সুবিধে হত। জিনিস ধরে না। অবিশ্যি সরীরটা বাদ রেখে আর যে ঘরগুলো রয়েছে সেগুলো বলতে গেলে প্রায় খালি। কতগুলো পুরানো আসবাব আর ঢাউস ঢাউস ছবি ছাড়া আর কিছুই নেই। তাও বেশির ভাগ ছবিই আবার সেকালের সায়েব-সুবোদের। গাঁয়ের মানুষের ঐসব ছবিগুলোর দিকে নজর নেই। কেউ কোনোদিন এসে বলে না— রায়মশাই, ছবিগুলো দান করবেন? — তাদের যত নজর এ ঘরের পাঁচখানা সিন্দুকে। তাও কেউ চোখে দেখেনি, সবই শোনা কথা। কী করে দেখবে, ওপর অবধি আসার মুরোদ থাকলে তবে তো। এ ব্যাপারে সদানন্দ একেবারে পাখোয়াজ। ভেতর-বাড়িতে আসতে হলে প্রথমেই তার সুমুখে পড়তে হয়, আর এগোতে হয় না। সদানন্দ জাতে পুরুত হলে কী হবে, বরকন্দাজিটা বেশ রপ্ত আছে। যদিও বা কালোভদ্রে কেউ তার চোখ পিছলে ভেতর-উঠোনে পা রাখে তারপরে আর যাবার ক্ষমতা নেই, সে যত বড় লাট-বেলাট হোক না কেন। সরীর দুখানা ড্যাবা চোখ দুশোখানা হয়ে আগলে রাখে ভেতরমহল। আর মেয়েমানুষের মুখ, বলিহারি। দু' কানে আঙুল ঠুসেও পার পাওয়া যায় না। চারু ওপরে বসে শোনেন আর মিটমিট করে হাসেন।

কিন্তু এত বড় ঘরেও জিনিস ধরে না। রাজ্যের বাক্স-প্যাঁটরা, বিছানার গাদা, পুরানো পাঁজির আন্ডিল আর গোটাপাঁচেক সিন্দুক নিয়ে রমরমা জমজমা ব্যাপার। এরই মাঝখানে সাবেক তক্তপোশের ওপরে চারুর শয়ন জাগরণ। পাশাপাশি পাহারায় থাকে ঐ একনলা বন্দুক। সিন্দুকগুলোয় রাজ্যের বন্ধকী কবলা দলিল বোঝাই। আর আছে ওজনদরে কেনা কিছু সোনা-রুপোর গয়না, যেগুলো সতী তাঁর শাশুড়ির দৌলতে পেয়েছিলেন। বেশ কিছু ক্যাশ সার্টিফিকেট, হ্যান্ডনোট, আটখানা ব্যাঙ্কের বই আর পুরনো গিনিও আছে। আর আছে অনেকগুলো কাঁসা পেতলের বাসন যার একখানা তুলতে গেলে হাত ভেঙে যায়। এ ছাড়া মৌজা ম্যাপ, সি এস রেকর্ডের বান্ডিল আর পুরনো কয়েকখানা দানপত্র রাখা আছে ওদের পেটের ভেতরে। ঘরের কোণে একগোছা হার্তছিপ দাঁড়িয়ে থাকে সর্বাঙ্গে মাকড়সার জাল আর মাথায় ঝুলের বোঝা নিয়ে। আর এককোণে রাখা আছে একখানা ভারী জাঁতা, যেটা এখানে রাখার কোনো কারণ খুঁজে পান না চারু। অনেকদিন আগে কে যে রেখে গেছে আর সরাতে পারেনি। বাড়িটার সঙ্গে যেন ঐ গন্ধমাদন জাঁতাখানার একটা অদ্ভুত সম্পর্ক রয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় ঐ জাঁতার ভেতরে বুঝি এই প্রকাণ্ড বাড়িটার সমস্ত ওজন ঠাঁই নিয়েছে। এ বাড়ি চারুনাথের বাবা উমানাথ এক ট্যাঁস সাহেবকে কলা দেখিয়ে জলের দরে জপিয়ে নিযেছিলেন। চারু আরো শুনেছেন এ বাড়ির জন্যে সাহেব পরে বহু দরবার করেছিলেন উমানাথেব কাছে। উমানাথ কোনো কথা বলেননি, কেবল বারান্দার ওপরে দাঁড়িয়ে একখানা সাফ-কোবালা আকাশে দুলিয়েছিলেন। চারু জাঁতাখানাকে ওখান থেকে সরান না।

হনুমানটা দিনে আসে, আবার দিন থাকতে থাকতে চলে যায় বলে এতদিন জানা ছিল। কিন্তু সে জানা যে ঠিক নয় তা টের পাওয়া·গেল সেদিন। অনেক বাতে মাথাব দিককাব জানালার ধারে হিমসাগব গাছটার দিক থেকে একটা বিশ্রী শব্দ হচ্ছিল। অনেকটা মানুষের কান্নার মতো। ঠিক যেন একটা বুড়ো মানুষ ঐ অন্ধকারে একনাগাড়ে কেঁদে চলেছে। ছেলেমানুষের কান্না শুনতে সময়ে সময়ে মন্দ লাগে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, সে কান্নায় মধু আছে। কিন্তু এ কান্না অসহ্য। বিছানায উঠে বসেন চারু। ঘরের কোণে কমিয়ে বাখা হ্যারিকেনের আলোয় বন্দুকটা তুলে নিতে কোনো অসুবিধে হয় না। পাশে রাখা চার-ব্যাটারির টর্চটা বাগিয়ে ধরে জানালার সামনে চলে আসেন। অমনি আমগাছের কান্না জুড়িয়ে যায়, অন্ধকারে গাছের ডালপাতার উশখুশ শব্দ। জোরালো আলোর তোড়ে আমগাছের সেই বিশেষ জায়গাটা হঠাৎ ধাঁধিয়ে ওঠে। চারু দেখতে পান হনুমানটা সেই আলো চোখে বিঁধে তাঁর দিকে চেয়ে আছে স্থির চোখে। চোখের পাতা পড়ে না, নড়ে না, নড়ে না একটুও। চকচকে চোখজোড়া চারুর দিকে থেমে থাকে। চারুর মনে হয় ও আসলে কাঁদেনি, কাঁদার ভান করছিল, বুড়োরা প্রায়ই যেমন করে আর কী। বন্দুকটা গুছিয়ে নেবার আগেই একটা শব্দ। তারপরে আর ওকে দেখা যায়নি। আমপাতাগুলো ঝকঝকে আলোয় অল্প অল্প কাঁপছিল।

দিন কয়েক হল আর একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন চারু। খবরটা প্রথমে পেয়েছিলেন সদানন্দর মুখে। বাগানে বেলপাতা তুলতে গিয়ে কী কারণে সদানন্দ উত্তরের মাঠে গিয়ে পড়েছিল। ঠিক মাঠ নয়, খানকতক কাঁঠাল গাছ আর সবেদা গাছ রয়েছে ওখানটায়। চারুর বন্দকি সম্পত্তি। মূল মালিক পতু মিঞা আজ দশ-বারো বছর চোখ বন্ধ করেছে কোনো ওয়ারিশ না রেখেই। টাকাটা শোধ করে যেতে পারেনি— যেমন পারেনি হাকিম মোল্লা, পটাই ঘোষ, হাজারি বিশ্বাস, এমনি আরো অনেকে। তাদের সাফ কোবালাগুলো

এখন চারুর সিন্দুকে। জমি ভাগীদার করে, আবার কোনোটা পতিত পড়ে থাকে দেখাশোনার অভাবে। কে দেখবে। সদানন্দর মুখে খবর পেয়ে বাগানের শেষ মাথায় এসে চারু দেখেছিলেন পতুর মাঠের অন্য চেহারা। কারা যেন সারি সারি খোঁটো বাঁশের খোঁটা পুঁতে রেখে গেছে। খোঁটা পুঁতে তোমার-আমার-ওর-তার সীমানা ভাগ হয়েছে। পতুর বুকে শূল বিঁধেছে যেন। চারু বুকে হাত রাখেন। ভেতরখানা যেন অমনি মাঠ হয়ে যায়, ভাগাভাগি হয়ে যায় অমনি করে। দলিলখানা চোখের ভেতরে দুলে ওঠে। খতিয়ান নং ৭৩-এর ইজারা ১১২, দাগ নং ৪৩৩-এর বাটা ৫৪৪, পরিমাণ ১ একর ৩৮ শতক। এটা অ-কৃষি জমি। চারু বেড়া টপকে ওপারে যান, তারপর দুহাতে এলোমেলো খোঁটাগুলো উপড়ে ফেলতে থাকেন, ছুঁড়ে দেন যত্রতত্র। বেলায় সদানন্দকে দিয়ে থানায় একখানা খাম পাঠান খোদ বড়বাবুর নামে। সেদিন রাতে শুয়ে পতুর মাঠ থেকে ভেসে-আসা নানান শব্দ শুনেছিলেন চারু। পরদিন সকালে ওপড়ানো খোঁটাগুলোকে আবার নিজের নিজের জায়গায় সটান দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। চারু সেগুলোকে আর উৎখাত করেননি। বড়বাবুর জন্যে পতুর মাঠ ঐভাবেই সাজানো ছিল।

গরমকালের দুপুরের যেন কোনো কূলকিনারা নেই। দিনকে বড্ড পেয়ে বসে। এত বড় দিনের সঙ্গে ভাবনাচিন্তাও যেন পাল্লা দিয়ে চলে। বন্দুকটা হাতে নিয়ে টানা বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ে যায় দু-একখানা ঘর বাদে এবাড়ির অন্যান্য ঘরগুলোর সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। মনে পড়ে না কবে শেষ পা রেখেছেন ঐসব ঘরে। মনে পড়তে চায় না কিছুতেই সেই বন্ধ ঘরগুলোর বাতাসহীন বাতাসের বাস কেমন। এইসব ভাবতে ভাবতে চারু সিঁড়ি ভেঙে নীচে চলে আসেন। টানা বারান্দায় রোদ আর ছায়ায় মাখামাখি জড়াজড়ি। বাইরের রোয়াকে আচার শুকোতে দিয়ে সরী ভেতর বারান্দার দরজার কাছে শুয়ে রয়েছে। মুখ খোলা, কষ বেয়ে পানের রস। সরী অগোছালো শুয়ে রয়েছে, কোনো হুঁশ নেই। দেখলে মনে হয় একটা মাদি পেটমোটা টিকটিকি কড়িকাঠ থেকে বেসামাল চিৎপাত হয়ে পড়েছে দরজার সমুখে। চারু ওপরে তাকান। বারান্দার কড়ি-বরগায় ঝুল আর মাকড়সার জালের মৌরসী পাট্টা। কড়ির গা বেয়ে ঝুলের ঝুরি নীচের দিকে নেমে এসেছে পুরনো সুরকির লাল গুঁড়ো মুখে করে। ওখানটা বেশ উঁচু বলে বাতাস সহজে পৌঁছয় না, আর তাই ঝুলগুলো দোলে না একটুও। সারা দিনরাত পুরনো কাসুন্দি মুখে করে নীচে নামবার হা পিত্যেশ করে যায়, খাবলানো খোবলানো মেঝে ছোঁওয়ার চেষ্টা করে, যা হয়তো কোনদিনই সম্ভব নয়, অন্তত যতদিন চারু বেঁচেবর্তে আছেন। বারান্দা বেয়ে একা হাঁটতে হাঁটতে চলে আসেন চারু দখিন মাথার শেষ ঘরখানার সামনে।

বাইরে থেকে দরজাটা ভেজানো ছিল। মান্ধাতার আমলের দরজা। গায়ে কলকে ফুলের নকশা কাটা চালচিত্তিরের মতো কারুকাজ করা। সামান্য ঠেলায় খুলতে চায় না। গায়ের জোরে বাঁ হাতের বন্দুকে ভর করে চারু দরজা ঠেলেন। দমাস করে একটা শব্দ হয়, দরজাটা খুলে যায় হাট হয়ে। চৌকাঠে পা রেখেই একটা গরম গন্ধের ধাক্কা পান চারু। কেমন একটা বিচুলি আর পুরনো কাঠের গন্ধ মেশানো। সামান্য আলো আর অনেক অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ওপাশের জানালা খোলেন চারু। জানালা খুলতেই কী যেন হয়ে যায়। বাইরে থেকে অনেকখানি আলোর ডেলা গরাদে ধাক্কা খেয়ে খানখান হয়ে যায়। চারু দেখতে পান সেইসব উজ্জ্বল টুকরোগুলো জানালা পেরিয়ে গরাদ গলে টপাটপ ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ছে। কে আগে আসবে তার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। একে ঠেলে, ওকে সরিয়ে, তাকে ডিঙিয়ে তারা ঘরে আসে। সেই ফাঁকে ঘরের

কোণে কী একটা নড়ে ওঠে। চারু দেখতে পান ভাঙা চেয়ারটার পাশে একটা প্রকান্ড গোসাপ আড়মোড়া ভাঙছে। এই পেল্লায় গতর। যেন কতদিন নড়াচড়া হয়নি। শুয়ে বসে শরীরে সবুজ পলেস্তারা পড়ে গেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় একটা সবজে পাথরের কুচ্ছিত কদাকার দানো। গোসাপটা চারুর দিকে সোজা তাকায়। চারু সরে গিয়ে ওধারের জানালাটা খুলে দেন। সাপটার চোখে আরো আলো ঢুকে পড়ে। পাথরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। প্রথমে মাজার কাছটায় একটা মোচড় আসে, তারপর ল্যাজে সামান্য আছড়ানি, সাপটা দেওয়াল কামড়ে আস্তে আস্তে চলতে শুরু করে। চৌকাঠ পেরোতে কোনো অসুবিধা হয় না। চারু দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখতে পান সাপটা হিলহিলিয়ে ছুটে চলেছে বারান্দা দিয়ে দরজার দিকে। বন্দুক তুলতে হয় না। সে আপনিই দরজা পেরিয়ে চলে যায় বাইরের দুপুরে।

ঘরের কোনা থেকে একখানা চেয়ার টেনে চারু দক্ষিণমুখো জানালায় বসেন বাইরের কাঁঠালগাছ, বনবাদাড় আর দূরের পুকুর মুখে করে। ঘরের দেওয়ালে বড় বড় ছবি, বেশির ভাগই সায়েব-সুবোদের। এককোণে একটা কার্পেট গোটানো রয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় ওটার আর কিছু নেই, ছিঁড়ে একেবারে উলকুটি ধুলকুটি। বাইরে তাকান। হ্যাঁ এই তো সেই কাঁঠালগাছ, অগুনতি কাঁঠাল গায়ে প'রে আর প্রকাণ্ড মৌচাক বুকে ক'রে। কী আশ্চর্য, এমন করে তো কোনোদিন দেখা হয়নি। এভাবে এই জানলার খোপের ভেতরে বসে তো কখনো দেখা হয়নি। যেন কী এক নতুনভাবে দেখা। অন্য রকম মনে হওয়া। বাহ্, বেড়ে মজাদার ব্যাপার তো। চারু খুঁটিয়ে দেখেন। প্রকাণ্ড চাকটা যেন গর্ভবতী মা-জননীর একখানা স্তন, দুধের ভারে ঝুলে পড়েছে। আসলে মধু তো দুধই বটে। বাহ্ বাহ্, বুড়ির এ বয়েসের রঙ্গ তো কম নয়। সারা অঙ্গে সোনার ছানাপোনা ঝলমল করছে। পেটের গর্তে বুঝি আরো আছে যারা বাইরে আসার জন্যে উশখুশ করে। চাকের ওপর থেকে নীচ অবধি অসংখ্য অগুনতি কালো মাছি। সব সময়ে নড়ছে-চড়ছে, একটার পিঠে আর-একটা, ঠাসাঠাসি গাদাগাদি। এদের শরীরগুলোই যেন চাকের শরীর। তলাকার ব্যাপার-স্যাপার কিছু দেখা যায় না। এতগুলো প্রাণ কেমন ঠাসবুনোটভাবে নড়াচড়া করছে। চাকের আসল শরীর তো লুকোছাপা, যেখানে প্রাণ নেই। সে শরীরকে আড়াল দিয়ে ঢেকে রাখে অগুন্তি পাঁচফোড়ন প্রাণ। চারু বুঝতে পারেন এই বাড়ি, বাগান, পুকুর সমেত রমরমা রাজত্ব বুঝি অমনি এক চাক। মনে পড়ে যায় একবার একটা ছোট ছেলে এসে দরবার করেছিল মধু ভাঙবে বলে। চারু তাকে সোজা হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন। ছেলেটা সারাদিন বাগানময় তেতো মুখে ঘুরঘুর করেছিল, তাকে আমল দেওয়া হয়নি। ফি বছর শহর থেকে দালাল আসে আমবাগান জমা নিতে, চারুকে তাতাবার জন্যে বিস্তর কাঠখড় পুড়োয়, কিন্তু কোনো কাজ হয় না।

সদানন্দর মুখে একবার শুনেছিলেন কোথায় যেন লেখা আছে এ জগতের পার্থিব জিনিসপত্তর সবই মধুময়। সে টাকাকড়ি, সোনাদানা, বাগান, বাড়ি— যাই হোক না কেন। কথাটা বড্ড মনে ধরেছে। কে বলে মধু নেই এ জগতে। এত বড় মধুর কারবার সামনে, আর লোকে বলে জীবনে রস নেই, মধু নেই। আরে বাবা চোখ থাকলেই মধু দেখা যায়, মন থাকলেই মধু খাওয়া যায়। বাগানবাড়ির কথা না হয় বাদ, সিন্দুক বোঝাই যেসব বন্ধকী দলিল আছে, সেগুলো নিংড়োলে কি কেবল নিমরস পড়বে। ভেসে যাবে, সব ভেসে যাবে। নিজের কথা নাহয় বাদ, কিন্তু আর দুজন? সদানন্দ আর সরী? তারাও তো ঐ মধু মাছি। দিনরাত মধু আগলায়, কাউকে ঘেঁষতে দেয় না চাকের সীমানায়। তাহলেও, আজকাল তাদের নজর এড়িয়ে ঐ বুড়ো হনুমান আর খোঁটা-পোঁতার দল

হামলা করে। এইটাই এখন চিন্তার বিষয়। সদানন্দ আর সরীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে মন চায়। তাহলে হয়তো ওরা ভেতরকার ছাড়ো-ছাড়ো ভাব কাটিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তাও কি সম্ভব? সদানন্দর দোতালায় ওঠার হুকুম নেই। সরী দোতালায় ওঠে, কিন্তু ঢুকতে পারে না। চৌকাঠের বাইরে পা ছড়িয়ে বসে থাকে। তার দৌড় ঐ অবধি। চাঁদনি রাতে সরী যখন পান গালে করে চৌকাঠের বাইরে বসে সুখদুঃখের কথা কয়, বেশ লাগে তখন। চারু তখন ঘন ঘন পান চান। সরী হাতে করে জোছনার মাঝখান দিয়ে এগিয়ে দেয়। একদিন তো ভাবের ঘোরে বলেই ফেলেছিলেন— তোকে কিছু টাকা দেব। অবিশ্যি পরে-পরেই কথাটা শুধরে নিয়েছিলেন, অন্য কথায় চলে গিয়েছিলেন। চারু জানেন, তাঁর সঙ্গে সরীকে জড়িয়ে গ্রামের মানুষ পাঁচকথা বলাবলি করে। তবে সবই আড়ালে-আবডালে। সামনাসামনি বলার মুরোদ হয় না। এ ব্যাপারে মাঝে মাঝে সদানন্দর দিকে আড়চোখে তাকাতে হয়। মনে হয় সেই যত নষ্টের গোড়া। একবার হয়েছিল কী—সরী জ্বরে পড়েছিল। বেদম জ্বর। একেবারে বেহুঁশ অবস্থা। সেদিন তার ঘরে গিয়েছিলেন চারু। গায়ে হাত রেখে দেখেন অবস্থা বেশ গরম। কী আর করেন, বাধ্য হয়েই থার্মোমিটার দিতে হয়। এই ভগবতী ড্যানার ওপর হাত চেপে ধরতে হয়। ঠিক সেই সময় দরজায় এসে দাঁড়ায় বুড়োকাঠ সদানন্দ। সেদিনও বাইরে আমবন-ছাঁকা জোছনা ছিল।

চাকের ওপর-নীচ দেখেন চারু। ওঃ কী বাঁধন অঙ্গের। কাঁঠালগুলো দেখেন। সব মধুর কল্‌সি যেন। হনুমানটার কথা মনে পড়ে যায়। চোখের সামনে দপ করে জ্বলে ওঠে— সেদিনকার সেই চার-ব্যাটারির ধাঁধায় পড়া একজোড়া পাথর-চোখ।

রাত ক'টা বাজে কে জানে। ঘড়ি দেখে সময়-যাচাই করতে সব সময় ইচ্ছে করে না। কোনো কোনো দিন ঘড়িতে দম দেওয়া হয় না। সময় চলে যেমন তেমন, যে-কোনো জায়গায় থমকে যায়, চারু তাকে নাড়া দিতে চান না।

বিছানার ওপর আড় হয়ে শুয়ে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের জমাট অন্ধকার দেখছিলেন চারু। কী ঠাণ্ডা ঐ অন্ধকার। অনেকক্ষণ ধরে সেদিকে চেয়ে থাকতে ভালো লাগে।

রাতের খাওয়া তো সকাল সকাল হয়ে যায়। ঘরের কোণে হ্যারিকেনটা যথেষ্ট কমিয়ে রাখা। পাশে ঘটিতে জল চাপা দেওয়া। সরীর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। নীচের মহল একেবারে চুপ। রাতের বেলা এখান থেকে ট্রেনের শব্দ পাওয়া যায়, যদিও স্টেশন এখান থেকে অনেক দূরে। এইমাত্র শেষ লোকালটা চলে গেল। তার শব্দ অনেক্ষণ ধরে এখানকার ভারী বাতাসে ভেসে বেড়ায়, তারপর আস্তে আস্তে আমবাগানের দিকে চলে যায়। বাগানে রাতের হাওয়া দিচ্ছে। সারাদিনের গুমোট হঠাৎ কেটে গিয়ে কোথা থেকে যে বাতাস হচ্ছে কে জানে। গাছেদের শরীর, পাতায় সে হাওয়ার শব্দ আলাদা আলাদা শব্দ তৈরি করে। বেশ মৌজ করে শুনতে ভালো লাগে। এ শব্দ শুধু হাওয়ার বা পাতার না, এ যেন ঐ বাগানের আনাচকানাচ অন্ধকারের শব্দ। চারু শোনেন।

আজ বিকেলটা বড় কূটকচালিতে কেটেছে। গাঁয়ের কয়েকটি খিলেন এসেছিল। তাদের সঙ্গে শিবের দালানে বসতে হয়েছিল। ওদের মধ্যে ছিল নগেন ঘোষ আর চরণ হাজরা। একথা সেকথার পর আসল কথায় এসে নগেন ঘোষ থমকায়। প্রস্তাবটা সোজাসুজি না এসে অনেক ঘুরপথে বাঁকা মুখে আসে। সামনে সেটেলমেন্টের মাপ আসছে। সেই পঞ্চান্ন-ছাপান্ন সালের পরে এই সেটেলমেন্ট। ওরা বলে সমস্ত সম্পত্তিটা যাতে শিবোত্তর

হিসেবে রেকর্ড করা যায় তার ব্যবস্থা পাকা করতে। বোঝানো হয় তাঁর মৃত্যুর পর পাঁচভূতে সম্পত্তি লুটেপুটে খাবে, কেউ দেখার থাকবে না। সদানন্দ বা সরীর ক্ষমতায় কুলোবে না এসব আগলে রাখতে। তার চেয়ে এখনই অর্থাৎ চারুর জীবদ্দশায় যদি একটা ট্রাস্টির হাতে সমস্ত সম্পত্তি সঁপে দেওয়া যায় তো কেমন হয়। গাঁয়ের কয়েকজনই সেই ট্রাস্টির সদস্য হবে, প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্যে এস.ডি.ও.-কে অনুরোধ করা হবে আর যাবতীয় খরচ-খরচা হবে শিবের নামে। বছরের হিসেব-নিকেশ করে গাঁয়ের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করা হবে। মোদ্দা কথা, চারুনাথ মরেও চিরকাল বেঁচে থাকবেন মানুষের মাঝখানে। মাথা নিচু করে প্রস্তাবটা শুনেছিলেন চারু আর আপন মনে বলেছিলেন আমি মরে তোদের সব ক'টার ঘাড় মটকাব রে শকুনের দল। — ওরা এক নাগাড়ে বকে যায়। চারু না-রাম না-গঙ্গা। মুখে একেবারে কুলুপ। শিবমন্দিরে সদানন্দর হাতে গোপালভোগের ঘণ্টা বেজে উঠতে চারু হাত তোলেন। ভেতর-উঠোনে তুলসীতলায় একটা সামান্য আলো কেঁপে ওঠে। চারু মাথা হেঁট করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসেন।

অন্ধকারে ভাবেন চারু মৌ জমেছে চাকে। লোভে লোভে আরো মাছি এসে বসতে চাইছে। মধুর লোভ বড় লোভ। নিজেকে সামাল দেওয়া বড় মুশকিল। কিন্তু তিনি নিজে তো লোভে পড়ে একে ভোগ করেননি ইচ্ছামতো। বুড়ো পাহারাদার মৌমাছির মতো চাক আগলে পড়ে থেকেছেন। কোথাও কোনদিন দুদণ্ডের জন্যে গিয়ে শান্তি পাননি। চারু ভাবতেও পারেন না তিনি চলে যাওয়ার পর, আরো অনেক দিন পরে এ বাড়িটা চোর-ছ্যাঁচোড়ের আড্ডা হয়েছে, আম-বাগান কেটে সাফ করে সেখানে জবরদখল কলোনি হয়েছে, পতুর মাঠে ছেলেরা বল খেলছে। কী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন রে বাবা! চারু উঠে বসেন। বিছানা ছেড়ে নেমে এসে জল খান। কমানো হ্যারিকেনের আলোয় দেওয়ালের গায়ে একটা ছায়া। হাতের জল চলকে ওঠে, চমকে ওঠেন চারু। সেই বুড়ো হনুমানটা উবু হয়ে বসে জল খাচ্ছে। চারুর মাথার সামনের দিকস্কার সান-শেডের মতোই তার গোটা চেহারার ছায়া অন্ধকার আলোতে ঐ দেওয়ালে সেই হনুমানটাকে এঁকে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি হ্যারিকেন উসকে দিয়ে বিছানায় এসে বসেন চারু। তাঁর চোখ জুড়ে সমস্ত ঘরময় হ্যারিকেনের আলো দপদপিয়ে নেচে বেড়ায়। সেই সঙ্গে ঐ ছায়া-হনুমান মস্ত কালো ছড়ানো চেহারা নিয়ে চঞ্চল আলোর সঙ্গে পাল্লা দেয়। সমস্ত ঘর জুড়ে এক বিরাট কালো প্রেতের ছায়া দুলছে, টলছে, কাঁপছে। এই ঘর, এইসব সিন্দুক, বাক্সপ্যাঁটরা-—সমস্ত গিলে ফেলে ছায়াটা ক্রমশ বড় হচ্ছে। চারু চোখ বুজে ফেলেন। সে কি আরো বড় হবে? এই বাড়ি, বাগান, পুকুর, পতুর মাঠ— সব ছাড়িয়ে কি ? চারুর মনে হয়, তার মাথা আকাশ ছুঁয়েছে।

দক্ষিণ বাগানের দিক থেকে সমস্ত অন্ধকার আর নিস্তব্ধতাকে ভাঙচুর করে একটা আর্তস্বর এ ঘরে এসে আছড়ে পড়ে। মনে হয় সে চিৎকারের তীক্ষ্ণ দাপটে এ ঘরের অন্য বন্ধ জানালাগুলো সব একে একে খুলে যাবে। চারু নিজের বুকে হাত রাখেন। সেখানেও অমনই এক চিৎকার শুরু হয়ে গেছে। চারু বাইরে কান পাতেন আর অমনি মনে হয়, শব্দটা খুব পরিচিত। এক হাতে টর্চ জ্বেলে আর অন্য হাতে বন্দুক নিয়ে বারান্দা পেরিয়ে, সিঁড়ি ভেঙে, দক্ষিণমুড়োর দরজা ঠেলে সরিয়ে একা বাগানে চলে আসেন চারু।

কাঁঠালগাছের কাছে এসে দেখতে পান সমস্ত গাছে কী এক অদ্ভুত অস্থিরতা। পায়ের কাছে একটা খাবলানো-খোবলানো আধখ্যাঁচড়া কাঁঠালশিশু। কে এক দানো বাচ্চাটাকে মার কোল থেকে টেনে তার কচি শরীর ফালা-ফালা করে ওখানে ফেলে দিয়েছে। এবারে

নজর অন্য দিকে। টর্চের সাদা আলোয় চারু দেখতে পান, বুড়ো হনুমানটা চাকের ভেতরে দুখানা হাত পুরে দিয়ে বসে আছে, তার কনুই বেয়ে রক্তের মতো মধু গলগলিয়ে পড়ছে মাটিতে, যেখানে-সেখানে। তার শরীর ছেঁকে ধরে লক্ষ মৌ পাহারাদার। চোখ মুখ অন্ধকার। ধোঁয়ার মতো ঘিরে ধরেছে বুড়োটাকে, যার মুখ হাঁ-করা আর চিৎকার আকাশ-ছেঁড়া। ঐ গড়িয়ে-পড়া মধু শুধু রক্ত নয় দুধও বটে। পোয়াতি মায়ের দুধ বয়ে যাচ্ছে যেমন-তেমন। টর্চটা মাটিতে শুইয়ে রেখে দু'হাতে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরেন চারু। বুড়োর চিৎকার ঢেকে গিয়ে একটা শব্দ হয়।

ভোরবেলাকার লালচে রোদ, বাতাস আর নির্জনতার কাছাকাছি দক্ষিণ বাগানের সাবেক কাঁঠাল গাছের পায়ের তলায় কাদা-কাদা রক্ত আর ঢেলে-দেওয়া মধুর মাঝখানে দুজনাতে শুয়ে। বুড়ো হনুমান আর আটাত্তুরে চারুনাথ। একপাশে পড়ে থাকা টর্চটির আলো এখন ঘোলাটে। ছিটকে পড়েছে বন্দুকটা ওদিকে। জানোয়ারটার বুক ছেঁড়া গুলির তোড়ে। মানুষটার টুঁটি ছেঁড়া নখের জোরে। লক্ষ মৌ-পাহারাদার দুজনের শরীর কামড়ে মধুর শেষ পায় না। চোখের, গলার ও বুকের জমাট রক্তে মধু খুঁজে বেড়ায়, খুঁটে নেয়। মাথার ওপরে খাঁ খাঁ আকাশ, রোদে টান-টান ঝুলে-থাকা চাকটাও এখন সাদা, পরিষ্কার। ভোরবেলাকার বাগানে দুটি শরীর আড়াল করে মৌ ওড়ে হাওয়ায় হাওয়ায়। মুখের আগায় রক্তের দানা।

মহিমের এক দিন

রাধানাথ মণ্ডল

সব কিছু কেমন পালটে যায়।

জামগাছের গাঢ় একটা ছায়া পড়েছে, তার তলায় দাঁড়িয়ে মনে হল মহিমের, এই জায়গাটা ঠিক তেমনই আছে, ঝাঁপড়ি মাথা, পুকুরের দিকে ঝুঁকে আছে কয়েকটা ডাল, দু-একটা পাখির বাসা গাছের উপরে। একটু হয়তো বয়স বেড়েছে গাছটার, কিন্তু মনে পড়ে ছোটবেলায় এরকমই দেখেছিল এই জামগাছটাকে। বর্ষায় এই রাস্তা দিয়ে যে-ই হেঁটে যেত, পায়ে লাগত জামের বিচি, জলে ডবকে-ওঠা জামের দাগ। কিন্তু ছায়াটা আর তেমন নেই। অন্তত এর তলায় দাঁড়িয়ে সেই রকম কোনও অনুভূতি আসছে না, ছোটবেলা যেমন হত।

কত বছর পরে যেন? কুড়ি? মহিম এক ঝলক হিসেব করে ফেলে মনে মনে। তা হবে। দু-এক বছর এদিক-ওদিক হতে পারে। সময়ের হিসেবে কুড়িটা বেশ কঠিন অঙ্ক, ঠিক ঠিক যোগ-বিয়োগ করা যায় না। কিন্তু কুড়ি বছর পর যদি সে এখানে এসে থাকে, তবে তার সঙ্গে আরও দশ যোগ করতে হবে। মামাবাড়ি চলে আসার প্রচণ্ড ব্যাকুলতা সে আরও দশ বছর আগে হারিয়ে ছিল। তখন সে শহরের হোস্টেলে থাকত, শহুরে মানসিকতা সেই সবে আক্রমণ করেছে ধীরে ধীরে। তারপর বহু বছর সে তার নিজের গ্রামেই আসেনি, মামাবাড়ির এই গ্রাম তো আরও দূরের কথা।

তবু এবার সে এখানেই এল। পুরী-দার্জিলিং-রাজগীর নয়, এমন কি ঘাটশিলা বা কাছের ডায়মণ্ডহারবার নয়, এবার পুজোর ছুটিতে সে গ্রামে এল, এবং তার মামাবাড়ির গ্রামে। সঙ্গে তার স্ত্রী, দুই মেয়ে। কলকাতায় মানুষ তার স্ত্রী রমলা বিয়ের পর একবার মাত্র এসেছিল তাদের গ্রামে, কিন্তু এখানে আসেনি। আর তার মেয়েরা কখনও চোখেই দেখেনি এরকম গ্রাম, এমন মাঠ, বাড়িঘর, গাছপালা, এমন মানুষজন। একটু দূরে বারান্দায় বসে আছে তারা, বারান্দায় বসে কথা বলছে। পাড়ার লোকেরা ঘিরে ধরেছে রমলাকে, ওমা, মহিমের মেয়েগুলিও এত ডাগরটি হয়ে গেছে? বড় মেয়ে নবনীতা একটু লাজুক, অনেক চোখের সামনে মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে তার, ছোট পারমিতাও বেশ ঘাবড়ে গেছে, তার মায়ের একটা হাত এমনভাবে আঁকড়ে আছে, যেন এক্ষুনি তাকে কেউ ধরে নিয়ে চলে যাবে।

ওই বয়সের বেশির ভাগ সময় আমার ওই বারান্দা ওই উঠোন আর এই গাছতলায় কেটেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহিম ভাবে। লম্বা বারান্দাটা ঠিক তেমনি আছে। একটু একটু ক্ষয়ে-যাওয়া খুঁটির সারি, মাথায় খড়ের চাল। সাদা, অপরিষ্কার দেওয়াল, ছোটবেলা কতবার যে আমের কুসির দাগ কেটেছে সেখানে। এখনও দেওয়াল সেরকম আছে, বদলানোর মধ্যে উঠোনে একটা নিমগাছ ছিল, এখন নেই। বাড়ির উত্তর দিকে নিমগাছ থাকা অমঙ্গলের— একথাটা সে প্রায়ই শুনত, প্রতি বছর কেটে ফেলার কথা হত। কিন্তু

কিছুতেই কাটা হয়ে উঠত না। সেই নিমগাছে প্রতি বছর অজস্র ফুল ফুটত, গন্ধে গোটা পাড়াটাকে মাতিয়ে দিত, তলায় প্রচুর পরিমাণে ঝরে পড়ত নিমফল, পাকা নিমফল কত যে খেয়েছে সে।

কবে যেন সেই নিমগাছটাকে কেটে ফেলা হয়েছে। ফলে বড় উঠোনটাকে একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। আরও অনেক কিছু পালটে গেছে। যেমন সামনের ওই টিনের চালের উঁচু উঁচু বাড়িগুলো ছিল না। এ পাড়ায় সবই ছিল তার মামাদের মতো খড়ের ছোট ছোট বাড়ি। এখন ওগুলোর জন্যে পাড়াটাকে একটু অন্য রকম দেখাচ্ছে। ওপাশের খামারে একটা জামের গাছ ছিল, পাকলে দারুণ মিষ্টি হত, কিন্তু তারা পাকার আগেই পেড়ে পেড়ে খেয়ে দাঁত টকিয়ে ফেলত। এখনও হয়তো গাছটা আছে, কিন্তু উঁচু বাড়ির জন্যে এখান থেকে দেখা যায় না।

আর পালটে গেছে মামীমা। ছোটবেলা থেকে সে মামীমাকে দেখে এসেছে এক রকম। সাদা থান পান-খাওয়া কালো কালো দাঁত। গলায় দু-কণ্ঠি তুলসীর মালা, কপালে ছোট্ট চন্দনের টিপ। মামীমার কোলে চড়লেই সে দোক্তার গন্ধ পেত। ঠোঁট ফাঁক করে ধরে মাঝে মাঝেই সে বলত, ও মামী তুমি এত পান খাও কেন গো? পান-খাওয়া ঠোঁট তার গালে চেপে ধরে মামীমা বলত, বোকা ছেলে, পান খাই বলেই তো বেঁচে আছি।

আজ সে প্রথম দেখল, মামীমার এখন একটাও দাঁত নেই। বয়সের ছাপ সারা শরীরে স্পষ্ট। কুঁচকে গেছে চামড়া, সাদা থানে মামীমাকে আর তেমন উজ্জ্বল দেখায় না। তারা যখন সবাই মিলে এসে উঠোনে দাঁড়াল, সে চেঁচিয়ে ডাকল, ও মামী, মামী—আস্তে আস্তে উনুনশাল থেকে বেরিয়ে এল মামীমা, মহিম দেখল একজন বৃদ্ধা। তার দিকে রমলা আর মেয়েদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। মহিম খুব আস্তে বলেছিল, মামীমা আমি—আমি মহিম। কথাটা ঠিক কানে গিয়ে পৌঁছায়নি তার। আরও অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাসি ফুটিয়েছিল মুখে। ও তুই— তুই আমাদের বরা? চোখে জল এসে গিয়েছিল মহিমের। ভুলে যাওয়া একটা নাম— বরা। মামীমার খুড়-শ্বশুরের নাম মহীতোষ। মহিম উচ্চারণ করতে গেলে মহীতোষ চলে আসে বলে মামী তাকে বরা বলে ডাকত। ছোটবেলা ঘুমোলে তার সর্দি-নাকে শোঁক-শোঁক শব্দ হত শুয়োরের মতো— তাই মামী তাকে আদর করে বলত বরা। এখন মহিমের মনে হল, গত কুড়ি বছর এত সুন্দর নামে তাকে কেউ ডাকেনি। মামীমা তাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু মহিম টের পায়, সেই গন্ধটা নেই। দোক্তা-মেশানো সেই পানের গন্ধ।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল মহিম। সাইকেলের শব্দে চমকে উঠে দেখে হরিপদ। নিঃসন্তান মামীমার একমাত্র আশ্রয়। ছোটবেলা থেকে মহিম দেখে আসছে এই হরিপদকে। মনে আছে হরি নামের এই মাঝবয়সী লোকটি এক সময় তার মামাবাড়িতে বাগাল হিসেবে এসেছিল। পরে মামী একে দত্তক নিয়েছে। হরিপদ প্রথমে মহিমকে খুব একটা ভাল চোখে দেখত না। ভাবত এই বুঝি মামীর জমিতে ভাগ বসাবে। কিন্তু যখন দেখল মহিম তা করল না, কলেজে পড়তে সেই যে কলকাতা গেল আর ফিরল না, বিয়ে-থা করে সেখানে সংসার পাতল, তখন সে বোধ হয় নিশ্চিন্ত হয়েছে। আজ খুব আপন লোকের মতো কথা বলেছে হরিপদ। মহিমের চেয়ে বয়সে বড় তবু তাকে সে মহিমদা বলে। মহিমরা এসেছে শুনে সে তাড়াতাড়ি মাঠ থেকে বাড়ি এসেছে, তারপর, আমাদিকে মনে পড়ল মহিমদা— বলে খুব খাতির করে বসিয়েছে, হাত-মুখ ধোয়ার জল এনে দিয়েছে গাড়ুতে করে, এখন সাইকেলে বাজার যাচ্ছে। হরিপদর দিকে তাকিয়ে একটু হাসে মহিম। ঘরকে যাও গো মহিমদা, মা তোমাদিকে জল খেতে দিয়েছে। যেতে যেতে হরিপদ বলে। হ্যাঁ, যাই, যাচ্ছি— মহিম জবাব দেয়।

খুব বেশি দূরে নয় বাজার। মহিম কত বার যে গেছে। একবার, তখন খুব ছোট, দাদু তখন বেঁচে, মহিম দাদুর হাত ধরে বাজারে গিয়েছিল। বঁইচি খুব প্রিয় ছিল মহিমের। তারা বলত ভেঁউট। দাদু তাকে একটা ভেঁউটেব মালা কিনে দাঁড় করিয়ে কোনও কাজে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তবু দাদুকে আসতে না দেখে মহিমের মনে হয়েছিল, সে হারিয়ে গেছে। মনে হওয়া মাত্র সে কেঁদে ফেলেছিল, আর কাঁদতে কাঁদতে ভুল রাস্তায় বাড়ি ফিরতে গিয়ে সত্যি সত্যি হারিয়ে গিয়েছিল মহিম। সে কী খোঁজাখুঁজি, ভেঁউটের মালা হাতে একটা বছর পাঁচেকের ফর্সা ছেলেকে দেখেছ কেউ? বলতে বলতে তার বৃদ্ধ দাদামশাই তোলপাড় করে ফেলেছিল তিনখানা গ্রাম। মহিমের মনে আছে, বিকেলের দিকে একজন দাড়িঅলা লোক তাকে মামাবাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়। অনেক বড় বয়স পর্যন্ত দাদু-মা-মামীর মুখে গল্পটা শুনেছে মহিম। জানতে পেরেছে, সে নাকি দু মাইল দূরের গ্রামে চলে গিয়েছিল, সেখানে গোরুর পাইকের সোলেমান শেখ তাকে দুপুরবেলা দেখতে পায়। লালপুরের সোলেমান দাদুর খুব চেনা লোক। মহিমকে দেখে বুঝতে পেরেছিল সে যোগীন নন্দীর নাতি। তারপর নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে শান্‌কির থালায় করে ভাত খেতে দিয়েছিল, আর বিকেল বেলা কাঁধে করে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল তার দাদুর কাছে।

বাড়ির দিকে পায়ে পায়ে ফিরতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে মহিমের। কেমন আছে সেই দাড়িঅলা সোলেমান শেখ? বেঁচে আছে কি? যে তাকে দেখতে পেলেই বলত, কি খোকা, আবার হারিয়ে যাবে নাকি? যখন একটু বড় হয়েছে, বুঝতে শিখেছে, লাজুক হাসত মহিম। বলত, না আর হারাব না চাচা, আমি এখন বড় হয়েছি না?

— হ্যাঁ, খুব বড়, এত্ত বড়। বলে গাল টিপে আদর করত মহিমকে।

লালুপুর যাবে নাকি আজ বিকেলে? খোঁজ করবে সোলেমান শেখের? বলবে, চাচা, আমি আবার হারিয়ে গেছি। আমাকে তুমি পৌঁছে দাও। আমার সেই ছোটবেলার মামার বাড়িতে আমাকে নিয়ে চলো। বলবে?

ঘরের ভিতরে পর পর চারটে আসন পাতা। রমলা আর দুই মেয়ে বসেছে, ফাঁকা আসনটায় মহিম গিয়ে বসল। সামনে সাজানো পিতলের রেকাবে মুড়কি আর ভেলিগুড়, এখানে বলে ভিড়ে। হরিপদর স্ত্রী একগলা ঘোমটা দিয়ে সবাইকে কয়েকটা করে বাতাসা দিয়ে গেল। ছোট মেয়ে পারমিতা এত অবাক হয়ে গেছে যে, আসনের উপরে খুব সুন্দরভাবে পায়ের উপর পা তুলে বসেছে। সবাই খাওয়া শুরু করতে সেও খেতে লাগল। পারমিতাকে দেখিয়ে রমলা বলল, দেখেছ? হাসল মহিম। হ্যাঁ, দেখেছি। ছোট মেয়েকে এত শান্তশিষ্ট ইতিপূর্বে তারা কখনও দেখেনি।

মহিম লক্ষ করল, রমলার মাথায়ও এক চিলতে ঘোমটা তোলা আছে। ঘরে আব কেউ নেই দেখে মহিম বলল, বাঃ, তোমাকে নতুন বউয়ের মতো দেখাচ্ছে। তার দিকে চোখ পাকিয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল বমলা, চৌকাটে মামীমাকে দেখে চুপ কবে গেল।

দরজার কাছে মেঝেতে উবু হয়ে বসে মামীমা বলল, একটা চিঠিও তো দিতে পারিস বাবা— বেঁচে আছি না মরে গেছি খবরও তো নিস না।

এই অভিমানের কণ্ঠস্বর মহিম চেনে।

গতকাল মার মুখেও ঠিক একই কথা শুনেছে। কিন্তু পারে না। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে কলকাতা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত ব্যস্ততা টুঁটি টিপে ধরে, সেখানে মা, মামীমা, এই গ্রাম, তার ছেলেবেলা— এসব কিছুকেই মনে করার সময় পায় না। বাজার, রেশন, অফিস টাইমের বাস তাকে ক্রমাগত দূরে সরিয়ে দিয়েছে এসব থেকে। বুকের বহুস্তর নিচে জমে আছে এই যে স্মৃতি, তার ছেলেবেলা, এই আকাশ-বাতাস— তাকে অনেক কষ্ট করে টেনে তুলতে হয়।

কী জবাব দেবে মহিম বুঝতে পারে না। শুধু মুড়কি-ভর্তি মুখে বলে খবর তো পাই।

— কই আর পাস! পেলে বড় অসুখের সময় একবার আসতিস। মরা বেঁচে উঠলুম বাবা। হরিটা ভাগ্যিস ছিল, বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল মামীমা। থানের আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বলল, কড়ে রাঁড়ি বাবা, ভগবান যদি ওইটুককে আমার হাতে না তুলে দিত কী নিয়ে যে বাঁচতুম—

মহিম অস্বস্তি বোধ করে। পারমিতা অবাক হয়ে দেখছিল, সে মাকে জিজ্ঞেস করে, মা, দিদা কেন কাঁদছে, মা?

রমলা মেয়ের দিকে তাকায়। নরম করে বলে, তোমাকে কিছু বলতে হয় না, তুমি চুপ করো।

— কাঁদিনি মা। কেঁদে আর কী করব। মামীমা উঠে দাঁড়ায়। একটু জোরে ডাকে বৌমা, অ বৌমা ওদের হাত ধোয়ার জল দাও— বলতে বলতে ঘরের বাইরে যায়।

একটু থমথমে হয়ে উঠেছিল ঘরটা। সহজ করার জন্যে মহিম গলা খাঁকারি দেয়, রমলার দিকে তাকায়, একটু জল খায়। পারমিতা বলে আমাকে আর একটা মিষ্টি দেবে মা? সঙ্গে সঙ্গে নবনীতা তার নিজের একটা বাতাসা বোনের পাতে দিয়ে দেয়। বড় মেয়ের উদারতায় মুগ্ধ রমলা মহিমের দিকে তাকিয়ে হাসে, মহিম বুঝতে পারে এই হাসির মানে, মেয়ে বড় হচ্ছে।

মহিমের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। চল্লিশ ছুঁই ছুঁই মহিম, যে কলকাতার বাড়িতে ভালো সন্দেশ এলেও, চেখে দেখে না, সে একথালা মিষ্টি মুড়কি আর চার চারটে বাতাসা খেয়ে ফেলে নিজেই একটু অবাক হয়ে গেল। একটি একটি করে মুড়কি তুলছে নবনীতা, তার খেতে বেশ দেরি আছে। মহিম ঘরটার চারদিকে একবার তাকাল।

এই দেয়াল, ওই কড়িকাঠ— তার মনে হয় হাজার হাজার বছর ধরে দেখেছে। তার বাল্যের বহু দিনরাত এই মেঝেয় শুয়ে উপরের দিক, ঘরের চারদিক দেখে দেখে কেটেছে। মহিম দেখল মাটির দেওয়াল তেমনই আছে, শুধু কিছু ছারপোকা মারার দাগ, মনে হয় আগে ছিল না। কোণে কোণে মাকড়সার জাল, দু-এক জায়গায় ঝুল ধরে আছে কড়িকাঠে। এখানে বলে সাঙা। তালকাঠের মাজ দিয়ে তৈরি বেশ মজবুত সাঙা বহুদিন ধরে একই রকম আছে। দেয়ালের চারদিকে অনেকগুলো ছবি। দুহাত তোলা গৌর নিতাই, পায়ে চন্দন লাগানো গুরুদেব, পদ্মাসনা লক্ষ্মী। এই সব ছোট ছোট বাঁধানো ছবির মাঝখানে বড় করে টাঙানো রাধাকৃষ্ণ, ঠিক তার পাশে মোটা ফ্রেমের ভিতরে সেই খুব চেনা লেখা ঃ সতীর দেবতা পতি জীবনের সার, পূজিতে এসেছি ভবে চরণ তোমার— মায়া।

মহিমের মনে পড়ে যায়, মায়া। মামীমার নাম। মাত্র বারো বছর বয়সে বিধবা মামীমা বিয়ের পরই শ্বশুরবাড়িতে এসে কাপড়ের উপরে অত্যন্ত যত্নে ছুঁচ-সুতোয় লিখেছিল এই প্রতিশ্রুতি, কিন্তু রাখতে পারেনি।

— নবু, বাবু তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। রমলা বলে। মহিম নবনীতার দিকে তাকায়। কলকাতায় এর চেয়ে অনেক প্রিয় খাবার তাকে জোর করে খাওয়ানো যায় না। এখানে যে স্বেচ্ছায় এতগুলো মুড়কি খেয়েছে, এটাই আশ্চর্য।

রমলার কথায় নবনীতা হাত গুটিয়ে নেয়। মা, আমি আর খেতে পারছি না। ভয়ে ভয়ে সে মায়ের মুখের দিকে তাকায়। রমলা কিছু বলার আগেই মহিম বলে, থাক, আর খেতে হবে না। রমলা কিন্তু-কিন্তু করে, এতগুলো খাবার নষ্ট করবে?

মহিম মনে মনে হাসে। কলকাতার মেয়ে রমলা, জানে না, কেউ খেতে না পারলে এখানে কোনও খাবার নষ্ট হয় না। যতই মাখা বা ঘাঁটা থাকুক সেটা বাড়ির মেয়েরা খেয়ে নেবে।

গাড়ুর জলে হাত ধুয়ে সবাই বারান্দার মাদুরে বসে। মহিম আর একবার দেখে, বারান্দাটাও অনেকটা একই রকম আছে। পর পর দুটো কুলুঙ্গি, একটা কুলুঙ্গিতে থাক করা তিন-চারটে ছোট মাপের পাঁজি, বিধবা মামীমার একাদশী-অমাবস্যাতে দেখতে লাগে। আর একটায় পিউরিটি বার্লির একটা ডিবে, ওতে সম্ভবত মুনিশদের জন্যে দোক্তা-শালপাতা রাখা আছে। দেয়ালে ছাড়া ছাড়া করে পোঁতা মশারি টাঙানোর জলুই, তার একটায় দুলছে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ধানভানা কলের এক ক্যালেণ্ডার। মহিম দেখে, বেশ কয়েক বছর আগের পুরোনো এই ক্যালেণ্ডারটা, শুধু শেষ পাতাটা ছেঁড়া হয়নি।

একটা সিগারেট ধরানোর ইচ্ছে ছিল মহিমের। কিন্তু এখানে সিগারেট খেতে একটু বাধো বাধো ঠেকল তার। অনেকে তাকে দেখে যাচ্ছে। পাড়া সম্পর্কে এরা সবাই মামা-মামী। যদিও দুই সন্তানের বাবা, তবু এদের চোখে সে ছেলেমানুষ। তার সিগারেট খাওয়া কেউ ভালোভাবে নেবে না। রমলাকে সে বলে, তুমি একটু রান্নাঘরের দিকে যাও না। নবু, তুমি একটু পারুকে নিয়ে খেলা কর, আমি আসছি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রমলা রান্নাঘরের দিকে যায়। মহিম উঠে পড়ে।

এই সেই পুকুর। এক সময় এর জলে অনেক গ্রীষ্মের দুপুর কেটে গেছে। জল ঘাঁটলে বকুনি খেতে হত খুব, তবু কী এক দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল এই মিশকালো জলের। দূরে যেতে ভয় হত, কেননা তার ধারণা ছিল, একটু বেশি জলে শেকল আছে, লোহার চেয়ে মজবুত কোনও ধাতুতে তৈরি— এবং জ্যান্ত সেই শেকল। একটু গভীরে গেলেই পা ধরে টেনে নিয়ে চলে যাবে। এই পুকুর নিয়ে ঘুমের মধ্যে সে অনেকবার স্বপ্ন দেখেছে, সবই ভয়ের স্বপ্ন। তবু সে এই রহস্যময় জলের কাছে বারবার এসেছে, নেমেছে, গা ডুবিয়ে বসে থেকেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

মহিম হাঁটে। এখন আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া শরৎকালের মেঘ। বেলা বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে ঘাসের উপর থেকে মুছে যাচ্ছে শিশিরের স্মৃতি। একটু গেলে মাঠ। লকলক করছে সবুজ ধানের ডগা। পর পর কয়েকটা আলে কাশফুল, কোনও ছবিতে দেখা নয়, চোখের সামনে ছুঁয়ে দেখার দূরত্বে ফুটে আছে।

এই মাঠে আমি একদিন হেঁটেছি, এই হাওয়া, এই ধানগাছ, এইভাবে কাশফুলের ফুটে থাকা— এসবই আমার কত চেনা। গোটা শরৎকালের প্রতিটি দিন আমার এখানে কেটেছে। গত জন্মের কথা মনে হয় এসব। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে মহিমের।

এই সেই শ্মশান। খুব গা ছমছম করত এদিকে আসতে। কাঠকয়লার স্তূপ একদিকে, আধ পোড়া কাঠ এখানে-ওখানে ছড়ানো, আর পর পর তিন সারি মন্দির। এরই একটা মন্দিরে লেখা আছে স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ নন্দীর নাম। তার দাদু। মহিমের তেমন মনে পড়ে না দাদুর মৃত্যুর ঘটনা। শুধু মনে আছে, মা তার হাতে ধরে তিন ক্রোশ রাস্তা কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল। মহিম একটু এগিয়ে যায়। এই মানুষ সমান উঁচু মন্দির তার দাদু? কেমন ছিল দাদুর চেহারা? অনেকগুলো ভাঁজ ছিল কপালে। বাঁ চোখের উপরে একটা আঁচিল ছিল। সব সময় খালি গায়ে থাকত। কোথাও যেতে হলে এক-আধবার ফতুয়া পরত, একটা গামছা থাকত কাঁধে।

এখানেই কোথাও তার মামাকেও পোড়ানো হয়েছিল। কিন্তু অল্প বয়সে মারা যাওয়ার জন্যে মামার শ্মশানে কোন মন্দির করা হয়নি। তবু মহিম দেখেছে, প্রতিদিন সন্ধ্যারতি হাতে মামীমা এই দিকে তাকিয়ে প্রণাম করত। এখনও করে নিশ্চয়ই। সরে এল মহিম, জোড় হাতে নমস্কার করল।

দুপুর বেলা সেই পুকুরে স্নান করল মহিম। সাঁতার কাটার চেষ্টা করল। জলে গা ডুবিয়ে বসে থাকল বহুক্ষণ। কলকাতার চেয়ে একেবারে আলাদা স্নান। কিন্তু সেই রোমাঞ্চ

হল না। ছোটবেলা যে-প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল জলের, মহিম দেখল, এখন তার একটুও অবশিষ্ট নেই।

খাওয়া দাওয়ার পর একটু ঘুমাবে স্থির করল মহিম। দেখল রমলার বেশ ভাব হয়ে গেছে হরিপদর বউয়ের সঙ্গে, মেয়েরাও পাড়ায় বেশ পরিচিতি হয়েছে। পারমিতাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে অনেকের মধ্যে— কে তাকে নিয়ে খেলবে। রমলা একসঙ্গে খেতে বসতে চায়নি। এখানে যা নিয়ম, মেয়েদের সঙ্গে পরে খাবে বলেছিল, কিন্তু মামীমা জোর করে একসঙ্গেই খেতে দিল। প্রচুর মাছ এনেছিল হরিপদ। চিংড়ি মাছ, পোনা মাছ। কলকাতায় এমন মাছ পাওয়া যায় না। খেতে গিয়ে হাসি পেল মহিমের। এক সময় এর ছোট একটি টুকরো অমৃত বলে মনে হত, এখন সেই স্বাদই নেই।

মন খারাপ-করা বিকেলে ঘুম ভাঙল মহিমের। বাইরে এসে দেখল বেলা পড়ে আসছে। উঠোনে এক টুকরো রোদ, ঘরের চালের দীর্ঘ ছায়ার পাশে বাঁধানো ছবিব মতো। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুকের ভেতর একটা কষ্ট টের পেল মহিম। কাল সকালে এখান থেকে চলে যাবে। যে-হারানো বয়েসকে পাবে বলে এসেছিল এখানে, তা আর নেই। সেই বাড়ি আছে, সেই বারান্দা, মানুষজন, তবু সেই আত্মীয়তা নেই। নিতান্তই বাইরের লোকের মতো, কুটুমবাড়িতে আসার মতো সে একদিনের জন্যে এসেছিল, তারপর চলে যাবে। শুধু এইটুকু। আর কিছু নয়।

মহিম শুনল, পিঠে তৈরি হচ্ছে। রান্নাশালে উনুনের ধারে বসে আছে মামীমা, কাঠের উনুনের আঁচে তার মুখ-চোখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। মহিমের আর বাইরে যেতে ইচ্ছে হল না। চুপচাপ বসে বসে সে উঠোনে রোদের মিলিয়ে যাওয়া দেখতে থাকল।

আবার ঘরের মধ্যে চারটে আসন পাতা হল, মহিম বসল রমলাদের সঙ্গে। আসকে পিঠে আর পায়েস। মহিমের খুব প্রিয় ছিল, তাই মামীমা আজ তৈরি করেছে। সবাবই পাতে পাতে পিঠে দিচ্ছিল হরিপদর বউ। প্রথমে মহিম, তারপর রমলা। নবনীতাকে দিতে যেতেই হাঁ-হাঁ করে উঠল মহিম। ওকে একটার বেশি দিও না। একটু অবাক চোখে তাকাল রমলা— কেন? মহিম বলল, না ওকে একটা মাত্র দেবে।

হরিপদর বউ তাই দিল। পারমিতাকেও একটাই দিল। মহিম খেতে খেতে দেখল নবনীতাকে। একটু একটু করে ভেঙে খাচ্ছে। মাথাটা নিচু, কোনও দিকে তাকাচ্ছে না। হরিপদর বউ একথালা পিঠে নিয়ে আবার সবাইকে দিতে এল। মহিম নিল, রমলা নিল, পারমিতাকেও পিঠে দিল হরিপদর বউ। নবনীতাকে দেবে কিনা ইতস্তত করছিল, মহিম বলল, না, ওকে আর দেবে না। বাবার দিকে তাকাল নবনীতা, ছলছল করছে তার চোখ। বিরক্ত হল রমলা। তোমার সবেতেই বাড়াবাড়ি। কেন, ও খেতে পারলে আরও নেবে না কেন? মহিম দৃঢ় গলায় বলল না, নেবে না।

খাওয়া হতে একে একে উঠে পড়ল সবাই। নবনীতা উঠল সকলের শেষে, মহিম দেখল, খুব দুঃখিত, প্রায় কান্না-কান্না তার চোখ-মুখ।

রাত্রিবেলা সবাই পাশাপাশি শুয়েছিল। মেয়েরা যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, রমলা জিজ্ঞেস করল, তুমি তখন ওরকম করলে কেন? মেয়েটা পিঠে খেতে চাইছিল, তুমি খেতে দিলে না! কোনও জবাব দিল না মহিম।

— কী হল, কেন খেতে দিলে না?

এবারও মহিম কোনও উত্তর দিল না।

কেন, তা কী করে বলবে সে? অনেক দিন আগে, সে যখন নবনীতার বয়সী, যখন সে মামাবাড়িতে থাকে, তখন পৌষ-ওঠা উপলক্ষে পিঠে করার জন্যে তার মামীমাকে

ডেকে নিয়ে গিয়েছিল পাড়ার একটা বাড়িতে। যেদিন ধান কাটা শেষ হয়ে যায়, মাঠের থেকে সেদিন শেষ ধানের আঁটিটিকে মাথায় করে শাঁখ বাজিয়ে বাড়িতে আনা হয়। এ হল পৌষ-ওঠা, কেউ বলে লক্ষ্মী আনা। সেদিন সব বাড়িতে উৎসব, পায়েস আর পিঠে হয়, লোকেদের খাওয়ানো হয় ইচ্ছেমতো। মামীমা সেদিন পাড়ার এক বাড়িতে পিঠে তৈরি করতে গিয়েছিল, নেমন্তন্ন হয়েছিল তার ছোট্ট ভাগ্নের।

অনেক লোকজনের যাওয়া আসা, শাঁখের শব্দ, আলপনা দেওয়া হয়েছে উঠোনে। ভীরু পায়ে মহিম নাছদুয়ারে গলা বাড়াতে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, কে? — আমি মহিম। খুব মৃদু জবাব দিয়েছিল সে। আমার মামী তোমাদের এখানে পিঠে করতে এসেছে।

— অ। আয় ভেতরে আয়।

তখন সন্ধে হয়ে আসছে। মহিম আস্তে আস্তে ভিতরে গেল। আধো অন্ধকার এক বারান্দায় তাকে চাটাইয়ের আসন পেতে দেওয়া হল। মহিম বসল। তারপর তাকে একটা থালায় একটা মাত্র পিঠে আর একটু পায়েস দিয়ে একজন বলল, খা, খেতে পারলে আবার দোব।

বাড়িতে সবাই ব্যস্ত। মহিমকে কেউই দেখছে না। মামীমা কোথায়, কে জানে! একটামাত্র পিঠে মহিমের অনেকক্ষণ খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। মাথা তার ক্রমশ নিচু হয়ে যাচ্ছিল। পাশ দিয়ে অনেক লোক হেঁটে যাচ্ছে দুমদাম পা ফেলে, কেউ তাকাচ্ছে না তার দিকে। মহিম এখনও অনেকগুলো পিঠে খেতে পারে। পাঁচটা-ছটা-আটটা--আসকে পিঠে আর পায়েস খেতে সে খুব ভালোবাসে। মহিম অপেক্ষা করল আরও কিছুক্ষণ। থালায় আঙুল দিয়ে সে গাছ আঁকল, পাখি আঁকল, ফুল আঁকল। আরও অনেকক্ষণ বসে থাকল মহিম। কিন্তু কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল না আর পিঠে নেবে কিনা। এক সময় মহিম উঠে পড়ল। একবুক কান্না আর অভিমান নিয়ে এঁটো হাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

মহিমের ঘুম আসছিল না। ঘরের কোণে একটা লণ্ঠনের দম কমানো। তার আলো খুবই কম। ঘরের চারদিকে জমাট হয়ে আছে অন্ধকার, মাকড়সার জালের সঙ্গে, দেওয়ালের ঝুলের সঙ্গে মিশে সেই অন্ধকার চোখের সামনে যেন থেকে থেকে দুলছে, আবার থেমে যাচ্ছে। শুধু ধারের কড়িকাঠের পাশে লণ্ঠনের গোল একটা আলোর চাকতি। মহিম সেদিকে চুপচাপ তাকিয়েছিল।

একটু পরে রমলারও ঘুমন্ত নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল মহিম। তার কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে পাশ ফিরে শুয়েছিল, এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। রমলা ঘুমিয়ে যেতেই আস্তে আস্তে উঠে বসল মহিম। হাত বাড়িয়ে ঘরের কোণ থেকে লণ্ঠনটা নিল। দম তুলল। এখন আলোয় গোটা ঘর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ঘরের দেয়াল, দেয়ালের উপরের সারি সারি ছবি। মেঝেতে শুয়ে রমলা আর তার দুই মেয়ে। একেবারে ধারে শুয়েছে নবনীতা— শক্ত বালিশ থেকে তার মাথাটা গড়িয়ে পড়েছে। মহিম আলোটা নিয়ে নবনীতার পাশে গিয়ে বসল। মাথাটা তুলে দিল বালিশের উপরে। তারপর খুব ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নবনীতার মুখটা দেখতে থাকল।

মহিম বুঝতে পেরেছে, এখন কিছুই তার ছেলেবেলার মতো নেই। সব কিছু কেমন অদ্ভুতভাবে পালটে গেছে। শুধু সেই দুঃখটা যদি থাকে।

মহেঞ্জোদড়োর এক রাত

জগন্নাথ প্রামাণিক

সত্যি কথা বলতে কি, জীবনটা দেখি দেখি করেও দেখা হয়ে উঠল না। গতকাল ভাদ্রের এক তারিখে আমি পঞ্চাশটি বসন্ত পার করে একান্ন বছরে পা দিলাম। আয়নার সামনে দাঁড়ালে ব্যাকব্রাশ চুলের মধ্যে চকখড়ি রঙের সাদা সাদা ছোপ। হাত-পায়ের মাংসপেশীতে এখনও শিথিলতা আসেনি ঠিকই, তবে চোখের কোণে কালি, কপালের রেখায় কুঞ্চন, গালে টোল পড়েছে। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যে যে এমন দুর্ভাগা হয়ে উঠেছি, তা নয়। মৃত পিতার, অসংযত রিপুর জন্যে তিনটি বোন, রুগ্‌ণা বিধবা মা আর দুটি ভায়ের শিক্ষাদীক্ষা, বিয়ে, সখ, সাধ-আহ্লাদ ইত্যাদির ভার আমার ঘাড়ে পড়ে, কারণ আমি বড় ছেলে। এখন মা আর আমি নাকতলার কাছে দু'কামরা ঘরে ভাড়া থাকি। ভাড়া মাসে ছ'শ, ইলেকট্রিক বিল আশি। জমাদারের দশ টাকা যোগ করলে সাতশকে বাকি থাকে আব দশ টাকা। কি আর বলব, মাসের প্রথম হপ্তায়, খামের মধ্যে করকরে সাতখানি একশ টাকার নোট পুরে, বাড়িওয়ালার হাতে দিয়ে, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা টেনে বলি, বোসদা, বাকিটুকু আর ফেরত না দিলেও চলবে। মন ভাল থাকলে, বোসদা কথার ওপর কথা ফেলে, দু'এক কথা বলেন, একটু হাসেন, তা-না হলে, গভীর ব্যক্তিত্বের ভাব দেখিয়ে প্রসারিত ডান হাতখানি গুটিয়ে সোজা ঘরের দিকে এগিয়ে যান। তখন আমার মনে একই সঙ্গে আনন্দ-দুঃখ-বেদনা খেলা করতে থাকে। ছুটির দিন, সময় হলে মায়ের কাছে বসে, বাজার দর, রাজনীতি, আজকালকার সমাজব্যবস্থার ভালমন্দ, অফিসের পরিস্থিতি, উভয়ের ফেলে আসা স্মৃতি, ভাই-বোনেদের সংসার প্রভৃতি নিয়ে গল্প করি কিম্বা রিমোট কন্ট্রোলে বিভিন্ন চ্যানেলে টি.ভি-র প্রোগ্রাম দেখি।

কথাবার্তা আলোচনার সময় মা মাঝে মাঝে বলেন, কুমার, এবার একটা বিয়ে কর।

মায়ের মুখে বিয়ের কথা শুনলে, আমার গা গুলোয়। বমি পায়। একই সঙ্গে মায়ের প্রতি রাগ, বাবার ওপর চরম ঘৃণা, আমার সমস্ত শিরা উপশিরাকে টান টান করে তোলে। মনে হয় গলা টিপে মেরে এখনই ঘর সংসার চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি, যেদিকে দু'চোখ যায়। আর তখনই মায়ের অসহায় করুণ চোখ, বাটির মত গভীর তোবড়ানো গাল, হাড়ে লেগে থাকা শিথিল চামড়া দেখে কেমন করুণা ও দুঃখ হয়। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলি, আর কেন মা, এই বেশ আছি। আর কটা দিন দিব্বি মায়ে বেটায় সুখেই কাটিয়ে দিতে পারব। তো এই আমার জীবন, ঘর-গেরস্থালি।

।। ২ ।।

আমার অফিস ডালহৌসি স্কোয়ারে। চাকরি রেলের। গত দু'বছর হল লোয়ার ডিভিশন থেকে আপার ডিভিশন ক্লার্কে উন্নীত হয়েছি। মাইনেও বেড়েছে।

এখন ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটা বাজলে অফিসে ঢুকি, বেরই সাড়ে পাঁচটা ছ'টা নাগাদ। আগে প্রায়ই লেট হ'ত, লাল কালির দাগ পড়ত খাতায়, তার সঙ্গে বসের চোখরাঙানি। অসংখ্য লোক গিজগিজে কলকাতায় হাঁটতে গেলে গায়ে গা ঠেকে যায়। ট্রামে বাসে উঠলে মেয়েদের ফলস্ চুলের মত পাদানি থেকে যে কোন সময় হঠাৎ খসে পড়ার সম্ভাবনা। এ রকম অবস্থায় আমার খুব সুবিধে হয়েছে মেট্রোরেল হওয়ায়। আঠার কুড়ি মিনিটের মধ্যে টালিগঞ্জ থেকে এসপ্লানেড। ভাবা যায়! প্রথম যেদিন মেট্রোরেল চলে— সেদিন রমার ট্রেনে চড়ে সে কি আনন্দ, দুঃখও অবশ্য ছিল। কারণ রমা থাকে হাওড়ার সালকিয়ায়। ওতো আর আমার মত নিয়মিত মেট্রোয় চড়ে অফিসে আসতে পারবে না।

— কুমার দা, রিয়েলি, ইউ আর লাকি, এবার আর আপিসে আসতে আপনাকে বাদুড়-ঝোলা হতে হবে না। সেই রমা, দীর্ঘ দশ বছর ঝুলে থাকার পর এখন বিয়ে করে দু'ছেলের মা। ছোট কেজি.টু, আর বড় ক্লাস ফাইভে। মোটকথা রমার সাংসারিক জীবন সুখের হয়েছে। হাজব্যান্ড পোর্টে ভাল মাইনের চাকুরে। নিজের বাড়ি।

রমার যখন বিয়ে হয়, আমার মেজ ভাই অশোক য়্যুনিভার্সিটিতে, ছোট ভাই রবি স্কটিশচার্চ কলেজে, আর ছোট বোন অনিতা সবেমাত্র মাধ্যমিক দিয়ে ইলেভেন-এ। তখন রমাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব ছিল না। রমা অবশ্য রেজিস্ট্রি করে রাখতে চেয়েছিল, আমি রাজি হইনি। কারণ আফটার রেজিস্ট্রি, আমি তো রমাকে দীর্ঘদিন চিনি, ও কোনমতেই এক সংসারে থাকতে চাইত না। ফলে রমাকে নিয়ে সাংসারিক অসন্তোষে জড়িয়ে পড়তে হত।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, বিয়ের হপ্তাখানেক আগে রমা ম্যারেজলিভের টাইপ কবা এ্যাপ্লিকেশন হাতে নিয়ে যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, ওর বেদনায় ভার হয়ে ওঠা চোখের পাতা দুটি দেখে, আমি ক্ষণিকের জন্যে এমন বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম যে, মনে হয়েছিল, মানবিকতা, কর্তব্যবোধ, শব্দ দুটো যদি ঈশ্বর আমার মগজ থেকে কোনরকমে খুবলে নিয়ে সেই মুহূর্তে গঙ্গার অতলজলে নিক্ষেপ করতেন, তাহলে হয়ত আমি চিরপ্রশান্তিতে জীবন কাটাতে পারতাম। ওর জড়িয়ে যাওয়া কণ্ঠস্বর, বিচলিত ভাব, লজ্জাহীন হাতের স্পর্শ ও আত্মসমর্পণ, আমার অন্তরপ্রকৃতির স্নায়ুতন্ত্রীকে সেই মুহূর্তে এমনই বেদনাক্লিষ্ট করে তুলেছিল যে স্থবিরের ন্যায় ওর মুখের দিকে চেয়ে নির্বাক বিস্ময়ে ভাষাহীনভাবে জড়ভরত হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম। চোখ মুছে ও আমার সামনে থেকে চলে যাবার আধ ঘণ্টা পরও আমার মুখে কোন শব্দ ছিল না। বাড়ি ফিরে, অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় সেদিন আমি একসঙ্গে একটা পেইন কিলার ও দুটো ঘুমের বড়ি খেয়েছিলাম। এখন আচরণে, কথাবার্তায় রমা খুবই স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক। যখন তখন ও আমার টেবিলে চলে আসে। ইয়ার্কি, ঠাট্টা তামাশা সবই হয়। ঠিক যেমন গরম চা বা কফির সঙ্গে মুড়মুড়ে স্ন্যাকস্। কিন্তু তবুও গলায় কাঁটা লাগার মত, হৃদয়ের কোথায় যেন মাঝে মাঝে খচমচ করে ওঠে। এর নাম মোহ, কামনা-বাসনা, নাকি ভালবাসা জানি না।

।। ৩ ।।

কয়েকদিন অঝোরে বৃষ্টির পর, আজ আকাশটা ভীষণ সতেজ ও নীল। যেন পুরনো বাড়িতে নতুন রঙ ফেরানো হয়েছে। তবে দমকা হাওয়া, আকাশের সাদা কালো রঙের

ভারি মেঘগুলিকে অতি দ্রুত কোথায় যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। ঝলমলে রোদ্দুরের পাশে পাশে আবছা ছায়ার আবির্ভাব, ঘন সবুজ গাছগাছালির মনোরম সভা, বাসা থেকে বেরোতেই মনটাকে কেমন আনন্দে ভরিয়ে তোলে। বাস স্টপে এসে লক্ষ্মীর গুমটি দোকানে দুটো জর্দা পানের অর্ডার দিয়ে ওপরের দিকে মুখ করে ভাবি, আমাদের বাংলায় কবির ভাষায় আষাঢ় শ্রাবণের বর্ষা এই পান গুমটির লক্ষ্মীর মতই ভীষণ চঞ্চলা ও ছলনাময়ী। বুকের হুক খুলে লক্ষ্মী বসে থাকে গুমটিতে। ওর বক্ষ সৌন্দর্য দেখিয়ে খদ্দের টানে। কেন জানি না, আমাকে দেখলেই লক্ষ্মী কেমন টানটান হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে দেহ হেলিয়ে প্রথমেই বুকের বোতামটা আগে ঠিক করে নেয়। তারপর পানে চুন লাগায়। হয়ত আমার ব্যক্তিত্ব, বয়স কিম্বা চোখের চাহনি ওকে লজ্জায় আড়ষ্ট করে তোলে। যদ্দুর জানি লক্ষ্মীর মা নেই। এই গুমটির রোজগারই হয়ত ওদের জীবন-ধারণের নিরাপত্তা। তা না হলে, লক্ষ্মীর এখন যা বয়স, এই সব ঘরের মেয়েদের এ্যাদ্দিন বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা। হয়ত ওর বাবা ইচ্ছে করেই বিয়ে দেয়নি কিম্বা বিয়ের খরচ যোগাড় করতে পারেনি।

লক্ষ্মী পান সেজে একটা পান হাতে দেয়। আর একটা পান কলাপাতা দিয়ে মুড়ে চুন লাগায় ভেতরে পাতার আবরণে। আমি বলি, একটু কাগজ দিয়ে মুড়ে দে, চুন বেরিয়ে প্যান্টের পকেট নোংরা করে দেবে। ও তাই করে।

মুখে পান ফেলে চিবোতে চিবোতে টালিগঞ্জ মেট্রো ধরব বলে মিনিতে উঠতেই, কয়েকজন নিত্যযাত্রীর কণ্ঠস্বর কানে ভেসে আসে। পাতালরেল বন্ধ। যতীন দাস পার্কের কাছে, মাটি ধসে ভেতরে জল ঢুকছে। মেজাজটা কেমন বিগড়ে যায়। এই ক' বছর আগে পাতালরেল চালু হল, প্রায়ই শোনা যায় এখানে ধস ওখানে ধস, জল ঢুকছে অমুক স্টেশনে, আগুন ইত্যাদি ইত্যাদি। যাবার সময় কষ্ট হবে না। কারণ একেবারে সোজা ডালহৌসি মিনিতে বসে যাওয়া যায়। কিন্তু লেট হবার সম্ভাবনা। ঝাড়া এক ঘণ্টা সময় মিনিতে যেতে। ফেরার সময় যদি রেল চালু না হয়, যা ভিড় হয় বাসে, প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

আমি যখন এরকম ভাবছি, ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে, কন্ডাকটর ঘণ্টি দিয়েছে বাস ছাড়ার, প্রতিবেশী পালদার গলা শুনতে পেলাম। কন্ডাকটরকে বলছেন, রোকো, রোকো ভাই। কন্ডাকটর বাস থামাবার জন্যে পুনরায় ঘণ্টি দেয়। পালদা কোনরকমে দু'মণি শরীরটাকে বাসে ঢুকিয়ে সোজা আমার সিটের কাছে এসে প্রথমে একগাল হাসেন, তারপর বলেন, আর পারিনা ভাই, পাতাল বন্ধ। কবে যে শুনব স্বর্গও বন্ধ হয়ে গেছে! সব বন্ধ হয়ে গেলে বেঁচে যেতাম। আর কষ্ট করতে হোত না। ওনার কথায় আমি ও বাসের অনেকেই হেসে উঠি। ভদ্রলোক রসিক, যতক্ষণ বাসে থাকবেন, এটা ওটা কথার গমকে রাস্তার একঘেয়েমি কিছুটা লাঘব হবে। মনে মনে ভাবি, যাক, পালদা আসায় কিছুটা রিলাক্স হবে বাস জার্নি।

সারাদিন অফিসে কাজের চাপে বাইরে না বেরুনোয় বাইরের খবর নেওয়ার সময় ছিল না। পাঁচটার সময় যখন লেজার বুক বন্ধ করে চশমা খুলে টেবিলে রাখি, তখন মাথাটা যেন কেমন ধরে গেছে। এখন এক কাপ চা হলে, শরীরটা সতেজ হয়। চেয়ার থেকে উঠে, ল্যাট্রিন হয়ে, নন্দর চায়ের ক্যান্টিনে এসে বসতেই শুনতে পেলাম, পাতালরেল চলছে, তবে কখন যে কোথায় আবার ধস নামবে কেউ বলতে পারছে না। অনেকেই পাতাল রেলের প্রযুক্তি ও নির্মাণের ত্রুটির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের রেলমন্ত্রীর গুষ্টির ষষ্ঠীপুজো করে দিচ্ছেন। রেলমন্ত্রী নাকি কয়েক কোটি টাকা কাটমানি

পেয়েছেন(?)। কেউ কেউ আবার প্রকৃতির খামখেয়ালীপনার সমালোচনায় মুখর। এ বছর বর্ষাটা যেন এঁটেল চিমড়ির মত লেগে আছে। বৃষ্টি বৃষ্টি আর বৃষ্টি! ছাড়তে চাইছে না। এমন বর্ষা নাকি ইদানিংকালে হয়নি। তার ওপর রেডিওতে আজ আবার দুপুরের খবরে বলেছে, বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ ঘনীভূত হয়েছে। বার ঘণ্টার মধ্যে তা গাঙ্গেয় উপত্যকায় আছড়ে পড়বে। ঝড় বইবে ঘণ্টায় আশি থেকে একশো কিলোমিটাব বেগে।

যাচ্চলে, ক'দিন বাদলার পর আজই তো সবেমাত্র রোদের মুখ দেখা গেল, আবার সাইক্লোন? আর পারি না বাবা। চা বিস্কুট খেয়ে নন্দর হাতে পয়সা গুণে দিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের টেবিলে ফিরে আসি। দু একটা টুকিটাকি হিসেবের উপর চোখ বুলিয়ে, খাতাপত্র গুছিয়ে ডাইনে বাঁয়ে চেয়ে দেখি, আমি, হেডক্লার্ক সুধীরবাবু আর দু'জন বেয়ারা এবং রঘু ছাড়া ঘরে কেউ নেই। সুধীরবাবুকে বলি, বাড়ি যান মশাই, আকাশের যা অবস্থা এখনি আবার ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি নামলো বলে। সুধীরবাবু—'তাই নাকি' বলে, চোখ থেকে চশমা খুলে টেবিল গোছাতে লাগলেন। আমি শান্তিনিকেতনি ব্যাগে টিফিন বক্স, কলম ঢুকিয়ে বাইরে এসে দেখি, সত্যিইতো ঘন কালো মেঘে আকাশটা একেবাবে ঢেকে গেছে। চারদিকে অন্ধকার অন্ধকার ভাব। রাস্তায় লোকজন কম। হাওয়ার দাপট বেড়েছে সকালের চেয়ে দু'তিন গুণ। এখনই যেমন করে হোক বাসায় ফেরা উচিত এবং বুদ্ধিমানের কাজ হবে অফিসের কাছ থেকে একটু হেঁটে বা বাসে উঠে ধর্মতলায় পাতাল রেল ধরা। যা ভাবা তাই কাজ। মিনিট খানেক দাঁড়াতেই ফাঁকা বাস পেয়ে গেলাম। বাসে উঠে ভাবি, আজ আর চণ্ডীতলায়, মডার্ন মেডিকেল সেন্টারে যাওয়া হল না। মায়ের ব্রেন স্ক্যানের রিপোর্টটা নিতে পারলে ভাল হত, ক'দিন ধরে যন্ত্রণাটা বেড়েছে। চোখেও ভাল দেখছে না।

কাউন্টারে ভিড় ছিল না। দু'জন বয়স্ক ভদ্রলোক, একজন মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা এবং একজন গুণ্ডা টাইপের ময়লা রঙের যুবক ছেলে লাইনে দাঁড়িয়ে। আমি পিছনে দাঁড়ালাম এবং যথারীতি তিনটাকা দিয়ে টিকিট কেটে প্লাটফর্মে এলাম। ইলেকট্রনিক ঘড়িতে চোখ পড়তেই বোঝা গেল এখন বাজছে ছ'টা তিন। নেক্সট ট্রেন ছ'টা বারোয়। এখনও ট্রেন আসতে ন'মিনিট বাকি। অভ্যাসবশত যেখানে কামরা পড়বে ভদ্রমহিলার পেছনে লাইনে দাঁড়ালাম। যদিও মোটেই প্রয়োজন ছিল না, কারণ প্যাসেঞ্জার খুবই কম। ছেলেটি দাঁড়িয়েছে সামান্য দূরে। যেখানে ঝড়ের মত বাতাস বইছে পাখার নিচে। ছেলেটি দেখলাম, রুমাল বের করে মুখ, কপাল এবং ঘাড় মুছে, চিরুনি বের করে চুল আঁচড়াচ্ছে। খুবই স্বাভাবিক; বাইরে প্রচণ্ড দমকা হাওয়া। যদিও এর কোনও প্রভাব এখানে, অর্থাৎ মেট্রো স্টেশনে বোঝা যাচ্ছে না। কিছুটা ফ্রেশ হয়ে ছেলেটি দেখলাম, ঘুরে দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে আর আমার চোখে চোখ পড়লেই চোখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে।

চোখ ঘুরিয়ে দেখি ভদ্রমহিলার গড়ন ভালই। রীতিমত সুন্দরী বলা যেতে পারে। পেছন থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে স্টেশনের স্বচ্ছ আলোয় যা দেখা যায়, ফর্সা মুখ, চুলগুলি হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে খড়গাদার মত এবড়ো খেবড়ো, ব্লাউজের নিচে স্পষ্ট ব্রা। সামান্য মেদে মানানসই চেহারা, পুরুষ্টু পাছা। তো এরকম মেয়েকে একজন ইয়াং ছেলে যে মনে মনে কামনা করবে এ-তো স্বাভাবিক। কারণ এই বয়সটাই যে স্ট্রেস অ্যান্ড স্ট্রেনের। কিন্তু ছেলেটির অদ্ভুত চেহারা, অ্যাসিড ধোওয়া জিনসের প্যান্ট, জাঙ্গলছিটের জামা, বিশ্রী হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল কোন বস্তিটস্তির। তার ওপর ভদ্রমহিলার দিকে কুটিল ও জটিল তাকানোটা, কেন জানি না, আমার কেমন ভাল লাগছিল না। আজকাল প্রায়ই তো খবরের কাগজে নানারকম সংবাদ পড়ি। নারীধর্ষণ, ইভটিজিং, শ্লীলতাহানি...

নির্ধারিত সময়েই ট্রেন এসে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে আরও কিছু প্যাসেঞ্জার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তবে এ সময় অন্যান্য দিন যা হয়, আজ তার তুলনায় অনেক কম। এক চতুর্থাংশ বলা যেতে পারে।

ভদ্রমহিলা উঠে আমার মুখোমুখি সামনের বেঞ্চিতে বসলেন। ছেলেটি বসল তির্যকভাবে আমার বাঁ ধারে, গেটের ওদিকে, মহিলার মুখোমুখি অন্য বেঞ্চে। এখন ভদ্রমহিলার মুখ স্পষ্ট আমার চোখের লেন্সের আওতায়। সামনা-সামনি বসার জন্যে এমনিতেই চোখ চলে গেল। এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সত্যি ভদ্রমহিলা সুন্দরী। আমার পূর্ব ধারণা ঠিকই। এক ঝলক তাকিয়েই লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিলাম। উনি কিন্তু তখনও আমার মুখের দিকে তাকিয়েই আছেন। এটা এমন কিছু নয়, বাসে ট্রামে এরকম প্রায়ই হয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এর-ওর মুখের দিকে চোখ চলে যায়। কিন্তু আমি ভদ্রমহিলাকে ওয়াচ করছিলাম এই কারণে যে, (হয়ত আমার ধারণা ঠিক নাও হতে পারে) ছেলেটির আবির্ভাব এবং ওইরকম ভাবে দেখা। যদি বিপদ আপদ হয়, আর কিছু না পারি, সামনে গিয়ে পাঁচটা কথা বলতে পারব। প্রয়োজনে ঠাস করে দু'এক থাপ্পড়।

যে যাই বলুক, যতই স্টেশনে জল ঢুকুক, ধস নামুক, পাতাল রেল আমাদের গর্ব। এখানে ডিসিপ্লিন বক্ষিত হয়। আমি কাউকে কোনদিন নির্দ্বিধায়, সিগারেট খেয়ে ছুঁড়ে ফেলতে বা খাবারের ঠোঙা, পানের পিক বা ময়লা জাতীয় কোন কিছু ফেলতে দেখিনি। শিয়ালদা হাওড়ার মত সমাজ-বিবোধী, বেশ্যা গুণ্ডাদের স্বর্গরাজ্য নয়। এখানের পরিবেশ এখনও দূষণমুক্ত। ট্রেন চলাচলেও একটা টাইম মেনটেন করা হয়।

মিনিট খানেকেব মধ্যেই লাউডস্পীকারে নিরমা, সুপার সার্ফ, কৃষ্ণচন্দ্র দত্তের গুঁড়ো মশলার বিজ্ঞাপন শেষ হল। তারপর ঘোষিকার সুমধুর গলার সুর ভেসে এল, "দরজা বন্ধ হচ্ছে। দরজা বন্ধ হো রাহা হ্যায়। ডোরস আর ক্লোজিং। আগের স্টেশন ময়দান, অগলা স্টেশন ময়দান, প্লাটফর্ম ডানদিকে, প্লাটফর্ম ডাইনে তরফ...।"

প্রথমে আস্তে, পরে তীব্রগতিতে ট্রেন ছুটে চলল। মৃদু মৃদু দোলন, নাচুনি। সত্যি পাতাল রেলে ভ্রমণ করার সময় আমার শরীরে এখনও রোমাঞ্চ হয়। সারাদিনের খাটুনি মনেই থাকে না।

হঠাৎ ট্রেন রবীন্দ্রসদন, ভবানীপুর পার হয়ে, 'যতীন দাস পার্ক' ঢুকবো ঢুকবো করছে, নিমেষে আলোগুলি নিভে জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র গুড় গুড় গুম গুম, তারপর ঝনঝন শব্দে ডাইনে বাঁয়ে দুলতে লাগল ট্রেন। শত চেষ্টা করেও কেউ সিটে বসে থাকতে পারছি না, সিট থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছি মেঝেয়। কতক্ষণ এরকম ভয়াবহ কাণ্ড ঘটেছিল, জানি না, যখন জ্ঞান হল দেখি আমি পড়ে আছি মেঝেয়, বাঁ হাতটাতে প্রচন্ড ব্যথা, নাড়তে পারছি না। কানে ভয়ংকর, বীভৎস চেঁচামেচি, কান্নার শব্দ ভেসে এল। অনেকেই পড়ে আছে নিচে অজ্ঞান অবস্থায়, অনেকেই প্রাণপণে দৌড়াদৌড়ি করছে। আমার পাশেই সেই ভদ্রমহিলা সেন্সলেস অবস্থায়। একজন আমার ডান হাত, ভদ্রমহিলার চুল মাড়িয়ে দিয়ে পাগলের মত দৌড়ে গেল সামনের কামরার দিকে। তৎক্ষণাৎ, কোথায় ছিল জানি না, সেই ছেলেটি ছুটে এসে আমাকে তুলে বসাবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি ছেলেটির সাহায্যে উঠে বসে জিজ্ঞেস করি, কি হয়েছে ভাই? ছেলেটি ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলে, কিছু তো বুঝতে পারছি না, তবে ভয়ানক কিছু একটা ঘটেছে। তারপর ভদ্রমহিলাকে দেখিয়ে ছেলেটি বলে, একটু হেল্প করুন, আগে দিদিকে তুলে সিটে শুইয়ে দিই, তারপর দেখছি আগের দিকে যেয়ে, কি হয়েছে।

আমি সংবিত ফিরে পেয়ে, হ্যাঁ— নিশ্চয় নিশ্চয়, বলে, ভদ্রমহিলার কাঁধ থেকে মাথা পর্যন্ত কোনরকমে বাঁ হাতে ধরি, ছেলেটি ধরে পা দুটি। সিটে শোয়ানোর পর ছেলেটি বলে, দিদিকে একটু দেখুন, আমি দেখছি কি হয়েছে।

অজ্ঞান অবস্থায় যা হয় ভদ্রমহিলাব শরীর একেবারে ল্যাদপেদে কাদা। মনে সন্দেহ দানা বাঁধে মরে গেল নাতো? প্রথমে নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে, পরে নাড়ি টিপে দেখি, না বেঁচে আছেন, তবে জ্ঞান নেই। চামড়ার ব্যাগটি তখনও বাঁ কাঁধে, চেন আটকানো থাকায় যে কে সেই। হাতের শপিং-এর পলিথিন প্যাকেটটি পড়ে আছে নিচে। প্যাকেট থেকে প্যান্টের দুটি ছিট, একটি ব্লাউজ, আর কাগজের প্যাকেটে মোড়া একটি ব্রা ছিটকে পড়েছে নিচে। এগুলি তুলে নিয়ে পলিথিন প্যাকেটে ঢুকিয়ে মাথার কাছে রাখি। আমার শরীবে তীব্র উত্তেজনা, ভয়। কি হল হঠাৎ? এদিকে এই অবস্থা। তৎক্ষণাৎ কর্তব্য স্থির করে নিয়ে ভাবি, প্রথমে চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে জ্ঞান ফেরানো যাক্। পরে যা হবার হবে। যা ঘটাব তা তো ঘটেই গেছে। কিন্তু জল পাই কোথায়? আমার পলিথিনের শিশির জল শেষ। টিফিন করার সময় খেয়ে নিয়েছি। তবে মেয়েরা এই সব ব্যাপারে দারুণ হিসেবী, ওনার ব্যাগে জল থাকলেও থাকতে পারে। এই ভেবে ওনার কাঁধের ব্যাগের চেন টানলাম। হ্যাঁ, শিশিতে জল আছে। প্রায় আধ শিশি। শিশি বের করে সামান্য হাতে নিয়ে মুখে চোখে ঝাপটা দিলাম। কাপড় সরিয়ে বুক ঢাকলাম। এভাবে মিনিট দুই-তিন বার বার জলের ঝাপটা দেবার পর, উনি একবার জোরে শ্বাস নিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়লেন এবং চোখ মেলে তাকালেন। যাক বাঁচা গেল। অস্বস্তি কিছুটা লাঘব হল। জীবনে এরকম পরিস্থিতিতে কোনদিন পড়িনি। জ্বর-জ্বালা বা এটা ওটা অসুখে বোনদের সেবা করেছি, কিন্তু একেবারে অপরিচিত, নাম-গোত্রহীন, কোন মহিলার শরীর স্পর্শ করে সেবা এই প্রথম। বমার সান্নিধ্যে যতবার এসেছি, বড জোর একটা কিস, একটু হাতে হাত রেখে উষ্ণতা বোধ ভিন্ন তেমন কিছু ঘটেনি, কিন্তু কেন জানি না এই অকল্পনীয় বিভীষিকার মুহূর্তে, আমার দেহ মনে কেমন একটা শিহরণ, টান উপলব্ধি করি ভদ্রমহিলার জন্যে। এদিকে চিৎকার, চেঁচামেচি, কান্নার শব্দে সমস্ত পরিবেশ ক্রমশঃ ভয়াবহ হয়ে উঠছে।

ভদ্রমহিলা চোখ মেলে প্রথম যে প্রশ্নটি করলেন তা হল— আমি কোথায়? আমি বললাম, এই তো এখানে। এমন সময় ছেলেটি ফিরে এসে বিমর্ষ হয়ে বলে, অনেকে বলছেন জোর ভূমিকম্প হয়েছে, ধস নেমে প্লাটফর্মে ঢোকার দু'মুখ, ট্রেন লাইন সব বন্ধ।

ছেলেটির কথা শুনে ভদ্রমহিলা আঁ আঁ শব্দে, আর্তনাদ করে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়তেই আমার শরীরের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রী কেঁপে ওঠে ভীষণ বেগে। ভয়াবহ এক জটিল পরিস্থিতির কথা ভেবে হাত পা ক্রমশঃ বরফের মত ঠাণ্ডা হতে থাকে। তবুও যতদূর সম্ভব জোর করে বুকে বল এনে পৌরুষকে জাগ্রত রাখবার চেষ্টা করি।

ধীরে ধীরে রাত বাড়তে থাকে। হাতের ঘড়ি দেখি, আটটার কাঁটা ছুঁই ছুঁই। প্রসঙ্গত বলি, এতবড় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পরও ঈশ্বরের অপার করুণা, বিদ্যুৎ বন্ধ হয়নি। যদি বিদ্যুৎ সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যেত তাহলে হয়ত, তিমির অন্ধকারে ডুবে, এতক্ষণ আমরা অনেকেই মারা পড়তাম।

এই রকম পরিস্থিতিতে ভাবতে অবাক লাগে, ছেলেটি যেন ঈশ্বরের দূত। অথচ ছেলেটি সম্পর্কে কত কি খারাপ ভেবেছি। মনে মনে কষ্ট হয়। লজ্জা বোধ করি। ছেলেটি নির্ভয়ে, নির্দ্বিধায় ট্রেনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছোটাছুটি করছে। নিচে পড়ে থাকা যাত্রীদের তুলে সিটে বসিয়ে বা শুইয়ে দিচ্চে। অজ্ঞানদের জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করছে,

সকলকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। বলছে, চিন্তা করবেন না, নিশ্চয় উদ্ধারকারী দল এসে পড়েছে, কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। খানিক বাদেই যে যার বড়িতে পৌঁছে যেতে পারবেন। ইতিমধ্যে শোনা গেল, দু'জন লোক পাগলের মত আপ লাইনে ছুটে যেতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা পড়েছে। ভয়ে আমার গা শিউরে ওঠে। কিছুক্ষণ বাদেই জলের ঝাপটা দিতে দিতে, ভদ্রমহিলার আবার জ্ঞান ফেরে। এবার কোন কথা না বলে উনি নির্বাক বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

শরীরে মৃত্যুভয় ও উত্তেজনা। কী বলব না বলব ঠিক করে উঠতে পারি না। এ মুহূর্তে কে কাকে সাহস দেয়, সান্ত্বনা? তবু নিজেকে সংযত করে বলি, কিছু ভয় নেই। দেখছেন না ট্রেনের সব প্যাসেঞ্জারদেরই একই রকম অবস্থা। আপনি তো আর একা নন। ভদ্রমহিলা কোন কথা না বলে, অতর্কিতে আমার হাতটা ধরে ফেলেন এবং তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন। আমি সহানুভূতি দেখিয়ে বলি, উঠে বসবেন? শরীরে কি কোন কষ্ট হচ্ছে? কোথাও কি চোট লেগেছে? কেঁদে কি করবেন, অদৃষ্টে যা আছে। তবে ভয়ের তেমন কোন কারণ নেই। নিশ্চয় এতক্ষণ উদ্ধারের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে।

— কি কুক্ষণে যে মরতে ট্রেনে এলাম। বাসে গেলেই ভাল হত। ভীষণ ভয় করছে। একটু ধরুন না, উঠে বসি। হাই ব্লাড প্রেসার আছে আমার।

ভদ্রমহিলা সহযোগিতা পেয়ে উঠে বসেন। কাপড় চোপড় ঠিক করে বলেন, আচ্ছা কতক্ষণ লাগবে রেসকিউ আসতে?

আশ্চর্য, কতক্ষণ লাগবে আমি কি করে বলব! তবু নিছকই প্রবোধ দেবার জন্য বলি, এই— এক দেড় ঘণ্টা তো বটেই। উনি কাঁধের ব্যাগটা নিয়ে চেন খুলে, ভিতরে হাত ঢুকিয়ে কি যেন খুঁজতে থাকেন। খুঁজে না পেয়ে বলেন, আমার ওয়াটারপটটা কি হল বলুন তো? আমি পাশে রাখা শিশিটা দেখিয়ে বলি, কিছু মনে করবেন না, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন তো, আমার কাছে জল ছিল না, তাই অন্যায়ভাবে আপনার ব্যাগটা খুলে, জল নিয়ে আপনার মুখে চোখে দিই।

ভীত সন্ত্রস্ত, কাঁপা ঠোঁটে উনি বলেন, ভালই তো করেছেন। তারপর ব্যাগ থেকে পার্স বের করে ওষুধ নিয়ে খান এবং আমার মুখের দিকে চেয়ে বলেন, প্রেসারের ওষুধ সব সময় কাছে রাখতে হয়। ক্লাসে পড়াতে পড়াতে মাথা ঘুরলে খাই।

— অহ, তো আপনি মাস্টারি করেন বুঝি?

— হ্যাঁ।

— কোথায়?

— সাউথ সিঁথিতে। নিউ মার্কেটে কিছু কেনাকাটা করব বলে নেমেছিলাম। আবহাওয়া খারাপ, ভাবলাম তাড়াতাড়ি পাতাল রেলে চলে যাব। তারপর উনি ঘাড় ঘুরিয়ে এদিকে ওদিকে কি খুঁজতে থাকেন। আমি বুঝে ফেলি, সেই পলিথিন প্যাকেটটি খুঁজছেন নিশ্চয়। বলি, কি খুঁজছেন? আপনার প্যাকেট থেকে সব কিছু পড়ে গিয়েছিল, তুলে রেখেছি, ওই যে... আমি আঙুল তুলে দেখাই। উনি প্যাকেটটি দেখে বলেন, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনি না থাকলে যে কি হত!

— ধন্যবাদের কি আছে, সহযাত্রীদের তো বিপদে আপদে দেখা কর্তব্য। আমিও তো, এই দেখুন না, বাঁ হাতটায় ভীষণ চোট পেয়েছি। আমাকেও একটি ছেলে প্রথমে ধরে তোলে।

ভদ্রমহিলা আমার মুখের দিকে চেয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, বললেন না, দেখলাম হতাশায় চোখের পাতা বন্ধ করে, আবার মেলে হেলান দিয়ে পা তুলে বেঞ্চে বসলেন। আমিও আর ডিসটার্ব করা উচিত নয় ভেবে সিট থেকে উঠে পাশের কামরার দিকে পা বাড়ালাম।

সব কামরার লোকেদেরই এক অবস্থা, চোখে মুখে ভীষণ উত্তেজনা, মৃত্যুভয় জড়িয়ে আছে। সকলেরই এক প্রশ্ন, এক জিজ্ঞাসা, কখন উদ্ধারকারী দল আসবে, উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। যে কোন দুর্ঘটনা পৃথিবীর মাটির ওপরে ঘটলে, আর কিছু না থাক, প্রকৃতির মুক্ত আলো বাতাসটা অন্ততঃ পাওয়া যায়। আর এই অতল গহ্বরে, বিভীষিকাময় পরিবেশে, স্নায়ু ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছে। মুখে যতই সাহসের কথা বলা যাক না কেন।

মিনিট খানেকের বেশী থাকতে পারলাম না। মৃত্যু চিন্তায়, শরীরের সমস্ত শক্তি, ধৈর্য যেন ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে দেখি, ভদ্রমহিলা অঝোরে কাঁদছেন। নিজের জীবনের যেখানে কোন নিশ্চয়তা নেই সেখানে অন্যকে প্রবোধই কি করে? তবুও খোঁড়ার অন্ধকে পথ দেখানোর মত, যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলি, আরে আরে, আবার কাঁদতে আরম্ভ করলেন? আপনি না একজন শিক্ষিকা? এতো চিন্তার কি আছে? জন্মেছেন যখন তখন মরতে তো একদিন হবেই......

— না, মানে ছেলেটার জন্যে মনটা খুব খারাপ লাগছে। হয়ত আর দেখা হবে না। আমি না খাইয়ে দিলে ও খায় না। রাতে আমার কাছে শোয়।

— আমি ভদ্রমহিলাকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে বলি, ছেলে কোন ক্লাসে পড়ে?

— এইটে।

— তা, কর্তা তো আছেন? বিপদ আপদ হলে কি করবেন বলুন? এই কথা বলে হাসবার চেষ্টা করি। কিন্তু এই অবস্থায় কি কোন মানুষ হাসতে পারে? তবু যতদূর সম্ভব ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে বলি, শুধুই কি ছেলে? কর্তার জন্যেও মন খারাপ হচ্ছে বলুন? এ কথা শোনার পর দেখলাম ভদ্রমহিলার মুখটা যেন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। জড়ানো গলায় বললেন, কর্তার জন্যে নয়, শুধুই ছেলের জন্যে। তারপর আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করেন, আপনার বৌ-ছেলে-মেয়ের জন্যে নিশ্চই মন খারাপ হচ্ছে? মুহূর্তে আমার ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যায়। মনে মনে ভাবি, জীবনে আমিও চেয়েছিলাম, আপনার মত একটি নারী, ছেলে-মেয়ে। কিন্তু কর্তব্য পালন করতে করতে কোন দিকে যে মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গেল, তাই সংসার করেও সংসারী হওয়া আমার হল না। মুখে বলি, আমি বিয়ে থা করিনি। তবে বাড়িতে বৃদ্ধা মা আছেন। অসুস্থ। তার জন্যে মনটা খারাপ হচ্ছে। কিন্তু কি করব বলুন?

হঠাৎ এ সময়ে সামনের দিক থেকে একটা উত্তেজনাপূর্ণ, বীভৎস, 'জল-জল, জল ঢুকছে'— শব্দের ভয়ার্ত চিৎকার কানে ভেসে আসে। সঙ্গে দুড়দাড়, দুমদাম ছোটাছুটির শব্দ।

সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের স্নায়ু অচল হয়ে আসে। ভদ্রমহিলা চিৎকার শোনামাত্র একরকম প্রায় লাফিয়ে, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সিট থেকে নেমে, আমাকে জড়িয়ে ধরেন। যেন ঠিক স্রোতের মুখে খড়কুটো ধরে বাঁচার চেষ্টা। স্পষ্ট বুঝতে পারি উনি কাঁপছেন থরথর করে।

এখন, এই মুহূর্তে মরণাপন্ন আমি, আমার সহযাত্রীরা, এই মহিলা যে আমার দু'বাহুর বেষ্টনিতে, জীবন্ত ফসিল হতে চলেছি। যেমন একসময় হয়েছিল, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ নরনারী, তাদের সুখের নীড়ের নিচে, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োয়। ইতিহাসে পড়েছি,

'খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে সিন্ধু নদ-এর উপত্যকায় এক সুসমৃদ্ধ ও সুগঠিত সভ্যতার নাগরিকগণ প্রবল বন্যায়, জলোচ্ছ্বাস কিংবা ভূমিকম্পে মাটির নীচে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।' মানুষ, মানুষের কামনা-বাসনা, ভোগ সুখ আরাম অর্থাৎ স্বচ্ছন্দ জীবন প্রবাহ যুগে যুগে বোধ হয় এভাবেই শেষ হয় একসময়। আবাব শুরুও হয় সেই শেষ থেকে। প্রকৃতির আপন খেলাঘরে, পুতুলেব মতই, মানুষের এই জীবন যেন সৃষ্টি স্থিতি লয়ের ছান্দিক সুরে বাঁধা। দুই-পাঁচ-দশ-বিশ কিম্বা তার কয়েক ঘণ্টা পরে আমরা এই অন্ধকার সুড়ঙ্গে ফসিল হয়ে যাব। হয়ে যাব ইতিহাস।

জল ফুটতে ফুটতে একসময় জ্বালানী শেষ হলে যেমন উষ্ণতা হারিয়ে শীতল হয়ে যায়, সেই রকম ধীরে ধীবে আমি ও আমার উত্তেজনা হারিয়ে খিদে-তেষ্টা আর উৎকণ্ঠায় একেবারে নিস্তব্ধ নিথর হয়ে পড়েছি। ধীরে ধীরে আরও জল বাড়ে। সময় এগিয়ে চলে।

মৃত্যু নিশ্চিত ভেবে, এক অকৃত্রিম ভালবাসা, সহানুভূতি, সমবেদনা, সীমাহীন আকাশের মতই আমার বুকের মধ্যে প্রসারিত হয় মহিলাটির জন্যে। উনিও নিশ্চিত মৃত্যু ভেবে নিয়ে বেশ কিছুটা শক্ত হয়ে উঠেছেন ততক্ষণে।

এখন আমরা একই বেঞ্চে পরস্পরের মুখোমুখি বসে আছি। অন্যান্য যাত্রীদের দেহমনেও স্নায়বিক শিথিলতা দেখা দিয়েছে। সকলেই যেন এখন নির্বাক, নিস্তব্ধ। যাদের হার্ট খুবই সবল, একমাত্র তারাই কিছুটা ঘোরাঘুরি কবছে, তাও বিকারগ্রস্তের মত।

ঈশ্বরের অপার করুণা, চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল ঢুকছে, তবে তা খুবই অল্প পরিমাণে। বিদ্যুৎ সাপ্লাই বন্ধ হয়নি। তাই আলোও জ্বলছে এবং পাখাও ঘুরছে। জল এখনও কামরার মধ্যে ঢোকেনি, বেল লাইন ছুঁয়ে আছে। বাত তখন প্রায় দু'টো, (ঘড়ি অনুযায়ী) ওনার ক্লান্ত, বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে বলি, খুব খিদে পেয়েছে আপনার? আমার ব্যাগে বিস্কুট আছে, খাবেন?

— হ্যাঁ, বের করুন। নির্দ্বিধায় উনি বলেন।

আমার পেটে আলসাব আছে। খালি পেটে থাকা চলে না, তাই সব সময় বিস্কুট কাছে রাখি। খিদে পেলেই দু'একটা খেয়ে নিই। ব্রিটানিয়া মেরীর প্যাকেট থেকে মাত্র দু'টো বিস্কুট খরচ করেছি অফিসে। প্যাকেটটি ব্যাগ থেকে বের করে ওনার হাতে দিয়ে বলি, নিন, খান।

এখনও ওনার নামটি আমি জানতে পারিনি। জানতে ইচ্ছে করে। তাই বলি, এতক্ষণেও আপনার নাম জানা হয়নি। কি নাম আপনার?

— আমার নাম উমা পাল। ভদ্রমহিলা আমার হাত থেকে বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে নিজের নাম বলে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার নাম? তারপর চারটি বিস্কুট প্যাকেট থেকে বের করে উনি আমার দিকে এগিয়ে দেন। বিস্কুট হাতে নিয়ে আমি বলি, আমার নাম কুমার রায়। আমার নামের সঙ্গে জীবনের কেমন মিল বলুন?(কথায় ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা মাত্র)।

উনি কিছুটা সহজ হয়ে বলেন, তাই বটে।

তবুও কথাগুলি কোমল কাঁটার মত বেঁধে আমাকে। আমি ওনার চোখ ও মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিই।

জানালার স্বচ্ছ কাঁচের মধ্য দিয়ে তাকালেই দেখা যায় এবড়ো-খেবড়ো দেওয়াল। মোটা মোটা আট দশটি নলের ভিতর দিয়ে বিদ্যুতের তারগুলি এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত চলে গেছে। মাত্র হাত দুই তিন দূরত্বে দেওয়াল। বারবার সেদিকে চোখ চলে যায়।

কামরার মধ্যে বিভিন্ন বড় বড় ছবি বাঁধানো অবস্থায় ট্রেনের দেওয়ালের সঙ্গে সাঁটা। কাশ্মিরী রমণী, রঙচঙে ঘাঘরা পরে হাসছে। দার্জিলিং-এর চা বাগানে চা তুলছে সুন্দরী নেপালী মহিলারা। জীবন্ত প্রাণবন্ত মনে হয়। এখন ওরা যেন শুধুই ছবি নয়। আমাদের সমব্যথী জীবন্ত মানব-মানবী।

চারটি বিস্কুটের দু'টি খেলাম, দু'টি উমার অজান্তে পকেটে রাখলাম। উনিও বোধহয় একটি কিম্বা দু'টি খেয়ে প্যাকেটটি মুড়ে আমার হাতে দিলেন। আমি বেশী খাবার জন্যে অনুরোধ করলাম না। কারণ কথায় আছে না, "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ"। শ্বাস থাকলেই মানুষ মুমূর্ষু অবস্থাতেও বাঁচার আশা পোষণ করে। যতক্ষণ প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ তো এই বিস্কুট ভরসা। খাবার জল শিশিতে কমই ছিল। প্রায় ঢোক দুই। তারই একটু খেয়ে নিয়ে উনি আমার দিকে শিশিটা এগিয়ে দিলেন। আমি কোন রকমে গলা ভেজাতেই জল শেষ। জল ফুরোতেই আমার মনে হল, আমি এতক্ষণ অর্বাচীনের ভাবনা ভাবছিলাম। কারণ বিস্কুট খেলেই জল খেতে হবে। জল না থাকলে বিস্কুট খেয়ে জীবন বাঁচানো কঠিন। যা-হোক, বিস্কুট খাবার পর আমি মনে ও প্রাণে কিছুটা স্বস্তি অনুভব করি। গভীর একটি নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে শ্বাসনালী দিয়ে।

কথায় আছে একটি মানুষের সঙ্গে কোন কোন সময়ে সাত পা হাঁটলে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নিশ্চিত মৃত্যুর পূর্বে আমার বড় আপন মনে হতে থাকে উমাকে। উমা যেন এই মুহূর্তে আমার জীবন-সঙ্গিনী। ওর স্পর্শ, আলিঙ্গন আমাকে এক বিচিত্র অনুভূতির রেশে আচ্ছন্ন করে রাখে। চাকরির সুবাদে আমার ভাল ইনকাম আছে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন আছে, মাকে নিয়ে একটা সংসারও আছে। কিন্তু নেই প্রকৃত আপন করে ভালবাসার জন। উমার দৃপ্ত চোখের সহানুভূতি, কথাবার্তা, সবই যেন কত আপন। কিন্তু উমা যে পরস্ত্রী? যা-হোক, তবুও ওর প্রতি গভীর মমত্ব ভালবাসার টান উপলব্ধি করে আমি আমার সংসার, ওর সংসার, অফিস প্রভৃতির গল্পে উমাকে ভুলিয়ে রেখে সময় কাটাতে চেষ্টা করি।

রাত তখন প্রায় চারটে। বিষণ্ণ এই পরিবেশের মধ্যেও যখন আমার বুকে একটা তীব্র, অস্বস্তিকর অনুভূতি আমাকে এলোমেলো করে দিচ্ছে, উমা ধীরে ধীরে এগিয়ে নিবিড় হয়ে কাছে বসে বলে, কুমারবাবু, আমরা এখন খুব কঠিনতম যন্ত্রণা আব পরিস্থিতির মধ্যে আছি, তাই না? আমি উমার এই তাত্ত্বিক, দর্শনসুলভ প্রশ্নে কেমন বিস্মিত হতবাক হয়ে যাই। বলি, হ্যাঁ।

আমার মুখে 'হ্যাঁ' শুনে উমা হেসে উঠে। সে হাসি বড় তাৎপর্যময়, কঠিন এবং কোমল।

তবে কি উমা অতৃপ্ত... ওর স্বামীকে নিয়ে সুখী নয়? ঠিক এমন সময় জলের রেখা ট্রেনের কামরার কানা ছুঁয়ে ভেতরে সূক্ষ্মগতিতে প্রবেশ করে। জল দেখে আমি খুবই ভয় পেয়ে যাই। চেঁচিয়ে বলি, এই দেখুন, জল ঢুকছে, কামরায়। উমা ভাবলেশহীনভাবে প্রথমে জল, তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে ঠিক তেমনভাবেই আবার হেসে ওঠে, বলে, ঢুকুক, মরতে হয় মরব। আমি উমার হাসি ও কথাবার্তায় চমকে উঠি, মেয়েটা কি ভয়ে পাগল হয়ে গেল নাকি...

কিন্তু কথাবার্তায় হাবভাবে তো তেমন কিছু মনে হচ্ছে না। বরং আগের চেয়ে মনোবল দৃঢ় হয়েছে বলেই মনে হয়। তবু সন্দেহ নিরসন হয় না। বলি, তোমার ভয় করছে না? উমা আগের মতই দৃঢ় কণ্ঠে বলে— না। আমি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে উমার মুখের দিকে নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি, ভাবি, জীবনের তুচ্ছতার কথা। আমার মনে

হয় মানুষের অহংকারের উর্ধ্বেও হয়ত এমন কিছু আছে যা চিরন্তন, যা আনন্দময়। মৃত্যু যদি আসেও, যদি তলিয়ে যাই মানুষের বিস্মৃতির অতলে, তবুও দুঃখ নেই। জীবনের করুণতম ও মধুরতম এই সময় বিলীন হয়ে যাক শাশ্বতের বুকে।

।। ৪

কব্জির ঘড়িতে সময় এগিয়ে চলে। একসময় তা চারটে পেরিয়ে ছটার ঘর ছোঁয়। বাইরে রাতের অন্ধকার কেটে গিয়ে হয়ত সুন্দর সকাল হয়েছে। হয়ত সাইক্লোনের দাপটে ঝড়ের গতিবেগ, বৃষ্টির তাণ্ডব বেড়েছে নয়ত কমেছে। কিন্তু আশ্চর্য, কলকাতার দমকল বাহিনী, পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সরকার, অগণিত মানুষজন সবাই কি ঘুমিয়ে পড়েছে? নাকি ভূমিকম্প, বঙ্গোপসাগরের জলোচ্ছ্বাসে সমস্ত কলকাতা শহর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? এখনও কেন কোন উদ্ধারের সংকেত পাওয়া যাচ্ছে না? এখানে এখন সকাল, দুপুর , বিকেল বলে তো কিছু নেই। শুধু ঘড়ির কাঁটার সংকেতে দিনরাত কল্পনামাত্র। আমার কান্না পায়, তা দলা পাকিয়ে গলা দিয়ে উঠে আসতে থাকে, কিন্তু উমার কথা ভেবে কাঁদতে পারি না।

এইরকম অবস্থায় যখন ঘড়ির কাঁটা প্রায় বেলা বারোটার কাছাকাছি, তখন জল বেঞ্চ ছুঁই ছুঁই। কিছু যাত্রী খিদে, তেষ্টা, ভয়, উৎকণ্ঠায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। ছেলেটি আগের মতই ট্রেনের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত জল ভেঙে ছোটাছুটি করছে। যেন ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল বা মাদার টেরিজা। বোঝা যাচ্ছে ওর মুখেও খিদে, তেষ্টা, ভয়, উৎকণ্ঠার ছাপ স্পষ্ট। তবুও মুখের সেই সরল হাসিটা অমলিন। সেই সান্ত্বনা বাক্য, "কিছু চিন্তা করবেন না, মনে হয় একটু পরেই আমরা সব উদ্ধার পেয়ে চলে যেতে পারব।" আমি চোখ বুজে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ঈশ্বর, যেন ছেলেটির কথাই সত্যি হয়।

উমা আমি বসে আছি বেঞ্চে, পা তুলে। জল, আর আধ হাত ওপরে উঠলেই সিট ডুবে যাবে। এখন প্রতিটি শব্দই যেন কানে ভোঁতা আর বিশ্রী লাগছে। বুকের মধ্যে সূক্ষ্ম অনুভূতি যেন বৃদ্ধ স্থবির। উমার সঙ্গে কথাবার্তায় কখন যে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছি টেরই পাইনি। এই যক্ষপুরীতে উমা যেন কবিতার মত আশ্চর্য-সুন্দর-স্নিগ্ধ। ওর কথাবার্তা সাহস দেখে আমার মনে হচ্ছে ও যেন এখন এই পৃথিবীর তুচ্ছতার অনেক উর্ধ্বে। ওর জীবনটা যেন বাধাবন্ধনহীন, 'মুক্ত বিহঙ্গের'মত।

চরম বিভীষিকার মধ্যে এভাবে প্রতিটি মুহূর্ত, সেকেন্ড, মিনিট, গড়াতে গড়াতে কেটে যায় আরও ঘণ্টা চারেক। উমা এখন আরও নিবিড়ভাবে আমার শরীর স্পর্শ করে। ওর বিধ্বস্ত, ক্লান্ত মুখে হাজার সূর্যের হিরণ্ময় দ্যুতি। জল আরও বেড়েছে। স্পর্শ করেছে আমাদের শরীর।

তখন সময় কত হবে জানি না। একটা প্রচন্ড হৈ-চৈ শব্দ শোনা গেল। আমি বুঝে নিলাম চরম মুহূর্তে পৌঁছে গেছি।

উমা নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে আমার দিকে। পূর্বেব মতই ভাবলেশহীন তার দৃষ্টি। হঠাৎ সেই মুহূর্তে সামনের দিক থেকে ভেসে এল ভয়ংকর করুণ স্বর, আর্তি 'বাঁচাও বাঁচাও'। আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলেছি। হয়ত দু'চার মিনিট চোখ বন্ধ করেই ছিলাম, হঠাৎ দেখি সবাই দৌড়াদৌড়ি করছে। সেই ছেলেটি জল ভেঙে ছুটতে ছুটতে আমাদের কাছে এসে বলে, শিগগির চলুন, উদ্ধারকারী দল এসে গেছে।

আনন্দের আতিশয্যে আমার শরীরে তখন কম্পন আরম্ভ হয়ে গেছে। কোন রকমে উমাকে বলি, চল, ঈশ্বরের অপার করুণা, আমরা এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, উমা ভাবলেশহীন নিথর, নিস্পন্দ। ছোট বালিকার মত তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ভাবি, মেয়েটা কি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেল? নাকি মানসিক চাপে স্নায়ুবৈকল্য ঘটেছে? আমি উমাকে একরকম হাত ধরে টেনে তুলে, দ্রুতগতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যাই।

একটি কি দুটি লোক আসা যাওয়া করতে পারে, গুহার সুড়ঙ্গের মত পথে উদ্ধারকারী দলের সাহায্যে আমরা বাইরে এসে পৌঁছই। বাইরে তখন পুলিশ, মিলিটারি, দমকলবাহিনী, ডাক্তার, নার্স প্রভৃতি কয়েকশ লোক। তখনও মৃদু ঝড় বইছে, বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ করে।

বাইরে বেরিয়ে এসে কেন জানি না, আনন্দ, উৎফুল্লতা হারিয়ে কেমন যেন বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ি। শরীর খারাপ লাগে। উমার মুখের দিকে তাকাতে পারি না। মিনিট পাঁচেক এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর ডাক্তারি পরীক্ষা হয়। ডাক্তার চেক আপ করে গোটা দুই করে টাবলেট আমাকে এবং উমাকে খাইয়ে দেন।

এমন সময়ে ভিড় ঠেলে খুঁজতে খুঁজতে সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান, টাকমাথা এক ভদ্রলোক একটি ছেলেকে নিয়ে আমাদের কাছে হাজির হন। ভদ্রলোকের চোখে মুখে চরম উত্তেজনার ছাপ। ছেলেটি একরকম ছুটে এসে 'মাম্মি মাম্মি' বলে উমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করে। উমা সযতনে ছেলেটির মাথার চুলে হাত বোলায়, চুমু খায়। দু'চোখ বেয়ে শ্রাবণ ধারার মত অশ্রু নেমেছে তখন উমার চোখে।

আমার বুকের ভেতর তখন অসহ্য একটা চাপা যন্ত্রণা। হিম শীতল একটা শিরশিরানি ভাব শরীরের ওপর থেকে নামতে থাকে নিচের দিকে। ওদের কিছু না বলে নিঃশব্দে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবার চেষ্টা করি। অজস্র ছাতা, কালো কালো মাথাব ভেতর দিয়ে কিছুটা এগোতেই একটি করুণ সুর কানে ভেসে আসে।

উমার গলার স্বর ক্রমশঃ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। আমার পায়ের গতি বাড়ে।

বিদ্যাসাগরের বর্ণমালা

অসীম ত্রিবেদী

ওইতো যাচ্ছে, শুকি যাচ্ছে দোকানে। বাবুবাড়ির বারোমাসের কাজের মেয়ে শুকি। একহাতে ঝুলছে ব্যাগ, অন্য হাতের মুঠোয় একশোটাকার নোট। দিদিমণি পইপই করে বুঝিয়ে দিয়েছে কত নেবে দোকানদার একশিশি হরলিক্স বাবদ, এক কিলো চিনি বাবদ, আর ঠিক কত ফেরৎ দেবে। আরও বলেছে জিনিষদুটোর দাম কাগজে লিখিয়ে নিবি। তাই শুকি যাচ্ছে 'চ-য় হস্যি দইস্তেন-য় হস্যি চিনি, ম য়হস্যি মদ্ধেণ ষ-য় ট-য় হস্যি মিষ্টি' একটু টেনে টেনে গানের মত 'চি-নি মি-ষ্টি' গুণগুণ করতে করতে।

যেতে যেতে, পৃথিবীর এই একটুকুনি জায়গা দিয়ে যেতে যেতে, পথের কিনার ঘেঁষে যেতে যেতে— যেন শুকির জন্যে পথের একচিলতে অংশও নয়, পথের প্রান্তের জন্যেই শুকি— হঠাৎ একটু কোনও নিরাকার বন্ধুর সঙ্গে এক্কাদোক্কা খেলে নিচ্ছে। পায়ের আঙুলের টোকায় চাপ্পু সরিয়ে সরিয়ে খোপ কাটাকাটা ঘরগুলো খালি পেরিয়ে যাওয়া আর পেরিয়ে যাওয়া। এই বয়সের ছেলে-মেয়েরাতো সোজা হাঁটেনা, নিয়মমেনে হাঁটেনা, শুকিও ঠিক তাই। পথ চলতে চলতে বন্ধুত্ববিহীন অদৃশ্য কোনও বন্ধুর সঙ্গে আচমকা আচমকা এক্কা দোক্কা খেলে নেয়। ফেরারপথে হাতে ব্যাগের ভার, জিনিসের দামের ভার ভারী হয়ে থাকা সেই নেই বন্ধুর সঙ্গে একা একা গল্প করতে করতে পথের কিনারের ক্ষীণ রেখা ধরে হেঁটে আসা বুইলি কেলো, চিনি দে পায়েস হবে— প-য় আকার উন্তস্থ্-র একার দইস্তেস, পায়েস, চিনিদে রসগোল্লা করতি পারে দিদ্‌মণি— রস গ-য়ওকার ল-য় লয় আকার গোল্লা ভত্যি রস একবারে হ্যাঃ হ্যঃ হ্যাঃ...

তো এই যে শুকি, যে শুকি বাবুবাড়ির বারোমাসের কাজের মেয়ে— শুকির জন্মের দু-তিন বছর বাদে যখন মেয়ে ছাপরা লাইনবস্তীর গলিতে অলির মত ছুটে বেড়াতে শিখেছে তখন মেয়ের গোরা পানা রং দেখে ওদের ওই ছাপরা লাইনের যাত্রাপাগল, কীর্তন পাগল, নাড়ু, ডিমবেচা নাড়ু, সুতরাং ডিমনাড়ু বলেছিল ঃ

আহা-হা, মাইয়ার রংখান্ কি, য্যান্ শুক্লপইক্ষের চন্দ্রা! এইবলে ডিমনাড়ু ওর নাম রেখেছিল শুক্লা। কিন্তু বাবাকেলে টিনের চালের ছাপরাইয়া লাইনের বাসিন্দাহলে যেমন জনাকতক নাড়ুগোপালের নাড়ুর পর গোপালের মর্যাদাটুকু আর খুব বেশিদিন থাকে না, কেবলনাড়ু— তাও শুধু নাড়ু নয়, ডিমনাড়ু, ফুচকানাড়ু বা বুটপালিশ করনেওলা পালিশনাড়ু ইত্যাদি আত্মপরিচয় ঘটে তেমনি একই আবহে গিঁটমারা দড়ির প্যান্ট বা বাবুবাড়ির বাতিল ফ্রকের জগতে বাড়তে থাকা মেয়ের শুক্লা নামও বেমানান হয়ে পড়ে। ফলে এক বিচিত্র লোকায়তকরণে কালে কালে শুক্লা থেকে শুল্লা হয়ে শুকা মারফৎ হয়ে যায় শুকি। তাতেও শেষ নেই, শুধু শুকি হলে হয় না— ঠিকে শুকি, মাসকাবারী শুকি, না বারোমেসে শুকি।

আমাদের যে শুকি সে হল ঐ তিনজনের মধ্যে সবচে' ছোটটি—বারোমেসে শুকি। এই সবে বছর বারো বয়েস হল। এখনকার এই বাবুবাড়িতে গেল প্রায় দু'বছর একটানা কাজ করে চলেছে। মাসকাবার হলে পিতা কিংবা বাবা নয় বাপ এসে গুণে গুণে একশোটি টাকা নিয়ে যায়। তারপর সে টাকায় বুলফাইটার কি ধেনো ঝাড়ে। সারারাত শূন্য বোতলের সঙ্গে, অন্ধকারের সঙ্গে রাস্তায় গড়াগড়ি খায়। অবশেষে পাখিসব রব করে রাতি পোহাইলে তিনি উত্তিষ্ঠত জাগ্রত হন এবং মুহ্যমান বিহঙ্গের মত ঘরে এসে শুকির মাকেও ঠ্যাঙায়, আর আর ভাইবোনদেরও ঠ্যাঙায় কোন ঐতিহাসিক আক্রোশে তা সে নিজেও না, কেউই জানে না। অবশেষে নিজের আগুনে নিজেই ভস্মাবশেষ হয়ে এলিয়ে পড়ে ঘরের মেঝেয়—অবশ্য যদি তাকে মেঝে বলে, কিংবা যদি ঘর বলে।

ফ্লাশব্যাকের এইসব ঘটনা কাজের বাড়ির দিদিমণির জানা। না, শুকি কখনো সাতকাহন বাখান করতে বসেনি। তবে কখনো সখনো শুকির মা এসে পড়লে সুযোগমত এসব পাঁচালী পেড়ে যায় যাতে করে মেয়েটা আর একটু দয়া, একটু বাড়তি খাওয়া, কিছু বেশি মনোযোগ পায়। দিদিমণির দয়ার শরীর ও ভারী দয়ামতী মন। তবে এদান্তে সামান্য খিটখিটে হয়েছেন এই দেখে যে, টিভি কি খবরের কাগজ, মেয়েদের পত্রিকা বা এক বড় পাত্তি ভিজিটের বিশেষজ্ঞ সমাজসেবী ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মোতাবেক এমন কোন ভিটামিনযুক্ত খাবার নেই যা মেয়ে পিংকিকে খাওয়ানো হয় না। তথাপি মেয়ের কাঠিসার দেহ, মুখে অরুচি, ভুরুর ফাঁকে সর্বক্ষণ রেললাইন পাতা। অথচ বারোমেসে শুকি এঁটো কাঁটা ফেলনা খাবারদাবার খেয়েই কি ফুলো গতর মা! যেন বাচ্চাহাতি! আর খিদেও বলিহারী! এই তো সাড়ে আটটায় পিংকির বাবার পাতে চারটি ভাত ছিল, সেগুলো সাঁটালো, সাড়ে ন'টা নাগাদ পিংকিকে স্কুলবাসে উঠিয়ে এসে ওর পাতের মাখা ভাত, মাছের ভাঙা মুড়ো খেয়েই আবার কালরাতের বাসি তিনটে রুটি আর এক খাবলা গুড় নিয়ে বসেছিল। এত কিছুর পরেও এই যে এখন ঘরে বিছানাপত্তর, বারান্দায় ডোযো-ঢাকনা এলোমেলো পড়ে আছে সেদিকে মন নেই হাতির, বর্ণপরিচয় খুলে একমনে পড়ে যাচ্ছে—আম খ-য় আকার, ব, খাব, খেয়েই মরবে।

পিংকি হাজারহোক বাচ্চা মেয়ে। বর্ণপরিচয়ের অনেক বানান তার মুখস্থ বলেও অনেক শব্দরই মানে তার জানা নেই। তাই শুকি দিদিমণিকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করে, দিদিমণি অ ত-য়ে য-ফলা আকার চ-য়ে আকার ব-য়ে শূনর, অত্যেচার মানে কি গো?

রাগে দিদিমণির সর্বাঙ্গ রি রি—সারা ঘর উলঢুল, কাজের পাহাড় জমে রয়েছে —এদিকে এমেয়ে খালি গিলবে আর 'অত্যাচার অত্যাচার' করে মাথা খারাপ করে ছাড়বে।

এই যে এই শুকির হাতে বর্ণপরিচয় উঠে আসা, এর একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। গেল কয়েকবছর যাবৎই চারদিকে সাক্ষরতা-সাক্ষরতা আওয়াজ, ইদানিং অবশ্যি সে বাজনা বেশ দূরে সরে যাচ্ছে পুজোর বিসর্জনের চলমান বাজনার মত, এখন আর তেমন বেশি বেশি বেশি করে টিভিতে সেই এক অজানা কমলার নাম সই করার ব্যাপার-স্যাপারও দেখায় না। গোড়ার দিকে পাড়ায় পাড়ায় দিচ্ছে ডাক, নিরক্ষরতা নিপাত যাক—এর ছেলেরা শুকিকে তাদের সন্ধেবেলার ক্লাসে বাগিয়ে নেবার খুব মতলব করেছিল, সফল হয়নি কেননা, দিদিমণি নিজেই দায়িত্ব নিয়ে বলেছিলেন যে, শুকিকে তিনি নিজে বাড়িতে পড়াবেন।

কাজের ভিড়ে, ব্যস্ততার মধ্যে কখন সে প্রতিজ্ঞা কোন আকাশে অস্তে চলে যায়। অথচ এখন যখন সাক্ষরোত্তর পর্বে চার দিকে 'চল পড়াই কিছু করে দেখাই'-এর ঝোঁক তলানি হয়ে আসছে এমত সময় দিদিমণির মনে কি এক কস্তুরী জাগে এবং বাড়িতে বর্ণপরিচয়

খাঁজাখুঁজি শুরু হয়। শেষমেশ জুতোর কালি ব্রাশ এসব রাখার পিজবোর্ড বাক্স সরিয়ে পিংকির বাতিল বর্ণপরিচয়খানা বেরিয়ে আসে। একগাল হেসে দিদিমণি বলেন।

নাহ, শুকি তোকে এবার লেখাপড়াটা শেখাবই।

এই কথা বলে বারোমেসে শুকির হাতে ধূলো ঝাড়া, জুতোর কালির দাগমোছা বর্ণপরিচয়টা ধরিয়ে দিদিমণি সেই প্রথম চেনালেন—

এই দেখো এই হচ্ছে বিদ্যাসাগর।

তো শুকি দেখে, মাড়োয়ারীদের ক্যালেণ্ডারের মত জাবড়া জাবড়া রঙে করুণ ও বিরক্ত একটা বুড়োমানুষের মুখের ছবি। সে মুখচ্ছবি দেখে তার তেমন আবেগ-টাবেগ না জাগলেও ঠাকুর প্রণামে অভ্যস্ত হাত ঠিকই কপালে ঠেকায়। তারপর আবারও একই বৃত্তান্ত। দিদিমণির মরণশীল আবেগ সমূহের অন্যতম সাক্ষরতা আবেগও অকালে পরমায়ু হারায়। ফলে অক্ষর পরিচয় হবার পর পিংকিই শুকির পড়াশোনার দায়-দায়িত্ব বুঝে নিয়েছিল পাকা বুড়ির মত। বাচ্চামেয়ে, মাস্টারি করার এমন মজার সুযোগ, যখন তখন চ্যাটাস-ফ্যাটাস চ্যাঁটানোর সুযোগ ছাড়ে? শুকির শিক্ষা, বরং বলা ভাল, কচি মাস্টারনীর হাতে, নতুন প্রজন্মের হাতে কখনো প্রকাশ্যে কখনো আবডালে ঠিকঠিকই এগিয়েছে। শুকি বর্ণের পাপড়ি থেকে অক্ষরপুঞ্জে, সেখান থেকে বাক্যমালিকায় ঠিকঠিক এগিয়েছে।

অবিশ্যি দিদিমণির না পারার বাস্তবিক কিছু কারণও আছে। সারাদিন হেঁশেল ঠেলা, তার ওপর পিংকির পড়া আছে, গান আছে, আবৃত্তি-আঁকা যোগাসন-সাঁতার—একই অঙ্গে একের ভেতর ছয় সাফল্যের চেষ্টা আছে! তার জন্যে দিদিমণির দিনে ও রাতে ঠাসা রুটিন। এই যেমন সন্ধেবেলা পিংকিকে পড়াতে আসবেন আন্টি। তাঁকে চা-টা, এটা-ও-টা করে দেওয়া, মিষ্টি হাসি দেওয়া আছে। তারপর হল গিয়ে টিভির বাক্স ভর্তি দিশি-বিদেশি সিরিয়াল আছে। আন্টি চলে যাওয়ার পরেও পিংকির পড়াশোনা আরও খানিকদূর টেনে যাওয়া আছে। কেননা, পিংকির বাবার তো আসতে আসতে রাত নটা! তিনি যেখানে কাজ করেন সেখানে অনেক টাকা—ফোলিওয় টাকা, পাশপকেটে টাকা, বুক পকেটে এবং পাছাপকেটেও টাকা। সেই অনেকটাকার চাকরি শেষে পিংকির বাবা বাড়ি ফিরলে তাঁর গায়ের কাছাকাছিই দিদিমণিকে থাকতে হয়, টাকা গুণতে হয়। গুণতে গুণতে গুণ গুণ করে গান জাগে গলায়—কিছু বাণী, কিছুটা লালালা কিছুটা উঁহু উঁহু...

তা এই যে শুকির বারোবছরের জীবন কিংবা এই যে প্রায় দু-বছরের বারোমেসে জীবন সেখানে বর্ণপরিচয়ের আলোড়নের পর এক নতুন আলোড়ন ঘটে গেল হঠাৎ। দিদিমণির মাসতুতো দেওব এলেন রাজধানী কলকাতা থেকে। খুব মানী লোক, সজ্জন লোক। পরোপকারী হিসেবে দেশজোড়া নাম। অনাথ বাচ্চাদের অনেকগুলো আশ্রম চালান। বস্তির বাচ্চাদের জন্যে খানকয়েক স্কুল করেছেন বাবু। হাসিহাসি মুখ। কথা বললে গলার স্বরে যেন গান বেজে ওঠে।

তখন বেলা এগারোটা। দাদাবাবু সেই কোন সকালে অফিস চলে গেছেন। পিংকিও অনেক আগে স্কুলবাসে স্কুলে গেছে। দিদিমণি শুকির গাদাগাদা খাওয়াদাওয়া নিয়ে খুব খানিক খোঁটা দেওয়ার পর দুজনে মিলে ঘরদোর ঝাড়া ঝাঁটা মোছা সারা। এরপর শুকি সকালের এঁটো বাসন মাজবে, তারপর সাবান-জলে বাসি জামাকাপড়গুলো থুপবে, শেষে একটু জিরিয়ে নিয়ে চান। এদিকে দিদিমণি শাড়ি পরে পরিপাটি— ওই মোড়ের মাথায় বিউটি পার্লারে যাবে আগু-পিছু চুল ছাঁটাতে। এমন সময় বাবু এলেন। এসে দিদিমণির সঙ্গে কি যে কঠিন কঠিন বাংলায় আলাপ করলেন, শুকি তার আগা-মাথা কিছুই বোঝে

না। শুধু দিদিমণি আর বাবু যখন নিজেদের দুঃখের কথাগুলো গল্প করছিলেন তখন বাংলাভাষাটা বেশ সরল হয়ে এল আর শুকিও জানতে পারল যে, বাবুর ভারী দুঃখ। বাবুর একটা বৌ আছে, তাঁর নাম ডলি— সেই ডলি বৌমণিরও খুব দুঃখ। কেননা ওনাদের বাড়ির এতদিনের কাজের ছেলেটা বিয়ে করে পালিয়ে গেছে। এতগুলো অনাথ আশ্রম চালায় যে মানুষ তার কলকাতাতেই সারাক্ষণের কাজের বারোমাসের ছেলে মেয়ে পাওয়াই যাচ্ছে না, সব্বাই নাকি ছোটমোট প্লাস্টিক কারখানা, টিভির যন্ত্রপাতির কারখানা, গুলকয়লার কারখানায় ঢুকে পড়েছে। এ অশ্রুতপূর্ব তথ্যটি শুকি কান দিয়ে গ্রহণ করে সিধে মগজের একটা খোপে ঢুকিয়ে দিতে দিতে শোনে— 'আমাদের কি হবে' ভেবে ডলি বৌমণির খুব মন খারাপ। বাবুর মন তাইতে আরও খারাপ। বাবু সেই খারাপ মন একটুখানিক ভাল করতে এখানে এসেছেন।

দিদিমণি বিউটি পার্লারে যাওয়া লাটে উঠিয়ে চা-টা করে দিলেন দেওরবাবুকে। এমন প্রতাপশালী দেওরের জন্যে এটুকু আত্মত্যাগ কিছুই না। বাবু চা-জল খেয়ে একটু ঠান্ডা হলে দিদিমণি তাঁকে নিয়ে পড়লেন—

তোমাকে গেলবছর যে বাচ্চা ছেলেটা দিলাম সেটাকে কোথায় দিলে?

সে তো বম্বের ছোটমাসীকে দিলাম।

তো এখন নিজের দরকারে নিয়ে এস ওটাকে।

কি করে আনব? ছোটমাসী আবার সেটাকে দুবাইতে কোন এক পাঞ্জাবী বন্ধুকে দিয়ে দিয়েছে।

তাহলে? এখন কি হবে?

সেইটাইতো ভেবে পাচ্ছিনা!

আচ্ছা তোমার ঐ অনাথ আশ্রম বা ঐ বস্তির ইস্কুল থেকে কোন বাচ্চাকে—

মাথাখারাপ! কাগজওয়ালারা তাহলে ছিঁড়ে খাবে। তাছাড়া ওরা একটু বড় হলেই গালফে, সাউথ ইস্টে যেতে চায—চাইবেই, টাকা অনেক বেশি পায়।

দিদিমণি চুপচাপ শোনে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে। ঠিক আছে তুমি চান টান করে রেস্ট নাও, আমি তোমার ফেবারিট ডিশটা বানাই— তারপর দেখছি। কিছু একটা নিশ্চযই—

দিদিমণি হুশ করে আলোচনা ছেড়ে উঠে পড়ে। তারপর শুকিকে যথাযথ নির্দেশ সহকারে বাজারে পাঠায়। শুকি চিকেন সেন্টার থেকে দু'কেজি ব্রয়লার হাতের ব্যাগে ঝোলাতে ঝোলাতে আসে আর সুরেলা বানান কবে—

ম-য় আকার অনুস্বার দইন্তে স মাংস, খ-য়ে আকার ব খাব। মাংস খাব...

ঘরে ফিরে দেখে বাবু চান সেরে একমনে সিগারেট টানছে। দিদিমণি চানে ঢুকছে— দিদিমণির চান মানে তো আধঘণ্টার নীচে না!

শুকির বানান করা সুরেলা 'মাংস খাব' শুনে বাবুর মিষ্টি হাসি। নাম জিজ্ঞেস করেন, গাল টিপে দেন, বলেন— বাহ! এই একটা কাজের কাজ করছ শুকদিদি, লেখাপড়া শিখছ। যাও, মাংসটা রেখে এস দিকি। তোমার সঙ্গে একটু গল্প করা যাক।

না বাবু, আমার অনিক কাজ রয়িচে। দিদমণি যদি গপ্পো করতি দ্যাকে তালি মারবে খুব।

এতে বাবু ভারী রেগে যান। বলেন,

মারুক দিকি। আমি আছি না! তারপর, যদিও দিদিমণি চানঘরে, গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করেন,

তোমায় এরা মারে?

না না, দিদ্‌মণি খুব ভাল। তবে এক আধসময়ে মেজাৎ গরম হলি পরে চড়িয়ে দেয়—ঐ আমনার এট্টু খেঁচো পেয়ারী ধরনের কিনা।

আর পিংকি কিছু করে না তো?

না, পিংকি তো আমারি পড়ায়, লেকায়। না পাল্লি পরে জুতো ছুঁড়ি মারে।

ছিঃ।

ঐ একটা সবিসর্গ ধ্বনিও শব্দে শুকি বাবুকে চিনতে পারে। তার মনে আষাঢ়ের বাতাস জাগে! কেমন আহ্লাদি বৃষ্টি-বৃষ্টি গলায় বলে—

আমনি বসেন বাবু, আমি আসতিছি।

বাবু হেসে বলেন— বাবু কিসের, অ্যাঁ? তুমি আমাকে দাদা বলবে,

শুকি ফের বাবুই বলে ফেলে, বাবু নরম স্বরে বলেন, বাবু না-রে পাগলি. দাদা বল দাদা।

শুকি বলে, দাদাবাবু।

দাদাবাবু শুধরে দেন, শুধু দাদা— নো বাবু।

শুকি আড়ষ্ট গলায় বলে— দাদা।

তারপর মাংসের ব্যাগ রাখতে যেতে একা একা নিজেকে বলে— লোকটা ভালতো, বেশ ভাল, দাদাটা ভাল, খুব ভাল! মাংস রেখে ফিরতে ফিরতে আচম্বিতে সেই একটা জটিল বানান তার মনে পড়ে, যার মানে পিংকিতো জানেই না, দিদিমণিকেও জিজ্ঞেস করা হয়নি। দাদার কাছেই এসে শুধোয়— দাদা কুজ্ঝটিকা মানে জানো?

কুজ্ঝটিকা মানে হল কুয়াশা, ঝাপসা—সবকিছু কেমন অস্পষ্ট দেখায় না শীতকালে?

ও হরি এই —শুকি ভাবে, তারপর তড়িঘড়ি বলে,

আর এট্টা বানানির মানে ব-অলবে দাদা? পিংকি বলতি পারিনিকো— ভ মুধ্যণ্য য়ে ড-য়ে ভণ্ড, ভণ্ড মানে কি গো?

বলছিরে বাবা, আগে তোর কথা শুনি।

শুকি যতটা পারে আত্মজীবনী প্রকাশ করে. যার পাতায় পাতায় লজ্জা।

তোর মা আছে?

হ্যাঁ। মাতো ঠিকে কাজ করে পাঁচ বাড়িতি।

আর বাবা?

বাবা রিস্‌কো চালায়। সনঝে বেলাতি বুলু ফাইটার-মাইটার কি সব গুড়জল খায় আর চেল্লায়, মার গুড়জল!

সেই না শুনে দাদার সে কি হাসি! শুকিও দেখাদেখি একটু হাসি ঠোঁটের কোলে মাখিয়ে রাখে। দাদা বলে,

তুইতো শুনলাম খুব খেতে ভালবাসিস।

শুকি অকপটে সায় দেয়—

আমি স-ব খাই। যার পাতিতি যা বাঁচে সব খাই। পিংকিও সব খেতি পারেনা. বাবুও পারে না- -ওনাদের পাতির খাবার খেয়িই শেষ করা যায় নাকো। বলতে বলতে শুকি মুখের হাসিটি ধরে রাখতে চায়, অথচ বারবার হাসিটাকে হারিয়ে দিয়ে কি এক বিষণ্নতা ওর গাল, চোখ, ঠোঁট বারবারই দখল করে নেয়।

সে হারজিতের লড়াই দেখে দাদা। লম্বা নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলে,

শোন শুকিদিদি, তোমার দুঃখ আমি ধরতে পেরেছি। আমি তোমায় পাতের এঁটো নয়, গোটাগোটা খাওয়াব। তোমাকে আমি কোনওদিনও মারব না, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

কোতায় দাদা?

কলকাতায়। ইয়া বড় বড় বাড়ি, চওড়া চওড়া রাস্তা, গোঁ গোঁ করে বাস ছুটছে, দারুণ সব দোকান-পাট—যাবে সেই কলকাতায়?

শুকি চুপ। মন চাইছে একটু হিসেব কষতে। তাই পরের পর কয়েকটা প্রশ্ন উঁকি-ঝুঁকি মারে মাথার ভেতর। টেবিলের কোণে রাখা বর্ণপরিচয়ের মলাটে বিদ্যাসাগরের মুখচ্ছবির ওপর আনমনা হাত বোলাতে বোলাতে জিগ্যেস করে ঃ

দাদা, আমনি পড়াবেন?

দাদাতো অবাক। কোথায় ভাবনা হচ্ছিল কত মাইনে চেয়ে বসে তাতো নয়, এ মেয়ে বিবেকানন্দের মত বলে বসল ঃ মা আমাকে জ্ঞান দাও....নিশ্চিন্ত স্বরে দাদা জানতে চায়, কি পড়তে চাও তুমি?

বন্নপরিচয়।

আবে শুধু বর্ণপরিচয় কেন, সব পড়াব। ইংরিজী, অঙ্ক সব আমি নিজে পড়াব। তুমি তো লক্ষ্মী মেয়ে।

শুকিব জীবনে তো ভগবানের মূর্তি দেখা আছে, ভগবান দেখা নেই। ভগবানের কথা কেমন হয় তা সে জানেও না। এখন এইসব অনন্য কথা শুনে সে আবার সাহসে ভর কবে শুধোয়—

দাদা সেই বানানির মানেটা বলি দেন।

কোন বানান?

সেই যি, ভ মুধ্যণ্য-য়ে ড-য়ে ভণ্ড মানে।

ওহো ভণ্ড! ভণ্ড মানে হল গিয়ে, ধর মুখে এক কথা বল আর কাজে করা উল্টো। এই যেমন, তুমি হয়ত বললে যে, তুমি সব কাজ পারো— বাসনমাজা, কাপড় কাচা, ঘর মোছা, বাজার-রেশন করা, আরও সব। তা এখন কলকাতায় আমার বাড়িতে গিয়ে যদি দেখি তুমি এসব কিছুই পার না, তাহলে তুমি কি হলে? ভণ্ড। তা তখন তোমার মত ভণ্ডকে কি পুষব-পালব? সোজা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব।

আমিতো তালি কলকেতাতে হাইরে যাবো।

আমার তাতে কি! একটা ভণ্ড হারিয়ে গেলে আমার কি। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

শুকি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কলকাতায় হারিয়ে যাবার ভয় তাকে স্তব্ধ করে রেখেছে।

আমি তোমায় দুধ দেব—

তালি দাদা সঙ্গে যাব।

দুধ খাবার বাটি দেব—

দাদা তোমার সঙ্গে যাব!

বাহ বেশ!

তালি এবাব বাবু বলি?

কেন, আবার বাবু কেন?

আমনি তো দাদা রইলেন না বাবু।

বাবুব মুখ স্বর্গীয় হাসিতে উদ্ভাসিত হল। বাবুর দুঃখ দূর হল। ডলি বৌমণিরও সুখের দিন আগত ঐ। শুধু বারোমেসে শুকির ছোট্ট এতটুকু মনে কি যে কি চলকে চলকে

ওঠে সে বোঝে না। দিদিমণি চান ঘর থেকে বেরোলে শুকি দৌড়ে ঢুকে দমাস্ দমাস্ শব্দে সাবানে ভেজানো জামা-কাপড় তো নয়, যেন মুণ্ডু আছড়াতে থাকে।

এখন দুপুর আড়াইটে। ব্রয়লার চিকেনের কারী রাজধানীর বাবুর খুব প্রিয়। গরম ভাত ও মাংস খেয়ে শুকির বাবু এখন ঘুমুচ্ছে। শুকি বাবুর সঙ্গে কলকাতায় যাবে এবং বায়নার টাকা পেয়ে শুকির মা আহ্লাদে ডগমগ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। কেবল দিদিমণিরই একটু সমস্যা হয়েছিল। মনে আঁতিপাতি সন্ধান করছিলেন যখন চানঘরে যে, কাকে, কোন বাচ্চাটাকে পাঠিয়ে দেওরকে নিশ্চিন্ত করা যায়— তখন, ঠিক তখনই প্রতাপশালী দেওর যে তাকেই অনাথ করে ছাড়বে এতটা ভাবা ছিল না দিদিমণির। তবু হাসিমুখেই দেওরকে বলেছিলেন, শোন, এ মেয়েকে যেন আবার পরোপকারের নেশায় হুট করে বোম্বাই-দুবাই কি হংকয়ে পাঠিয়ে বোস না! আগে নিজেদের একটা পাকা... এখন শুকির দিদিমণি নিজের অনাথ ভাব সামলে দিবানিদ্রায় থেকে পৃথিবীতে ক্রমাগত কার্বন-ডাই-অক্সাইড উপহার দিয়ে চলেছেন।

একা শুকি খালি জেগে। একটা বড়পানা ব্যাগে তার জামাকাপড় গোছগাছ করা হয়ে গেছে। এখন বর্ণপরিচয়টা নেবে বলে টেবিল থেকে তুলে আনে। ছবির বিদ্যাসাগর জানবেনই না তার ছবির মুখে কার গাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা লবণাক্ত জল গড়িয়ে পড়ল। নিজের বারো বছরের জীবনে যে বিচিত্র সব বর্ণের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে গেছে, বর্ণপরিচয় খুলে শুকি পাতায় পাতায় দেখে তাদের পরিচয়! হিংসা, কপট, কুজ্ঝটিকা পেরিয়ে একটা জটিল বর্ণসমাবেশে তার চোখ স্থিত হয়। যত কম শব্দ করে সম্ভব, বিশাল অপরাহ্নে একা একা সে পড়ে :

ব ঞ-য়ে চ-য়ে দইস্তেন-য়ে আকার বঞ্চনা।

পাতা উল্টে যায়। পড়ে, দ-য়ে হস্যু বিসর্গ খ, দুঃখ ... পড়তে পড়তে একসময় দু'চোখ জলে ঝাপসা হতে হতে আর কিছু দেখতে পায় না শুকি— বর্ণপরিচয় না, বিদ্যাসাগর না, জগৎ না, সংসার না, কিচ্ছু না—কুজ্ঝটিকা, বিদ্যাসাগর, কুজ্ঝটিকা...

সাঁকোর দুই পার

অমর মিত্র

ক্রমশ মানুষ বাড়ছে। বাড়ছে মানে তারা পৌঁছে যাচ্ছে খালপাড়ের দিকে। খালের এপার কেষ্টপুর, ওপারও। মধ্যিখানে বাঁশের সাঁকো, এখন বর্ষায় খালের কালো জল ঢেকে গেছে কচুরিপানায়। কচুরিপানা ছুঁয়ে গেছে সাঁকোর বাঁশ। রঙমিস্ত্রি আব্দুলের সাইকেলের পিছনে বসা জোগাড়ে মজুর পার্বতী বলল, আব্দুল ভাই, তোমার কয় বিঘা জমিন?

আব্দুল বোধহয় শুনতে পেল না। সাইকেল ক্রিং ক্রিং মানুষ কাটিয়ে এগোচ্ছে সে। পার্বতী একটু বেঁকে বসেছে। তেমনভাবেই বসতে হয়েছে তাকে। এক হাত চালকের সিটের পিছনের গোল হাতল ধরে আছে, অন্য হাতে কেষ্টপুরের বস্ত্রালয়ের নাম ছাপানো লাল সাদা ক্যারি ব্যাগ। ক্যারি ব্যাগে এটা ওটা, জলের বোতলে সল্টলেকের টাইম কলের জল। এ জল তার স্বামী যোগেনের জন্য। যোগেনের পেটে ঘা। জল ভাল হলেও খা নাকি সারে।

— এবাব আগে আগে বর্ষা এসে গেল। আকাশের মেঘে তাকিয়ে বলল পার্বতী।

— হ্যাঁ। সাড়া দিল আব্দুল শুনতে পেয়ে।

— তুমার চাষ নাই।

— জমিন নিউ টৌনে চলে গেছে, ছিল বিঘা দুই ধান জমি।

– টাকা তো মিলবে অনেক।

মাথা নাড়ল আব্দুল, কাগজে গোলমাল, টাকা তুলাই যাচ্ছে না।

— গোলমাল তো চাষ হঁতো কী করে?

সেডাকি বাবুরা বোঝবে, তাদের কলমেই গোলমাল হয়, তাদের কলমেই গোলমাল যায়, মাঠ পড়ে থাকে নিজের মতো। বলতে বলতে রোগাপানা লম্বা আব্দুল সিটে বসেই মাটিতে পা ফেলে দিল। পথ আটকে গেছে সামনে একটা ভ্যান রিকশা এসে পড়ায়। ক্রিং ক্রিং করতে লাগল আব্দুল, তখন পার্বতী ভাবল নেমে পড়ে। সে নামবে কিনা জিজ্ঞেস করতে আব্দুল মানা করল। পথ আবার খুলে গেল। সাইকেলের চাকা ঘুরলে আব্দুল বলে, তুমি কি কাল সত্যিই আসবে না পার্বতী?

পার্বতী বলল, কী করে আসি বলো আব্দুল ভাই, একটা দিন উল্টোডিঙি থেকে একটা লোক জোগাড় করে কাজটা চালিয়ে দাও।

আব্দুল কথা বলল না। ধীরে ধীরে সাইকেল চলছিল। পার্বতী ভাবছিল যোগেনের সামনে, গাঁয়ের লোকের সামনে আব্দুল তাকে বৌদি বলে। কিন্তু কাজের সময়, এই সাইকেলের পিছনে নিয়ে ফেরার সময় আচমকা পার্বতী বলে ডেকে উঠলে সব যেন অন্য রকম হয়ে যায়। আব্দুলের বাড়ি জোত-ভীম, তার বাড়ি অনেকটা আগে থাকদাড়ির নতুন পাকা ব্রিজের কাছে, খাল পাড়ের নীচে দখল করা জমিতে। আব্দুল মিস্ত্রি ঘর বাড়িতে শেষটান দেয়, একেবারে নিঁখুত, কোথাও রঙের কম বেশিনেই, কোথাও হালকা,

কোথাও গাঢ় এমন হয় না। মিস্ত্রিই এসে যোগেনকে বলেছিল তুমি মাটি কেটে বেড়াও, বউদি মাটি বয়, তার চেয়ে রঙের কাজ করুক আমার সাথে, খাটর্নি কম, কাজটা মনে হয় পারবে।

আব্দুল বলল, রঙের কাজ সবাই পারে না, তুমি যে র'ম বেরাশ ধরো, যে কেউ তেমন পারবে, তুমি বললি হবে নাতো পার্বতী, আমি লোক চিনি, আমি তো মিস্তিরি।

পার্বতী বিড়বিড় করে, আমি কী করব?

বুন বনাই নিয়ে আদিখ্যেতা করলি চলবে?

কী করব, না হয় থাকি ঝুপড়িতে, কিন্তু বুন বুনাই তো থাকপে, বুনরে বাড়ি রেখে আসপে বুনাই, আমি তারে আম, কাঁঠাল খাওয়াব, মাছ খাওয়াব, শখ তো মরে নাই।

— আম কাঁঠাল খাওয়াবে, ভারী আহ্লাদ, তুমারে খাওয়ায়।

— মরণ! পার্বতী হেসে উঠল, বুনের তো হবে।

শুনল আব্দুল। কথা বলল না। পার্বতীকে নিয়ে দোতলা বাড়ির সব ঘরগুলিতে রঙ দিচ্ছে আব্দুল। দিন দশেক হয়ে গেল ঘর, বারান্দা, বাথরুম, ডাইনিংরুম, রান্নাঘর, সিঁড়ি, কত জায়গা। নতুন বাড়ি। কর্তা এসে বসে বসে ঝিমোয়। তারা দুজনে সমস্ত দিন গুনগুন করে যেন। আব্দুল টের পাচ্ছে যোগেনের বউ-এর চোখ ভাল। রঙের পোঁচ কোথায় হাল্কা, কোথায় গাঢ়, কী সুন্দর চিনতে পারে। যোগেনের বউ থাকলে কাজটা বেশি হয়। না থাকলে কাল আর রঙেই আর মন বসবে না তার। অথচ বউ তো নিজেই বলে সে তার চেয়ে কম করেও পাঁচ বছরের বড়। পার্বতীর ছেলের বয়সই বছর চোদ্দো। বাপের সঙ্গে খাটতে বেরোয়।

আব্দুল বলল, তুমার বুনরে তো দেখিনি।

— দেখবা কী করে, বাপেব বাড়ি তো বনগাঁ।

— ওর বিয়ে হল কোথায়?

— থাকে বেলেঘাটা বস্তি, ওর বব স্যামুল বিশ্বেস কল মিস্তিরি।

আব্দুল সাইকেল ক্রিং ক্রিং করে এগোচ্ছে। আচমকা পথে মানুষ কমে গেল, ওই যে এসে গেল খাল পাড়, ওখানে লোক জমে আছে যেন চাক বেঁধে। আব্দুল সাইকেলের গতি বাড়ায় না, একটু ফাঁকা পথে গতি আরও কমিয়ে দেয়, বলল, তুমার বুনেব বে হল কবে?

— তুমার কী দরকার?

— তুমার কী আর বোন আছে?

— আছে, বাবার পাঁচ মেয়ে, এখনও দুটো স্যাযনা বুন রয়েছে, বে দেবে বলে ছেলে খুঁজতেছে।

— কোথায় আছে?

— টিবটিবে, এসবে তুমার দরকার কী?

— তুমার বুন কী তুমার মতো, রঙ চেনে, বঙ করে?

— আব্দুল তুমি বড় বেয়াদপ। বলে ঝপ করে নেমে পড়ে পার্বতী, দাঁড়াও আব্দুল ভাই, আটা, ডাইল, তেল কিনতে হবে, সাবানও নেব একটা!

— এখানে কেন?

— এমনি। বলে এগিয়ে গেল পার্বতী।

আব্দুল বুঝল তার কথাটাকে থামাতে পার্বতী নেমেছে। যতই অভাব হোক, মোছলমানের ঘরে কি হিঁদু মেয়ে দেবে? হতেই পারে না। তাই আলাপও থামিয়ে দিল

যোগেনের বউ। আব্দুল বিড়ি ধরায়। দূর থেকে পার্বতীকে দ্যাখে। যোগেন ছোটখাটো, পার্বতী একটু ছাড়িয়ে যাওয়া। দেখলে মনে হয় না ওরই ছেলের বয়স চোদ্দ। যোগেন অসুখে পড়ে কমজোরি হয়ে গেছে, আগের মতো খাটতে পারে না, তাই তার বউকে নিজের কাজে টানতে পেরেছে আব্দুল। বউটি বেশ।

নাম ধরে ডেকে সুখ, আবার বউদি বলে ওর হাতে জল খেয়েও স্বস্তি। আব্দুল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দোকানের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই সময়টায় সব দোকানেই ভিড়। সল্টলেকে যারা যে কাজেই যায়, রাজ মিস্ত্রির কাজে, কল মিস্ত্রির কাজে, ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজে, জোগাড়ে হয়ে, বাসন মাজতে, কাপড় কাচতে, রাস্তায় পিচ ঢালতে—তারা সবই এই পথে ফেরে। সকালে খাল পেরিয়ে হেঁটে কিংবা ভ্যান রিকশায় বোঝাই হয়ে সল্টলেকে ঢুকে পড়ে হারিয়ে যায়। বিকেলে, সন্ধ্যায় আবার খালপাড হয়ে ওপারের অন্ধকারে মিশে যায়। সাঁকো পেরোবার আগে অথবা পরে সবাই চলে আটা কিনতে দোকানে। ভিড় জমায়। সেই ভিড়ে মিশে গেছে পার্বতী।

বুড়ো নরহরি এল আব্দুলের কাছে, ও মিস্তিরি, শুনেচিস?

— কী শুনব? আব্দুল অন্যদিকে মুখ ফিরোয়।

— নতুন টৌনের সব মাটি নাকি মেশিনে কাটচে?

— তাতো কাটবে, একি পুকুর কাটা, না রাস্তায় মাটি ফেলা?

— যাই হোক দেশে কী মাটি কাটা মনিষ্যি নাই?

আব্দুল বিড়িটা পায়ের তলায় পিষে দেয়। বুড়ো নরহরি এখানে কোথায় যেন থাকে। মাথা ঠিক আছে বলে মনে হয় না। শুধু বকবক করে। একটা লোক পেলেই হল। আব্দুলকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুড়ো আর দেরি করেনি। তার গায়ে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, মাটি কী মেসিনে কাটা হবে?

আব্দুল সরে দাঁড়ায়। খালের ওপারে দক্ষিণ দিকে পরপর অনেক গ্রাম ভবাট হচ্ছে। থাকদাড়ি, মহিষগোট, খুনী, জোতভীম, কোচপুকুর—সমস্ত গ্রামের ধানজমি, জলাজমি,. ভেড়িপুকুর মাটিতে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে। মাটি এসেছে এপারের মুন্সির ভেড়ি থেকে। ভেড়ির জল বের করে দিয়ে দিনরাত ডোজারে মাটি কাটছে। আব্দুল দেখেছে রাতে ডোজারের চোখ দপদপ করে জ্বলে। শত শত লরি পার্বতীদের ভিটের কাছ দিয়ে পাকা পোল পাব হয়ে এসে নেমে পড়েছে থাকদাড়ি, মহিষগোট মাঠে। কিন্তু সেতো অনেকদিন ধরে হচ্ছে। কথাটা যোগেন বলেছিল তাকে, দেশে কি আমরা নাই, মাটি কাটতে পারতাম না আব্দুল। যোগেনের কী ক্ষমতা খুনীর বিল, মহিষগোটের মাঠ ভরাট করার? মেসিনে ছাড়া সম্ভব নয়। হাজার মানুষের শক্তি ধরে ডোজার দত্যি।

বুড়ো নরহরি আবার ডাকে, ও আব্দুল, মাটি কাটা এভাবে হবে?

আব্দুল হেসে ফেলে, বলল, ওতো মাঘ মাস থেকে চলছে কাকা। এখনতো বন্ধ, বর্ষা এয়েচে, ভেড়িতে জল হয়ে যাচ্চে।

তাহলি বন্ধ হয়েছে তো?

সে তো বর্ষার জন্য। বলতে বলতে আব্দুল দোকানের দিকে তাকিয়ে পার্বতীকে খুঁজল। এখনও দাঁড়িয়ে আছে। পার্বতী খুব ঠাণ্ডা। জোরে কথা বলতে না পারলে দোকানদার মাল দেবে? দূর থেকে পার্বতীকে লক্ষ্য করে আব্দুল। বেশ আলগা শ্রী আছে। মনে হয় আয়না, চিরুনি কিনে দেয়। সিঁদুর, আলতাও। তখন বেশ লাগে। ডুরে শাড়ি পরে কাজে আসতে পারে তো ওই সিনথেটিক কাপড় বাদ দিয়ে। কাপড়ে রঙের ছিটে লাগবে। লাগুক, আব্দুল না হয় কিনে দেবে, দিলেই বা কিনে, কে খোঁজ করছে।

বুড়ো নরহরি বলল, আগে আগে খোঁজ পেলে কি আমি ছেড়ি দেতাম?

আব্দুল হেসে ফেলে, কবে খোঁজ পেলে?

এই তো একটু আগে।

এ্যাদ্দিন ঘুমোচ্ছিলে?

বুড়ো বিড়বিড় করতে লাগল। আব্দুল সাইকেল ঠেলে দোকানের কাছে চলে গেল, হাঁক মারল, কই পার্বতী হল?

পার্বতী ঘুরে তাকায়, হাসল, চাপা গলায় যেন ভর্ৎসনা করল। আব্দুল একটা বিড়ি ধরায়। এই মেয়েমানুষটার সঙ্গে কাজ করে সুখ আছে। এমনিতেই মেয়েমানুষ হেলপার হলে কাজ ভাল হয়, তো পার্বতী। এ কাজ ওকাজ কম কাজ তো করে না। জল চাই জল দেবে, ভারায় দাঁড়িয়ে জল খেয়ে বোতল ফেরত দেবে, বিড়ি, দেশলাই, কোথায় রাখা হল তা খুঁজে দেবে। দুপুরে একসঙ্গে ভাত খেতে বসে আব্দুল পার্বতীর হাতের ছোঁয়া পায়। আব্দুল ভাই নঙ্কা নেবে, প্যাঁজ, জল চাই তুমার, একী তুমি নুন আনো নাই, ডাইল নেবা, না না তুমার ডিম তুমি খাও, ডাইলে আর ভাতে আমার হয়ে যায়।

খেতে খেতে আব্দুল বলে, আজ এই ঘরটা শেষ হবে, হাত লাগাও পার্বতী, দুজনে বেরাশ না টানলি কাজ ওঠবে না।

বুড়ো নরহরি আবার কাছে এসে গেছে, বুঝলি আব্দুল, মানষিই তো কেটেছে এই কেষ্টপুরির খাল, তখন কি মেসিন ছিল?

আব্দুল ঠাণ্ডা চোখে তাকায়, ছিল না তো আমি কি করব?

তুই মেসিনে মাটি কাটা বন্ধ করবি।

আব্দুল বলে, যাও দিনি, মাথা খারাপ করো না। পার্বতী এবার বোধ হয় খাল পারে। সমস্ত দিন এই দোকান ঝিমোয়, সন্ধের ঝোঁকে এমন বেচাকেনা হয়। আব্দুল আকাশে তাকায়। মেঘ ঘিরছে উপরটা। বৃষ্টি হবে নাকি? বুড়ো নরহরি বললে, না হবে না।

কী হবে না?

মেসিনে মাটি কাটা, মাটি তোলা, মেসিন বিকল হবে।

আব্দুল ডাকে, ও পার্বতী, হল?

যাই আব্দুল ভাই। পার্বতী ঘুরে মিহি গলায় সাড়া দিল।

বুড়ো নরহরি বলল, আগে মেসিন ছিল না, এত নদী, নালা, জলকর, সমুদ্দুর তো মানষেই কেটেছে দু'হাতে, কোদাল মেরে মাটি তুলেছে, আমার ঠাকুদ্দার বাপ নলবন ভেড়ি কেটেছিল।

তোমারে বলে গেছিল?

সবাই জানে তেনার এক কোদালে এক ঝোড়া মাটি উঠত।

কেডা কেডা জানে?

তুই তো জানিস, তোরে আমি বলিনি থাকহরি লস্করের কথা?

তার নাম তো ছিরিহরি ছিল?

নানা, ছিরিহরি তার বাপ, কী জানি কোন হরি, আমার নিজিরই এখন গোলমাল হয়ে যায়। বলে নরহরি হাত বাড়ায়, বিড়ি দে দিনি এটটা। বিড়ি নেওয়ার পর দেশলাই চায় নরহরি বুড়ো। তিনটি কাঠি নষ্ট করে তবে দেশলাই ফেরত দিল আব্দুলকে। ধোঁয়া টানার সময় বুড়োর গাল চুপসে যায়, বুক দপ দপ করে। আব্দুল ঘুরে দেখল পার্বতী দাম দিচ্ছে, সে বুড়োকে বলল, আর কডা বিড়ি নেবা?

নিতি পারি। বুড়ো হাসল।

খেয়ে যে হাঁপ ধরবে।

ধরবে না, দে দিনি গোটা পাঁচ, তুই রঙ মিস্তিরি, তোর কত দাম! বলি এ সব জায়গার অনেক পুকুর, খাল বিলে আমার ঠাউদ্দা, তার বাপ, তার বাপের কোদাল মারার দাগ আছে।

আব্দুল শুনতে শুনতে কৌটা থেকে বিড়ি বের করে নরহরির হাতে দেয়। পার্বতী এল, কুণ্ঠিত গলায় বলল দেরি করিয়ে দিলাম।

তা তো করলেই, হঠাৎ এখেনে মাল কিনলে কেন?

একটু সস্তায় দেয়। বলতে বলতে হাঁটল পার্বতী। পাশাপাশি সাইকেল ঠেলে এগোয় আব্দুল। যেতে যেতে পার্বতী আচমকা বলে, তুমি খুব ভাল লোক, অন্তঃকরণডা ভাল।

মনে ধরিচে আমারে?

পার্বতী বলল, কথাটা তুমার দাদার, আমি বলি তুমি বেয়াদপ।

আব্দুল হে হে করে হাসে, বলল, একদিন তুমারে যদি বালির মাঠে নে যাই!

পারবা না, তুমার সে স্বভাব লয়। বলতে বলতে দাঁড়াল পার্বতী, কেননা আব্দুলও দাঁড়িয়েছে। পার্বতীর চোখ খালের ওপারে। দোকানে দোকানে আলো, গোধূলি বেলায় দুশো বছরের পুরনো গির্জার চুড়ো আকাশের মেঘের দিকে তাকিয়ে।

আব্দুল জিজ্ঞেস করল, কল মিস্তিরির নামডা কী যেন?

— স্যামুল বিশ্বেস।

— তুমার বুনাই কাজ করবে?

— করবে, কাঁথি থেকে ফিরে।

— শ্যামলরে ফিরে আমার সঙ্গে দেখা করতি বলবা, বড় কাজ আছে।

— শ্যামল লয় স্যামুল।

— তার মানে! স্যামুল কারও নাম হয়?

— হয়, ওরা গিজ্জে পাটি, আমাদের ধম্মো তো ওদের লয়!

আব্দুল অবাক, কেরেস্তান? হ্যাঁ, আচ্ছা কে দেখলি বলবে ও কেরেস্তান, বুন ওরে বে করায় বাপ খুব কষ্ট পেয়েচে, কিন্তু কী করবে, ভালোই তো আছে পরভাতি।

— তুমার বুনের নাম প্রভাতী?

— হ্যাঁ, তার নামে কী দরকার?

— সে রঙের টান মারতি পারে?

— না, কলের কাজ শিকেচে।

আব্দুল বলল, দাঁড়াও কাচ ঘরে একটা কাজ আছে, কথা বলে আসি।

— কাচ লাগাবে ও বাড়ির জানলায়? পার্বতী জিজ্ঞেস করে।

— হ্যাঁ, নীল কাচ বলেছে বাবু।

— কী র'ম নীল, সমুদ্দুরের মতো?

— হ্যাঁ, বাবু তো তাই বলে, তুমি সমুদ্দুর দেখেচো?

পার্বতী মাথা নাড়ে, বলল, বুন দেখেচে, ওর শউর ঘরের কাছেই সমুদ্দুর, সে নাকি নীল আর নীল!

— ঠিক বলেচো, তা বুনের সঙ্গে গিয়ে দেখে এস।

পার্বতী বিষণ্ণ হয়, বলল, গেলি তো খরচা হবে, মাটি কাটার জন হল তুমার দাদা, রোগে ধরেচে, হাসপাতালে নে যেতি হবে, তুমি সঙ্গে যাবা মিস্তিরি?

— আগে থেকে বলো?

— তুমি থাকলি ভরসা পাব। বিড়বিড় করে পার্বতী।

পার্বতীকে দাঁড় করিয়ে সাইকেল রেখে আব্দুল গেল কাচ দোকানে। কাচওয়ালাও গিজ্জে পার্টি। কী নাম যেন! মাইক মণ্ডল। ওরা নাকি সাতপুরুষ খ্রিষ্টান, বলেছিল তাই পার্বতীকে। আব্দুল গেল ওকে কাচের খবর দিতে। মাপ নিয়ে আসবে বাড়ি থেকে। তারপর মেপে মেপে কেটে লাগিয়ে দেবে। কাচওয়ালা যেমন আব্দুলের কাছ থেকে কাজ পেল, কাজের খবর পেল, তেমনি সেও কত খবর দেয় আব্দুলকে। মিস্ত্রিতে মিস্ত্রিতে যোগ খুব। দোকানের সঙ্গেও মিস্ত্রিদের যোগ আছে। কিছু লেনদেন তো হয়ই। সবটা জানে না পার্বতী। সে ভাবে যোগেন যদি সুস্থ থাকত যোগেনকে রঙের কাজ শেখাত। যোগেন একদিন কাজে যায় তো পাঁচদিন যেতে পারে না, তো রঙের কাজ করবে কী করে? কাজটা তো সময়ে শেষ করতে হবে।

পার্বতী দেখল ওপারে ইমানুয়েল গির্জার চূড়ায় মেঘ নেমে এসেছে। কতকাল আগের যিশু মন্দির এটা। তার বোন প্রভাতী এই মন্দিরেই তো স্যামুয়েলকে দেখেছিলো প্রথম। এখন প্রভাতী রোববারে যিশু বন্দনায় যায়, বেলেঘাটার গির্জায়। শনি, মঙ্গল বারে বড়বাবার মানত আর মঙ্গলচণ্ডীর পুজোও করে। স্যামুয়েল কিছু বলে না। বড়বাবাও কী কম বড় ঠাকুর! ভয় নেই।

সাঁকো পার হয়ে এপারে এল বুড়ি এলিজাবেথ। মেঘের মতো রঙ বুড়ির, চোখে চশমা, হাতে লাঠি, গায়ে গোড়ালি ছোঁয়া, ময়লা ম্যাক্সি। মাথার চুল সাদা ধবধবে, পুরুষ মানুষের মতো ঘাড় থেকে ছাঁটা। তাকে দেখে দাঁড়াল বুড়ি। হাঁরে বউ, একা দাঁড়ায়ে?

আব্দুল ভাই আসতেছে।

তোর বুন, বুনাই আমারে নোতন বস্তর দেবে বলেছিল, কই দিল না তো, কবে আসবে?

— দেবে বলেছিল?

— হ্যাঁ, না বললি বলতিছি। খরখব করে উঠল বুড়ি, মা কালীর কিরে, যিশুবাবার কিরে, বিশ্বেস হল তোর?

সমস্তটাই বানানো কথা তা জানে পার্বতী। এবপর যদি প্রভাতীর সঙ্গে দেখা হয়, বলবে পার্বতীব কথা। পার্বতী তাকে কিছু দেবে বলেছিল। বুড়ি গির্জার বারান্দায় পড়ে থাকে। খালপাড়েব হোটেলে ভাত খায়। মানুষ যে কী ভাবে বেঁচে থাকে, তা মানুষই জানে। আজ যদি যোগেন অসুস্থ না হত, তিনজনে খাটলে কত পয়সা! তখন সে বুড়িকে নতুন বস্ত্র দিত। আহাবে'।

— যাচ্ছ কোথায?

— সললেক।

— রাত হয়ে গেল যে।

— যাক, আমি আর ফেরব না।

— কেন গো, কী হল?

. বুড়ি আচমকা মাটিতে বসে পড়ল, বাজাবে চরণ নস্করের পো, আমারে গঙ্গাজল আর গোবর খাওয়াবে কয়েচে, আমি আর এখানে থাকব না।

পার্বতী চুপ কবে থাকে। এমন হচ্ছে। চরণ নস্করের বড় জুতোর দোকান। তার ছেলে মোটর সাইকেল দাপিয়ে বেড়ায়। জমির দালালি করে। বুড়ির পিছনে আগেও লেগেছে, বুড়িও ক্ষেপে অন্য কোথাও গিয়ে পড়ে থেকেছে। গোবর খাওয়ালেই নাকি

ধর্মনাশ। পার্বতী আকাশ দেখল। মেঘ যেন আরও নেমে এসেছে। এই অন্ধকারে মাথা পাগল বুড়ি যাবে কোথায়? জলে ভিজবে যে। সে বলল, চলো ওপাবে চলো, বিস্টি আসবে, দেবতা গুর গুর করছে।

— ওই চরণের বেটা? বুড়ি এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করে।

— ঠাট্টা করে।

— আমার যে ডর লাগে রে!

— ঠাকমা তো। পার্বতী বোঝাতে চায়।

— নারে না, ও বলেচে ঘুমুলি মুখি গোবর দে হিন্দু করে দেবে।

পার্বতী স্তম্ভিত হয়। আব্দুল চলে আসে। আব্দুল বুড়িকে দেখে টেনে তোলে মাটি থেকে, ওঠো গো রানী এলিজাবিত।

বুড়ি উঠল। আগে বুড়ি হাঁটে, পিছনে দু'জন ওরা। পার্বতীর গা ছমছম করে, ভয় হয়। সত্যি যদি ঘুমন্ত বুড়ির মুখে গোবর দিয়ে যায় শয়তানটা। ধর্ম চলে যাবে? বাঁশের সাঁকো দুলছে। অন্ধকার হয়ে এসেছে সর্বদিক, আকাশ, শূন্যতা, মাটি, জল। বুড়ি আবার ফিরছে গির্জায়। পার্বতী ভাবে তার উপর ভরসা হয়েছে বুড়ির। কিন্তু সে তো রঙ মিস্ত্রির হেলপার, সমস্ত দিনে আশি টাকা মজুরি। চরণ নস্করের বেটাব যদি ইচ্ছে হয় তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে বালির মাঠে ফেলতে পারে। শিউরে ওঠে পার্বতী। কী নিষ্ঠুর অন্ধকার ছেয়ে ফেলছে সর্বদিক।

পার্বতী বলল, ও বুড়িমা, খালে নাকি লঞ্চ চলত একসময়?

— চলত, তা যদি থাকত তাতে করেই চলে যেতাম, হাঁটতে পারিনে বেশি, কোমরে লাগে।

কথা বদলে পার্বতীর ভয় গেল, বলল, লঞ্চ ডুবি দেখেছিলে তুমি।

তা দ্যাখপো না, এমনি আষাঢ় না শেরাবন মাস ছিল সেডা, এমনি মেঘ ছিল আকাশে। বলতে বলতে সাঁকো শেষ করল বুড়ি।

সাঁকো পার হয়ে এসে তিনজন অন্ধকারে ছেয়ে যাওয়া খালটিকে দেখল। তারপর আবার চলল। পার্বতী এগিয়ে বুড়ির গায়ে হাত দিল। তুমি ভগবান যিশুর কাছে আছ, তিনি তোমারে রক্ষা করবে ঠাকমা।

বুড়ি বলল, আজ রাতডা জেগে থাকতি হবে।

আব্দুল বলল, গিজ্জেয় যাও বুড়িমা, জল আসপে।

বুড়ি বাজারের আলো অন্ধকারে ছায়া ফেলে ফেলে এগিয়ে গেল। ওরা দু'জন ঘুরল। আব্দুল আকাশে তাকায়, তাড়াতাড়ি যেতি হবে।

— হ্যাঁ, নাহলি ও লোক জলের ভিতরেই বারুয়ে পরবে।

— তোমারে খুব ভালবাসে তাই না?

— বাসে, পার্বতী মাথা নামায়।

আব্দুল দেখল পার্বতীর মাথা নত করা। চোদ্দো বছরের ছেলের মা, রুগ্ণ স্বামীর বউ, রঙ মিস্ত্রির কাজের মেয়ে পার্বতী আবার মুখ তুলল, চলো।

— তুমারে মিঠাই খাওয়াই।

— কেন কী হল?

— কল মিস্তিরির বেটা হবে তাই। খিল খিল করে হাসল আব্দুল।

— তুমার মাথা ঠিক নাই।

আব্দুল সাইকেল দাঁড় করিয়ে মোহিনী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে গেল। শনপাপড়ি কিনল চারটে। তিনটে পার্বতীর হাতে দিল, একটা সে মুখে দিল, বলল, কাচ মিস্তিরি একটা কাজের খোঁজ দিল, হানাপাড়ায় নোতন ফেলাট বাড়ি, আটটা ফেলাট রঙ করতি হবে, প্যারিস হবে, বড় অর্ডার, তাই মিঠাই খাওয়ালাম।

— আমারে বেশি দিলে যে?

— বেটা আর যোগেনের জন্যি নে যাও। বলে হাসল আব্দুল।

পার্বতী বলল, জল খাবা মিস্তিরি?

— দাও। ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করল পার্বতী। যোগেনের জন্য ভালো জল নিয়ে যাচ্ছে সে। জলেও তো রোগ সারে। দু'ঢোক গলা ভিজিয়ে আব্দুল ফেরত দিল বোতল। সাইকেল ঠেলে এগোতে লাগল সে। রাস্তায় পড়ে দেখল পৌনে দুশো বছর আগের গির্জায় আলো জ্বলছে। পার্বতীও দেখল তা। তার বোন বোনাই এখানে এলেই গির্জায় যায়। ফাদার কুণ্ডুর সঙ্গে দেখা করে। একবার পার্বতীও গিয়েছিল। ফাদারের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। মনে মনে মানত আছে গির্জায়, যোগেনের অসুখ সারলে যিশু ভগবানের কাছে একশো আটটা মোমবাতি দেবে। এখেনে মানত আছে জোতভীম কালীতলায় মানত আছে। কোচপুকুর মাজারে মানত আছে। পার্বতী মনে মনে বলল, বাবা লোকটির রোগ সারায়ে দাও, তোমার নামে কালীতলায় বাতি দেব, মাজারে বাতি দেব।

আব্দুল উঠে পড়ল সাইকেলে। পিছনে লাফ দিয়ে উঠল পার্বতী। সাইকেল সাঁ সাঁ করে ছুটল অন্ধকারে। ক্রিং ক্রিং বাজতে লাগল ঘন্টি। সাইকেলে প্যাডেল করতে করতে আব্দুল জিজ্ঞেস করল তোমার কুনো বুন নাই বউদি, রঙের টান দিতে পারে?

কথাটি শুনতে পায় না পার্বতী। সে ভাবছিল যোগেনের কথা। অন্ধকারে নিশ্চয়ই পথে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

মানুষ কিম্বা কোলবালিশ

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

ক'দিন আগেই রাস্তায় পিচ দিয়েছে। সাইকেল ছুটিয়ে বড় সুখ, তারাদাস তাই পোঁ-পোঁ ছুটছিল। মটোর গাড়ি ওকে ওভারটেক করে সামনে দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে বের হয়ে এল একজন রোগাপানা, পাকা চুল, ফর্সা মানুষ। বলল, 'শোন তারাদাস কথা আছে।' লোকটাকে আগে কখনো দেখেনি তারাদাস।

তারাদাস বলল,, 'কী কথা?'

লোকটা বলল, 'তুমি উড়বে?'

'এ্যাঁ?'

'বলছি, তুমি উড়বে?'

'মাইরী আর কি! —মানুষ কি উড়তে পারে?'

'মানুষ পারে না। এতদিন পারেনি। এবার পারবে।'

'ইঃ।'

'শোন তারাদাস। তোমায় ওড়া শেখাব।'

'ওঃ'। বুঝে গেল তারাদাস। পাগল-ফাগল হবে। ও প্যাডেলে চাপ মারে। লোকটা আবার বলে, 'যেও না, কথা আছে।'

তারাদাস বলে, 'এখন আমার কথা শুনবার সময় নেই, আমার এখন দ্বারকপাটি যেতে হবে।'

'দ্বারকপাটি কার বাড়ি?'

'ভোলা ঘোষের বাড়ি। ভোলা ঘোষকে চেনেন? বাড়িতে ডেয়াবি বানিয়েছে। চল্লিশটা জার্সি গোরু। জেনারেটার আছে ঘরে। জেনারেটারে টিভি চালায়, ভিডিও চালায়'...

'আর এখন তুমি ওর জন্য ভিডিও ক্যাসেট নিয়ে যাচ্ছ,— কেমন না?'

'হ্যাঁ। শোলে, ডন, আর... ইয়ে।'

'বুঝেচি। বলে যাও।'

'ওটা বেশি রাতে চলবে। ভোলা ঘোষের শালা এসেছে বাড়িতে।'

'নাও তারাদাস, রেডি হও। ওড়া শেখাব। তোমার আর কষ্ট হবে না। এই চেন খুলে গেল, এই টায়ার পাংচার— টিউব লিক এসব হ্যাপা আর পোহাতে হবে না তোমার। তুমি আকাশে উড়ে... তারাদাস এখন আকাশের দিকে তাকায়। দু'ফালি মেঘ ভাসছে। দুটো চিল উড়ছে।

গাড়ির পিছনের ক্যারিয়ার থেকে বুড়োটা কি একটা বের করে বলল, 'এই দেখ ডানা। লাল ডানা।' খুলে ধরল বুড়োটা। রূপকথার বইয়ের ছবিতে পরীদের যে-রকম ডানা হয়, ঠিক সে-রকম। লোকটা যাদুকরের মতো হাসছে।

'এটা তোমার পিঠে বেঁধে দেব তারাদাস'।

'এঃ। মাইরী আর কী। আমাকে উড়িয়ে দিয়ে সরে পড়ো আর আমি পড়ে মরি আর কি।' তারাদাস এবার বুদ্ধি করে বলে— আগে আপনি উড়ে দেখান তো দেখি কি রকম উড়তে পারেন তারপর নয় আমি উড়ছি।'

'আমার যে হার্টের দোষ, আমি উপরে উঠতে পারি না। তবে আমি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। শূন্যে বাঁদর পাঠিয়েছি। দাঁড়াও দেখাচ্ছি।' এই বলে ক্যারিয়ার থেকে বার করে আনলো একটা খাঁচা। শূন্য খাঁচা। 'এই খাঁচাতেই বাঁদরটা ছিল, সেদিন পালিয়েছে।' বুড়োটা এরপর বার করে আনল একটা কোলবালিশ। রেশমী কাপড়ে মোড়া, জরির ঝালর ঝুলছে।

বলল, কোলবালিশটাকে মনে করো একটা মানুষ। মানুষটা শুয়ে আছে। এইবার দ্যাখো এই মানুষটার পিঠে এই ডানাজোড়াটা বেঁধে দিলুম।' 'বাঃ কী সুন্দর কাঁচ বসানো ডানা।' তারাদাস দেখল কোলবালিশটার পিঠে ডানাটা বেঁধে দিতেই কোলবালিশটা প্রজাপতি হয়ে গেল।

'এগুলো কাঁচ নয় খোকা, এগুলোকে বলে ফোটো ইলেকট্রিক সেল। এতে সূর্যের আলো পড়লে বিদ্যুৎ তৈরি হয়, সেই বিদ্যুতেই এই ডানা নড়ে। পেট্রোল-ব্যাটারি কিস্‌সু লাগে না। দিনের আলোয় সারাদিন চিলের মতো আরামসে ওড়ে। কোন অসুবিধে নেই। তবে রাতে বেশিক্ষণ ওড়া যাবে না। সোলার এনার্জি তো, সারাদিন ডানায় রোদ খাইয়ে তবে রাত্রেও কিছুক্ষণ ওড়া যায়, তারপর আস্তে আস্তে এনার্জি ফুরিয়ে যায়। 'ডানায় রোদের গন্ধ মুছে ফেলে চিল' আছে না— জীবনানন্দের কবিতায়? তুমি তো আবার পড়ো নি এইসব, ঐ রকম ধারা। বুঝলে না?' কিছুই বুঝল না তারাদাস। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

'এবার দ্যাখো, খাঁচাটাকে ঝুলিয়ে দিলাম। এই যে মানুষটা শুয়ে আছে, এর পেটে বেল্ট বেঁধে বাঁদরের খাঁচাটা ঝোলালাম। চাঁদে যাবার আগে কুকুর, বাঁদর এদের পাঠিয়ে ছিল না মানুষ? —তারপর তো মানুষ বিশ্বাস করে রকেটে উঠল। —তা তুমিও তো মানুষ, তাই তোমার বিশ্বাস তৈরির জন্য বাঁদর পাঠাচ্ছি। যদিও বাঁদরটা পালিয়ে গেছে, খাঁচাটাই পাঠাচ্ছি তাই।

এবার দ্যাখো মানুষটার মানে কোলবালিশটার বেল্টের এই বোতামটা টিপলাম। সবুজ আলোটা জ্বলল। মানে ফুল এনার্জি। এবার সুইচ অন করলেই ডানা নড়বে। দ্যাখো তারাদাস এখানে কী করছি। এক হাজার ফিটের বোতামটা টিপে দিলাম। — কেন বলো তো? কারণ এই রেশমী জামা পরা মানুষটা তো আসলে কোলবালিশ। বোধ বুদ্ধি নেই, বিবেচনা নেই। কখন থামতে হবে জানে না। কখন বাঁয়ে ঘুরবে, কখন ডাইনে ঘুরবে জানে না। এইজন্য এক হাজার ফুটের বোতামটা টিপে দিলাম। এক হাজার ফিট উঠেই আবার নেমে আসবে। আমি আমার ইচ্ছেমতো ওকে বাঁয়ে ঘোরাতে পারি, ডাইনে ঘোরাতে পারি, ওঠাতে পারি, নামাতে পারি, আমার ইচ্ছেমতো। পুরো আমার ইচ্ছেমতো।'

বোতাম টিপল লোকটা, আর কোলবালিশটার পিঠে ডানা নড়তে লাগল। কোলবালিশটা একটা প্রজাপতি। উড়ছে। চাকতি বসানো সুন্দর ডানায় উড়ছে। শূন্য খাঁচাটা অবাধে উঠে যাচ্ছে আকাশে। তারাদাস ঘাড় উঁচু করে কোলবালিশটা দেখে। আহা। ডানা নড়ছে। প্রজাপতি। বাতাসে একটা হাল্কা গোঁ গোঁ শব্দ। তারাদাস ভীষণ ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকে। একটু পরেই গোঁত্তা খেয়ে কোলবালিশ পাখিটা নামতে থাকে। লোকটা বলে, 'দেখলে, এবার কেমন নেমে যাচ্ছে? যা বলব, ও তাই করবে।' কোলবালিশটা

মাটিতে নেমে গেলে বাঁদরের খাঁচাটা ভুঁয়ে এলিয়ে পড়ে। কোলবালিশটার দিকে তাকিয়ে বুড়ো লোকটা বলে, 'এভ্‌রিথিং ওকে?' কোলবালিশের জরির ঝালর বাতাসে নড়ে।

'তারাদাস, এবার তুমি।'

তারাদাস মাথা চুলকোলো। বলব, 'না। আমি পারব না।'

'বোকা ছেলে। পারব না আবার কী? সুইচটা অন করলেই তো উড়বে, তার সামনের হাতের কাছেই এটা স্টিয়ারিং। ডাইনে, বাঁয়ে, উপরে, নিচে, যেদিকে সরাবে সে দিকেই যাবে। কোলবালিশটা স্টিয়ারিং জানে না, তাই উঠেছে আর নেমেছে। কোলবালিশটার বিবেচনা নেই তাই আমি যা হুকুম করেছি ও তাই করেছে। নাও, কাছে এসো, ডানা বেঁধে দি।'

'তা আমাকেই ধরলেন কেন? আমার ভাল্লাগে না।'

'ভাল্লাগে না? তুমি বলোনি তোমার নিজের মনে মনে— যখন ছ'মাইল আট মাইল দূরে দূরে ভাঙা সাইকেল চালিয়ে ক্যাসেট সাপ্লাই করতে যাও বা ফেরত আনতে যাও, — বলোনি হে ভগবান আমি যদি পাখি হতাম?'

'সে তো কত লোকেই বলে।'

'কিন্তু সবাই তো আর তোমার মতন নয়। তুমি তোমার মাতামহীকে অতিশয় ভালোবাস। তিনি যে উপদেশ দেন তুমি তাহা পালন কর। তুমি মিথ্যা কথা কহ না। অন্যায় কর্ম কর না। যদি দৈবাৎ কর, অনুতপ্ত হও। তুমি কটুবাক্য, কুবাক্য কহ না। পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ, সেই হেতু পরের দ্রব্য লও না। আলস্যে কাল কাটাও না। ভি.ডি.ও. ভাণ্ডারের মালিক নারায়ণবাবু যাহা আদেশ দেন তাহা প্রফুল্ল বদনে সত্বর পালন কর। বুলু ক্যাসেটগুলি ঠিক ঠিক স্থানে লুক্কায়িত রাখ।'

ইতিমধ্যে তারাদাসের পেটে বেল্ট বাঁধা হয়ে গেছে। পিঠে সেট হয়ে গেছে ডানা। 'নাও স্টিয়ারিং ধরো। ওঠো, ওয়ান, টু, থ্রি।' বোতাম অন করে দিল লোকটা। ডানা নড়তে লাগল। 'স্টিয়ারিং উপরের দিকে ঠেলো'... বুড়ো চিল্লাল। তারাদাস তাই করল। তারাদাস উপরে উঠতে লাগল। তখন চ্যাঁচাল, আমার সাইকেলটা দেখো...

বুড়োটা বলল— 'সাইকেল পড়ে থাক। সাইকেল স্তর পার হয়ে গেছ তুমি। তুমি ওড়ো। উড়তেই থাকো।' তারাদাস আকাশে উঠছে। দুধারে বিস্তৃত সবুজ. বুড়োটা দু'বাহু উপরে তুলে বলে চলেছে— ডানাটার সম্মান রেখো তারাদাস। এটাকে খারাপ কাজে লাগিও না। 'ডানাটার মর্যাদা রেখো তারাদাস। মানুষের কাজে লাগিও এটাকে।'... বুড়োটা বকেই চলেছে। তারাদাস ঘাড় উঁচু করে মেঘ দেখে। স্টিয়ারিং সামনে ঠেলে, পেছনে ঠেলে, উঁচু করে, নীচু করে, বাঁয়ে ঘোরায়, ডাইনে ঘোরায়, তারাদাস ওড়ে। সারাটা আকাশ নিয়ে খেলা করে। বহু নীচে কালো সুতোর মতো মদালসা নদী। ঐ নদীটা পড়েছে মধুক্ষরা নদীতে। ঢেউকলকল মধুক্ষরা নদীটা কী শান্ত এখন। নকশী কাঁথার মতো আলপনা আঁকা মাঠ। কৃষিক্ষেত্র। চাষের মানুষেরা মিশে আছে মাঠের সবুজে, আর মাঠের সবুজ মিশেছে বহু দূরের আকাশের নীচে। কোনটা যে চম্পাহাটি, কোনটা যে সজনেহাটি বোঝা যায় না। কোনটা যে দুধসাগর গাঁ আর কোনটা যে ক্ষীরসাগর গাঁ বোঝা যায় না। তিন কাঠা তেরো ছটাকের সঙ্গে দুই-কাঠা বারো ছটাকের ঝগড়ার কথা মিথ্যে মনে হয়। জনার্দনের আতা গাছের ডাল হরিপদর সীমানায় দু'হাত ঠেলে আসা মিথ্যে মনে হয়। শুধু মাঠের বিশাল সবুজ সত্যি। মদালসা নদীর দুপাশে দুধের ফেনার মতো জমে থাকা কাশবনের সাদা রঙ সত্যি। আকাশের গায়ে ওড়া তুলোর মেঘ সত্যি। ঐ তিন

সত্যি সাবা গায়ে মেখে মেঘে মেঘে লুটোপুটি খায় তারাদাস। তারপর এক সময় তারাদাস নামতে থাকে। আবার দেখতে পায় মাঠের সবুজে খোপ খোপ আলোর সীমানা। সবুজের ভিতর থেকে উঠে আসে বিড়িখোর মানুষ। তারাদাস দেখে সবুজের ভিতর দিয়ে কালো রাস্তা। কালো রাস্তায় ভ্যান-রিক্সা দেখে তারাদাস। তারাদাস দেখে একটা লোক সাইকেল চেপে যাচ্ছে। লোকটা ধনা-মনা-ঘনা যে কেউ হতে পারে। কে লোকটা বোঝা যাচ্ছে না। সাইকেলটা হিরো-র‍্যালে-বি.এস.এ. যা খুশি হতে পারে। কী সাইকেল বোঝা যাচ্ছে না। লোকটা সাইকেল চালিয়ে আম-জাম-পাকুড়-অশ্বত্থের ভিতরে একটা গ্রামের গভীরে মিশে যায়। তারাদাস যেখান থেকে উড়েছিল সেখানে গিয়ে দেখে ওর সাইকেলটা নেই। তখনই চীৎকার করে— সাইকেল... আমার সাইকেল...। নেই সাইকেল নেই। বুড়োটাব কথা মনে হলো একবার। তুমি সাইকেল স্তর পার হয়ে গেছ তারাদাস। তখন শ্যামল মিত্রের গানটা একবার গাইল— যাক্ যা গেছে তা যাক.. তারাদাস এ সময় দেখে কালো রাস্তা দিয়ে একটা ভ্যান-রিক্সা আসছে। ভ্যান-রিক্সা থেকে কথা আসছে। ভ্যান-রিক্সার বডিতে মাইক ফিট করা।

আউর ক'গোলী বা?

ছে গোলী—

তেরা ক্যা হোগা কালিয়া।

আপকা নিমক খায়া সরকার

অব গোলী খা...

শোলের ডায়লগ। পার্বতী হলে শোলে এসেছে। শোলের কথা মনে হতেই আর্তনাদ করে ওঠে তারাদাস। ক্যাসেট?

ক্যাসেট সাইকেলের বাস্কেটে ছিল। তারাদাস কালো ফিতের মতো রাস্তাটার দিকে হতবাক তাকায়। তারাদাস দেখে একজন খালি-গা মানুষ রাস্তা থেকে কী যেন কুড়িয়ে নিল, তারপর ফেলে দিল। মাথার ঝুড়ি নামিয়ে অন্য একজন মহিলা কী যে তুলে নিল, আবার ফেলে দিল। সাঁই করে মাটিতে নেমে এল তারাদাস। ঐ তো, ওগুলোই তো ভি.ডি.ও. ক্যাসেট। শোলে, ডন, আর ভট্ভট্। খালি গা মানুষদের ভাগ্যিস এসব দরকার হয় না। কিন্তু এসবে ভোলা ঘোষদের সুখ হয়। ভোলা ঘোষের সুখের খোঁজে তারাদাস অনেকক্ষণ পরে পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়ালো। ওগুলো কুড়িয়ে উড়িয়ে নিচে চলল দ্বারকপাটি।

ভোলা ঘোষ তখন তাঁর শালা, শালা-বৌ-এর সঙ্গে রসিকতা করছিল। 'বলো তো— এটার উপর ওটা দিয়ে মাগ-ভাতারে রইল শুয়ে... এটা কী?' ভোলা ঘোষের শালা-বৌ বলল, 'ইশ্ কী অসভ্য।' ভোলা ঘোষ বলল, 'তোমার মনের মধ্যে পাপ। ওটা হল খিল। দরজার খিল।' এমন সময় ঘেউ ঘেউ আব হাম্বা হাম্বা ডাক শুনে বাইরে তাকাল ভোলা ঘোষ, দেখল একটা ডানাওলা মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে। ভোলা ঘোষ বাইরে বেরোলে হাত জোড় করে দাঁড়ায় তারাদাস। যেন গরুড়। নারায়ণের বাহন। তারাদাস বলে, 'নারায়ণ ক্যাসেট ভাণ্ডার থেকে এসেছি। এই যে ক্যাসেট। ডন, শোলে আর ইয়ে।' কুকুররা ঘিরে ধরেছে তারাদাসকে। ভীষণ ঘেউ ঘেউ। তারাদাস চোঁ করে উপরে ওঠে। সূর্য লালচেপানা হয়ে আসছে। আর বেশিক্ষণ ওড়া যাবে না, বুড়োটা বলে দিয়েছিল। আকাশে দিক ঠিক রাখা মুস্কিল। উত্তরে মধুক্ষরা নদী, দক্ষিণে গোপেশ্বরের মন্দিরের চূড়া। এবার নিজের গ্রামের দিকে যায় তারাদাস।

জনার্দন মল্লিক চেক লুঙি পরে মজুর চরাচ্ছে। বগলে ট্রানজিস্টার, হাতে সিগারেট। মল্লিকবাবুর বাগানের গাছের আগায় আতা পেকে আছে। তোতা পাখির কিচির মিচির। তারাদাস যেতেই পাখিরা উড়ে পালায়। বেশ বড়ো সড়ো একটা আতা ছিঁড়ে নিল তারাদাস। তিতু আতা খেতে ভালোবাসে। তিতু জনার্জন মল্লিকের মেয়ে। জনার্দনবাবুর বাড়ির চারিদিকের মাটির পাঁচিল, দরজায় গণেশ। পাঁচিলের গায়ে লেখা : জাতীয় সংহতি রক্ষা করুন। আরও আছে।

গাছ লাগান গাছ বাঁচান, গাছ হল প্রাণাধিক।

নিবেদন করিছেন শ্রী জনার্দন মল্লিক।

জনার্দন মল্লিকের ভগ্নীপতি পাশের গ্রাম ক্ষীরসাগরের পঞ্চায়েত প্রধান। জনার্দনের জমির কাছে সরকারি ডিপকল হয়েছে। এখন বছরে তিনটে চাষ। এখন জনার্দন মল্লিককে সবাই জনার্দনবাবু বলে। তিতুর খোঁপায় একদিন কাঠালীচাঁপা গুঁজে দিচ্ছিল তারাদাস, জনার্দনবাবু দেখে ফেলেছিল। বলেছিল— 'আর কক্ষণো এ বাড়ির দরজা মাড়াবি না হারামজাদা।' তারাদাস দরজা মাড়ায় না। সাঁই করে সোজা পাঁচিল-ঘেরা উঠানের মধ্যিখানে নামে। তিতু তখন গুড়াখু দিয়ে দাঁত মাজছিল। হাতের মধ্যে আতাটা দিয়েই উপরে উঠে যায় তারাদাস। কদম গাছের মগডালে আনন্দে ক'বার দোল খায়। ওকে ঘিরে জড়ো হতে থাকে লোকজন। সবার চোখ উপরে। আকুল আহ্বানে বলে, নেমে এসো, কদম্বের শাখা হতে নেমে এসো ত্বরা। তারাদাস উড়ে উড়ে নেমে আসে। বাচ্চারা আনন্দে হাত তালি দেয়। তিতু ভীষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। হাতে তখনো আতা। তারাদাস মাটিতে নেমে কোমরের বেল্ট খুলে ডানাটা পিঠ থেকে খুলে পাশে রাখে। মানুষজন আর তারাদাসকে দেখছে না তেমন। ডানাটাকেই দেখছে। তারপর তারাদাসকে ঘিরে মিটিং বসে। জনার্দন মল্লিক হাঁকে, 'অ্যাই তিতু, এখানে কি? যা-ঘর যা...।' তারপর তারাদাসকে বলে, 'ঝেড়ে বল তো তারাদাস, ব্যাপারটা কি।' তারাদাস সব বলে। প্রথম থেকে সব বলে। মতিলাল ভটচাজ ফিসফিস করে হীরালাল মিত্রকে বলে, 'সিডিউল কাস্টরা সব দিক থেকেই সুবিধে পাচ্ছে হে।' জনার্দন মল্লিক সব শুনে নিয়ে কদমগাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে থাকে :—

শুন বলি জনগণ শুন সবে এক মন তারাদাস গর্ব সবাকার...

ঠিক সেই সময় জনার্দনের উপরে গলা চড়িয়ে বলতে শুরু করল এই দুধসাগর গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান হরিপদ রায়, প্রাইমারি মাস্টার : 'বন্ধুগণ, তারাদাস একটা ওড়ার যন্ত্র পেয়েছে,— তা যে ভাবেই হোক। কিন্তু তার ঐ ওড়ার ফায়দা নারায়ণ বিশ্বাসকে একা ভোগ করতে দেয়া হবে না। তারাদাসের ডানার সাহায্যে নারায়ণ বিশ্বাস ওর দোকান থেকে আরও দূরে দূরে আরও তাড়াতাড়ি ক্যাসেট সাপ্লাই করে আরও বেশি মুনাফা করবে। আমরা তারাদাসকে অনুরোধ করব, হে তারাদাস, তুমি তোমার ডানা জনগণের কাজে লাগাও। আমের মুকুলে মেটাসিড স্প্রে করো উড়ে উড়ে। তাতে সব বকুলেই ওষুধ লাগবে। ক'টা বাঁদর এসে প্রায়ই জ্বালাতন করে, তাড়া করলে এ ডাল থেকে ও ডালে পালায়। তুমি রাক্ষসের মুখোশ পরে উড়ে উড়ে বাঁদর তাড়িও।

তারাদাস বলে, বেশ তো।

তারাদাসের ঠাকুর্মা চোখের জলে নাকের জলে একশো। বাপ-মা মরা নাতিকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'হ্যারে, তোর ভয়ের কিছু নেই তো, ডানাটা বিগড়োবে না তো? তারাদাস বলে— না-না, কিচ্ছু ভয় নেই। ডানা চালানো ভীষণ সোজা। আমার তো এখন আর মাটিতে পা দিতেই ইচ্ছে করে না।' বুড়ি বলে— হ্যাঁরে, তোর মালিক এবার তোর

একটু মাইনে বাড়াবে তো? তারাদাস বলে, না বাড়াক। এবার মেলার সময় দেখো— কি রকম কামাবো। মটোর সাইকেলের আশ্চর্য খেলা আসে না, ভোঁ-ভোঁ ঘোরে, কত টাকা কামায়। আমিও বোঁ-বোঁ উড়ব। মাইকে বলব আসুন দেখুন— উড়ন্ত মানুষ...

নারায়ণ বিশ্বাসের হাটের নারায়ণ ক্যাসেট ভাণ্ডারের সাইন বোর্ডের তলায় আর একটা ছোট সাইন বোর্ড জুড়ে দেয়া হয়েছে। বিঃ দ্রঃ : খবর পাইবা মাত্র উড়ন্ত মানুষ দ্বারা দ্রুত অর্ডার সাপ্লাই করা হয়।

এই গ্রামে ইলেকট্রিক এসেছে বছর দুই। ফোন ছ'মাস। নারায়ণ ক্যাসেট ভাণ্ডারের ফোন নম্বর দুই। প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের ফোন তিন। আট মাইলের মধ্যে আর হেলথ সেণ্টার নেই, আট মাইলের মধ্যে আর ভি.ডি.ও. ভাণ্ডারও নেই। তারাদাসকে নতুন পোশাক দিয়েছে নারায়ণ। কালো প্যান্ট, সাদা জামা। তারাদাস ছন্দে ছন্দে ওড়ে আনন্দে।

তারাদাস পাঁচ জনের উপকারও করে দেয়। এ নিয়ে ওর সমস্যা। কেউ হয়তো বলল— তারাদাস, নারকোল পেড়ে দিবি? ও পেড়ে দিল,— ওর তো এক মিনিট। পরে দুঃখীরাম এসে বলল— তাবাদাস, আমার ভাত মারিস না। আমি একটাকা নিয়ে নারকোল পাড়ি। তুই এসব করলে আমাব কী হবে। একদিন জনার্দন বলল— 'তারাদাস এই কাগজগুলো ধর, আকাশ থেকে ছড়িয়ে দিবি।' তারাদাস তাই করল। হরিপদ মাস্টার তো রেগে টং। বলল, 'তারাদাস, জনার্দনের চক্রান্তে পা দিও না। ওরা আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে। জনার্দনের ভগ্নীপতি ক্ষীরসাগর থেকে এসব করাচ্ছে। আমার কথা ছাড়া আর কোনো কাজ করবে না, এই তোমায় বলে দিলুম। আমি এই গাঁয়ের প্রধান।' তারাদাস মাথা নাড়ে।

গাঁযে একদিন জনার্দন মল্লিকের বাড়িতে ডাকাতি হলো। পুলিশ কী করে জানতে পেরেছিল ঠিক ক'টার সময ডাকাতি হবে, তাই পুলিশ জীপ নিযে এসেছিল আবার ডাকাতও জানতে পেরেছিল পুলিশ আসবে, তাই ডাকাতরা একটু আগেভাগেই এসে গিয়েছিল। পুলিশ যখন এলো ততক্ষণে ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতরা মাঠ ভেঙে পালাচ্ছে। জীপ তো আর মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটতে পারে না, তাই আব ডাকাতগুলোকে ধরা গেল না। পুলিশ বলল, খবর আছে আসছে হপ্তায় হরিপদবাবুর বাড়িতে ডাকাতি হবে। হরিপদ বলল— সে কী? তবে তো আপনাদের এলার্ট থাকতে হয়। পুলিশের বডবাবু বললেন, এলার্ট না হয় থাকলাম, তবে মাঠ ভেঙে ডাকাত পালালে আমরা কী করব? মাঠে তো আর জীপ যায় না। হরিপদবাবু তক্ষুনি তারাদাসকে ডেকে আনিয়ে বলল, 'তারাদাস, পুলিশ সাহেবকে একটু ওড়া শিখিয়ে দে ভাই, সামনের সপ্তাহে ডাকাত আসবে, আমার বাড়িতে ডাকাতি হবে, ডাকাতি করে মাঠ ভেঙে পালাবে। ট্রেনিংটা থাকলে তোর ডানাটা নিয়ে মাঝমাঠে উড়ে গিয়ে পুলিশ ডাকাতকে গুলি করে দিতে পারবে।'

এ আর বেশি কথা কি। তারাদাস রাজী হয়।

বড়োবাবুর হাই-ব্লাডপ্রেসার। মেজবাবু ট্রেনিং নিতে এলেন। নাম কানাই পাত্র।

ট্রেনিং হলো। তারপর মেজবাবু উড়তে উড়তে করল কি, বলা নেই, কওয়া নেই মধুক্ষরা নদীর ধারে চলে গেল। নদীর পাড়ে সুহাসিনী গ্রাম। গ্রামের ধারের পুকুরে গ্রাম্যবালারা সব কলহাস্য সহকারে স্নানরতা ছিল। তাদের বস্ত্র ছিল পুকুরপাড়ে ছাড়া। কানাই করল কি, সাঁই করে কয়েকটা কাপড়-চোপড় তুলে নিয়ে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিল। তারপর ডালে উঠে বসে রইল। কানাইয়ের হাতে মোহন বন্দুক।

ব্যাপারটা জানাজানি হলো যখন সাপ্তাহিক বিষদাঁত পত্রিকায় ব্যাপারটা লেখা হ'ল। জনার্দন মল্লিক ওর মাঠের মুনিষ-মজুরদের শোনাল—

আরে শুন সবে মন দিয়া আজব কাহিনী
সম্প্রতি হইয়াছে ইহা লোক জানাজানি
মাস্টার হরিপদ
মাস্টার হরিপদ— কানাই পাত্র চক্রান্ত করিয়া
নারীর বস্ত্র নারীর ইজ্জত লইল যে হরিয়া
শুন সেই বৃত্তান্ত...

হরিপদ বলল, 'তারাদাস, তোর ডানাটারই যত দোষ। যত অশান্তির কারণ। এই ডানাটা ভেঙে ফেলা হবে কিনা এ নিয়ে আমরা আলোচনায় বসব।'

নারায়ণবাবু বললেন— 'তারাদাস, তোর ঠাক্‌মা আমার হাতে পায়ে ধরে বলেছিল বাপ-মা মরা নাতিটার একটা গতি করে দিতে। বুড়ির মুখের দিকে তাকিয়েই তোকে আমি চাকরি দিয়েছিলাম। শোন্ তুই আমার চাকরি করিস। ওসব হরিপদদের কথা শুনবি না। জনার্দনের কথাও না। আমি যা বলব তাই শুনবি, যা বলব তাই করবি। তোর ডানা কাউকে দিবি না। ওটা আমার।'

তারাদাস বলল, 'বুড়োটা ডানাটা দেবার সময় যে বলেছিল— ডানাটার অমর্যাদা হতে দিস নি, মানুষের উপকারে লাগাস...'

নারায়ণ বিশ্বাস বলল— 'বিচার করে উপকার করতে হয়। তোর ছোট্ট মাথায়, বোকা মাথায় কি এত বিচার-বিবেচনা আসে? বরং আমিই বিচার-বিবেচনা করে বলে দেব তোকে।'

নারায়ণ ক্যাসেট ভাণ্ডারে লক্ষ্মী এলো। ফুলে-ফেঁপে উঠল দোকান। দোকানের নাম সামান্য চেঞ্জ। ভাণ্ডারটা হলো সেন্টার। নারায়ণবাবু দোকানে রঙ করালেন, নতুন লাইট বসালেন,; ধূমধাম করে বিশ্বকর্মা পূজা হল। ভি.সি.পি., ভি.সি.আর-এ মালা পড়ল, তারাদাসের ডানায় মালা পড়ল, চন্দন পড়ল, ধূপকাঠি গোঁজা হলো স্টিয়ারিং-এর ফাঁকে। ইঞ্জিনিয়ার ডেকে নারায়ণবাবু ডানায় ওয়্যারলেস সিস্টেম করালেন। স্টিয়ারিং-এর মাঝখানটায় তো একটা স্পীকার দেয়া হলো। উড়ন্ত তারাদাসকে এখন নারায়ণবাবু নির্দেশ দিতে পারেন, আবার তারাদাসের কথাও শুনতে পান নারায়ণবাবু। যেমন :

ভূদেব সামন্তর বাড়িতে পৌঁছে গেছি স্যার...

ইয়েস।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আরও দু'দিন রাখতে চাইছে স্যার।

না, তা কি করে হয়; মালতীমাধবপুরে অষ্টপ্রহর হরিসংকীর্তন চলছে, ওখানে তো আজই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দিতে হবে।

স্যার, অবনী সাঁতরার বাড়ি পৌঁছে গেছি স্যার।

ইয়েস।

অবনী বাড়ি নেই।

ওনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বল।

স্যার?

ইয়েস...

ডট্‌ডট্ ক্যাসেটের ব্যাপারে বৌদির সঙ্গে কথা বলা কি ঠিক হবে?

এতদিনেও কায়দা শেখনি? একটু বুদ্ধি করে বল।

তখন তারাদাস এইভাবে কথা বলে। 'তিনটে ক্যাসেট দিয়ে গেলুম বৌদি, সতী সাবিত্রী, হান্টার ওয়ালী আর দ্রৌপদী কী বস্ত্র হরণ। লাস্টেরটার ডবল্ দাম কিন্তু,— দোব?'

বৌদি বললেন, রেখে যাও...।

নারায়ণ তারাদাসকে কোয়ার্টার দিয়েছে বৈকুণ্ঠ ভবনের চিলেকোঠায়। বৈকুণ্ঠ ভবন নারায়ণের নতুন বাড়ি। অল মোজাইক। তারাদাসের ঠাক্‌মা চিলেকোঠায় মনের সুখে ঝোল চচ্চড়ি রাঁধে। মুখে আর হাসি ধরে না। বলে, এবার লাতবৌ আনবো।

তারাদাস কাজে যাবার সময় বুড়িকে পেন্নাম করে। উড়ান দেবার আগে ডানার বোতাম টেপার সময় শোনে দুগ্‌গা-দুগগা। তারাদাসের হাতে নতুন ঘড়ি, পরনে নতুন ইউনিফর্ম। বুড়ি তাকিয়ে থাকে...

তারাদাস যায়
জরির জুতো পায়
একশো টাকার জামাজোড়া
তারাদাসের গায়
মন্দা মন্দা বাতাস লাগে
সোনামণির পায়।

এদিকে জনার্দন ভার্সেস হরিপদর ঝগড়া উঠেছে তুঙ্গে। জনার্দন তো নিমিত্ত মাত্র। আসলে ঝগড়াটা হলো দুধসাগরের প্রধান হরিপদর সঙ্গে ক্ষীরসাগরের প্রধান গোবর্ধনের। জনার্দনের দোষ হলো গোবর্ধন ওর ভগ্নীপতি। জনার্দনের আতা গাছের ডালগুলো হরিপদর সীমানার মুখে পড়েছিল। গাছের ডাল তো আর দাগ নং জে.এল.নং বোঝে না। কাটলেও আবার ডাল গজায়। এ নিয়ে ঝামেলা। সালিশি হয়েছিল কাছটা কেটে ফেলতে হবে। তখনই ঐ বিখ্যাত কবিতার জন্ম। ঐ যে, জনার্দনের পাঁচিলের গায়ে যেটা লেখা আছে : গাছ লাগান, গাছ বাঁচান গাছ হলো প্রাণাধিক, নিবেদন করিছেন জনার্দন মল্লিক। গাছটা সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিল। এবার কাটতেই হলো।

আতাগুলো ভুঁয়ে লুটোপুটি, তোতা পাখিরা সব উড়ে পালাল। জনার্দনের বোকা মেয়েটা তিতুর সে কী কান্না। কান্না আর থামে না। তারাদাস বলে কাঁদিস না তিতু, আমি, আমি তোকে...

গাঁয়ের শেষ প্রান্তে আতা বাগানের বস্তিতে যে ছোটলোকগুলো থাকতো, ওখানে আগুন লাগল। দুটো বাচ্চা পুড়ে মরে গেল। আতাগাছ যে-কটা ছিল পুড়ে কালো। আতাবাগান বস্তির লোকগুলো হরিপদর হয়ে খুব খেটেছিল ভোটে।

অনন্ত মাঝিকে পাওয়া যাচ্ছিল না। মদালসা নদীর জলে ভেসে উঠল ওর লাশ।

নারায়ণ বিশ্বাসের বাড়িতে এখন অনেকবার বাজে টেলিফোন।

নারায়ণবাবু এখন কেউকেটা লোক। চিন্তামগ্ন লোক।

নারায়ণবাবুর সঙ্গে গোবর্ধনের ফুসুর ফুসুর
নারায়ণবাবুর সঙ্গে হরিপদর ফুসুর ফুসুর
নারায়ণবাবুর সঙ্গে পুলিশের ফুসুর ফুসুর।

তারাদাস এখন ঘর আটকা। নারায়ণবাবু বলেন, এখন ক'দিন বাইরে বেরুতে হবে না তারাদাস। তোর ডানার দিকেই সবার নজর। পেলে কেড়ে নেবে, নয়তো ভেঙে দেবে।

বুড়ি ঠাক্‌মা তারাদাসের ডানায় থুথু দেয়, ঝাঁটার কাঠি বেঁধে দেয়।

একদিন বৈকুণ্ঠ ধামে অনেক জুতো। বসার ঘরে দোর বন্ধ করে আলোচনা। ঘরে কে কে আছে জানে না তারাদাস। আকাশে সেদিন সকাল থেকে মেঘ।

তারাদাসের ঠাক্‌মা খিচুড়ি চাপিয়েছে। এমন সময় নারায়ণবাবু এলেন তারাদাসের চিলে কোঠার ঘরে।

'তারাদাস, কথা আছে।'

'কী কথা?'

'একটু বেরুতে হবে তোকে।'

'আজ যে মেঘলা দিন। সূর্যের আলো না পড়লে যে আমার ডানা নড়ে না।'

'আলো আছে। আলো আছে বলেই তুই আমাকে দেখছিস, আমি তোকে দেখছি। একবার দেখনা-রে ভাই তারাদাস, ভীষণ দরকার।'

'ভাই' ডাক শুনে তারাদাস গলে যায়। ডানা লাগিয়ে একবার ট্রায়াল দিল। একপাক উড়ে এল। ভাবল, সত্যিই তো, আলো কী অদ্ভুত। সূর্যকে দেখতে না পেলেও সূর্য আছে চরাচরে।

তারাদাস বলল, 'কোথায় যেতে হবে?'

নারায়ণ ছাদের কোনায় ডেকে নিয়ে যায়। বলে, 'সোজা উত্তরে। মধুক্ষরা নদী পার হতে হবে।'

'ওখানে তো আমাদের ক্যাসেটের কেলায়েন্ট নেই,—

'ক্যাসেট নয়-রে, অন্য জিনিস।' নারায়ণের গলার স্বর গাঢ়। 'জিনিসটা আনতে হবে তোকে'।

'কি জিনিস?'

'পরে জানবি। শোন তারাদাস, নলখাগড়ার মাঠ পার হয়ে মধুক্ষরা নদীব পাড়ে যাবি। তাবপব নদী পার হয়ে একটু গেলেই একটা মন্দির। সেই মন্দিরেব পাশে নামবি। তাবপর কোথায় যাবি, কী করতে হবে, ওয়ারলেসে বলে দেব তোকে। এই-নে চাবি। লাগবে তোর। জিনিসটা খুব সাবধানে আনবি, খুব সাবধানে।' ক্যাসেট বাখাব বাস্কেটটা পেটের তলায় ভালো করে বেঁধে দেয় নারায়ণ। তারাদাস যাত্রা করে। বুড়ি ঠাক্মা বলে দুগ্‌গা দুগগা। নারায়ণ হাত নেড়ে বলে গুডলাক।

নদীর উপরে আসে তারাদাস। বর্ষার জলে ফুলে ফেঁপে নদী এখন বিশাল। তলায় তাকালে ভয় লাগে।

নদী পার হয়েই দেখল আতাবন। পাকা পাকা আতা ফলে আছে। ওয়ে ওয়ে... ওয়ে ওয়ে...। দুটো তিতুকে দেবে, দুটোর বীজ সারা দুধসাগবে ছড়িয়ে দেবে। আতা ফলগুলো বাস্কেটে পুরে নিল তারাদাস। গাছের কোটরে পেল তোতা পাখির ছানা। তুলে নিল। তারাদাস বাঁচাবে। মাউথ পিসে কণ্ঠস্বর শুনতে পেল তারাদাস।

মধুক্ষরা নদী পার হয়েছ?

ইয়েস স্যার।

এবার অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলো। ওর কথা মতো কাজ করে যাও।

ইয়েস স্যার।

একটা খ্যাড়খেড়ে গলায় শুনতে পায়, তারাদাস এখন কোথায় আছ?

আতা বনে। কী সুন্দর আতাবন।

গুলি মারো আতাবন। সামনে যাও।

ইয়েস স্যার।

মন্দির দেখছ?

ইয়েস স্যার।

চূড়ায় ত্রিশূল?

ইয়েস স্যার।

মন্দিরের পিছনে নেমে যাও।

ইয়েস স্যার।

মন্দিরের পিছনের কাশ বনে নেমে যায় তারাদাস। তারপব কথামতো লাল রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে যেতেই একটা একতলা বাড়ি। বাড়ির দরজায় তালা। কথামতো চাবিটা বার করে তারাদাস। তালাটা খোলে। ঘরের জানালা-টানালা সব বন্ধ। ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা গন্ধ।

টর্চটা বার করে। জ্বালায়। ঘবের কোণায় চাবটে প্যাকেট। টর্চের আলোয় তারাদাস খুঁজতে থাকে পদ্মফুল আঁকা প্যাকেট। তারাদাস পায় না। প্যাকেটগুলো উল্টেপাল্টে দেখে। কোনোটাতেই পদ্মফুলের ছবি নেই। তারাদাস খুব সমস্যায় পড়ে। হনুমান কী করেছিল, হনুমান?

বিশল্যকরণী খুঁজতে গিয়ে হনুমান বিশল্যকরণী চিনতে না পেরে পুরো গন্ধমাদনটাই নিয়ে এসেছিল না? তারাদাস চারটে প্যাকেটই তুলে নেয়। হেড অফিসের সঙ্গে কথা বলে :—

'কোনো প্যাকেটে পদ্মফুলের ছবি নেই স্যার। ওভার।' আবার সেই খ্যাড়-খেড়ে—

'ভালো করে দ্যাখ।'

'দেখেছি স্যার, খুব খুব ভালো করে দেখেছি। ওভার'।

'সে কী? —নিশ্চয় আছে। ভালো করে দ্যাখো।'

'নেই স্যাব।'

'সব রাসকেল। কেউ ঠিক কাজ করে নি। তুমি এক কাজ করো। চারটে প্যাকেটই নিয়ে এসো, আমরা পরে দেখে নেব।'

'প্যাকেটে কি আছে স্যাব?'

'তা তোমার জেনে কাজ নেই। তুমি প্যাকেটগুলো নিয়ে এসো।'

তারাদাস চারটে প্যাকেটই তুলে নেয়। অজানা প্যাকেট। আকাশ মেঘলা। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বেল্টের বোতামটা টিপল তারাদাস। হলুদ আলো। মানে ডানার শক্তি বেশি নেই। মধুক্ষবা নদী পার হতে পারবে তো? দুগ্‌গা বলে উড়ান দিল তারাদাস।

উড়তে উড়তে আতাবন পার হলো তারাদাস। উড়তে উড়তে যেন টের পায় একটু একটু করে নিচে নেমে যাচ্ছে ও। নদীর উপরে চলে আসে তারাদাস। ডানা যেন আর তত জোরে কাঁপছে না। একটু করে নীচু হয় তারাদাস। নদীর মাঝবরাবরও আসেনি। নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে তারাদাস। তারাদাস ভয় পায়। ওয়ারলেসে জানায়— 'নদীর উপর দিয়ে উড়তে উড়তে আমি তারাদাস বলছি, আমি নিচে নেমে যাচ্ছি ক্রমশ। আমাকে একটু হাল্কা হতে হবে। একটু ওজন কমাতে হবে আমাব একটা প্যাকেট ফেলে দিচ্ছি জলে...

তক্ষুনি সমবেত স্বর :— 'সর্বনাশ তারাদাস, প্যাকেট ফেলো না।'

'আমার যে হাল্কা হতে হবে।'

'তা হলে পেচ্ছাপ করে দাও।'

তাই করল তারাদাস। মধুক্ষরা নদীর জলে তারাদাস পেচ্ছাপ করল। একটুক্ষণ পরে আবার যেন নিচে নামছে তারাদাস। একটু পরেই তারাদাস আবার চীৎকার করল— 'আমি আবার নীচে নেমে যাচ্ছি। এবার একটা প্যাকেট ফেলে দিচ্ছি আমি, যে-কোনো একটা প্যাকেট।'

'যে-কোনো একটা প্যাকেটের মধ্যেই আমাদের দরকারি প্যাকেটটা আছে। প্যাকেটটা ফেলো না। তুমি তোমার প্যান্টটা খুলে ফেলো।'

তাই করল তারাদাস। কায়দা করে প্যান্টটা খুলে ফেলে দিল মধুক্ষরা নদীর জলে। কিছুক্ষণ ঠিক, কিন্তু, একটু পরেই আবার নিচে নামতে লাগল তারাদাস। বর্ষায় উথাল-পাথাল নদী। তারাদাস চীৎকার করল— 'আমার নিচে নেমে যাচ্ছি আমি। জলে ডুবে যাব। একটা প্যাকেট ফেলে.দিই আমি?

'আর কি কিছুই নেই তোমার কাছে তারাদাস ঐ প্যাকেটগুলো ছাড়া? ধারালো কিছু নেই? শরীরের কিছুটা রক্ত ঝরিয়ে দিতে পারো না তুমি?'

'আমার কাছে কটা আতা ফল আছে, আর তোতা পাখির ছানা।'

'আতা ক্যালানে কোথাকার! ফেলে দাও! এক্ষুনি ফেলে দাও ও সব।'

তখনই ডুকরে কেঁদে ওঠে তারাদাস। তারাদাস তখন ঝুড়ির ভিতর থেকে বের করে নিল একটা আতাফল। পরিপূর্ণ গন্ধ ছিল। তারপর মুঠিতে শক্ত করে চেপে ধরল। আতা ফল ফেটে যায়, ভেঙে যায়।

একটু একটু করে জলের দিকে নেমে যাচ্ছে তারাদাস। তখন আকাশকে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মহিমাকে সাঁই সাঁই বাতাসকে বলল, আমাকে বাঁচাও...

আর অল্প কয়েক হাত নিচে তোলপাড় জল। তারাদাস চোখ বুজে তুমুল আর্তনাদ করে— আমাকে বাঁচাও। তারাদাসের চতুর্দিকে তখন শুধুই বৃষ্টির গুঁড়ো, আর কালো স্পীকারের যান্ত্রিক কলরব, ফেলে দে—ফেলে দে আতা।

এখন তারাদাসকে বাঁচতে হলে যে কোনো একটা জিনিস বেছে নিতে হবে। আতা কিংবা বাদামী প্যাকেট। প্যাকেটে কি আছে জানে না তারাদাস। বিষ না বীজ—না বীজাণু— না ড্রাগ— হেরোইন না নাপান না নিউক্লিয়ার ছাই, তারাদাস জানে না। অথচ তারাদাসেরই ডানায় ভর করে চলেছে। হুকুম।

তারাদাসের আগে কোলবালিশটাও উড়েছিল। ওড়ানো হয়েছিল। কোলবালিশটার নিজের কোন ইচ্ছে ছিল না। প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত ছিল না। তারাদাস তো কোলবালিশ নয়। ডুবে যাবার আগে ওকে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে।

আকরিক

মানব চক্রবর্তী

স্ল্যাগের নমুনা দেখেই যিনি মেটালের টেম্পারেচার আঁচ করতে পারেন, 'ব্লিডার'-এর ধোঁয়া দেখে যিনি বলে দিতে পারেন, ফার্নেসের গতি-প্রকৃতি কেমন, তাঁকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। অনঙ্গমোহন দত্ত পাস করা মেটালার্জিস্ট নন। তবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় তিনি মেটালার্জি গুলে খেয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে কত পাস করা ধাতুবিদ তাঁর কাছে নাকানি-চোবানি খেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

টমাস হিলের কাছে কাজ-শেখা মানুষ তিনি। সেই হিল-সাহেব, যিনি স্যার বীরেন মুখার্জির আমলে প্রতিটি ব্লার্স্ট-ফার্নেসে বলে বলে টার্গেট পুরো করতেন, 'আয়রন-মেকিং'-এর ক্ষেত্রে এক সিদ্ধ-পুরুষ। না, যৌবনের হিল-সাহেবকে দেখেননি অনঙ্গমোহন দত্ত। শেষের দশ বছরের ছোঁয়া পেয়েছিলেন। তাতেই যা শিখেছেন, তার জোরেই দাপটে চালিয়ে গেছেন ব্লাস্ট ফার্নেসের মতো কঠিন কাজ। হ্যাঁ, কঠিন বটে, রাফ্ অ্যাণ্ড টাফ্, তবে কাজটাতে একটা চ্যালেঞ্জ আছে। এখানেই অনঙ্গমোহনের যত টান।

ঘুমের মধ্যেও অনঙ্গমোহন দত্তের চোখের সামনে বারোশো টন ক্যাপাসিটির বিশাল ব্লাস্ট-ফার্নেসটা ভাসতে থাকে। প্যানেল বোর্ড... ব্লাস্ট-টেম্পারেটার... পেরিফেরিয়াল টেম্পারেচার... হট্-ব্লাস্ট প্রেশার... ইত্যাদি। অসংখ্য ইন্ডিকেটার চোখের সামনে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। লাল-নীল-সবুজ-হলুদ অসংখ্য বাতি জ্বলছে নিবছে।

দীর্ঘ পনেরো বছর সফলভাবে ফার্নেস-ইনচার্জ পদে কাজ করা অনঙ্গমোহন দত্তের জীবন ছকে বাঁধা। সেই ছকের অধিকাংশটা জুড়ে শুধু স্ল্যাগ, মেটাল, আয়রন-ওর, লাইমস্টোন, ডলোমাইট, ম্যাঙ্গানিজ-ওর আর কোক।

একসময় তিতিবিরক্ত ইন্দুমতী আক্ষেপ করে বলত, তোমাদের মতো মানুষের বিয়ে করাই উচিত নয়। আমি যদি একটা লোহার পিণ্ড হতাম, তবে হয়ত তুমি আরও বেশি আনন্দে থাকতে। আর আমিও বাঁচতাম। চাওয়া থাকত না, পাওয়া থাকত না। দুঃখ-যন্ত্রণা থাকত না।

— আঃ ইন্দু, প্লিজ, অমন বোলো না। আয়রন-মেকিং-এর মতো চ্যালেঞ্জিং কাজ আর কিছু আছে? একবার ভেবে দেখ তো— আমাদের ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র দেশে কত আকরিক ছড়ানো রয়েছে! তার কতটুকুই বা আমরা কাজে লাগাতে পারছি! এই একটা ইন্ডাস্ট্রি আজ সারা পৃথিবীকে শাসন করছে। আর শেষদিন অবধি করবেও। জাপান, কোরিয়ার মতো ছোট ছোট দেশ, 'আয়রন-মেকিং'-এর ক্ষেত্রে কত উঁচুতে পৌঁছে গেছে, অথচ বিশাল সম্পদের মালিক হয়েও আমরা...

— রাখো তোমার লেকচার। আমার জীবনটাকে তুমি শেষ করে দিয়েছ।

এসব বহু বছর আগের কথা। ইন্দুমতী তখন অনঙ্গমোহনের শরীরে কেবল লোহা লোহা গন্ধ পেত। কখনও বা কয়লা-কয়লা গন্ধ। রেগেমেগে বলত, মানুষ নও তুমি।

আকরিক। তারপর যত দিন গেছে, একটার পর একটা প্রমোশন পেয়েছেন অনঙ্গমোহন, অবশেষে ফার্নেস-ইনচার্জ হয়েছেন, বাংলো হয়েছে, মাইনে বেড়েছে অনেক, ঘরে বসেছে ফোন, সোসাইটিতে প্রতিপত্তি বেড়েছে, ক্লাবে খাতির— ইন্দুমতীও তালে তালে সব সইয়ে নিয়েছে। বুঝেছে, তাঁর স্বামীর মাঝে মাঝে গভীর স্বরে বলা 'ওয়ার্ক ইজ ওয়ার্শিপ, ওয়ার্ক ইজ জয়' কথাটা মানুষটার জীবনে বর্ণে বর্ণে সত্যি। বাধ্য হয়েই তখন ইন্দুমতী না বুঝলেও, ভাল না লাগলেও, স্বামীর কারখানা-সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ নিয়েছে। মন দিয়ে শুনেছে। চোখেমুখে ছদ্ম-আগ্রহ ফুটিয়ে তুলেছে।

হ্যাঁ, তাতে ফল হয়েছে। মানুষটা তাতেই গলেছে। লোহার মানুষকে গলাতে তাঁকেও লৌহ-প্রেমিক হতে হয়েছে। হয়তো এটাই নিয়ম।

অনঙ্গমোহন দত্তের ঘুম ভেঙে গেল।

ঘরের ভেতর চাপ চাপ অন্ধকার। যত রাতই হোক না কেন শুতে, ঘুম ভাঙার সময়টা তাঁর বাঁধা। পাঁচটা থেকে সোয়া-পাঁচটা। এত বছরের অভ্যাস যাবে কই! ভাঙলেই অনঙ্গমোহন দত্ত ডান হাতটাকে বাড়িয়ে দেন পাশের টেবিলটাকে লক্ষ্য করে। মাথার পাশের ছোট্ট টেবিলটাতে এই এতকাল অবধি রাখা থাকত ফোন। ফোন নয়, বলা ভাল ইন্দুমতীর সতীন।

শেষ রাতের আবেশে যৌবন-যাই-যাই ইন্দুমতী যখন ঘুমের মধ্যে গভীরভাবে জড়িয়ে থাকত অনঙ্গমোহনের গলা, ততক্ষণে উনি শুরু করে দিয়েছেন রোজকার ফোনপর্ব। কখনও বিরক্তি, কখনও রাগ, আবার কখনও-বা খুশির প্রলেপ লেগে থাকত ফোনে-মুখ-রাখা অনঙ্গমোহনের চোখেমুখে।

প্রথমদিকে, অর্থাৎ যখন তিনি ফার্নেস-ইনচার্জ হলেন, তখন অবশ্য ফোন তুলে বলতে হত 'দত্ত স্পিকিং...'। পরের দিকে ভাবী গলা চিনতে আর কারও অসুবিধা হত না। প্রতিটি ফার্নেসের ফোরম্যানরা জেনে গিয়েছিল ঠিক সোয়া পাঁচটাতেই ভেসে আসবে ফার্নেস-ইনচার্জ অনঙ্গমোহন দত্তের গলা, হ্যালো... নাম্বার ফোর ফার্নেস...।

ব্যাস... সঙ্গে সঙ্গে কারখানা থেকে নাইট শিফ্‌টের ফোরম্যান শুরু করে দিত আট ঘণ্টার খুঁটিনাটি রিপোর্ট। কাস্ট নম্বর দু হাজার ষাট, কাস্ট টাইম বারোটা চল্লিশ, 'ফ্লাসিং' তিন ল্যাডেল, মেটাল একশ কুড়ি টন, স্ল্যাগ পাঁচ ল্যাডেল, ফার্নেসে হিট যাচ্ছে সাতশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, মুভমেন্ট অলরাইট...

মাঝপথে থামিয়ে অনঙ্গমোহনের প্রশ্ন, হোয়াট? ওনলি হানড্রেড টোয়েন্টি টন্‌স মেটাল? ঢালাইয়ে পাঁচ আর 'ফ্ল্যাসিং' তিন, মানে আট ল্যাডেল স্ল্যাগ, আর মেটাল মাত্র একশ কুড়ি? কারখানার যা প্রোডাকশন দিচ্ছ তাতে এবারে আর 'ইনগট' নয়, কড়াই তৈরি করতে হবে। যত্তো সব। তা ফার্নেস ড্রাই হয়েছে?

— হ্যাঁ স্যার। ড্রাই। 'হার্ড ব্লো' করিয়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে ফের চিৎকার। 'হার্ড-ব্লো'? হোয়াই? তোমরা কি চোখ বুজে কাজ করো? লগ-বুকে লেখা ইনস্ট্রাকশনগুলো দেখনি? আমি কতবার বলেছি চার নম্বর 'হার্ড-ব্লো' করাবে না, 'মাইল্ড-ব্লো' শুরু হতেই ঢালাই বন্ধ করে দেবে। নাঃ, তোমাদের দ্বারা কিস্যু হবার নয়। শুধু একগাদা পড়াশুনা করলেই ফার্নেস চালানো যায় না। বুঝতে হয়। চোখ-কান খোলা রাখতে হয়। যে কোক এখন ফার্নেসে চার্জ হচ্ছে, তার 'মাইকাম' জান? 'অ্যাশ্‌-কনটেন্ট' কত পার্সেন্ট জান? কিস্যু খবর রাখো না। কোক কোয়ালিটি খুব খারাপ। খুব। ভিলাইয়ের 'রেক্' এখনও আসেনি। আর আমাদের 'কোক্-ওভেন' যে-মাল দিচ্ছে

সে আর বলবার নয়। 'হার্ড-ব্লো' করাতে গেলে আন-বার্নট্ কোক্ চলে আসবে হোলের মুখে। হয়তো যে কোনও সময় 'মেস্' হয়ে যেতে পারে...

— না স্যার... ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। মেটাল অত কম হওয়ায় একটু চিন্তায় ছিলাম। তাই হার্ড ব্লো করিয়েছি...

— আবার কথা! হুঁ, চিন্তা! ফার্নেস-ফোরম্যান শুধু মেটালার্জি পড়লেই হয় না হে, হিম্মত চাই। হি মাস্ট বী অ্যা স্ট্রং ম্যান...

ভয়ে গলা জড়িয়ে যেত ফার্নেস ফোরম্যানের। সত্যি, অনঙ্গমোহন দত্তকে কোনওভাবেই ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। লোকটা আশ্চর্য মন্ত্রবলে বাড়িতে বসেই যেন টের পেয়ে যায় নাইট শিফ্টের ফোরম্যানের ছোটখাটো ক্রটিবিচ্যুতি।

এহেন অনঙ্গমোহন দত্ত ঘুম ভাঙতে আজও হাত বাড়ালেন। ফোন পেলেন না। বদলে জলের গেলাস। ওটাকেই শক্ত করে ধরে মুখের কাছে এনে ঘুমজড়িত স্বরে সবে বলেছেন...হ্যালো..নাম্বার ফোর ফার্নেস..সঙ্গে সঙ্গে হাত পিছলে পড়ে গেল কাঁচের গেলাস। ঝনঝন শব্দ নল। অর্ধেক জল বিছানায়। অর্ধেক মেঝেতে। ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল ইন্দুমতী।

—কী হল?

বেড-স্যুইচ্ জ্বালতেই নজরে পড়ল ঠিক সোয়া-পাঁচ।

—কী হল? দিন দিন কি বাচ্চা ছেলে হয়ে যাচ্ছ? গেলাসটা ভাঙলে তো! ইস্...বিছানাটাও ভিজে গেল।

হতভম্ব অনঙ্গমোহন অস্ফুটে বললেন, সোয়া পাঁচ...

— সোয়া পাঁচ? তাতে হলটা কি? ইন্দুমতী অবাক।

-- না কিছু হয়নি, তবে...

— তবে?

— এই সময়টাতে বুকের মধ্যে কেমন যেন করে।

— তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে? ইন্দুমতী উদ্বিগ্ন।

— আঃ, শরীর কেন খারাপ লাগবে! আগুন আর কয়লার সঙ্গে যুদ্ধ করা শরীর অত সহজে খারাপ হয় না ইন্দু। ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে যেতেই মনে হল..সময় হয়ে গেছে...

ইস্ কী ভুলটাই না করতে যাচ্ছিলেন অনঙ্গমোহন। ভাগ্যি কথাটা শেষ করেননি। ফোন ভেবে জলের গেলাস তোলার কথা বললে আর রক্ষা থাকত না। এতকাল যা করেছেন, করেছেন। আর তা হবার নয়। সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন অনঙ্গমোহন। বাংলোটা অবশ্য ছেলের নামেই হয়েছে। খোকাও তো উঁচু পোস্টে চাকরি করে। চাকরির সুবাদে খোকারও ফোন আছে। তবে তা ওর শোবার ঘরে থাকে। এ ছাড়া বহু কিছুই বদলে গেছে। এতকাল ছিল তাঁর পালা। এবারে শুরু হয়েছে ইন্দুমতীর পালা। যন্ত্রের সঙ্গে এতকাল ঘর করা মানুষটাকে ইন্দুমতী এবারে ঘরের মানুষ হিসেবে পেয়েছে। ফোনপর্ব দিয়ে আর দিন শুরু নয়। দিন শুরু ইন্দুর হাসিমুখ দিয়ে। দিন শুরু ইন্দুমতীর সঙ্গে মর্নিং-ওয়াক দিয়ে। ভোর ছ'টার মধ্যে ফ্লাস্কে চা ভরে দিয়ে যায় কাজের মেয়ে লতা। সেই ফ্লাস্ক আর দু'টো কাপ ব্যাগে ভরে ইন্দুমতীর হাত ধরে কোনদিন সোজা শুনশান রিভারসাইড রোডের দিকে, কোনদিন ভারতী ভবন পেরিয়ে সিধে স্টেডিয়ামের দিকে। মাঝে, ফাঁকা জায়গায় দু'দণ্ড জিরানো। ভোরের হাওয়ায় একত্রে চা-পান।

ইন্দুমতী তখন কত কথা বলে। কত গল্প। ছোটোখাটো অভাব-অভিযোগ থেকে শুরু করে বয়েসকালের পছন্দ-অপছন্দের ফিরিস্তি। চার বছর বিয়ে হয়েছে খোকার। এখনও

কেন বাচ্চাকাচ্চা হচ্ছে না। এত বড় বাড়িতে একটা বাচ্চা না থাকলে ভাল লাগে। এত পড়াশোনা জানা ছেলে এটা কেন বোঝে না, প্রথম বাচ্চা যত দ্রুত হয় ততই মঙ্গল। অথবা, (দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে) বউমার রান্নার হাত কিন্তু তেমন নয়। আসলে, রান্না-বান্নার ব্যাপারে ইচ্ছেটাই হল শেষ কথা। ভাল রান্না করার ইচ্ছে থাকলে তার হাতে রান্নার স্বাদ হবেই। বউমা তো হেঁশেলে ঢুকতেই চায় না।

অসংখ্য কথায়, গল্পে, পথচলায়, ইন্দুমতী অনঙ্গমোহনকে নিয়ে সকালের এই সময়টা যথার্থ উপভোগ করে। প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির চেয়েও বড় হল এই সব সাংসারিক খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা। এ আলোচনায় সার-অসারের চেয়েও বড়, নিজেকে ঘোর সংসারী বলে মনে হয়। বেশি বলে ইন্দুমতী। অমঙ্গমোহন কম। মাঝে-মধ্যে হুঁ, হাঁ করেন। মন খুব খুশি থাকলে অনঙ্গমোহন সমর্থনসূচক ভঙ্গিতে তাঁর পেটেন্ট বাক্যটি ব্যবহার করেন, 'হ্যাঁ, জজে মানবে'। ইন্দুমতী তখন বোঝে, কথাটা খুব মনে ধরেছে। নইলে 'তাই তো' 'ঠিক আছে' জাতীয় ছোটখাটো উত্তরের মধ্যে দিয়েই সাঙ্গ করেন প্রভাতফেরী। তবে হ্যাঁ, একটা কথা, যেখানেই যান না কেন, মাঝে মাঝেই চোখ চলে যায় দূরের ওই চিমনিগুলোর দিকে। ফার্নেসের সুউচ্চ চূড়ার দিকে। ধোঁয়ার দিকে চেয়ে মনে মনে আঁচ নিতে চেষ্টা করেন, ফার্নেসের ঢালাই খুলল কি না! কালো অথবা লালচে রঙের, অথবা ঠিক সাদা নয়—ছাই রঙের ধোঁয়া দেখে মনে মনে বিশ্লেষণ করতে বসেন, এই ধোঁয়া ঠিক কোন জাতের মেটালের পূর্ব-লক্ষণ। হয়তো বা কখনও বলেই ফেলেন, বুঝলে ইন্দু, অত কালচে ধোঁয়া কিন্তু ফার্নেসের পক্ষে ভাল লক্ষণ নয়। এই সময় আমি থাকলে হিট আটশো সেন্টিগ্রেড চালু করে দিতাম। আজকালকার ছেলেরা এসব একেবারে খেয়াল করে না।

চোখ পাকিয়ে তখন ইন্দুমতী ধমকে ওঠে, চোখ ঘোরাও। চোখ ঘোরাও বলছি। ইস্, তুমি কি আর কোনওদিন বদলাবে না? বলছিলাম বউমার রান্নার ব্যাপারে, আর তখনই ওনার শুরু হল সেই একঘেয়ে...

ঘোর কাটতেই লজ্জিত স্বরে অনঙ্গমোহন বলেন, ও হ্যাঁ, কী বলছিলে? রান্না! হ্যাঁ, তা খারাপটা কী হচ্ছে? বেশ তো করে বউমা।

— সত্যি, তুমিও যেমন! দেখলে না, সেদিন টাটকা ইলিশমাছ কেমন পেঁয়াজ দিয়ে রাঁধল। এ তো আমি জন্মে শুনিনি বাপু। টাটকা ইলিশ পাতলা করে ঝোল হবে। শুধু কাঁচালঙ্কা, কালোজিরে আর এক চিমটে হলুদ দিযে ব্যাস্। পেঁয়াজ দিলে ইলিশের গন্ধ থাকে! আসলে রান্নার ব্যাপারে আমি ঠিক যেটা বলব, বউমা তার উল্টোটা করবে। আমার বাপু এসব একেবারে পছন্দ হয় না।

ততক্ষণে কারখানার দিক থেকে ফের একটা গুমগুম শব্দ ভেসে আসার সঙ্গে সঙ্গে অনঙ্গমোহন হয়তা বলে বসলেন, মনে হয় স্ক্র্যাপ চার্জ করল। ব্লাস্ট-ফার্নেসে যত স্ক্র্যাপ চার্জ হবে, তত ভাল। তবে হ্যাঁ, স্টেডি হিট দিয়ে যেতে হবে।

এবারে হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বিরক্ত স্বরে বলে উঠতে হয় ইন্দুমতীকে, না...কাল থেকে আর এ দিকে আসব না। সোজা চলে যাব দামোদরের ধারে।

হেসে জবাব দেন অনঙ্গমোহন, তিনপুরুষ ধরে আমরা এই কারখানার সঙ্গে জড়িত। বাবা, আমি, তারপর এখন ছেলে। ওটা এখন নিছক রুটি-রুজির ব্যাপার নয় ইন্দু। সম্পর্কটা আত্মীয়ের চেয়ে বেশি। দামোদর পেরিয়ে গেলেও ওকে আমি ভুলতে পারব না।

জলের গেলাস ভাঙার শব্দে ঘুম ভেঙেছে ইন্দুমতীর। সুতরাং দিনটা কেমন কাটবে কে জানে। বিরক্ত মুখে উঠে পড়ল। সাবধানে দেখেশুনে খাটের এককোণা দিয়ে নামল। তারপর হাঁক দিল, লতা...ও লতা...

লতা ভোর-ভোর ঘুম থেকে উঠে চা বসিয়েছে গ্যাসে। কিচেন থেকে জবাব দিল সে, যাই কত্তামা...

—শোন, এ ঘরে গেলাস ভেঙেছে। মেঝেটা ভাল করে ঝাঁট দিয়ে কাঁচের টুকরোগুলো বাগানের এককোণায় ফেলে দে। চায়ের কদ্দুর। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল তো।

— দিই কত্তামা...

ছ'টার মিনিট দশেক আগেই বেরিয়ে পড়ল ইন্দুমতী-অনঙ্গমোহন।

— নাও, পা চালিয়ে চলো। আজ লামেয়ার পার্ক পেরিয়ে দামোদরের চড়ায় গিয়ে বসব। ফ্লাস্ক কাঁধে অনঙ্গমোহন বললেন, দিন দিন যে তোমার হাঁটার তেজ বাড়ছে দেখছি!

খুশি-গলায় ইন্দুমতীর জবাব, যাক্, তবু একটা গুণের কথা বললে। উঠতে বসতে মেয়েদের তো আর কম খোঁচা দাও না।

— না, না, খোঁচা দেব কেন? আমি আসলে ওই রান্নাঘরে ঘাড় গুঁজে থাকা মেয়েদের মোটে পছন্দ করি না।

— রান্নাঘরে ঘাড় গুঁজে না থাকলে এই যে এতগুলো বছর শিফট্ ডিউটি করলে, তার মধ্যে তিন পদের তরকারি, মাছ-ভাত, কী করে করতাম শুনি! আগুনের কাজ, ভালমন্দ না খেলে শরীর টিকতো?

— তা মিথ্যে নয়। তবে আমাদের দেশের মেয়েরা এভাবে প্রচুর সময় নষ্ট করে। বিদেশে মেয়েরাও সমানতালে ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়তো বেশিই করে। এই দ্যাখো না— জাপান, কোরিয়া, ওদের দেশে মেয়েরাও ফার্নেসের মতো বিপজ্জনক কাজ করছে। কেন, সেই যে একবার, বোধ হয় আশি-একাশি হবে, 'হার্থ-ব্রেক আউট' হওয়ায় একটা ফার্নেস যখন অচল হয়ে পড়ল, তখন জাপান থেকে একদল এক্সপার্ট এসেছিল। যাদের দলে তিনটে মেয়ে। ইনচার্জও একজন মেয়ে। কী সাহস! কী স্মার্ট! দস্তানা, হান্টিং শু পরে তরতর করে উঠে গেল ফার্নেসের টপে। সাতটা দিন পড়ে রইল ওই গরম ফার্নেসের পাশে। দেখে তো আমরা তাজ্জব! তারপর দাওয়াই বাতলে চলে গেল। সাধে কি আর জাপান, কোরিয়া এখন আয়রন মেকিংয়ে রাশিয়া, আমেরিকার মতো দেশকে পেছনে ফেলে দিয়েছে! আমি বলতে চাই, কেবল রান্নাঘরে আটকে না থেকে মেয়েরা ছড়িয়ে পড়ুক সর্বত্র। মেয়েরা যত এগোবে, দেশ তত এগোবে।

ক্ষুব্ধ ইন্দুমতী বলল, বেশি বাজে বকবক করো না তো! যে দেশে যা। আমাদের দেশের মেয়েরা ছোটবেলা থেকে যেমন শিক্ষা পায়, যেভাবে বেড়ে ওঠে, তাতে এটাই স্বাভাবিক। মুখে তোমাদের শুধু বড় বড় কথা। অথচ একদিন যদি দুপুরে সময়মতো খাবার পাঠাতে দেরি হত, এসে তো ফেটে পড়তে। রাত-ডিউটি করে দিনে ঘুমোনোর জন্য, খোকাকে কোলে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটাহাঁটি করেছি। যাতে ওর চিৎকারে তোমার ঘুম না ভাঙে। আত্মীয়-স্বজন এলে সামনে ঘরে বসিয়ে ফিসফিস করে কথা বলেছি। জোরে কেউ কথা বললে লজ্জার মাথা খেয়ে নিষেধ করেছি, আস্তে, উনি ঘুমোচ্ছেন। তোমার সময়ের যোগান দিতে গিয়ে আমি যে নিজের সময়ের সবটুকু খুইয়েছি, তার বেলা?

— আঃ ইন্দু, সে কথা বলছি না। আমি বলতে চাইছি...

— থাক বুঝেছি। রান্নাঘরে সময় নষ্ট করার কথা তুলছো তুমি, অথচ রাত ডিউটিতে ন'টার সময় খেয়ে দেয়ে তুমি চলে যাওয়ার পর আমি শুধু সেদ্ধভাত খেয়েই কতদিন শুয়ে পড়েছি! রান্নাঘরে কি আমি নিজের জন্য সময় কাটাই? বাঙালি মেয়েরা হল সহ্য আর ধৈর্যের মিশেলে মানুষ। তোমার যদি জাপানি বউ হত, তাহলে দু'বেলা পরিপাটি করে খাওয়া, লাউয়ের সঙ্গে কুচোচিংড়ি, মুগের ডালে মাছের মাথা, পোস্তর বড়া, খাবার পরে নিয়ম করে ওষুধ এগিয়ে দেওয়া, শোবার আগে দুধ, এসব বেরিয়ে যেত। রাত্তিরে আধঘণ্টা পা না টিপলে যার ঘুম আসে না, সে আমায় সময় নষ্ট নিয়ে খোঁটা দেয়! হুঁ। ওদের দেশের ক'টা মেয়েকে রাত জেগে স্বামীর পা টিপে দিতে হয় শুনি? একদিন পা টেপালে, দ্বিতীয়দিন কোর্টে মামলা উঠবে, বুঝেছ!

অনঙ্গমোহন ইন্দুমতীর চোখে চোখ রেখে হাসলেন। নাঃ, কথায় ইন্দুমতী তাঁর চেয়ে অনেক এগিয়ে। শুধু কি কথায়? যুক্তি কি কিছুই নেই? আছে। নিশ্চয়ই আছে। ইন্দুমতীর একটা কথাও মিথ্যে নয়। তাঁর মতো কাজ-পাগল মানুষকে কীভাবে আগলে রেখেছে ইন্দু, কীভাবে ঘরদোর, সংসার, সামাল দিয়েছে, তা কি আর জানেন না তিনি।

লামেয়ার পার্ক পেরিয়ে এসেছেন। সামনে দামোদর। কিছুটা চড়া, কিছুটা জল। বাতাসে সিরসিরে আমেজ। সোনারোদ ছড়িয়ে পড়েছে। ভারি মিষ্টি চারপাশ।

সত্যি, জায়গাটা দারুণ। পেছনে লামেয়ার পার্কে ঘন গাছ-গাছালি,সামনে দামোদর। বুক ভরে শ্বাস নিলেন অনঙ্গমোহন। চারপাশের অপরূপ সৌন্দর্যের মাঝে অনঙ্গমোহন যেন নতুন করে দেখছেন ইন্দুমতীকে। বয়েস হয়েছে। চোখের নিচে হালকা কালচে দাগ পড়েছে ইন্দুর। চুলে পাক ধরেছে। তবুও মুখে চোখে কী স্নিগ্ধতা! ইন্দু আজও সমান সুন্দর। সেই আগের মতো। অথচ তিনি! মুখ চোখের পোড়া রং। গালে কপালে কুঞ্চনের দাগ। জোরে হাঁটতে গেলে হাঁপ ধরে। ইন্দুর তুলনায় যেন অনেক বুড়িয়ে গেছেন।

জীবনভর আগুন ঘেঁটে, লৌহ-উৎপাদনের মত কঠিন কাজে সারাটা জীবন ক্ষইয়ে এসে, আজ, এই পড়ন্ত বয়সে মনে হচ্ছে, ঠিক, বড় খাঁটি কথা বলেছে তাঁর ইন্দুমতী। সত্যি, বাঙালি মেয়েরা সহ্য আর ধৈর্যের মিশেলে মানুষ। ওদের তুলনা মনে হয় আর কারও সঙ্গে চলে না। নইলে, বিয়ের পর প্রথম প্রথম নাইট-শিফ্‌ট ডিউটিতে যাওয়ার আগে, ইন্দুমতী যখন দু-হাত টান করে দরজা আগলে বলত, 'থাক, আজ না হয় নাই বা গেলে...' অনঙ্গমোহন তখন গম্ভীর স্বরে বলতেন—ছিঃ ইন্দু, এ কী বলছ! ফার্নেস-ফোরম্যান রাস্তোগীর সঙ্গে আমার একটা অদৃশ্য প্রতিযোগিতা চলছে। এ মাসে কে কত বেশি প্রোডাকশন দিতে পারে। এ সময় অ্যাবসেন্ট হওয়া যায়! আমার জীবনের উন্নতির সবকটা সিঁড়ি, উৎপাদনের দড়ি দিয়ে বাঁধা।

ইন্দুমতী তখন ছলছল চোখে বলত, বেশ, যাও।

ম্লান মুখে চেয়ে থাকা ইন্দুর গাল টিপে অনঙ্গমোহন বলতেন, প্লিজ...অমন করো না...দিন তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

নিজেকে মুহূর্তে সামলে নিয়ে ইন্দু বলত, আঃ...ওসব থাক। যাও, সাবধানে যেও। একছুটে ঘর থেকে নিয়ে আসত হেলমেট। তারপর হেসে বলত, সেফ্‌টি ফার্স্ট স্যার। 'ঝুঁকি বিপদের সহায়, ঝুঁকি নেবেন না।' কথাগুলো সেফটি-উইকে প্রচারিত বিরাট বিরাট ব্যানার দেখে শিখেছিল ইন্দু। অনঙ্গমোহন খুশি মনে রওনা দিতেন।

কতবার বাইরে বেড়াতে যাবার প্রোগ্রাম, একেবারে শেষ মুহূর্তে কারখানার গোলমালে বাতিল করতে হয়েছে। বেড়ানোর স্বপ্ন এভাবে ভেঙে যেতে একা একা কেঁদেছে ইন্দুমতী।

না, তাতেও দমেননি অনঙ্গমোহন। কারখানার জন্য নিজেকে আঠারো আনা উজাড় করে দিতে প্রস্তুত তিনি। তবুও কিন্তু ইন্দুর মুখের হাসিটি মরেনি। যাবতীয় শখ-আহ্লাদকে স্বামীর পায়ে সঁপে দিয়ে একটার পর একটা বছর কাটিয়ে গেছে।

শুধু কাজ, কাজ আর কাজ। পাগলা-ঘোড়ার মত ছুটে বেড়ানো অনঙ্গমোহন ভাল করে ইন্দুর দিকে নজর দিতে পারেননি। ছেলে মানুষ করার সব ঝক্কি, বাজার-হাটের যাবতীয় দায়িত্ব, এর সঙ্গে এক টুকরো বাগান, অতিথি-আপ্যায়ন, সামাজিকতা, সব কিছু নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে, একা, ঘরে-বাইরে লড়ে গেছে ইন্দুমতী। এও কি কিছু কম?

নাঃ, ইন্দুর সঙ্গে কারও তুলনা চলে না। কারও। সহ্য ও ধৈর্যে, মায়া-মমতায়, রূপে-গন্ধে ইন্দু অদ্বিতীয়।

শরীর থেকে বয়সের এক-একটা বাকল খসে পড়ছে অনঙ্গমোহনের। ইন্দুমতীর হাত ধরে বললেন, চলো...ওই চড়াটায় গিয়ে বসি...

— যাবে? চলো যাই...আনন্দে চকচক করে উঠল ইন্দুমতীর চোখের তারা।

পাড়ের কাছে গোড়ালি-ডোবা তিরতিরে জলে দাঁড়িয়ে অনঙ্গমোহনের শরীরটা সিরসির করে উঠল। ইন্দুর কাঁধ ছুঁয়ে তিনি নিঃশব্দে হাসলেন। ইন্দু হাসল খিলখিল করে।

দু'জন বয়েস-পেরুনো মানুষ জল পেরোচ্ছে। জলের পরে চড়া। চড়ার পরে ফের জল।

— বেশ লাগছে ইন্দু।

— ভাল লাগছে তোমার?

— হ্যাঁ, খুউব। তোমার?

— তোমার ভাল লাগাটাই যে আমার ভাল।

— আঃ সে কথা নয়। এ জায়গাটা যে এত ভাল লাগবে, আগে কিন্তু কখনও তা বুঝতে পারিনি।

— আমি তো তোমায় আগেও কতবার বলেছিলাম। তখন তো আমার কথা শুনতে না। খালি ওই ফার্নেস আর ফার্নেস...

যে ফার্নেস ছিল এতকাল অনঙ্গমোহনের দিনরাত্তিরের বীজমন্ত্র, এই মুহূর্তে তা হঠাৎ বিস্বাদ মনে হল।

— আঃ ওসব কথা এখন থাক। দূরের পাহাড়গুলো কী সুন্দর দেখাচ্ছে, তাই না?

হেসে বলল ইন্দু, কী ব্যাপার, এই যে সেদিন বললে জীবনভর ফার্নেসের আগুনে কাজ করে চোখটা একেবারে গেছে, চশমার পাওয়ার না বাড়ালেই নয়—কই, দূরের পাহাড়গুলো তো বেশ দেখতে পাচ্ছ।

— হুম। তা মিথ্যে নয়। আসলে এই জীবনে তো অনেক কিছুই দেখার কথা ছিল, কিছুই আর তেমন করে দেখিনি। আজ হঠাৎ সব যেন একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সব সুন্দর। আমার কী মনে হয় জান, আগুনের ঝলসানি দেখতে দেখতে ক্লান্ত চোখদু'টো এই স্নিগ্ধ সুন্দরের কাছে এসে হঠাৎ জোর ফিরে পেয়েছে।

ইন্দুমতী অনঙ্গমোহনের একটা হাত শক্ত করে চেপে এগিয়ে চলল চড়ার দিকে। অনঙ্গমোহন পা দিয়ে বালিতে আঁকিবুকি কাটছেন। পা ডুবিয়ে বালি ছিটোচ্ছেন বাচ্চা ছেলের মত। ফের হাঁটছেন। সূর্যের আলো পড়েছে ইন্দুর গালে। দু'-এক গাছি কাঁচা পাকা চুল মুখে চোখে এসে পড়েছে। অনঙ্গমোহন থমকে তাকিয়ে রইলেন ইন্দুর দিকে। একদৃষ্টিতে।

-- ওমা, অমন করে কী দেখছ?

— তিল...

— তিল?

— হ্যাঁ, ওই যে...বলেই হাত তুলে আঙ্গুল ছোঁয়ালেন ইন্দুর চিবুকে। তারপর ওই তর্জনী, যা দীর্ঘ তিন যুগ ধরে ফার্নেসে 'ল্যান্সিং' করে করে খসখসে, কালচে, সেই আঙ্গুলটা বুলোতে লাগলেন বিন্দুসম তিলটার ওপর। তিল থেকে গাল, কপাল, ইন্দুর সারাটা মুখমণ্ডলে খেলে বেড়াতে লাগল অনঙ্গমোহনের ডান-হাতের তর্জনী। যেন তিনি হন্যে হয়ে হারানো বয়সের একখানি মানচিত্র খুঁজে ফিরছেন। না জানি তিন যুগ আগে ওই মানচিত্রে আরও কত সুজলা-সুফলা শস্যক্ষেত্র ছিল, কী ভীষণ কাজেব ঘোরে একে একে সে সব ঊষর হয়ে গেছে।

— যাঃ, কী করছ! লজ্জা লাগছে। ইন্দু ভারি গলায় বলল।

অঙ্গমোহন ঘোরের গলায় বললেন, আজকের সকালটা ভারি ভাল লাগছে। আসলে সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ যদি পুরানো দিনগুলোর স্মৃতি ফিরে আসে, তবে মনে হয় এমনই ভাল লাগে।

— এসো এখানেই বসি...

— সেই ভাল। বালিতে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। দাও, চা দাও।

দামোদরের চড়ায় অনঙ্গমোহন বসে পড়লেন। পাশে ইন্দু। চায়ে আলতো চুমুক দিতে দিতে সহসা দু'জনের সব কথা হারিয়ে গেল। এই বয়সে, এমন পরিবেশের সঙ্গে মানানসই সব কথা অনঙ্গমোহন কত বছর আগে ভুলে গেছেন! আগুন ও কয়লার মাঝে, অজস্র বাংকারে ঠাসা আকরিকের ঘেরাটোপে, প্রতি মিনিটে সত্তর-হাজার কিউবিক ফুট 'উইণ্ড ভল্যুম' আর সাড়ে সাতশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আগুনে-বাতাসের (হট-ব্লাস্ট) তীব্র শব্দে, তিনি কি হৃদয়ের মহার্ঘ বস্তুটিকে খুইয়ে ফেলেছেন?

চা শেষ করে বালিতে কাপ রেখে অনঙ্গমোহন দেখলেন, দু-হাঁটুর মাঝে থুতনি রেখে দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছে ইন্দুমতী।

অনঙ্গমোহনের অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করছে। ফেলে আসা দিনের অজস্র স্মৃতি ভিড় করছে। বয়সের কড়ি বরগা ভেঙে বুকের ভেতর পাগলা ঘোড়াটা পেছনপানে দৌড় দিয়েছে। কিন্তু ভাষা হয়ে কিছুই ফুটে উঠল না মুখে। তার বদলে,হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি বলে বসলেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ইন্দু?

জলের তিরতির মাধুর্যমাখা শব্দকে হার মানিয়ে ইন্দুমতী সরু গলায় বলল, হুঁ। একটা কেন, অনেক...

— তুমি...তুমি সুখী তো!

ইন্দুমতী এবারে সশব্দে হাসল। ধীরে ধীরে হাসি ছড়িয়ে গেল নির্জন চড়ায়। তারপর হাসি থামিয়ে চোখের তারায় ফুটিয়ে তুলল কৌতুক-ফুলের ঝিলিক।

— তা হঠাৎ লৌহমানবের মনে এ প্রশ্ন কেন?

— না...আজকাল কেন জানি না মাঝে মাঝে মনে হয়, তোমাকে বোধ হয় কোথাও কোথাও আমি ফাঁকি দিয়েছি।

ইন্দুমতী জবাব দিল না। সরু আঙ্গুল বালিতে ডুবিয়ে কী যেন লেখায় মগ্ন। উত্তরের আশায় উদ্বিগ্ন অনঙ্গমোহন এগিয়ে উবু হয়ে দেখলেন বালির বুকে ফুটে ওঠা কটি অক্ষরে ইন্দুমতীর হৃদয়ের হলফনামা— খুউব ...খুব সুখী...ইন্দু...

আবেগে অনঙ্গমোহন ইন্দুমতীকে জড়িয়ে ধরে গাঢ় গলায় বললেন, তবে যে আগে আমায় কত কী বলতে! কারখানা নিয়ে মেতে থাকায় কত রাগ করতে! সে সব?

— ইন্দুমতীর মুখে মিষ্টি রোদের মত হাসি ছড়িয়ে গেল। সে বলল, হ্যাঁ, বলেছি। কাজপাগলা মানুষের বউরা মুখে হয়ত অনেক কিছু বলে, ভেতরে ভেতরে কিন্তু তারা দারুণ সুখ পায়। যখন ভাবতাম, তোমার ওপর কত লোকের দায়িত্ব, কত লোকের জীবন-মরণের প্রশ্ন এই একজনার হাতে, তখন কম সুখ হত নাকি! তোমার মতন একজন নরম প্রকৃতির মানুষ, বছর শেষে 'টার্গেট' পুরো হলে যখন বাচ্চাছেলের মত আনন্দে আত্মহারা হয়ে ফিরে আসতে ঘরে, আগের সপ্তাহের নাইট-শিফ্‌টে অনুপস্থিতির খামতি মেটাতে গিয়ে আমাকে নিয়ে পাগলের মত...হ্যাঁ...পাগলের চেয়ে বেশি...কী কাণ্ডটাই করতে— তখন আমার সব ক্ষোভ কেটে যেত। বিশ্বাস করো। আসলে, খেয়ে-ঘুমিয়ে আর দশজনার মত ফাঁকি মারার চাকরি করে যারা জীবনটা কাটিয়ে দেয়, তাদের বউদের গর্ব করার মত কিছুই থাকে না। কিস্যু নয়। আর যাদের জীবনে বড় করে বলার মতো কিছুই থাকে না, তাদের সুখ কীসে! শাড়ি-গয়না আর বেড়ানো-খেলানো তো সুখের খোলস। ওতে শাঁসের চেয়ে আঁশ বেশি।

বুক জুড়িয়ে যাচ্ছে অনঙ্গমোহনের। আহা...হা...কথা নয়, যেন অমৃতধারা। ইন্দুমতীর মুখখানি একহাতে উঁচু করে অনঙ্গমোহন বললেন, ঠিক, লাখ কথার এক কথা বলেছ তুমি। ওতে শাঁসের চেয়ে আঁশ বেশি। একটা জীবন... গোটা একটা জীবন মানুষ শুধু আঁশ নিয়ে মাতামাতি কিভাবে করে, ভাবলে অবাক হই। এই তো গত পরশুদিন হঠাৎ দেখা বিজয়েন্দ্র গুহর সঙ্গে, সেই গুহ, যে ব্যাটা ব্লাস্ট-ফার্নেসের আগুন সহ্য করতে না পেরে পালাল সেফ্‌টি ডিপার্টমেন্টে। এইয়া মোটা হয়েছে এখন। রিটায়ারের পর ডায়াবেটিস, প্রেশার, হাজার ব্যামো। আমায় দেখে বলে কিনা, কি হে দত্ত, লোহা গলাতে গলাতে চেহারাটা একেবারে দড়ি পাকিয়ে ফেলেছ দেখছি! আমি কী উত্তর দিলাম জানো! বললাম, লোহা নয়, বলো সোনা। সোনা গলাতে গলাতে মনখানি সোনা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কমজোরি একটু হয়েছি ঠিকই, তবে ডায়াবিটিস আর প্রেশার এখনও কাছে ঘেঁসতে পারেনি। সোনায় কী আর মরচে ধরে! তুমি যে শাঁসের কথা বললে, আর আমি যে সোনার কথা বললাম, দুটোই এক ইন্দু। হুবহু এক।

এই মুহূর্তে ইন্দুমতীর মুখের দিকে চেয়ে অনঙ্গমোহনের মনে হল, জাপানের যে-মেয়ে টেক্‌নিশিয়ানরা গরম ফার্নেসের মাথায় তরতরিয়ে উঠে যেতে পারে, আগুনের সঙ্গে গলাগলি করে ক্ষতস্থান জুড়ে দিতে পারে, সে ইন্দুর মত মুখ বুজে সহ্য করার পরেও পুরুষকে এমন স্বীকৃতি দিতে পারবে? পারবে এমন কোমল অথচ উদ্দীপনার অমোঘ মন্ত্র কানের কাছে বাজাতে? অসম্ভব। বিদেশের মেয়েরা যদি নিজে কাজ করে নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দেয়, বাঙালি ঘরের ইন্দুমতীর মত মেয়েরা পরোক্ষে, সে কাজের-মানুষের শরিক হয়ে নিজের মহত্ত্বকে আরও বেশি ফুটিয়ে তোলে। দক্ষতা অর্জন করা সোজা। মহত্ত্ব? ওটা তো আর ঘষে-রগড়ে আসে না!

কোনটা কম? যারা খেলে, তারা তো জয়ের আনন্দে খেলে। আর যারা উদ্দীপনা উৎসাহ দিয়ে খেলোয়াড়কে রাত্রিদিন চাগিয়ে রাখে, ব্যথার জায়গায় সান্ত্বনা প্রলেপ দেয়, বাইরে থেকে গলা ছিঁড়ে জয়ের স্বপ্ন দেখায়, তারা? না...না...। একটু আগে অনঙ্গমোহন বিদেশি মেয়েদের সঙ্গে বাঙালি মেয়েদের তুলনায় যা বলেছেন, তা ঠিক নয়। ভুল।

সন্ধ্যায় ইন্দুমতী-অনঙ্গমোহন সোফায় পাশাপাশি বসে টিভি দেখছেন। শব্দটা খুব কমানো। খোকার নাইট-শিফ্‌ট চলছে। আজ তৃতীয় দিন। এ সময় খোকা হয়ত পাশের

ঘরে ঘুমোচ্ছে। পায়ের কাছে বসে আছে কাজের মেয়ে লতা। নিজের কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যার এই সময়টুকু টিভি দেখা তার অনেক দিনের অভ্যাস।

হঠাৎ লতা বলল, শব্দটা একটু বাড়িয়ে দিই কত্তামা?

সঙ্গে সঙ্গে ধমকে উঠলেন অনঙ্গমোহন, না...খবরদার না। খোকার নাইট-শিফ্‌ট চলছে না? আটঘণ্টা রাত জাগলে, বারোঘণ্টা সলিড ঘুম দরকার। সাউন্ড যা আছে থাক।

লতা হাত নেড়ে বলল, দাদাবাবু তো উঠে পড়েছেন কখন!

— উঠে পড়েছে? কেন?

— তা আমি কী জানি!

টিভি ছেড়ে অনঙ্গমোহন উঠে এলেন পাশের ঘরে। দেখলেন, নির্ভাজ জামাকাপড় পরে খোকা চুল আঁচড়াচ্ছে ড্রেসিং-টেবিলের সামনে।

গম্ভীর মুখে অনঙ্গমোহন জিজ্ঞাসা করলেন, কোথাও বেরুচ্ছ নাকি? আজ তো তোমার নাইট-শিফ্‌ট আছে .

খোকা আয়নার কোণা দিয়ে বাবাকে দেখল। মুখ না ঘুরিয়েই জবাব দিল, হুঁ। স্টিল-প্ল্যান্টের চাকরি। তার ওপর ব্লাস্ট-ফার্নেসের মত ডিপার্টমেন্ট! নাইট-শিফ্‌ট তো কবতেই হবে। মেটালার্জি পাস করে আমার ব্যাচের কত ছেলে অন্য ডিপার্টমেন্টে পরিষ্কাব-পরিচ্ছন্ন কাজ করছে, আর আমি পড়লাম কিনা ব্লাস্ট-ফার্নেসে। তাও কিনা ভারতের সবচেয়ে পুরনো মডেলের ফার্নেস!

অনঙ্গমোহনের একটাই ছেলে। সে এখন ব্লাস্ট-ফার্নেসেব সহকারী ম্যানেজার। বছর ছয়েকের চাকরি। এর মধ্যেই সে তিতিবিরক্ত হয়ে গোপনে গোপনে অন্য চাকরির খোঁজ করছে। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি যখন আছে, হয়তো হয়ে যাবে। তবে অনঙ্গমোহন এ সব জানেন না। বরং আজও তিনি স্বপ্ন দেখেন খোকা একদিন এই ফার্নেসের ইনচার্জ হবে। হয়তো রিটায়ারের আগে সিনিয়ার ম্যানেজার বা আরও ওপরে যাবে। যে কারখানা তৈরি হওয়ার সময় থেকে এই কর্মযজ্ঞে জড়িত ছিলেন অনঙ্গমোহনেব বাবা বিরজামোহন, যার বিকাশের চরম মুহূর্ত প্রত্যক্ষ করেছেন অনঙ্গমোহন নিজে, সেই কারখানাকে আরও আধুনিকতর প্রযুক্তির মাধ্যমে অনেক...অনেক এগিয়ে নিয়ে যাবে তাঁর ছেলে, নতুন প্রজন্মের এইসব শিক্ষিত তরতাজা যুব-সম্প্রদায়! এই সব স্বপ্ন দেখতে ভারি ভাল লাগে অনঙ্গমোহনের। নিজেকে ভীষণ গর্বিত মনে হয়। একটা কারখানার কর্মযজ্ঞে তিনপুরুষের এই আত্মনিবেদন বড়ো কম কথা নয়। অনঙ্গমোহন বিটায়ার করার পরে কোম্পানির পাক্ষিক কাগজ 'ইয়োরস ফেইথফুলি' কত করে লিখেছিল এ সব কথা!

ওই সংখ্যাটা বড় যত্ন করে রেখে দিয়েছেন অনঙ্গমোহন। হ্যাঁ, এই তো স্বীকৃতি। টাকা-পয়সার চেয়ে অনেক বড় এই স্বীকৃতি। আজও যখন মন বিষণ্ণ হয়ে যায়, অনঙ্গমোহন তখন ওই সংখ্যাটা বার করে চোখের সামনে ধরেন। বড় বড় অক্ষরে লেখা হেডিং....'ডেডিকেশন অব থ্রি জেনারেশন টু অ্যা স্টিল-প্ল্যান্ট...'

ছেলের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে হতবাক অনঙ্গমোহন। সহসা কোনও উত্তর যোগাল না মুখে। এ কি বলছে খোকা! স্টিল-প্ল্যান্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ব্লাস্ট-ফার্নেস। হ্যাঁ, যাকে বলে হার্ট। সেই হার্টের কারিগর হওয়ার জন্য মনে মনে কোথায় গর্ববোধ থাকবে, নিজেকে আর দশ জনের চেয়ে উঁচু মনে করবে, তা নয়, এ দেখি তার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা! এমন বিরূপ মনোভাব নিয়ে কি করে খোকা ব্লাস্ট-ফার্নেসকে নার্সিং করবে! কি করে রেকর্ড প্রোডাকশন দেবে!

অনঙ্গমোহনের মুখ যন্ত্রণায় কুঁচকে উঠেছে। তিনি মনের কষ্ট চেপে রেখে ধীর স্বরে বললেন, ছিঃ খোকা, তুমি অমন কথা বলছ। স্টিল-প্ল্যান্টে হাজার হাজার লোক কাজ করে, কিন্তু তাদের সকলের মধ্যে ব্লাস্ট-ফার্নেসের কর্মীদের আলাদা সম্মান। হিল সাহেব বলতেন, স্টিল-টাউনশিপে ব্লাস্ট-ফার্নেসের ওয়ার্কাররা 'এ-ক্লাস' সিটিজেন। ওনার জমানায় ব্লাস্ট-ফার্নেসের কর্মীদের রেশনের দোকানে লাইন দিতে হত না। হাসপাতালে শত ভিড় থাকলেও ডাক্তারকে সবার আগে দেখতে হত ব্লাস্ট-ফার্নেসের কর্মীদের। এমন কি টাউন-ইঞ্জিনিয়ারকে কড়া নির্দেশ দেওয়া ছিল, কোনও ব্লাস্ট-ফার্নেস কর্মীর কোয়ার্টারের জল, লাইট বা অন্য যে কোনও সমস্যার ক্ষেত্রে এক সেকেণ্ড দেরি না হয়। দরকারে অন্য ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজারের কাজ পড়ে থাকবে, কিন্তু ব্লাস্ট-ফার্নেস পিপ্‌ল উইল গেট ফার্স্ট প্রেফারেন্স। রাত জাগতে হয় সত্যি কথা, তিন-শিফট ডিউটি করতে হয় সত্যি কথা, আগুন আর প্রচণ্ড শব্দের মাঝে কাজ করতে হয় এটাও সত্যি, কিন্তু এ কাজের স্যাটিশফ্যাকশান কতটা ভেবে দেখ তো? কী চ্যালেঞ্জিং রোল!

আয়নার সামনে থেকে সরে এল খোকা। অনঙ্গমোহনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঠোঁটের কোণা ভেঙে হাসল। তাচ্ছিল্যের হাসি। তারপর সোফায় বসে বলল, তোমার এই কথাগুলো আমি বহু বছর শুনে আসছি। আর এখন এতে উদ্দীপ্ত হওয়ার মত কিছু নেই। বরং আমার হাসি পায়।

— হাসি পায়? কেন?

— কেন আবার! খুব সোজা। তুমি যে স্যাটিশফ্যাকশানের কথা বললে, সেইটে ভেবে। জানি না কিসে তোমার অত সন্তুষ্টি। তবে আমি এ কথা বেশ দায়িত্ব নিয়েই বলতে পারি, কারখানার এখন যা হাল হয়েছে, তাতে জব স্যাটিশফ্যাক্‌শান বলতে আর কিছুই নেই। ওযার্কাররা ডিউটিতে আসবে দেরিতে। যাবে আগে। কাজের কথা বললে গোঁসা করবে। আড়ালে গালাগালি দেবে। এই তো গেল হপ্তায়, এক অফিসারকে চার-নম্বর ফার্নেসেব এক ক্রেন-ড্রাইভার ঘুসি মেরেছে। কিন্তু পানিশমেন্ট হল ওই লোকটাব? উল্টে ইউনিয়নের মাধ্যমে সব ওয়ার্কাররা একজোট হয়ে ডি.এম্ এর কাছে পিটিশন দিয়েছে ওই অফিসার লেবারদের গালিগালাজ করে। বিহেভ জানে না। ইত্যাদি ইত্যাদি। কারখানাটাকে শেষ করে দিল ইউনিয়ন। কাউকে কিছু বলার উপায় নেই। এখনও যে শিফ্‌টে দুটো করে ঢালাই হচ্ছে এই যথেষ্ট। এরপর দেখবে সারদিনে মাত্র তিনটে ঢালাই হবে। এরপরও তুমি কাজের স্যাটিশফ্যাক্‌শানের কথা বলছ?

অনঙ্গমোহন যেন নতুন কথা শুনছেন। কিছুটা উত্তেজিত গলায় বললেন, কিন্তু আমাদের সঙ্গে তো অমন ব্যবহার কেউ করত না। দু'-একজন বাজে লোক যে ছিল না, তা নয়— তবে তাদের দিয়েও বুদ্ধি করে আমরা অনেক কাজ করিয়ে নিয়েছি। ওই যে, যে ক্রেন-ড্রাইভারের কথা তুমি বলছ, তার নাম নিশ্চয়ই হরদেও। আমার মনে আছে এক-একটা ব্রেক-ডাউনে লোকটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখ বুজে কাজ করে গেছে। সেই লোক যখন গায়ে হাত তুলেছে, তখন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই অন্য কিছু...

খোকা এ-কথায় প্রচণ্ড রেগে বলল, এই তোমার দোষ। তোমার ধারণা, তোমরাই যত কাজ শিখে বসে আছ, আর পাস করা ইঞ্জিনিয়াররা সব এক-একটা মহামূর্খ...

— না...না...সে কথা নয় খোকা, তুমি ভুল বুঝছ...আমি বলতে চাইছি, এই লোকগুলোকে দিয়েই তো আমরা মেটালের বন্যা বইয়ে দিয়েছি...কারখানার অ্যাট্‌মসফিয়ারকে কাজের অনুকূল রেখেছি...

— থাক্, সব জানি। তাহলে সত্যি কথাটা বলি। কারখানার বারোটা বাজিয়েছ আসলে তোমরা।

— আমরা?

— ইয়েস, অফকোর্স। তোমাদের মত ফিটার, চার্জম্যান থেকে প্রমোশন পেয়ে-পেয়ে অফিসার হওয়া লোকগুলো।

অনঙ্গমোহন কেঁপে উঠলেন। একী শুনছেন তিনি? নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছে না। যে কারখানার জন্য যৌবনের সোনারং দিন-রাত নিংড়ে দিয়েছেন, যে ফার্নেসের আগুন, কালিকয়লা আর তীব্র শব্দকে ভালবেসে, বশ মানিয়ে, রাত্রিদিন ওই একটিমাত্র তপস্যায় রত থেকেছেন, 'প্রোডাকশন'...'প্রোডাকশন' বীজমন্ত্রের আড়ালে কত শরৎ-বসন্ত ফাঁকি দিয়ে গেছে, তাকে খোকা বলছে এমন কঠিন কথা?

অনঙ্গমোহন আর স্থির থাকতে পারলেন না। চিৎকার করে বললেন, গভর্নমেন্ট টেকওভারের পর তবু আমরাই এই ফার্নেসে, এই একই যন্ত্রপাতি, একই লোকজন নিয়ে রেকর্ড প্রোডাকশন দিয়েছি, ভুলে যেও না। তখন তোমাদের মত গুচ্ছের ইঞ্জিনিয়ারের ভিড় ছিল না। আজ অত অফিসার, এত ইঞ্জিনিয়ার, মডার্ন টেকনোলজি নিয়ে তোমাদের কত পড়াশুনা, তবু কারখানা-জীবনের প্রথম ও শেষ সত্যি যেটা, আউটপুট, তোমরা সেখানে চরম ব্যর্থ।

মেটালার্জিস্ট ছেলের আঁতে লাগল। সে পাল্টা চিৎকার করে বলল, হ্যাঁ তা করেছ। হাঁসের পেট থেকে সোনার ডিম বার করার মত। বিনিময়ে হাঁসটাকে শেষ করে ফেলেছ।

— না, মোটেও নয়। আজও যদি আমি ফের চার্জ নিই, দেখবে ওই ফার্নেস-ই কেমন তরতরিয়ে মেটাল দিচ্ছে...

— দ্যাখো বাবা, মিছে তর্ক করে কী লাভ! তোমার আউটলুকের সঙ্গে আমার মিলবে না। আমি তো লেবারদের ময়লা হাতে বানানো খইনি গালে পুরে ওদের সঙ্গে মিশতে পারব না, অথবা, 'ব্রেক ডাউন' বা 'সাট্-ডাউন' হলে ওদের সঙ্গে বেলচা হাতে কাজ করতে পারব না।

— তুমি কি আমাকে মিন করছ?

— বুঝতেই পারছ, আমি সিনিয়রদের কাছে শুনেছি। বল, এগুলো মিথ্যে? যন্ত্রণাকাতর স্বরে অনঙ্গমোহন বললেন, না, মিথ্যে নয়। তবে ওতে ফার্নেসের সাধারণ কর্মীরা আরও বেশি উৎসাহ পায় কাজে। তিন ঘণ্টার কাজ দু'ঘণ্টায় করে দেয়। সবাইয়ের মধ্যে একটা টিম-ইউনিটি, যাকে বলে 'কম্বিনেশন', গড়ে ওঠে।

এমন সময় খোকার বউ মণিদীপা ঘরে ঢুকল। ঝলমলে শাড়িতে দারুণ দেখাচ্ছে তাকে। বোঝা যায়, কোথাও বেরুনোর প্রস্তুতি চলছে। স্বামী-শ্বশুরের উত্তেজিত কথাবার্তা পাশের ঘর থেকে শুনেছে। সে মৃদু হেসে বলল, আঃ মিছিমিছি তুমি বাবাকে খোঁচাচ্ছ কেন?

— না দীপা, আমার এসব একদম ভাল লাগে না। বাবার ধারণা যে, শুধু ওনারাই জানেন, আর আমরা সবাই বোগাস্। এটা ঠিক নয়।

খোকার রাগ তখনও কমেনি। একে তো চোপরা সাহেবের বাড়ি পার্টিতে যেতে দেরি হয়ে গেল অনেকটা, তার ওপর গায়ে পড়ে বাবার এ জাতীয় কথাবার্তা।

এদিকে মনে মনে যথেষ্ট আহত ও ক্ষুব্ধ অনঙ্গমোহন এ-সময় বউমাকে সামনে দেখে কিছুটা যেন হারানো কূল ফিরে পেলেন। তার সমর্থনের আশায় বললেন, শুনেছ...শুনেছ খোকার কথা! আরে বাবা, এত অল্পে নিরাশ হলে চলে? যে কোনও শিল্প-সংস্থাতেই

অবস্থার ওঠাপড়া হয়। কখনও ভাল, কখনও মন্দ। কিন্তু অফিসার যারা, তাদেরকে তো সবসময় একটা আশাবাদী চিন্তাধারা রাখতে হবে। পথ তো দেখাবে তারাই। রাস্তা বাতলাবে। আমাদের এই স্টিল-প্ল্যান্টের পারিপার্শ্বিক কত্তো সুবিধে। নিজেদের ভাল ভাল মাইনস্। আয়রন ওর মাইনস্। সামনেই দামোদর। অঢেল জল আর বালি। ট্রান্সপোর্টের কত সুবিধা। কোম্পানির গা ঘেঁসে সাউথ-ইস্টার্ন রেলের লাইন। তিন মাইল দূরে ইস্টার্ন-রেলের লাইন। এক মাইলের মধ্যে জি.টি রোড। এমনকি আরও একটা বিরাট সুবিধা, নিজেদের রোপ-ওয়ে। কয়লা আসছে, বালি যাচ্ছে। সাধে কি আর স্যার বীরেন মুখার্জী এই জায়গাটায় কারখানা করেছিলেন। তুমিই বল বউমা, এত যার পারিপার্শ্বিক অ্যাডভান্টেজ, সে কারখানার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশাজনক মনোভাব কি উচিত? বিশেষত, একজন অফিসার হয়ে? তুমিই বল মা?

মনিদীপা চোখের কোণায় কাজলের সূক্ষ্ম টান দিয়ে হেসে বলল, বাবা আপনার কথাগুলো ঠিক। তবে আমায় যদি জিজ্ঞাসা করেন একজন ব্লাস্ট-ফার্নেস অফিসারের স্ত্রী হিসাবে আমার প্রতিক্রিয়া কী রকম, তবে কিন্তু আমি...

— বল...বল বউমা...

— আমার ভোটটা কিন্তু আপনার বিপক্ষে যাবে।

চুপসে গেলেন অনঙ্গমোহন। ধ্বস্ত গলায় বললেন, বিপক্ষে! কেন শুনি?

— প্রথমত কাজটা নোংরা। কালি-কয়লা-আগুন আর শব্দ। আমি ওর মুখে শুনেছি দীর্ঘকাল ফার্নেসে কাজ করলে তার চোখের জ্যোতি, মানে ভিশ্‌ন, যথেষ্ট ক্ষতি হয়। হিয়ারিং-ট্রাবল, হজমের গণ্ডগোল, এইসব হয়। সুতরাং বউ হিসেবে আমি তো এইসব কখনোই চাইব না।

— ও আচ্ছা। বুঝলাম। অনঙ্গমোহন জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন!

— এই দেখুন না, আমার দাদা এখন রেলের অফিসার। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে ঢুকেছিল। এয়ার-কন্ডিশন অফিসে বসে কত আরামের কাজ। একবেলা যায়, ওবেলা না গেলেও চলে। সে তুলনায় ব্লাস্ট-ফার্নেসের অফিসার। ওহ্...হরিবল...। ব্লাস্ট-ফার্নেসের উঁচু দরের ম্যানেজাররা যে পোশাক আর গামবুট পরে ডিউটি যায়, রেলের ফিটাররাও ওর চেয়ে ফিটফাট পোশাক পরে।

এক হাতে বুক খামচে ধরে অনঙ্গমোহন মৃদু গলায় বললেন, তুমি শুধু পোশাক দিয়েই বিচার করলে বউমা?

— না, শুধু পোশাক কেন! বাইরে কাপড় শুকোতে দিলে সে কাপড়ে কয়লার গুঁড়ো আর আয়রন-ওরের ডাস্ট লেগে থাকে। জানালা খোলা থাকলে ওদিকের ভেসে আসা বাতাসে ঘরের কী অবস্থাটাই না হয়! ব্লাস্ট-ফার্নেসের দিকে ওই জানালাটা তো ভয়েই খুলি না। ভেবে দেখুন তো বাবা, ওই পলিউটেড অ্যাট্‌মসফিয়ারে একটা মানুষ কত বছর সুস্থ থাকতে পারে!

অনঙ্গমোহন উঠে পড়েছেন। আর একটি কথাও বললেন না। ছেলে ও বউমার সামনে দিয়ে সোজা হয়ে, দৃঢ় পায়ে হেঁটে এলেন সামনের ঘরে। যেন এটাই প্রমাণ দিতে চাইলেন, দ্যাখো...আমাকে দ্যাখো...আমি অনঙ্গমোহন দত্ত...সারাটা জীবন ব্লাস্ট-ফার্নেসের আগুনে পুড়ে, আজও কেমন রয়েছি। হয়ত, হয়ত বা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি সুস্থ আছি।

ইন্দুমতী টিভিতে চোখ রেখে তন্ময়। অনঙ্গমোহনের সবকিছু অসহ্য লাগছে। ঘরে ঢুকেই তিনি টিভির দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা ইন্দুমতীকে একবার মাত্র দেখলেন, তারপর দ্রুত হেঁটে গেলেন রঙিন টিভি-টার সামনে। সুইচ অফ করে দিলেন।

—ইস্—এত ভাল সিরিয়ালটা তুমি বন্ধ করে দিলে? কী হল তোমার! খোলো...এখনও দশমিনিট বাকি আছে....

অনঙ্গমোহন ফের চালু করলেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, এতে চোখ খারাপ হয় না!

ইন্দুমতী হঠাৎ এ-জাতীয় কথায় দারুণ অবাক হল। উঠে এল অনঙ্গমোহনের পাশে। ততক্ষণে উনি জানলার গরাদ দুটো ধরে ঠায় চেয়ে আছেন বাইরের অন্ধকারে। পিঠে হাত রেখে কোমল স্বরে ইন্দুমতী বলল, আজ কি হয়েছে তোমার?

অনঙ্গমোহন জবাব দিলেন না। তাঁর চোখ দূরের গনগনে চিমনির দিকে। চারটে স্টোভের উঁচু মাথা দেখা যাচ্ছে। তার পাশে ফার্নেস। ফার্নেস-টপে বড় বড় দুটো সার্চ-লাইট। দেখা যাচ্ছে চার্জিংয়ের পরে 'লার্জ-বেল' খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ার উদ্গিরণ। স্কিপ-কারের ওঠানামা। আলোয় আলোকিত ফার্নেসেটা এত দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে না শুধু তার অভ্যন্তরে গলন্ত লোহার টগবগানি। দেখা যাচ্ছে না আগুনে-বাতাসের তীব্র দাপটে কীভাবে ভেতরে টন-টন কোক্ পুড়ছে। কী তীব্র কমবাস্‌ন! টলটলে সোনারং গলিত লৌহ। মেটাল। কী প্রচণ্ড জাগ্রত, সম্ভাবনাময়, বিশাল ফার্নেস।

যতটা দেখা যাচ্ছে, সে তো প্রাণভরে দেখছেনই অনঙ্গমোহন। যা দেখা যাচ্ছে না, তাও অনুভব করছেন হৃদয় দিয়ে। ফার্নেসের ভেতরে জমে থাকা টলটলে গলিত লৌহের মত, তাঁর বুকের মধ্যেও টগবগ করে ফুটছে অভিমান।

ইন্দুমতী দুহাত দিয়ে কাঁধ চেপে অনঙ্গমোহনের মুখ ফেরাল। অনঙ্গমোহনের দু'চোখে টলটল করছে জল।

— কী হল, তুমি অমন করছ কেন! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

— আমিও কিছুই বুঝতে পারি না আজকাল। সুখ কী! স্যাটিশফ্যাক্‌সন কী! এক বেলা ডিউটি করে অন্য বেলা না গেলে, দেশ এগোয় না পিছোয়, আমি বুঝতে পারছি না ইন্দু....কিছু না...

হতভম্ব ইন্দুমতী মুখ ফিরিয়ে বলল, মরণ, আমার হয়েছে মরণ।

রাতে খেতে বসে অনঙ্গমোহন গম্ভীর গলায় শুধোলেন, ওরা ফেরেনি?

ঘড়ির দিকে চেয়ে ইন্দুমতী সহজ গলায় বলল, সবে তো ন'টা। চোপরা সাহেবের বাড়ির পার্টি কি এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়!

অনঙ্গমোহন মুখ তুলে চাইলেন ইন্দুমতীর দিকে। পার্টি? চোপরার বাড়ি! তুমি জানলে কী করে?

— জানব না কেন! বউমা তো লতাকে বলে গেছে রাতের খাবার না করতে। তাইতেই আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কী ব্যাপার। তখন বউমা নিজেই বলল পার্টির কথা। চোপরা সাহেবের বাড়িতে নাকি জি.এম., ডি.জি.এম, এ.জি.এম, সবাই আসবেন। এসব জায়গায় না যাওয়াটা নাকি বোকামি।

এক টুকরো রুটি মুখে পুরে অনঙ্গমোহন বললেন, পার্টিতে আমিও গেছি ইন্দু। তবে নাইট-শিফ্‌ট ডিউটি থাকলে কখনও নয়। জি এম কেন, খোদ ইস্পাতমন্ত্রী এলেও নয়। আরে বাবা, আগে হল কাজ। পার্টিতে কি হয় না হয়, সব জানি। অনেকের ধারণা, পার্টিতে গেলে, ওপরতলার সাহেবসুবোদের সঙ্গে গল্পগুজব করলে, আখেরে বোধ হয় কিছু লাভ হয়। ভুল। কাজের মানুষ যারা, তারা ঠিক কাজের মানুষ চিনে নেয়। মাঝখান থেকে পার্টিগুলোতে গিয়ে বদনেশা মাথায় চেপে বসে। এই তো, যেবার দিল্লি থেকে

ইস্পাত-মন্ত্রকের সেক্রেটারি এলেন, তিরাশি সালে, ক্লাবে কী বিরাট পার্টি হল, তোমার মনে আছে?

— হ্যাঁ, সে আর থাকবে না!

— সেবার তো ঝেঁটিয়ে সবাই গেল। জি.এম সাহেবের অর্ডার ছিল প্রতিটি অফিসার যেন হাজির থাকে। জমকালো গ্যাদারিং চাই। আমি, একমাত্র এই অনঙ্গমোহন দত্ত, সেদিন বলেছিলাম, 'স্যার, সবাই যদি রাত বারোটা অবধি পার্টিতে থাকে, প্ল্যান্ট চালাবে কে?' মনে আছে সেদিন স্টক-হাউসের ফোরম্যানদের নিয়ে আমি শিফ্ট চালিয়েছিলাম। পরদিন জি.এম সাহেব ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন, 'আপনার মত কিছু অফিসার আছে বলেই এখনও কারখানা চলছে। ইউ আর রিয়েলি গ্রেট মিঃ দত্ত।' আর আজকালকার ছেলেছোকরাদের অবস্থা দেখ, পার্টির নাম শুনলেই আহ্লাদে আটখানা।

অনঙ্গমোহন ফের খেতে শুরু করলেন। খাওয়া? আজ তাঁর রুচি নেই। থালায় হাত রেখে মাঝেমাঝেই উদাস হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি। মিনিট কয়েক চুপচাপ খাওয়ার পর হঠাৎ অনঙ্গমোহন প্রশ্ন করলেন, খোকা আজ ডিউটি যাবে তো?

সন্ধ্যার পর থেকেই অনঙ্গমোহনের কথাবার্তায় কেমন যেন একটা ঝাঝালো ভাব। ইন্দুমতী কিছুটা অবাক হল। তারপর বলল, কী ব্যাপার বল তো, আজ সবেতেই তোমায় কেমন যেন অখুশি-অখুশি দেখছি...

— আঃ, যা জিজ্ঞাসা করছি সেইটে বল। খোকা আজ ডিউটি যাবে কিনা...

— যাবে না কেন! সবে তো ন'টা। ও দেখবে ঠিক পৌনে দশটার সিটি বাজার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে। তারপরই পোশাক পরে ছুটবে কারখানায়। এখান থেকে মোটরবাইকে কারখানা যেতে তো পাঁচ মিনিটও লাগে না।

— ইমপসিবল। এভাবে হয় না ইন্দু। এভাবে একজন কর্মী তার বেস্ট আউটপুট দিতে পারে না। আরে বাবা, ডিউটি যাওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে, বিশেষত নাইট-শিফ্‌টে, খেয়েদেয়ে, নিজেকে একটু কনসেনট্রেট করে নিতে হয়। কন্ট্রোল-রুমে মিনিমাম দশ মিনিট আগে পৌঁছে কাজের প্ল্যানিং সম্পর্কে একটু নিশ্চিন্তে ভাবনা-চিন্তা সেরে নিতে হয়। আই মিন, মানসিক প্রস্তুতি। আমরা তো এতকাল এভাবেই করেছি।

বিরক্ত ইন্দুমতী এবার চড়া গলায় বলল, এই তোমার এক রোগ। খালি আমরা আর তোমরা। সবসময় নিজের সঙ্গে অন্যের তুলনা করবে। হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান! খোকা এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে। ওকে নিয়ে তোমার এত ভাবনার কী দরকার!

অনঙ্গমোহন চুপ করে গেলেন। মন দিলেন খাওয়ায়। কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। বলে উঠলেন, ভাবনা আবার কী! তবে একটা কারখানায় যখন তিনপুরুষের শ্রম মিশে যায় তখন তা আর নিছক চাকরি থাকে না। তার চেয়ে অনেক বেশি। অ-নে-ক বড় ব্যাপার। আসলে, ব্যাপারটা যে কী, সেটাই আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না।

দশটা বাজার মিনিট দশেক আগে দোরগোড়ায় মোটরবাইক থামার শব্দ হল। অনঙ্গমোহন বুঝলেন, ওরা ফিরল। খাটে আধশোয়া ভঙ্গিতে সেই কবেকার পুরোনো 'ইয়োরস ফেইথফুলি' পড়ছিলেন। সেই লেখাটা— 'ডেডিকেশন অব থ্রি জেনারেশন টু অ্যা স্টিল প্ল্যান্ট'। পড়ছিলেন আর নতুন এক আশায় মুখচোখের রঙ বদলে যাচ্ছিল।

খোকা ফিরে আসার পর কিছুতেই আর মনোনিবেশ করতে পারলেন না ওই লেখাটায়। ঘুরেফিরেই মনে পড়ছিল সন্ধেবেলা খোকার মুখে শোনা কথাগুলো। আর ততই তীব্র এক বিষণ্ণতায় ছেয়ে যেতে লাগলেন অনঙ্গমোহন। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে

দ্রুত হাতে পোশাক পরিবর্তন করে খোকা যখন ডিউটি যাবার প্রস্তুতি শেষ করছে, তিনি আর বসে থাকতে পারলেন না। নিজেকেই নিজে ধিক্কার দিলেন। এই তাঁর ছেলে! নাইট-শিফ্‌ট ডিউটির দিনে পার্টিতে হই-হুল্লোড় করে এসে ছুটল কারখানায়। এভাবে কেউ ডিউটি যায়! ব্লাস্ট-ফার্নেসের নাইট-শিফ্‌ট কি এত সহজ! এ তো দু'-ঘণ্টা পরেই টেবিলে মাথা রেখে ঝিমোবে।

মনে মনে অনেক কিছু বলবেন ভেবে দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন অনঙ্গমোহন। মাথায় হেলমেট পরে খোকা বেরোচ্ছে। বাবাকে সামনে দেখে সে হেসে বলল, চোপরা সাহেবকে আর দেখতে হবে না। গতবার জাপান ঘুরে এল, এবারে নির্ঘাত রাশিয়া যাবে। পার্টিতে যা খরচা করছে...

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে অনঙ্গমোহন বললেন, জাপান-রাশিয়া কেন, সারা-পৃথিবীর স্টিল-প্ল্যান্টগুলো ঘুরে দেখলেও তোমাদের চোপরা সাহেব আমাদের কাছে চিরদিনই 'চোপরা' হয়ে থাকবে। ও ক'দিন কাজ করেছে ফার্নেসে! কী জানে! সাট্-ডাউনের প্রোগ্রাম থাকলে এই চোপরা সিক্ করে বাড়িতে বসে থাকত। 'ঢালাই যখন খুব জোরে চলত, মেটালের 'রাশ্' দেখে ভয়ে কাঁপত। আমাকে বলত, 'ঢালাই আপ বন্ধ কিজিয়ে দত্তাবাবু'। বোঝো অবস্থাটা! সে এখন মাসে একটা করে পার্টি দেয়। আসলে তোমরাই ওকে পাত্তা দিয়ে কেউকেটা করেছ। যাদের কোয়ালিটি থাকে, তাদের গাঁটের পয়সা খরচা করে পার্টি দিতে হয় না।

খোকা ঘুরে বাবাকে দেখল। তারপর বলল, এইগুলোকেই বলে কমপ্লেক্স। হীনম্মন্যতা। আসলে তোমাদের জুনিয়ার আজ এতটা উপরে চলে গেছে বলেই তুমি চোপরাকে সহ্য করতে পার না।

— কী বললে, হীনম্মন্যতা? তাই বলে যা সত্যি তা বলব না? তোমাদের চোপরা-ভজন আমি মেনে নেব?

— তুমি মানলেই বা কী! আর না মানলেই বা কী! চেয়ারটাকে তো আর অস্বীকার করা যায় না! আর তাছাড়া তোমার মুখে তো আজ পর্যন্ত কারও প্রশংসা শুনলাম না। হ্যাঁ, একমাত্র নিজের ছাড়া...

কথাগুলো যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। মুখচোখ ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠল। তিনি দু'-পা এগিয়ে গেলেন। আর তখনই খোকার মুখ থেকে অ্যালকোহলের উৎকট গন্ধ তাঁর নাক ছুঁয়ে গেল। তার মানে পার্টিতে ড্রিংক করেছে খোকা, তারপর ব্লাস্ট-ফার্নেসের একজন অফিসার চলেছে নাইট-শিফ্‌ট ডিউটিতে! ছিঃ ভাবা যায়! যে কিনা অন্যান্য কর্মীদের পরিচালনা করবে, সে নিজেই যদি এমন বেহাল অবস্থায় থাকে, তবে সাধারণ কর্মীদের দোষ কোথায়!

মুখের ভাষা হারিয়ে গেল অনঙ্গমোহনের। তিনি থম্ মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন। মোটরবাইক যখন স্টার্ট হল তখন দশটা সাত। অর্থাৎ ব্লাস্ট-ফার্নেসের একজন দায়িত্বশীল অফিসার সোয়া দশটায় কারখানা পৌঁছে চার্জ নেবে। বাঃ চমৎকার! এরা আবার কথায় কথায় নতুন প্রযুক্তির ধুয়ো তোলে! 'আয়রন-মেকিং'-এর নিত্য-নতুন থিয়োরি বাতলায়! আগে তো নিজের চরিত্রকে আয়রনের মতো শক্তসমর্থ কর, তারপরে আয়রন মেকিং....

কিছুতেই ঘুম আসছে না অনঙ্গমোহনের। এপাশ-ওপাশ করছেন। পাশ থেকে ইন্দুমতী বলল, কাল সকালে ফের দামোদরের চড়ায় যাবে তো?

অনঙ্গমোহন জবাব দিলেন না। তিনি চোখ বুজেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন ক্রুদ্ধ, গর্জনরত, বিশাল ফার্নেস। রাত্রিদিন জ্বলে-যাওয়া অগ্নি-জঠর। বিশাল ময়ালের মত পেঁচিয়ে থাকা

'বাস্‌ল-পাইপ'। আঠারোটা টুইয়ারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত জ্বলন্ত বাতাস। যার নিচে দাঁড়ালে মানুষকে কত ছোট মনে হয়। কত সামান্য। অথচ মানুষ, বুদ্ধি ও সৃষ্টির নেশায় বলীয়ান হয়ে, প্রতি-মুহূর্তে ওই যন্ত্র-দানবটার ওপর কায়েম করে রেখেছে প্রভুত্ব।

— কিগো, ঘুমিয়ে পড়লে? ইন্দুমতী কনুইয়ের ঠেলা দিল।

— অ্যাঁ...

— কাল সকালে যাবেতো ওখানে?

— কোনখানে?

— ইস্, দিন দিন কী যে হচ্ছে তোমার! কিচ্ছু মনে থাকে না। কাল কিন্তু ফের যাব দামোদরের চড়ায়।

— গেলে হয়, না গেলেও হয়। অনঙ্গমোহনের নিস্পৃহ উত্তর।

বিস্মিত ইন্দুমতী বলল, ওমা, আজ যে কত বললে জায়গাটা ভাল লেগেছে! এখন আবার...সত্যি, তোমায় আমি আজও বুঝে উঠতে পারলাম না। বেশ তো ছিলে সারাটা দিন, সন্ধ্যা থেকে বদলে গেলে...

অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ে রইলেন অনঙ্গমোহন। তারপর ইন্দুমতীর বাড়ানো হাতখানা চেপে ধরলেন। অন্ধকারে টেনে নিলেন নিজের বুকের ওপর। বুকের ভেতর এই মুহূর্তে ঘটে যাওয়া অজস্র যন্ত্রণার পরশ দিতে চাইলেন সহধর্মিণীকে। অনেকক্ষণ এইভাবে কাটার পর গাঢ় স্বরে অনঙ্গমোহন বললেন, হ্যাঁগো..কাজে ফাঁকি দেওয়া মানুষকে তুমি সহ্য করতে পার?

হেসে বলল ইন্দুমতী, আজ অবধি কতবার জিজ্ঞাসা করেছ কথাটা, ভেবে দেখ তো।

— না ইন্দু, এ তো শুধু কথা নয়। ন্যায়-অন্যায়ের মাঝে ছোট্ট একটা কাঁটা। যখনই চারপাশের মানুষের মধ্যে নতুন নতুন উপসর্গ দেখি, মনে বড় ভয় হয়। তবে কি এতকাল আমি-ই উল্টোপথে হাঁটলাম? তখন ওই ছোট্ট কাঁটাটা আমার থিতিয়ে-আসা শিরাগুলোকে খুঁচিয়ে দেয়। আমি ফের জেগে উঠি। বলো না....হ্যাঁ গো...ফাঁকি-দেওয়া মানুষকে তুমি সহ্য করতে পার?

ইন্দুমতী একহাতে অনঙ্গমোহনকে বেড় দিয়ে বলল, না গো না। একদম না। যারা কাজে ফাঁকি দেয়, তারা সংসারেও ফাঁকি দেয়। কারখানা থেকে চারঘণ্টা আগে বাড়ি পালিয়ে যারা বাগানে ফুলগাছ পোঁতে, সে গাছে কখনও ফুল হয় না গো....। নাও, এবারে ঘুমোও...অনেক হয়েছে।

— ঘুম আসছে না। আচ্ছা ইন্দু, এবার বলো তো, যারা ফাঁকি দেয় না তাদের কী হয়? ইন্দুমতী থমকে গেল। জড়ানো হাতের বেড় ঢিলে হয়ে এল।

— কী হল? উত্তর দিলে না?

— কী আবার হবে! নিজের মনের কাছে ঠিক থাকা যায়।

— ব্যাস্...এইটুকু?

— হ্যাঁ, এছাড়া আর কী। বেশি কাজ করলেই কী তার একটা হাত গজাবে? এই যে তুমি, দিন-রাত্তির কাজের মধ্যে থেকে রিটায়ারের পনেরো বছর আগে ফার্নেস-ইনচার্জ হলে, তারপর শেষ করলে তো সেই এক জায়গায়। তোমার চেয়ে কত জুনিয়ার চোপরা, দেখতে দেখতে কোথায় চলে গেল! হয়ত দেখবে রিটায়ারের আগে এ.জি.এম বা ডি.জি.এম হয়ে যাবে।

অনঙ্গমোহনর গলা কেঁপে উঠল। তাহলে কাজের কোনও দাম নেই?

— আছে। নিশ্চয়ই আছে। কাজ হল অনেকটা ধর্মপালনের মত। ওর সঙ্গে বাইরের পাওয়া না-পাওয়ার সম্পর্ক রাখতে নেই। ধার্মিক মানুষ যা পায়, তার সবটাই নিজের মনের কাছে...

অনঙ্গমোহন ইন্দুমতীর হাতটাকে ফের টেনে নিলেন। তারপব বললেন, ঠিক বলেছ তুমি। খাঁটি কথা। 'ওয়ার্ক ইজ ওয়ারশিপ, ওয়ার্ক ইজ জয়।' এই আনন্দটা তো নিজের মনের কাছে।

পরক্ষণেই ব্যথাভরা গলায় অনঙ্গমোহন বললেন, আজকাল অবশ্য এই আনন্দেব অন্য একটা নামকরণ হয়েছে। পাগলামি.

— জানি না বাপু, তোমার কথার লেজমাথা আমি বুঝতে পারি না। ঘুমোও এখন।

অনঙ্গমোহন চুপ করে গেলেন। বালিশের নিচে রাখা সেই কবেকার পুরনো কোম্পানীর পাক্ষিক, 'ইয়োরস ফেইথফুলি'। সন্তর্পণে ওটা বার করে বুকেব ওপর রাখলেন। গন্ধ শুঁকলেন। অন্ধকারে ইংরিজি অক্ষরগুলোর ওপর হাত বোলালেন। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল মন। বন্ধ হয়ে এল চোখের পাতা।

অনেক রাতে প্রচণ্ড এক গুমগুম শব্দে কেঁপে উঠল ঘর। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন অনঙ্গমোহন। অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হল না। শুধু ভয়ংকর সেই শব্দটার রেশ কানে বেজে চলেছে। ইন্দুমতীকে এক ঠেলা মেরে বললেন, ওঃ কি ঘুম! পৃথিবী রসাতলে গেলেও কিছুই টের পাবে না।

ইন্দুমতী চোখ রগড়ে অবাক গলায় বলল, কী ব্যাপার!

— কোন শব্দ পেলে না? ঘরটা মনে হল যেন কাঁপছে। তুমি কিছু বোঝনি?

ঘুমজড়িত গলায় ইন্দুমতী বলল, হ্যাঁ, শব্দ একটা হযেছিল মনে হয়, তবে ঘব কাঁপছে কিনা...

— যত্তসব। ঘুমের মধ্যে ঘরে আগুন লাগলেও তোমরা টের পাবে না।

ইন্দুমতী রাগতস্বরে বলল, শব্দ যদি হযেই থাকে, তাতে কি যায় আসে! তুমি হঠাৎ হঠাৎ এমন এক-একটা কাণ্ড করো যার মাথামুণ্ডু আমি বুঝতে পারি না। নাও, এবারে ঘাড়ে জল দিয়ে এসে ঘুমোও...

আর ঘুম! এরপরেও অনঙ্গমোহন ঘুমোতে পারেন। ততক্ষণে তিনি জানলার কাছে। আশেপাশে দু-একটা কোয়ার্টারে লাইট জ্বলে উঠেছে। তার মানে ওরাও নিশ্চয়ই প্রচণ্ড শব্দটা শুনেছে। হায়, সবাই শুনল, অথচ ইন্দুমতীই কিছু শুনল না। সেই ইন্দুমতী, যে ফার্নেস-অন্তপ্রাণ অনঙ্গমোহনের স্ত্রী। বিয়ের পর থেকে যে ঘুমের ঘোরে স্বামীর মুখে লক্ষবার শুধু ফার্নেস আর প্রোডাকশন, মেটাল আর স্ল্যাগ, সাট-ডাউন আর ব্রেক-ডাউন শুনে শুনে অজস্র টেকনিক্যাল শব্দের মানে অবলীলায় বুঝতে পারে, সেই ইন্দুমতী, বিখ্যাত 'থ্রি জেনারেশন' এর মধ্যম জেনারেশনের গৃহকর্ত্রী, সে কিনা শুনতে পেল না ওই ভয়ংকর শব্দ!

অনঙ্গমোহন করুণামিশ্রিত চোখে ইন্দুমতীর দিকে চেয়ে বললেন, শব্দটার লক্ষণ ভাল নয়, মনে হচ্ছে কারখানায় কোন এক্সপ্লোশন...

জানালার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। দৃষ্টি তাঁর দূরের ফার্নেস-টপ। কালো ধোঁয়ায় ভরে আছে ফার্নেসের মাথা। বড় বড় সার্চলাইটের আলোয় ওই ধোঁয়ার কালচে মেঘ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। দারুণ আশংকায় কেঁপে উঠল তাঁর বুক।

ততক্ষণে ইন্দুমতী শুয়ে পড়েছে। বিছানা থেকে ডাকল, শুধু শুধু দাঁড়িয়ে রইলে যে...

— তুমি ঘুমোও। আমার আর ঘুম হবে না। শব্দটা মনে হচ্ছে...

— আঃ, কেমনধারা মানুষ তুমি! শব্দ হয়েছে তো তোমার কী! কারখানায় কত রকমের শব্দ হতে পারে!

— আমার কান ভুল শোনে না ইন্দু। এ শব্দের মানে বড় ভয়ংকর। তুমি বুঝবে না।

— হ্যাঁ, পৃথিবীর কেউ কিছুই বুঝবে না তুমি ছাড়া। শব্দ হলে জেগে উঠবে। শব্দ না শুনলে বলবে, ফার্নেসের ফোঁপানি শুনতে পাচ্ছি না কেন! আবার ধোঁয়া না হলেও মুশকিল, বলবে, ফার্নেসের মাথায় একটুও ধোঁয়া নেই কেন! এইগুলোই তোমার পাগলামি।

অনঙ্গমোহন জবাব দিলেন না। এই মহূর্তে ইন্দুমতীর কোনও কথা তাঁর কানে যাচ্ছে না। দৃষ্টি একদিকে স্থির! ফার্নেস-টপ। ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে কালো ধোঁয়া। তীক্ষ্ণ চোখে অনঙ্গমোহন চেয়ে আছেন। ওই তো...হ্যাঁ...সার্চ-লাইটের আলোয় এখন দেখা যাচ্ছে যন্ত্রদানবটাকে। স্কিপ-ব্রিজের ওপর স্কিপ-কার দুটো দাঁড়িয়ে। তার মানে কি চার্জিং বন্ধ? কেন? কেন? অনেকগুলো অশুভ চিন্তা মাথায় পাক মেরে উঠল। এতক্ষণ ধরে তো দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়। যন্ত্রদানবটার ক্ষিধে একমুহূর্তের জন্যেও মরে না। কন্টিনিউয়াস চার্জিং করে যেতে হয়। ওই স্কিপ-কার বয়ে নিয়ে যায় ফার্নেসের খাবার! আয়রন ওর, ডলোমাইট, লাইমস্টোন, ম্যাঙ্গানিজ-ওর। স্কিপ-কার এতক্ষণ থেমে আছে মানেই আশংকা। বিশেষ করে ওই প্রচণ্ড শব্দটার পরে পরেই।

মনে মনে প্রচণ্ড অস্থির হয়ে উঠলেন অনঙ্গমোহন। বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন, প্রচণ্ড শব্দটার পেছনে কী কী কারণ থাকতে পারে। আচ্ছা, শব্দটা তো মেলটিং-শপ থেকেও আসতে পারে। বয়লার বা কোক--ওভেনেও হওয়া বিচিত্র নয়। তবে কি ডুপ্লেক্স-প্ল্যান্টে কিছু হল? অজস্র সম্ভাবনার মধ্যে একটা চিন্তাই পাক খেতে লাগল তাঁর মাথায়। তা হল, শব্দটার পরে-পরেই কেন ব্লাস্ট-ফার্নেসের মাথার ওপর কালো মেঘের মতো ঘন ধোঁয়া ছেয়ে ছিল! কেনই বা মাঝপথে ফার্নেসের খাদ্য সরবরাহকারী স্কিপ-কার দুটো নিথর। কেন, কেন , এখনও চার্জিং বন্ধ হয়ে আছে?

মনের ভেতর আশংকার গুরুগুরু শব্দ বেড়ে চলেছে ক্রমেই। একবার কি তবে ফোন করবেন প্ল্যান্ট-কনট্রোলে। কী দরকার! সোজা ব্লাস্ট-ফার্নেসেই তো করা যায়।

অস্থির অনঙ্গমোহন অন্ধকারের মধ্যেই সোজা হেঁটে চললেন খোকার শোবার ঘরের দিকে। দরজার কাছাকাছি এসে থমকে গেলেন। ঢুকবেন কি ঢুকবেন না, ভাবলেন একমুহূর্ত। এত রাতে ঘুমোচ্ছে বউমা। একা। সহজাত সংস্কারবোধ কয়েকমুহূর্ত নিশ্চল করে রাখল তাঁকে। পরক্ষণে মনে হল, হ্যাঁ, এই মুহূর্তে একটা ফোন করা অনেক বেশি জরুরি। তিনি নিশ্চয়ই ঢুকবেন। একবার কেন, দরকারে বারবার। ফোন করবেন। একশোবার করবেন। তিনপুরুষের সম্পর্ক মিলেমিশে এ কারখানা তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে। তাঁর রিটায়ার হয়েছে। ভালবাসা, মমত্ববোধের তো আর অবসর হয়নি। তা ছাড়া ছেলে এখন ডিউটি করছে ব্লাস্ট-ফার্নেসে। একজন পিতা হিসেবেও তিনি যথেষ্ট দায়িত্ববান। খোকার কাছে ফোন করে ওই ভয়ংকর শব্দটার উৎস জানার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। অবশ্য প্ল্যান্ট-কনট্রোলেও তিনি ফোন করতে পারেন, একজন দায়িত্বশীল অবসরপ্রাপ্ত কর্মী হিসেবে। কেন, দেশ বিপন্ন হলে কি অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকের ডাক পড়ে না! তবে হ্যাঁ, তিনি সৈনিক। আগেও ছিলেন, আজও। তিনপুরুষের সম্পর্ক-জড়িত এই কারখানা তাঁর কাছে জন্মভূমির মতই পবিত্র।

দরজায় ঠক্‌ঠক্ শব্দ করলেন অনঙ্গমোহন। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বউমার নাম ধরে জোরে ডেকে উঠলেন, মণিদীপা...ও বউমা...একটু উঠবে।

ঘুম ভেঙে বিরক্তমাখা-গলায় মণিদীপা বলল, কে?

— আমি, একটু ওঠো মা...লাইট জ্বালো...ভীষণ জরুরি কাজ আছে...এক্ষুণি একটা ফোন করতে হবে...

ধড়মড়িয়ে উঠে এল মণিদীপা। লাইট জ্বালল। সামনে উত্তেজিত শ্বশুরমশাইকে দেখে দারুণ অবাক হয়ে সে বলল, ফোন! এত রাতে!

— হ্যাঁ বউমা, খুব দরকার...

— কাকে ফোন করবেন এত রাতে?

— আঃ...তোমাকে কি কৈফিয়ত দিতে হবে! বলছি খুব দরকার....

অনঙ্গমোহনের মুখচোখে ঘাম। অস্থিরতাব চিহ্ন স্পষ্ট। মণিদীপা গম্ভীর গলায় বলল, করুন কিন্তু...

— আবাব কিন্তু কী! ফোন করব প্ল্যান্টে...

— কারখানায়! কিন্তু কারখানার সঙ্গে এখন তো আপনাব কোন সম্পর্ক নেই..

ওদিকে রিং হচ্ছে। অথচ কেউ ধরছে না। একটানা ক্রিং. ক্রিং... হয়েই চলেছে। অনঙ্গমোহনের আশংকা আরও তীব্র হল। ফের ডায়াল ঘোরালেন। এবারে প্ল্যান্ট-কনট্রোল। একবারেই সাড়া পাওয়া গেল।

— আমি অনঙ্গ দত্ত বলছি...

— কে?

— এ.এম দত্ত । রিটায়ার্ড ফার্নেস-ইনচার্জ। অনঙ্গমোহন দত্ত। কিছুক্ষণ আগে প্রচণ্ড একটা এক্সপ্লোশনের শব্দ শুনলাম। ওটা কোথেকে হল? কেন হল? আমাকে ডিটেলস্ জানান।

অনঙ্গমোহন এই মুহূর্তে যেন ফিবে গেছেন দশ বছর আগে। গলায় সেই তেজ। সেই ভারিক্কি আওয়াজ। ওপার থেকে প্ল্যান্ট-কনট্রোলের কর্মী আমতা আমতা করে বলল, দত্ত! মানে আপনি কি সেফটি-ডিপার্টমেন্টেব অমিয় দত্ত বলছেন?

— ওফ্ নো... অমিয় আমার চেয়ে এগারো বছরের জুনিয়ার। আমি অনঙ্গমোহন দত্ত, এইট্টি থ্রিতে ইস্পাত-মন্ত্রকের কাছ থেকে কাজের স্বীকৃতি হিসেবে মেরিট-সার্টিফিকেট ও ক্যাশ রিওয়ার্ড পেয়েছিলাম, পনেরো বছর ব্লাস্ট-ফার্নেসের ইনচার্জ হিসেবে কাজ করে...

— দূর মশাই... আপনি ভুল জায়গায় ফোন করছেন।

চিৎকার করে অনঙ্গমোহন বললেন, ভুল নয়, আমি ঠিক জায়গাতেই করেছি। বলুন... শব্দটা কিসের? এনি অ্যাক্সিডেন্ট?

— এ নিয়ে বাইরের কারও সঙ্গে ডিসকাস করা সম্ভব নয়। আপনি ছাড়ুন।

— বাইরের মানে? হোয়াট ডু য়ু মিন? জানেন, আমাদের তিনপুরুষ এই কারখানার সঙ্গে জড়িত! 'ইয়োরস ফেইথফুলি' পড়েন? 'ডেডিকেশন অব থ্রি জেনারেশন টু অ্যা স্টিল প্ল্যান্ট' পড়েননি?

ওপার থেকে শব্দভেদী বাণের মত ভেসে এল তাচ্ছিল্যের মসিমাখা শব্দ— মাঝরাতে যতসব পাগলের কাণ্ড!

— কী বললেন? হ্যালো... হ্যালো...

ততক্ষণে ওপার স্তব্ধ। অনঙ্গমোহন রাগে ফোনটাকে শক্ত করে চেপে দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, পাগল! ঠিক আছে, সকাল হোক, খোকা ফিরুক, তারপর দেখাচ্ছি। জঘন্য...

কথাগুলো মণিদীপার সামনে বলে ফেলেই অনঙ্গমোহন নিজেকে সামলে নিলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, মণিদীপার চোখেও শ্লেষ ও কৌতুকের ঝলক।

অবসন্ন অনঙ্গমোহন ধীর পায়ে ফিরে যাচ্ছেন। বউমার দিকে মুখ তুলে তাকাতে লজ্জা লাগছে। প্ল্যান্ট-কন্ট্রোলের ওই ছোকরা যেভাবে খারিজ করে দিল তাঁকে, যে অন্তর্জ্বালায় পুড়ে যাচ্ছেন তিনি, বউমার কটাক্ষ-মিশ্রিত চাহনি যেন তাতে দমকা বাতাস। দরজা পেরিয়ে অনঙ্গমোহন নিজের অন্ধকার ঘরের দিকে কিছুটা এসেছেন, তখনই শুনতে পেলেন মণিদীপার গলায় ছোট্ট দুটি শব্দ, অদ্ভুত মানুষ...

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালেন অনঙ্গমোহন। তাঁর ধৈর্যের বাঁধ নিমেষে ভেঙে গেল। তিনি চিৎকার করে বললেন, তোমরাও কি কম অদ্ভুত? কী সুন্দর ঘুমুচ্ছ, পার্টিতে পার্টিতে ঘুরে বেড়াচ্ছ, আর যে কারখানার জন্যে এই নিশ্চিন্ত জীবন, এত ঠাঁটবাট, তার কথা দিব্যি ভুলে থাকছ।

মণিদীপা এতক্ষণ অনেক সহ্য করেছে। আর পারল না। সেও বলে উঠল, এত রাতে একী সোরগোল শুরু করেছেন বাবা! চাকরি তো কত লোকই করে, রিটায়ার করে, কই, কেউ তো আপনার মতো করে না!

অনঙ্গমোহন একহাতে কোনরকমে দেয়াল হাতড়ে ধরলেন। তারপর হিসহিস করে বললেন, তাদের কাছে চাকরি মানে চাকরগিরি। সম্পর্ক শুধু মাইনের সঙ্গে। আমার কাছে চাকরির মানে একটা পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে চলা। বিপদে-আপদে সবার জন্যে সবাই বুক দিয়ে দাঁড়ানো। হাসপাতালে যে ডাক্তার চাকরি করে সে মাইনে পায় ঠিকই, তবে তার চেয়েও বড় হল তাঁর সেবা। চাকরিটা আমার কাছে ছিল ওই রকম... হ্যাঁ... হয়ত বা তার চেয়েও বেশি...

অন্ধকার ঘরের ভেতর সেঁদিয়ে গেলেন অনঙ্গমোহন। ইন্দুমতী পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে। দেয়াল-ঘড়ির টিকটিক। মাথায় পীত-রং হেলমেট, পায়ে গামবুট, যৌবনদৃপ্ত অনঙ্গমোহনের বাঁধানো ছবিটা এখনও দেয়ালে।

সন্তর্পণে ছবিটা পেড়ে আনলেন। খোলা জানালা দিয়ে যে চিলতে রশ্মি ঘরে ঢুকছে, তাতে নিজেকে দেখলেন অনঙ্গমোহন। কয়লার গুঁড়ি জমেছে। বুকে ঘষে পরিষ্কার করলেন। তারপর ফের দেখলেন এক হাত তফাতে ঘুমন্ত ইন্দুমতীকে। বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছবিটা আবার যথাস্থানে রেখে এগিয়ে গেলেন জানালার কাছে। দৃষ্টি তাঁর দূরের ওই ফার্নেস-টপে... নিথর নিস্পন্দ স্কিপ-কার, যন্ত্রদানবটা আজ যেন ভারি শান্ত... শব্দহীন... বড় অসহায় ...

সারারাত জানলার কাছে বসে রইলেন অনঙ্গমোহন।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় ঘুম ভাঙল ইন্দুমতীর। জানালার কাছে পাথরের মূর্তির মত বসে থাকা অনঙ্গমোহনকে দেখে নেমে এল। চোখ দুটি লাল। উস্কোখুস্কো চুল। চাহনিতে বিষাদের ছবি—

— তুমি এখানে বসে আছো! ঘুমোওনি? কী হয়েছে?

— জানি না ইন্দু। জানি না। অনঙ্গমোহনের নয়, যেন অচেনা মানুষের গলা।

ইন্দুমতীর মুখচোখে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। কাছে এসে নরম গলায় বলল, মর্নিং-ওয়াকে যাবে না? দামোদরের ওই সুন্দর চড়ায়... চল... সকাল হয়ে গেছে...

অনঙ্গমোহন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, না। আমি কোথাও যাব না।

— কী হয়েছে তোমার! তুমি অমন করছ কেন?

অনঙ্গমোহন চিৎকার করে বললেন, আঃ... তোমরা কী আমায় একমুহূর্ত শান্তিতে থাকতে দেবে না। যাও... ওসব মর্নিং-ওয়াক ইভনিং-ওয়াক আমার জন্যে নয়... আমাকে একা থাকতে দাও...

ছুটে এল মণিদীপা। ইন্দুমতীর কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, একটু এদিকে আসুন মা, কথা আছে।

দরজা পেরিয়ে বাইরে এসে মণিদীপা বলল, কিছু মনে করবেন না মা, বাবার মতিগতি কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না! বাবাকে ইমিডিয়েটলি ভাল ডাক্তার দেখান দরকার। কাল রাতে ছটফট করে বেড়িয়েছেন। ঘুমোননি। মাঝরাতে আমাকে তুলে বললেন, কারখানায় ফোন করতে হবে, ভীষণ জরুরি কাজ। তারপর ফোন করে কার সঙ্গে যেন ঝগড়া করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করায় আমাকেও মুখ করলেন।

— এত কাণ্ড হয়েছে রাতে! ইন্দুমতী মনে মনে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। কপালের ভাঁজ প্রকট হল। তারপর এগিয়ে গেল অনঙ্গমোহনের কাছে।

লতা ফ্লাস্ক ভরে চা রেখে গেছে। কাপে ঢেলে ইন্দুমতী এগিয়ে দিল। অনঙ্গমোহন তা ছুঁয়েও দেখলেন না। তাঁর দৃষ্টি দূরের ফার্নেসের মাথায়। মাঝে মাঝে চোখ ফিরিয়ে দেয়াল ঘড়ি দেখছেন। চা জল হয়ে গেছে। তিনি শুধু একজনের প্রতীক্ষায় বসে আছেন। খোকা। এখনও ফেরেনি। এ শিফ্‌টের লোকজন কখন চলে গেছে। নাঃ, মন ভাল নেই অনঙ্গমোহনের।

সাতটা বেজে গেছে, তবু খোকা ফেরেনি। উৎকণ্ঠায় মণিদীপা বার দুয়েক ঘুরে গেল। ইন্দুমতীর মুখেও কোন কথা নেই। দু'জনেই চিন্তিত। একসময় আর থাকতে না পেরে মণিদীপা বলল, এখনও ফিরছে না কেন মা? এত দেরি তো কখনও হয় না।

ইন্দুমতীরও ঠিক একই প্রশ্ন। অথচ যিনি এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারেন, তিনি আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। স্বামীর হাবভাব দেখে ইন্দুমতী কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পাচ্ছে না। অনঙ্গমোহন যেন আজ তাঁর মধ্যে নেই। অপ্রকৃতিস্থ। সারা ঘর থমথমে।

ঠিক সাড়ে-সাতটায় মোটরবাইকের শব্দ হল। সারাঘরে মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এল চঞ্চলতা । ছুটে গেল মণিদীপা। ইন্দুমতী কপালে হাত ছোঁয়াল। একমাত্র নিথর অনঙ্গমোহন। সারা গায়ে কালি, জামা প্যান্ট-হেলমেটে অজস্র কয়লার গুঁড়ো-মাখা খোকা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, দূর... এর নাম চাকরি! যতসব ছোটলোকের কাজ। উঃ, সারাটা রাত যা কাটল।

জামাকাপড় খুলে চান করতে ঢুকল খোকা। ঘরের ছন্দ ক্রমে ফিরে এসেছে। রান্নাঘর থেকে কুকারের সিটি। টিভিতে শরীর চর্চার ন্যাকা-ন্যাকা প্রোগ্রাম। লতাকে রান্না-সংক্রান্ত নির্দেশ। ফুটফুটে রোদ্দুরের চিক্‌ড়িমিকড়ি।

পাক্কা আধঘণ্টা পর বাথরুমে থেকে বেরোল খোকা। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ঘাড়ে-গলায় পাউডার ঢেলে, চুল আঁচড়ে ডাইনিং টেবিলে বসল। ইন্দুমতী এসে ডাকল, এসো...

অনঙ্গমোহন তখনও অপলক চোখে চেয়ে আছেন ব্লাস্ট-ফার্নেসের মাথার দিকে। ধোঁয়া নেই। চার্জিং হচ্ছে না। স্কিপের ওঠানামা নেই।

— এসো... খাবো চল...। কাল থেকে তোমার কী হয়েছে!

— কিছু হয়নি। অনঙ্গমোহনের গম্ভীর জবাব।

— তবে খেতে আসছ না কেন?

— ক্ষিদে নেই।

— তুমি না খেলে আমিও তবে খাব না। সত্যি, মাঝে মাঝে তুমি এমন কর, যার কোনও ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই না...

অনঙ্গমোহনের ঠোঁটদুটো সামান্য নড়লো। বললেন, খোকা বসেছে?

— হ্যাঁ, অনেকক্ষণ হল।

— চল তবে...

কড়া করে সেঁকা টোস্ট হাতে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে অনঙ্গমোহন ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছু খুঁজছিলেন। এবং অবশ্যই তা পাচ্ছিলেন না। ফলত, নিজের অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছিল। শেষ অবধি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। কি রে খোকা, কাল রাতে প্ল্যান্টে কিছু হয়েছে? প্রচণ্ড একটা শব্দ শুনলাম। মনে হল বুঝি কোনও এক্সপ্লোশন...

আধ-সেদ্ধ ডিমে কামড় বসিয়ে খোকা মৃদু হেসে বলল, কী আবার হবে? চারনম্বর ব্লাস্ট-ফার্নেসটা বসে গেল।

— বসে গেল? কী বলছ তুমি? অনঙ্গমোহনের মুখে এসে জমাট বেঁধেছে শরীরের সব রক্ত।

— হ্যাঁ, কাল রাতে ছয়, সাত, আর আট নম্বর ট্যুইয়ারের নিচে অনেকটা জায়গা নিয়ে 'ব্রেক-আউট' হয়েছে। ভেতরের 'ব্রিক-ওয়ার্ক' মনে হয় বহুদিন আগেই ক্ষয়ে গিয়েছিল।

খোকার নির্বিকার ভাবভঙ্গি দেখে অনঙ্গমোহন উত্তেজিত স্বরে বললেন, চার্জে কে ছিল? তুমি?

-- হ্যাঁ, আমি আর তড়িৎ মুখার্জী।

— তোমরা আগে থেকে কিছু বলতে পারলে না? যে জায়গায় 'ব্রিক-ওয়ার্ক' ক্ষয়ে যাবে, তার বাইরের প্লেটে অন্তত 'রেড-হট' একটা সাইন দেখা যাবে।

খোকা বিরক্ত গলায় জবাব দিল, দ্যাখো বাবা, আমি একজন মেটালার্জিস্ট। ফার্নেসের ব্যাপারে আমায় সবসময় উপদেশ দিও না তো। যা হবার তাই হয়েছে। তোমরা এতকাল প্রোডাকশন বাড়ানোর জন্য ফার্নেসগুলোকে নিংড়ে ছিবড়ে করে দিয়েছ। মেনটেনেন্স করেছ? কিছু করনি। সুতরাং এটা অবধারিত। হতই। আজ, নইলে কাল। তবে হ্যাঁ,দুঃখ লাগছে এই ভেবে যে, আমার ফার্নেসের দুটো লোক, চিনবে হয়ত, রামলখন আর নাগিনা বাহাদুর মারা গেছে।

আর্তনাদ করে উঠলেন অনঙ্গমোহন, মারা গেছে!

— হ্যাঁ। কপাল খুব ভাল যে সে সময় ঢালাই চলছিল। মেটাল আর স্ল্যাগ অনেকটা খালাস হয়ে যাওয়ার পর এই ঘটনা। যদি 'প্রেগনেন্ট-ফার্নেসে' এটা হত, তবে আর দেখত হত না। কাউকে খুঁজে পাওয়া যেত না। আজ আবার দশটার মধ্যে ডি.এম সাহেবের অফিসে ডাক পড়েছে। এই নিয়ে এনকোয়ারি হবে।

অনঙ্গমোহনের শরীর কাঁপছে। কাঁপা গলায় শুধালেন, এখন কী হবে?

খোকার মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্নমাত্র নেই। দুধে কর্নফ্লেক্স গুলতে গুলতে জবাব দিল, কী আবার হবে! লোকদুটোর বাড়ির লোক ক্ষতিপূরণের টাকা পাবে। আর ইউনিয়ন 'আণ্ডার দ্যা টেব্‌ল' কিছু পেলেই ঠাণ্ডা।

— না... না... আমি বলছি ওই ফার্নেসটার...

— তা... এই... মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। এক্সপার্টরা পরীক্ষা করে দেখুক আগে। মডার্নাইজেশনের যা হাওয়া চলছে, তাতে করে কিছু বলা যায় না। হয়ত এটা ভেঙে ফেলে নতুন ফার্নেস হতে পারে, 'কন্টিনিউয়াস কাস্টিং'... তবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়ত পুরনো ফার্নেসটাকেই নতুন করে রিলাইনিং করতে চাইবে। যাক্ সেসব আমাদের চিন্তা নয়। ওদের হেডেক্। ক'টা মাস এখন এই আগুন আর নাইট-শিফ্টে জেগে থাকার হাত থেকে বাঁচব, এটাই আমাদের লাভ।

অনঙ্গমোহনের হাত থেকে ছলকে পড়ল চা। লাভ? একটা ফার্নেস বসে গেলে তোমাদের লাভ?

— লাভ না হলেও ক্ষতিটা কিসের! এখন সরকারি প্ল্যান্ট। সরকারের চিন্তা। তাছাড়া রিলাইনিং হলে তো সকলেরই লাভ।

— সে তো প্রচুর খরচের ধাক্কা!

— খরচ কী জি.এম নিজের পকেট থেকে দেবে? সরকার দেবে। রিলাইনিং হলে কোটি কোটি টাকার কন্ট্রাক্ট পাবে ঠিকাদাররা। একটা ব্লাস্ট-ফার্নেস রিলাইনিং হওয়া মানে কী বিরাট কর্মযজ্ঞ সে তো জানই। জি.এম, এম.ডি এরা যা কাট-মানি পাবে, তা কল্পনাও করা যায় না। ইউনিয়নের নেতাদেরও প্রচুর লাভ। কারণ রিলাইনিং-এ শয়ে শয়ে অস্থায়ী মজদুর নিয়োগ করবে ওরাই। আর শ্রমিকদের লাভ যে আছে,তা বলাই বাহুল্য। কারণ চালু ফার্নেসে কাজ করা ওদের কাছে বাধ্যতামূলক কিন্তু রিলাইনিং এর কাজ তা নয়, তখন রোজ ওভারটাইম দিতে হবে। এতগুলো লাভ যেখানে, সেখানে একটা ফার্নেসের 'বসে যাওয়া' কী এমন ক্ষতি?

অনঙ্গমোহনের গলার কাছে জমাট বেঁধে আছে যন্ত্রণা। তিনি ধ্বসা গলায় বললেন, আর সরকার? তাঁর ক্ষতিটা কে পোষাবে?

— দূর, এটা কোনও প্রশ্ন হল বাবা!

— কেন? কেন নয়? সরকার কি তোমার জন্মের শত্তুর? তুমি, জি.এম, এম.ডি, ইউনিয়নের নেতা, শ্রমিক, সরকার কি এদের বাদ দিয়ে?

— উঃ, তর্ক তুমি কোনদিন ছাড়বে না। এটা স্যার বীরেনের আমল নয়, ভুলে যাচ্ছ তুমি।

অনঙ্গমোহন খোলা-চোখে দেখলেন ছেলেকে। কোনও কথার অর্থ বোধগম্য হল না। চেয়ার ছেড়ে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন। অর্ধসমাপ্ত খাওয়া ছেড়ে। নিজের ঘরে এসে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। চটি গলিয়ে বেরুতে যাবেন, সামনে এসে দাঁড়াল ইন্দুমতী।

— কোথায় চললে এই রোদে?

— অ্যাঁ... কিছু বললে! ঘোরের মধ্যে প্রশ্ন শুধোলেন অনঙ্গমোহন।

— বলি যাচ্ছ কোথায়!

— তা জানি না ইন্দু, তবে দামোদরের চড়ায় যেতে পারলে বেশ হত। আমার কিছু ভাল লাগছে না। আমি একা থাকতে চাই। একদম একা....

একটু দূরে দাঁড়িয়ে শুনল মণিদীপা। তারপর ছুটে গিয়ে স্বামীকে বলল, এসো, নিজের কানে শোনো, আমার কথা তো বিশ্বাস করবে না। নিজে শুনে যাও। বাবা বলছেন এখন দামোদরের চড়ায় যাবেন। কোনও সুস্থ মানুষ এমন বলতে পারেন! তুমি আজই ডাঃ সিন্‌হাকে ফোন কর। উনি এসে বাবাকে কিছুক্ষণ অবজার্ভ করলেই সব বুঝতে পারবেন।

খোকা গম্ভীর গলায় বলল, কাউকে ধরে-টরে যদি বাবাকে কোনও প্রাইভেট কনসার্নে ঢুকিয়ে দিতে পারতাম, মানে সারাটা দিন এনগেজ থাকলে এসব কেটে যেত। দেখি, আজ একটা অফিসে একবার ফোন করব। স্ন্যাগ-ব্যাংকের ওধারে ওদের কোম্পানি বিরাট ঠিকার কাজ পেয়েছে। যদি সুপারভাইজার গোছের কোনও কাজে বাবাকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়...

সারাটা রাত চরম অস্থিরতার মধ্যে কাটালেন অনঙ্গমোহন। বারবার তাঁর ঘুম ভেঙে গেছে। যখনই ঘুম ভেঙেছে, তখনই ছুটে গেছেন জানালার কাছে। স্তব্ধ ফার্নেসের দিকে চেয়ে থেকেছেন পলকহীন। বিড়বিড় করেছেন। তারপর ফিরে এসেছেন বিছানায়। নাগিনা বাহাদুর, রামলখনের তালগোল পাকানো মৃতদেহ ভেসে উঠেছে। এই সেই নাগিনা বাহাদুর, যে বয়ে চলা তরল-লোহার স্রোতের কাছে বীরবিক্রমে এগিয়ে যেত, এক ল্যাডেল ভর্তি হতেই দ্বিতীয় ল্যাডেলের রাস্তা খুলে দিত, তারপর আগুনে ঝলসানো, ঘামে আর কয়লার গুঁড়িতে মাখা ছোটখাটো মানুষটা অদ্ভুত হাসিতে মুখ ভরিয়ে বিদঘুটে সুরে গেয়ে উঠত, 'আগ হামারা সাঁইয়া, আগ সে মহব্বত আগ সে গুস্যা, মগর, উসিমে হামার পরছাইয়া... আ...'

অথবা সেই রামলখন— বহুদিন আগে একবার 'রানারে' পিছলে পড়ে গিয়ে অনেকটা ভীষণভাবে পুড়ে গিয়েছিল, ছ-মাস পর হাসপাতাল থেকে যখন ছাড়া পেল, সিনিয়ার ম্যানেজার যখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুম্ হালকা-কাম করেগা রামলখন? নাইট-শিফ্‌ট করনে নেহি হোগা...', তখন সে উত্তর দিয়েছিল, 'কিঁউ সাহাব? শের বুঢ়হা হোতা মগর ঘাস নেহি খাতা। ফার্নেস কা কাম, শের কা কাম। হম চুহা বননে নেহি মাঙ্গতা সাহাব।'

এমন দু'জন কর্মী মারা গেল, অথচ খোকাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কিছুই হয়নি। খাচ্ছে দাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, টিভি দেখছে। বরং ফার্নেস বন্ধ থাকার আনন্দে সাতকাহন করে গল্প করছে! ছিঃ...

সারারাত কেটে গেল এইভাবে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই অনঙ্গমোহন বাক্স গোছাতে শুরু করলেন।

ইন্দুমতী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, বাক্স গোছাচ্ছো কেন?

— গ্রামের বাড়ি ফিরে যাব।

— সে কী! লাইট নেই, কলের জল নেই, থাকতে পারবে? এতদিন কোম্পানি টাউনশিপে থেকে...

ছুটে এসেছে খোকা, মণিদীপা। সবাই হতভম্ব। অনঙ্গমোহনের ভ্রূক্ষেপ নেই। একমনে গুছিয়ে চলেছেন। সব গোছগাছ সারা হতে, পুরনো ইয়োরস ফেইথফুলিটা সযত্নে ভাঁজ করে একটা ব্যাগে রাখলেন। ইন্দুমতীর দিকে ফিরে বললেন, নাও... তৈরি হয়ে নাও...

বিস্মিত খোকা বলল, এখানে তো তোমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না! এত বড় কোয়ার্টার...

মণিদীপা এক-পা এগিয়ে এসে বলল, বাড়ির সামনেই কত বড় হাসপাতাল। ঘরে ফোন। আপনার বয়স হয়েছে বাবা। এ সময়ে ওই গণ্ডগ্রামে পড়ে থাকার কী দরকার!

অনঙ্গমোহন খোলা জানালা দিয়ে ধোঁয়াহীন স্তব্ধ ব্লাস্ট-ফার্নেসটার দিকে চেয়ে আর চোখের জল চেপে রাখতে পারলেন না। হু হু করে কেঁদে ফেললেন। তারপর হাতে বাক্স, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বললেন, ওই ঘুমন্ত ফার্নেস আমি সহ্য করতে পারছি না। ওর সঙ্গে সঙ্গে আমারও মনে হচ্ছে বুকের কলকব্জা ঘুমিয়ে পড়েছে। এতকাল মনে হত, অবসরের পরেও বুঝি আমার অবসর নেই। আজ কিন্তু সত্যিকারের অবসর।

— বাবা, এসব কী বলছ তুমি!

— হ্যাঁরে খোকা, ঠিকই বলছি। আধুনিকতার ছোঁয়ায় সব বদলে যাবে। আবার হয়ত নতুন করে জেগে উঠবে ওই ফার্নেস। বিজ্ঞানের নতুন নতুন ছাপ পড়বে। কত

মেটালার্জিস্ট... পলিউশন থাকবে না...শব্দ থাকবে না...হয়ত সেদিন আগুনের আঁচও গায়ে লাগবে না। ঠাণ্ডা ঘরে বসে যন্ত্র দিয়েই হয়ত সব অপারেট করবে তোমরা। সে তো বড় সুখের দিন, আমরা কি তা সইতে পারব? পুরনো মানুষ আমরা, এতকাল আগুনের সঙ্গে ঘর করছি, এবার না হয় মাটি আর জলের সঙ্গে ঘর করি। দুটোর কেউ কম নয়। আগুনের পরেই জল। তারপরে মাটি। কি বলো খোকা?

— আমি কিছু বুঝতে পারছি না বাবা। আগুন... জল... মাটি... কী বলতে চাইছ তুমি?

অনঙ্গমোহন বাঁ-হাতে চোখের জল মুছে বললেন, হ্যাঁগো ইন্দু... কই , হল তোমার!

তারপর খোকার দিকে ফিরে হাসলেন। বড় নিষ্পাপ সেই হাসি। ছেলের মাথায় হাত রেখে বললেন, কী করে বুঝবে বলো... এসব তো আর মেটালার্জির বইয়ে থাকে না। বুকে লেখা থাকে। আধুনিকতার যত চাপ মাথায়। বুকের কথা কেউ ভেবেই দেখে না...

তিতির

বীরেন শাসমল

আজ কেউ আসেনি। আজ অরন্ধন। মহাবেশ্যা নগ্নিকার চোখ স্থির। বরিষণ ধর্ষিত পথরেখায় অন্ধকার। ব্যাঙেরা বর্ষাবন্দনায় রত। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর ঘোষিত হল।

শৃগালেরা চুপ হয়ে গেল। আকাশ প্রণয়ীর মতো উদ্দাম। অশনি গর্জনে বিপন্ন গাছেরা। বিদ্যুল্লেখায় তাদের ছায়া কাঁপে।

মেঘগর্জনে বিদীর্ণ দিগ্‌দেশ। জীর্ণ কপাটে বিষাণ বাজে। রুদ্ররোষে কেউ ছিঁড়ে ফেলছে পৃথিবীর নাভিমূল।

কৃষকযুবারা কেউ আসবে না। বর্ষা সমাগমে তারা বীজবপনে ব্যস্ত। নির্বীক্তি ফূর্তি নিষিদ্ধ এখন। গ্রামীণ তার অনুশাসন জারি করেছে। নটেরা দল বেঁধে আসে না। কুট্টনী বা বীটপরিবৃতা সালঙ্কারা গণিকারা ফিরে গেছে নগরীতে। নর্তকীদের নর্তনধ্বনিও থেমে গেছে। বণিক আসে না সম্ভার নিয়ে। দূর তাম্রদেশীয় বণিকেরাও তাদের নৌকা ভাসায় না। নদীতীরে, গঞ্জের প্রান্তরেখায়, তাঁবুগুলিতে আলো জ্বলে না। গভীর রজনীতে কখনও বা মন্দিরার মৃতধ্বনি জেগে ওঠে। বাতাসে ছড়িয়ে গেলে তা কান্নার মতো শোনায়। আপাতত জল দেখছে নগ্নিকা। কুটির সম্মুখস্থ পথে খলখল প্রাণবন্ত জল।

তার ভিতর ও বাহির জুড়ে বর্ষণের তৃষ্ণা। অবিচ্ছিন্ন জলধারায় ভেসে আসে আবর্জনার স্তূপ। ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে নিচে। বেদজ্ঞ পণ্ডিত সেদিন মন্দির সোপানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন গঙ্গা সর্বপাপবিনাশিনী। পৃথিবীর পাপকে সে বহন করে নিয়ে যায় নিচে। তাকে বিনষ্ট করে সে পুণ্যতোয়া হয়, দুঃখেও হাসে নগ্নিকা। যদি তাই হয় তাহলে আমিও পুণ্যতোয়া। সমাজের পাপের বাস নিচে। জনপদসীমার বাইরে তাকে ফেলে আসতে হয়। জনপদের প্রত্যন্তে তাই বেশ্যার বাস। তার কাজ পাপ ধারণ করা। নীলকণ্ঠের মতো পাপের বীজকে বিনষ্ট করা। কোনদিন গর্ভধারণ করবে না সে। মাতৃত্বে তার অধিকার নেই। পিতামহরা আদর করে নাম দিলেন জনপদকল্যাণী। অকল্যাণ ভক্ষণ করে সে হবে কল্যাণী। বহুভুক্তা সে। সাধারণ্যা। বেশভূষায় বহুজনচিত্ররঞ্জিনী, বিনোদিনী। শূদ্রাণী সে। দাসী। শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ বললেন : জনপদের পয়ঃপ্রণালী।

অন্তেবাসীর বিলাপ শোনা যায়, বুকের গভীরে। কোথাও পাখি ডাকল বোধহয়। পাখি? এত রাতে? প্রত্যন্তে সেই শরীরবিলাসিনীর শরীরে পুরাকালিক আঁধার। এখান থেকে জীবনরেখা কতদূরে। হৃদয় জলতলে বড় তৃষ্ণা! এত জল তবু পানের জল থাকে না নগ্নিকার। লবণাক্ত সমুদ্রবিষাদে রয়েছে সে বহুদিন। হায়! আর কি কেউ আসবে না? কেই বা আসবে এই দুর্যোগময়ী ঘোর রজনীতে? অনাঘ্রাণে যায় চন্দনগন্ধ। অগুরু অঙ্গে শুকায়, শুষ্ক হয় কাষায়চূর্ণমর্দিত দেহকোষ। ধুয়ে যায় পায়ের আলতা। গালের পত্রলেখা। শিথিল হয় কটি দাম। মেখলার বাঁধন টুটে যায়। এলোকেশী খুলে ফেলে তার কর্ণিকার সাজ। ছিঁড়ে ফেলে অর্জুন ফুলের কুচিকা। অপমানে ম্রিয়মাণ হয় কেয়ূর। চিকনবেলায় বেজেছিল যে কাঁকন, আজ তা মূর্ছা যায়।

তৃতীয় প্রহরে বর্ষণ থামে। বিধৌত আকাশে আশ্চর্য চন্দ্রিমা। নগ্নিকা পড়ে থাকে অবিন্যস্ত তার শয্যায়। আজ তার ঘরে উনান জ্বলবে না।

কুটির সম্মুখস্থ পথ কর্দমাক্ত। বৃক্ষগুলি আহারতৃপ্ত বৃষের মতো রয়েছে রোমন্থনে। শাখাচ্যুত জলবিন্দু ঝরে পড়ছে টুপটাপ। শব্দ ক্রমে সঙ্গীত হয়ে উঠছে। নিকটে, দীর্ঘকায় মাছগুলি মত্ত জলোৎসবে। রাত্রি মোহময়ী। তার রঙ্গসভায় ধীরে ধীরে শুরু হয় রম্যসঙ্গীত।

একটি পাখি ডাকে কোথাও। অবিচ্ছিন্ন কান্নার মতো সে ডাক। কেমন অপার্থিব আলোকধারায় ডুবে আছে রহস্যপাখির মতন। কেনই বা এই নিশীথিনীর অমৃতময় শুভ্র হাসিতে ঢেলে দিচ্ছে হলাহল? কে জানে। যেন বহুদিন উপোসী রয়েছে সে। জোটেনি কোন কীটপতঙ্গ কুল বা বটবৃক্ষের ফল। ধান্যফল, পক্ক গোধূম বা যব সে বোধহয় দেখেনি অনেকদিন। ক্ষুৎকাতর তার ডাক হাহাকার বলে মনে হয়। বায়ুস্তরের গভীরতম প্রকোষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে সে ডাক। এমন অসহ্য সুন্দর জ্যোৎস্নার এই কাতর কুৎসিত কূজন জাগিয়ে দেয় নগ্নিকাকে। নাকি তারই ক্ষুধার পাখি, নাকি গহীন দুঃখের কারাগারে অন্তরীণ তার প্রাণপাখি।

ঘোর লাগে নগ্নিকার। এ কোথায় কোন প্রদেশে সে প্রস্থিত হয়েছে। সামনে তার উত্তম যবাগু, অপূপ, ভাত, ঘৃত, দুগ্ধ, গুড় ও শর্করা স্তূপীকৃত। উত্তম খাদ্যসামগ্রীর গন্ধগুণে তার ক্ষুধা উদ্দীপ্ত হয়। সামান্য যবানীটুকুও(যবের মণ্ড) যার জোটে না, তার কাছে এ স্বপ্ন বড় মধুর। স্বপ্নেরও যে গন্ধ আছে, ঘ্রাণ আছে তা উপলব্ধি করেছে সে। হঠাৎ সেই উপলব্ধ সত্য নাকি মায়ায় পাখিটা তাকে ডেকে নিয়ে চলেছে! হাহাকারে এমন করুণ সুর বাজিয়ে কোন্ বৃক্ষশাখায় লুকিয়ে আছে সে পাখি খুঁজে বেড়ায় নগ্নিকা।

কোথায় ডাকলে গো পাখি?

কুটিরের সামনে এসে দাঁড়াল একজন মানুষ।

চমকে তাকাল নগ্নিকা।

এই দুর্যোগময়ী রাত্রিতে কে এসে দাঁড়াল? তার কি শরীরের জ্বালা এই দুর্যোগের চাইতেও তীব্র?

কিন্তু এ কি দেখছে সে! এ যে একজন ঋষি—ঘনকৃষ্ণশ্মশ্রুগুম্ফযুক্ত ঋষিকুমার! বনজ্যোৎস্নায় তার শরীরময় খেলে বেড়াচ্ছে অন্ধকারের লিপিমালা। শুভ্রকান্তি আলোয় ছায়ায় অতিলৌকিক। ব্রহ্মার মতো দুই চোখে তাঁর জ্ঞানদীপ্তি। বাঁ হাতে কমণ্ডলু। ডান হাতে লৌহদণ্ড। বৃক্ষবাকলের পরিবর্তে পরনে তাঁর কাপাস নির্মিত বস্ত্র। বহিরঙ্গে শুভ্র অধিবাস। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুঠাম দেহ। সুগঠিত গ্রীবা। পাদুকাবিহীন দুই পা কাদামাখা।

কুটিরে কি মানুষ আছে?

আছে ভগবান।

ঋষিকুমার আজ রাতের অতিথি।

পদার্পণে পবিত্র হোক এ কুটির। গৃহস্বামিনীকে আজ্ঞা করুন—সে আপনাকে কুটিরে নিয়ে আসুক।

তাই কর বৎসে।

নগ্নিকা নিয়ে আসে ঋষিকুমারকে। কুটিরে রাখা জলকুণ্ড থেকে জল নিয়ে পা দুটি ধুয়ে দেয় তাঁর। কেশরাশি দিয়ে মুছিয়ে দেয় পায়ের জল। কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়ায়।

দুর্যোগময়ী এই রজনীতে কোথা থেকে আপনার আগমন ঋষি? এ কি! আপনার পরিধেয় বস্ত্রখণ্ডটি তো ভেজা! আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন ঋষি। আসুন, আপনাকে শুকনো বস্ত্র দিই। কিন্তু কি-ই বা দিই আপনাকে। এ অধীনা স্বামীপুত্রবিযুক্তা প্রোষিতভর্তৃকা।

পরনের বাস বা নীবি ছাড়া আর যে তার কিছুই নাই, এদিকে শুকনো বস্ত্র ছাড়া আপনার জ্বরবিকার ঘটবে। ঋষিকুমার ইতস্তত করেন। তাঁর মুখমণ্ডলে তীব্র জ্যোৎস্না এসে পড়ে। অনিন্দ্য কান্তিতে অপরূপ বিভা। দিব্যমুখশ্রী জ্বলে ধিকিধিকি। যেন অনন্ত দহনে পুড়ছে এবং পোড়াচ্ছে। সে মুখ পোড়ায় নগ্নিকাকে। অবিকল বসুমিত্র। শ্মশ্রুগুম্ফ বাদে। নগ্নিকা চেয়ে থাকে ঋষিকুমারের দিকে। শোভা পায় না এই বেশ। এমন সুন্দর যুবাপুরুষের এমন অকালবৈরাগ্য। এমন কামনাহীন ঋজুতার ছল। কাপাসে আচ্ছাদিত এই সুদেহ— যেন শরদিন্দু রশ্মিবলয় ঢাকা পড়েছে অকালমেঘের চক্রান্তে।

সন্দেহ হয় নগ্নিকার। জীবন দেখার অভিজ্ঞতা তার কম হয়নি। মানুষী জীবনের রাজপথ থেকে কেন এই ঋষিকুমার পা ফেলে যায় অরণ্যের তৃণমূলে, কেন চলে যায় নদীতটে, ধূধূ প্রান্তরে? নাকি এও এক বিশুষ্ক অভ্যাস? যে অভ্যাস নিতান্ত প্রয়োজনীয়। গ্রাসাচ্ছাদনের মতোই প্রয়োজনীয়। কে জানে! দীর্ঘদিন মানুষ দেখতে দেখতে, তার ভেতর বাহির খনন করতে করতে অনেক সত্য দীপ্ত অগ্নির মতো জ্বলে উঠেছে। দেখা যাক, কোন নতুন সত্য সুপ্ত আছে তার জন্য। আবার তাকায় সে ঋষিকুমারের দিকে। মনে পড়ে। এমনই ঘনঘোর বরিষায়, এমনই রজনী গভীরে এসেছিল কুলপুত্র বসুমিত্র। তারপর অনেক বছর।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ঋষিকুমারকে আবার বলে সে, ঋষিকুমার—! আপনার শুষ্ক বস্ত্রের বড় প্রয়োজন। আপনি শীতে কাঁপছেন। আপনাকে কৌশেয় বস্ত্র একখানি দিই? বিশুদ্ধ, ক্ষার পরিষ্কৃত সে বস্ত্র।

তাই দাও ভদ্রে।

'ভদ্রে' সম্ভাষণে গভীর থেকে নড়ে ওঠে তার জীবনমূল। আবার সেই জীবনরেখার ওপার থেকে ভেসে আসে মায়া। জীবনশতদল ফুটে থাকে সরোবরে। সূর্যকরস্পর্শে দলগুলি যার প্রাণে প্রাণে প্রস্ফুটিত হয়। তৃণমূলে ঠোঁট খোলে অসংখ্য তৃণফুল। প্রকৃতিলোকে ছড়িয়ে পড়ে চঞ্চল তৃষ্ণা।

মনে পড়ে। স্মৃতি! যেন কণ্টকশয্যায় আছে নগ্নিকা।

সেদিন বনবীথিকায় সেজেছিল বকুল। কদম্বমূলে চাঁদ লুটোচ্ছিল। আজ কদম্বমূলে কেউ যায় না। সে বেদিকাটি নেই। পাতা ঝরিয়ে ক্লান্ত হয়েছে বকুল। জোড়া ঘুঘুর একটি মারা গেছে। আর একটি শুধু কেঁদে কেঁদে ডাকে। দীঘি জলহীন হয়ে আছে। শৈবালে আচ্ছন্ন জল। আকাশ দেখা যায় না। জলমুকুরে কালের কালি। বসন্তকাল গেল অপ্রেমের ক্লেদে। শরীর বেচে বেচে কখন শীতকাল নেমে এল চুপি চুপি। নাকি শীতকাল আসার আগেই শীতার্ত হয়ে উঠল নগ্নিকা।

এমনই ঘনঘোর বরিষায়। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল— 'আসব'। নগ্নিকা ক্রমে প্রেমিকা হয়ে ওঠে। তৃষ্ণার্ত হয়। সে ভুলে গেছে তাব ক্ষুধা।

তার চেয়ে গূঢ় অন্তরচারী খেলা শুরু হয়ে যায় তার শরীরময়। যেন শরীরে শরীর নেই। প্রস্থিত সে অপরূপ কাকলিশব্দিত পুষ্পগুঞ্জরিত উপবনে। সেখানে শুধুই রাজন্যের অধিকার! বসন্তসমাগমে জাতী যুথী চম্পা চামেলির মতো লজ্জায় শিহরিত হল তার দেহদল। হাঃ! বসুমিত্র! এ কি লজ্জার গৌরব তুমি দিয়ে গেছ আমার।

নগ্নিকা দেখে, বোধিতে অমল জ্যোৎস্নার মতো পৃথিবী, পৃথিবীপৃষ্ঠে তার শুদ্ধ শরীর। পণ্যার লজ্জাহীনতা নেই তার শরীরে। সে যেন ভদ্রজন-পরিবারের কুলপুত্রী। ঋষিকুমারকে সে পোশাক পরায়। বিনীতাব মতন সে নিবেদন করে : কী ভাবে আপনার সেবা করতে পারি ঋষিকুমার?

আমি ক্ষুধার্ত।

হায়! ঈশ্বর। আমার যে আজ অরন্ধন। ঘরে আমার কিছুই নাই। আমি কী করে এই তাপসের ক্ষুধা নিবৃত্ত করি?

সে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। তার দু চোখে টলটল করে বারিবিন্দু।

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব সঙ্কটে পড়েছ ভদ্রে।

অধোবদনে নগ্নিকা। এই দুর্যোগ রজনীতে ঘরে আমার সক্তু(ছাতু) শষ্প বা যবাগু কিছুই নাই। আজ আমার উপবাস ঋষি।

ঋষি মৃদু হাস্য করে বলেন ঃ ক্ষুধার্তকে অন্নদান না করা পাপ।

জানি ঋষিকুমার। কিন্তু আজ রাত্রে আমার ঘরে কিঞ্চিৎ চরু ছাড়া আর কিছুই নাই। সামান্য তণ্ডুলটুকুও আজ রাত্রে দুষ্প্রাপ্য।

আমি একজন গৃহস্থের বাড়িতে অতিথি হয়েছি।

নগ্নিকা যেন মরে যেতে থাকে। আবার সেই গৃহের অনিবার্য দ্যোতনা।

শব্দটিতে কী কঠিন আকর্ষণ! গৃহস্থেরা গৃহে কত সুন্দর। গৃহহীনা প্রত্যন্তবাসিনীর এই গুহা শ্রুতি স্মৃতি এবং শাস্ত্রোক্ত নরক। হায় হায়! বজ্রপাত হয় তার মাথায়। যে মিথ্যাকে সে উচ্চারণ করেছে সত্য বলে, সেই মিথ্যাকে এখনও বরণ করে নিতে হবে সত্য বলে। এ যেন মহাপরীক্ষা—সত্যের ভার বইতে পারবে নগ্নিকা? কেন, কেন নয়? রক্তমাংস অনুভবযুক্তা মানুষী আমি। অনুশাসন আজ আমাকে সে মর্যাদা থেকে জোর করে বঞ্চিত করেছে, সমাজ নামের এক নিষ্ঠুর অন্ধ দৈত্য আমাকে বেঁধে রেখেছে তার তৈরি করা নিগড়ে। জীবজন্তু পশুপাখিদের মতো আমিও তো আলয়ে বাস করি, গৃহে আমার বাসস্থান-- তবে কেন আমি গৃহী নই? অসম্ভব কম্পনকে নিয়ন্ত্রণে এনে সে বলে, এও সত্য ঋষি।

ব্রাহ্মণকে উপবাসী রাখলে গৃহস্থের ঘোর অমঙ্গল।

সত্য।

গৃহস্থের পাত্রে সর্বদাই উদ্বৃত্ত তণ্ডুল রাখতে হয় অতিথিসেবার জন্য?

সত্য।

অতিথি অভুক্ত ফিরে গেলে বিশেষ করে সে যদি উপবীতধারী ব্রাহ্মণ হয়—তাহলে ব্রহ্মশাপে তাকে ঘোর পাতকী হতে হয়।

কিন্তু অনিচ্ছাকৃত অবহেলায় বা অজ্ঞানে যে কর্ম করে তার দণ্ড তো লঘু হয়। যদি রাজদ্বারে শ্মশানে প্রাণসংশয়ে রাষ্ট্রনীতিতে মিথ্যা অধর্ম না হয় তাহলে আন্তরিক অথচ অবস্থাবিপাকের ত্রুটিও অধর্ম বলে আখ্যাত না হওয়া উচিত। আর এমন পাতকীর জন্য শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণও তো কিছু প্রায়শ্চিত্তের বিধান রেখেছেন ঋষি!

ঋষিকুমার বিস্মিত হন। এ নারী তো সামান্যা নয়! এর যথেষ্ট শিক্ষা আছে। শাস্ত্রজ্ঞানও তো কম নয়! তার সন্দেহ হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি জানো না ভদ্রে, নারীমাত্রেরই শাস্ত্রজ্ঞান নিষিদ্ধ?

ঋষিকুমার কি জানেন না, অনুশাসন থাকলে তার শিথিলতাও থাকে, নিয়ম উজ্জ্বল হয় নিয়মহীনতা থাকলে, আলো উজ্জ্বল হয় অন্ধকার গভীর হলে? জ্ঞান তো প্রদীপ্ত আলো। জ্ঞান সূর্যের মতো তেজস্বী। তাকে কি নিষেধের হাত দিয়ে আড়াল করা যায়! ঋষিকুমার বোধহয় অধ্যয়ন করেননি—বিদুষী গার্গীর কথা? যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে ভয় দেখিয়েও নিস্তার পাননি। মৈত্রেয়ীকে তাই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অত্যাশ্চর্য দৃষ্টিতে নগ্নিকাকে দেখেন ঋষি। জিজ্ঞাসা করেন ঃ কার কাছে এই জ্ঞানলাভ করেছ তুমি?

আপনারই মতো একজন ঋষিতুল্য মানুষের কাছে। তিনি একদিন আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন আমার। আমি অতি সামান্য নারী। আমায় মার্জনা করবেন।

ঋষি আবারও অবাক হন।

এমন মার্জিত উচ্চারণে অতিথি সম্ভাষণ। এ কি সম্ভব কোন কুলললনার পক্ষে? তিনি আর চিন্তা করতে পারেন না। তাঁর উদর জ্বলে যাচ্ছিল ক্ষুধায়। দূর দেশে, এক ক্ষত্রিয় রাজকন্যের যজ্ঞে তিনি গিয়েছিলেন ঋত্বিক হয়ে। কিন্তু দানসামগ্রী নিয়ে উপস্থিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে রীতিমতো সংঘর্ষ হয়। ক্ষোভে চলে আসেন ঋষি বা বলা যায় পালিয়ে আসেন। কিছুই নিয়ে আসতে পারেননি। শুধু দ্রুত কমণ্ডলুতে ভরে এনেছিলেন উত্তর ভারতের মহার্ঘ প্রিয়ঙ্গু তণ্ডুল। আপাতত তাই দিয়ে ক্ষুধা শান্ত হোক। তিনি রন্ধন করতে বলেন নগ্নিকাকে।

কমণ্ডলু থেকে মহার্ঘ প্রিয়ঙ্গু ঢেলে নিতে গিয়ে হাসে নগ্নিকা। মনে পড়ে বসুমিত্রের সুন্দর কথাগুলি। অন্ন ব্রহ্ম, প্রাণ ব্রহ্ম। প্রাণ এবং অন্ন দুই দেবতা এক হয়ে পরমত্ব পায়। অন্নেই সমস্ত প্রাণী আশ্রিত। ইহজগতের সত্যমূল্যহীন ব্রহ্মের অস্তিত্ব তাই মিথ্যা। ঋত্বিকেরা জীবনকে বলেন মায়া। অথচ সেই জীবনকে রক্ষা করতে কমণ্ডলুতে গঙ্গাজলের পরিবর্তে তণ্ডুল বহন করতে ভোলেন না। ক্রোধের জন্ম হয় নগ্নিকার বোধ -এর গভীরে। গূঢ় হিংসার মতো কিছু অনুভব তাকে ওলটপালট করে দেয়। মনে হয় সমস্ত কিছুই খাণ্ডব দহনের মতো পুড়িয়ে ফেলে। সামান্য তণ্ডুলের জন্য কী কঠিন জীবিকা তার। শরীরকে অন্যের আহার্য করে তুলে ধরতে হয়। তবেই মেলে তার নিজের আহার। রাজার কোন কর্তব্য নেই তাদের প্রতি। সামান্য করুণা করে গ্রামশাসক গ্রামীণ। উদরপূর্তির জন্য তা যথেষ্ট নয়। জনপদে, গৃহস্থের আলয়ে সে ঢুকতে পারে না। ত্রিসীমানায় গেলে কঠিন শাস্তির বিধান দেয় গ্রামীন। জনপদে এত খাদ্য— এত শস্যসমাগম। নবান্ন উৎসবে অপরিমেয় অপূপ (পিঠে) অপচয় হয়। ইঁদুর পেচক পাখি এত শস্য খেয়ে ফেলে। শুধু সে খেতে চাইলেই দোষ! গণিকারা এতখানি হীন নয়। গণিকাদের পোষে রাজা। রাজার আইন গণিকাদের রক্ষা করে। তার বৃত্তি অনেক নিরাপদ। গণিকারা রাজাকে কর দেয়। রাজ অন্তঃপুরে আমন্ত্রণ পায়। পুত্রজন্মে, পুত্রকন্যার বিবাহে, অতিথিদের প্রত্যুদগমনে। গন্ধবারি, পূর্ণকুম্ভ বহনের কাজও পায় তারা। শুধু বেশ্যার কোন কাজ নেই।

রন্ধন করে নগ্নিকা। যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ রন্ধন করে। হৃদয় পুড়িয়ে সে সিদ্ধ করছে সে তণ্ডুল। কী এক অসহ্য ঘৃণা মঞ্জরিত হয় শরীরে। অসম্ভব অসম্ভব ইচ্ছাগুলি তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। লোমকূপ ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে। তার অঙ্গ জ্বলে দু'রকমের ক্ষুধায়। দ্বিতীয় ক্ষুধা তাকে অস্থির উন্মাদিনী করে তোলে। এ কি তার অভ্যাসের ক্ষুধা? নাকি ক্ষুধার নেশায়, ক্ষুধা না থাকলেও এক অদম্য ক্ষুধাকে সৃষ্টি করা? কালের পৈঠায় বসে হুতাশন জ্বালিয়ে রাখা কাল থেকে কালান্তরে? নাহ! সে ক্ষুধা শান্ত হবার নয়। অগ্নি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় অতীতকালে। রহস্যময় বয়ঃসন্ধিতে নিষ্ঠুর পুরুষের বিধান তার পৃথিবীকে বিষাক্ত করে দিয়েছে। স্মৃতিপথে ভেসে আসে তার বাল্যকালের নদী! যেন এই ডুবে গেল তার অলক্তরঞ্জিত পা দু'খানি। নয়নসম্মুখে বালিকার খেলাঘর, স্বপ্ন— মান্দাস। বালিকার সমাজ ছিল। সামাজিক পরিচয়ে সে কারুর কন্যা ছিল। কিন্তু মিথ্যা দিব্যতার মোহে, মিথ্যা পুণ্যের লোভে তাকে বলিদান দিল তার নিজেরই জন্মদাতা পিতা। যজ্ঞের দানসামগ্রী হয়ে পিতা তাকে বিক্রি করে দেয় রাজার কাছে। অনূর্ধ্বা বারো বছরের,

বিবাহের জন্য উপযুক্তা কন্যা সে তখন— নগ্নিকা এই তার শাস্ত্রীয় পরিচয়। সেই নগ্নিকা তখন সামান্য তৈজসপত্রাদির মতো পণ্য হয়ে গেল সামগ্রীর হাটে। মনে আছে তার —যজ্ঞের দান হবার জন্য সারিবদ্ধ সেই সব অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যাদের যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ঠিক পশুদের মতো যুথবদ্ধভাবে, তখন লোভী ঋষিকুল রাজার জয়ধ্বনি দিচ্ছিল গম্ভীর মেঘগর্জনের মতো বা ক্ষুধার্ত শিবাকুলের মতো তাদের বিচিত্র স্বরধ্বনিতে শুধু মাংস ভক্ষণের আহ্লাদ। উপস্থিত পুরুষেরা হিংস্র শ্বাপদের মতো দন্তবিকশিত করে হাসা করছিল। নাট্যে যখন বয়স্কা বারনারীর বিবাহ দৃশ্যের অভিনয় করে তাদের চূড়ান্তভাবে অপমান করা হচ্ছিল তখন দর্শকেরা হি হি হাস্যরোলে ভরিয়ে তুলেছিল সভামণ্ডপ। তারপর সেই ঋষিপ্রবর, জ্ঞানতপস্বী নিষ্কলুষ স্বর্ণকান্তিময় চরিত্র— যার সাথে তাকে প্রত্যুদগমনে বাধ্য করল তার পিতা, বালিকাদের ভোগ করার নামে তাদের ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছিল। তারপর তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ক্রীতদাসীদের হাটে। সেই প্রত্যূষকালে জীবন হয়ে উঠেছিল তমসাচ্ছন্ন রজনী। বালিকা বারবার প্রার্থনা করেছে হে তমোনাশকারী সূর্যদেব, আমাকে জ্ঞান দাও, শক্তি দাও, যাতে এই অন্ধকারকে পরাজিত করতে পারি। সেই থেকে ঋষি সম্পর্কে তার যাবতীয় শ্রদ্ধাকুসুমগুলি দলিত হয়ে গেল। ঋষি সম্পর্কে কল্পিত আলো যেন তাদের জীবনের সমগ্র অন্ধকারের বিনিময়ে—

রন্ধন শেষ নগ্নিকার। পাকপাত্র রাখে সে ভূমিতলে। ব্যাঘ্রচর্মনির্মিত আসন পেতে দেয়! মৃৎপাত্রে জল রাখে। পূজার জন্য নৈবেদ্য সাজায়। ধীরে, কোমল স্বরধ্বনিতে মঞ্জরিত কিশলয়ের মতো আকাঙ্ক্ষা দুলিয়ে সে ডাক দেয়— ঋষিকুমার—

ঋষিকুমার ধ্যানে বসেছিলেন। ক্ষুধায় কাতর তাঁর ধ্যান গভীরতা পাচ্ছিল না কিছুতেই। বারবার নষ্ট হচ্ছিল মনঃসংযোগ। চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠছিল। শরীরময় বৈকল্য।

নগ্নিকার ডাকে চোখ দুটি উন্মীলিত করেন তিনি। সামনে অপূর্বা। এমন রমণীমূর্তি তিনি এতদিন নিরীক্ষণ করেননি। ঋষিকুমারের শরীর ঘিরে ঘণ্টাধ্বনি— যেন ত্রিলোকজুড়ে খুলে যাচ্ছে সমস্ত রাত্রির কপাট। এ কি জ্ঞান— সৃষ্টিস্থিতিধ্বংস স্থিত হয়ে আছে, এই কি সেই মূলাধার! মুগ্ধ, উল্লসিত আনন্দবিহ্বল অসীম প্রকৃতিলোকে বেদমন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত শুধু জীবনের আলো— যা দিব্যবিভায় শস্য-ঐশ্বর্যময়ী প্রকৃতি থেকে প্রার্থনা করছে শস্যের আশীর্বাদ— বেদজ্ঞান যেন লোকজ কবিতার মতো— এই ধরিত্রীর রূপবতী কায়াকে চিত্রিত করে ছন্দে গানে ঝঙ্কারে, চক্ষু মুদ্রিত হলেই যেন দেবী মানবী তাকে প্রলুব্ধ করে—

সামনে তিনি কাকে দেখছেন? এই কি পৃথিবী? মানবীই কি সেই অনুপম সৌন্দর্যময়ী দেবীমূর্তি? আশ্রমে তাঁর শিক্ষা তালিকায় রেখেছে ব্রহ্মচর্য বেদাধ্যয়ন মন্ত্র অগ্নি যজ্ঞাচার পূজা গুরুসেবা। কিন্তু এই পৃথিবীরূপিণী নারী যে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় রয়ে গেল। কী হয় এই নিঃসার ব্রহ্মচর্যে? কোন ঋষিই তো ভোগসুখ ত্যাগ করেন না। তবে? ধন্দে পড়ে যান ঋষিকুমার। কিন্তু হঠাৎই তিনি ধাক্কা খান। এ আমি কী ভাবছি? এ যে পাপ? মৈত্রায়নী সংহিতা বলে, রমণীমাত্রই মিথ্যাচারিণী, দুর্ভাগ্যস্বরূপিণী। তৈত্তিরীয় সংহিতা বলে, সর্বগুণান্বিতা শ্রেষ্ঠা নারীও অধমতম পুরুষের থেকে হীন, শতপথ ব্রাহ্মণও বলল, অনৃত বা মিথ্যা কী? স্ত্রী শূদ্র কুকুর ও কালো পাখি।

সামনে আমি কী দেখি? মিথ্যা, মিথ্যা। হে আমার অশান্ত হৃদয়, মিথ্যার পিছনে ধাবিত হয়ো না।

সাময়িক স্থৈর্য অবলম্বন করলেন ঋষি। ভোজন করতে বসলেন।

কিন্তু তিনি দেখলেন, পাকপাত্রটি সম্পূর্ণ নিবেদন করা হয়েছে তাঁকে। তিনি নগ্নিকার দিকে তাকান। শরৎশিশিরে স্নিগ্ধ পুষ্পকলিকার মতো দুটি চোখ। ঋষি আবার মায়ায় পড়ে যান। আবেগমথিত স্বরে বলেন, এ কি করছো ভদ্রে? শুধুমাত্র অতিথির জন্য কেন? তোমারও তো কিছু রাখা উচিত।

অতিথিসেবা করতে পারিনি। অতিথির আনা তণ্ডুল নিজের জন্য রাখি কোন লজ্জায়?

প্রীত হলেন ঋষিকুমার। এমন স্বাভাবিক স্বীকারোক্তিতে মুগ্ধ তিনি। এতে লেগে আছে অন্তরের শ্রদ্ধার স্পর্শ। আন্তরিকতাই তো শ্রেষ্ঠ আতিথেয়তা। তিনি শান্তস্বরে নগ্নিকাকে বলেন, এর অর্ধেক তোমার জন্য রাখো।

আপনি উচ্ছিষ্ট করে দিন।

তাই করেন ঋষিকুমার।

পরম তৃপ্তিতে ভোজন করে নগ্নিকা।

রাত্রি শেষ যামে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। অসহ্য, অসহ্য জ্যোৎস্নায় পুড়ে যাচ্ছে চারপাশ। ঋষি বসে আছেন কাষ্ঠাসনে। কোথা থেকে যেন বনজ ফুলের সৌরভ ভেসে আসছে। নিজের ভেতরেও এক অনির্বচনীয় বাক্‌সৌরভের গন্ধ পান তিনি। যেন শব্দেরা উন্মুখ হয়ে আছে প্রকাশিত হবার জন্য। কী সেই প্রকাশ? প্রগাঢ় অনুভব আসে সাড়া দিয়ে। নিজের বিরুদ্ধে কঠিন যুদ্ধে নামতে হয় তাঁকে।

কুটিরের পশ্চাদ্দিকে একটি প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের আলোতে সেই রমণীর ছায়া। রমণী বেশভূষার বিন্যাস করছে। কেশগুচ্ছ খুলে দিলে ঢুকে পড়ল গোপনচারিণী অন্ধকার। সন্দিগ্ধ ঋষিকুমার নিজেকে বিশ্বাস করতে পারেন না। তাকিয়ে থাকেন নগ্নিকার ছায়ায়। তাঁর বুকের ভেতরও একটি ছায়া নড়ছে। এত রাত্রে এমন সজ্জাবিলাস কেন? নিজের পরিধেয় বস্ত্রের দিকে চোখ যায় তাঁর। চমকান। এ কি বেশ আমার। সামনেই তাঁর পরিত্যক্ত কাপাস শুকোচ্ছে হাওয়ায়। এতদিনের পরিচিতি এই কাপাস, শুদ্ধ, মালিন্যহীন কাপাসে তিনি দাগ দেখতে পান। আবার নিবিড় জ্যোৎস্নায় ধুয়ে গেল সেই কাপাস। তাতে বৃক্ষলতার ছায়া পড়ে দুলছে। তাঁর ভেতরে প্রবল আলোড়ন শুরু হল। পৃথিবীতে কি আজ মহাপ্রলয় শুরু হবে? কাপাসে ছায়ার কারুকার্য শুরু হয়। পত্রশাখা ফুলদলের ছায়া। তাঁর ভেতরে ছায়া সংক্রমিত হয়। এ সময়ে আবার ডেকে ওঠে পাখিটা। বোবা কান্নার মতো। ঋষিকুমার অস্থির হন। মনে হয় পাখিটা তাঁকেই ডাকছে।

আর একজনও অস্থির হল। অদৃশ্য এই পাখিটা তাকে কাঁদাচ্ছে। ঘুরে বসল নগ্নিকা। মুকুরে অস্পষ্ট বিম্বিত হন ঋষিকুমার। নাকি মুকুর ব্যর্থ হয়েছে, তার মনের মুকুরে ভেসে উঠল প্রতিচ্ছায়া? গৌরবর্ণ। দীর্ঘ। জানু পর্যন্ত ছড়ানো বাহু। শালপ্রাংশু। ঋজুবক্ষে উপবীত। জটাজুটশ্মশ্রুগুম্ফের ভিতরে যুবক অসম্ভব শক্তিমান। মূর্ত মদনদেব। স্বপ্নমেদুর সহস্র রজনীর প্রেমার্তি যেন বন্দি হয়ে আছে এই বক্ষোগুহায়। শুধু সামান্য আঘাতে তার অর্গল খুলে দিতে হবে। সামান্য আলোকশিখায় তার অন্ধকারের স্তর ভাঙতে হবে।

ধীরে সামনে আসে নগ্নিকা। ওষ্ঠে মাধুকী। কপালে তিলক। কপোলে পত্রলেখা। তার ঊর্ধ্বাঙ্গ বাস ঋষিকুমারের শরীরে। শরীর ঢাকা তার শুধুই নীবিবন্ধে। আমন্ত্রণের মেখলা বিপজ্জনকভাবে শিথিল। কটিতট শীর্ণা নদীরেখার মতো দেখায়। ওষ্ঠরঞ্জনীতে ওষ্ঠ বিম্বফলকেও লজ্জা দেয়। চক্ষুতারকায় ম্রিয়মাণ নক্ষত্রেরা।

সে আসে। পদক্ষেপে ব্রীড়া। ভঙ্গিমায় লাস্য। স্বর্গোদ্যানের নর্তিনীর মতো মধুকরকুঞ্জিত নূপুরনর্তনে সে আসে। ঋষিকুমারের কাছে এসে দাঁড়ায়। আচ্ছন্ন সেই ঋষি। গূঢ় হৃদয়দেশে সংঘাত। থরথর কেঁপে ওঠেন তিনি। ঋষিকুমার।

মধুস্রাবী সে কণ্ঠস্বরে মিথ্যাস্বরূপিণী রমণী তাঁকে ভয় দেখায়। তার চোখের দ্যুতিতে দুরন্ত বিদ্যুৎ। তাকে আহ্বান জানায়।

ঋষিকুমার! সারারাত অনিদ্রায় কাটাবেন না। গাত্রোত্থান করুন। অনাথিনীর এই শয্যায় আপনি শয়ন করুন। অনাথিনী ভূমিতলে শয়ন করুক।

ব্রহ্মচারীর পক্ষে তৃণশয্যাই শ্রেষ্ঠ শয্যা।

মনে করুন এই শয্যাই তৃণশয্যা। সামান্য এই পালঙ্ককে মনে করুন ভূমি। এক রাত্রির শয়নে পাপ হবে না আপনার।

আমি সংসারত্যাগী ঋষি। জগতের মায়ায় আমায় বন্দী করো না।

আপনি মুক্ত ঋষি। আপনার চরিত্র প্রভাতকালীন সরোবরের নির্মল জল রাশির মতো। যদি সামান্য শয্যাশয়নে আপনার ব্রহ্মচর্য চলে যায় তবে কিসের ব্রহ্মচারী আপনি? কাঞ্চনকে ত্যাগ করার অনেক আগে তাকে মন থেকে ত্যাগ করতে হয়। তাই না ঋষি? কাঞ্চনের স্পর্শে আপনার কলুষ লাগবে না, কামিনী আপনাকে বিচলিত করতে পারবে না, তবেই আপনি ঋষি। আপনি নিখাদ স্বর্ণ। স্বর্ণ কোনদিন কলুষিত হয়?

তুমি বড়ই বাকচতুরা।

আপনাকে দেখামাত্র আমার সব চাতুর্য খসে পড়েছে ঋষি। আপনি শয্যা গ্রহণ করুন।

দুটি হাত ধরে ঋষিকুমারকে সে শয্যায় নিয়ে আসে। চঞ্চল ঋষিকুমারের কাপাস পড়ে থাকে ওদিকে।

শয্যায় শয়ন করিয়ে তাঁকে নিজের উত্তম পশমবস্ত্রটিতে ঢেকে দেয় নগ্নিকা। হঠাৎই ঋষিশরীরে কম্পসাত্ত্বিকের উদগম হয়। অসম্ভব শৈত্যপ্রবাহে ডুবে যাচ্ছেন তিনি। প্রবল শীতবাতাসে হাহা ধ্বনি ভেসে বেড়াচ্ছে শরীরময়। তৃষ্ণার দংশনে বিক্ষত তাঁর মন।

নগ্নিকার পুষ্ট অধরে প্রতিজ্ঞা। বসে থাকে সে পায়ের কাছে। তপ্ত করতলে সে ঋষিকুমারের পা দুটি চেপে রাখে। আপনি কাঁপছেন কুমার। যেন গভীর থেকে বলে ওঠে নগ্নিকা। ধীরে সূক্ষ্মতন্তুজালের মতো অঙ্গুলি বিস্তার করে সে। একটি একটি করে লোমকূপ খুলে দেয়। পদমর্দন করে।

ঋষিকুমারের শীত বাড়ে। তৃষ্ণা বাড়ে। চক্ষুদুটি রক্তবর্ণ হয়।

ফিসফিস করে নগ্নিকা।

ঋষিকুমার!

উঁ।

কখনও কোন পবিত্র প্রভাতে ফুলগুলিকে ফুটে উঠতে দেখেননি তপোবনে, অরণ্যমধ্যে কোন চকিতা হরিণীর গাত্রলেহন করতে দেখেননি হরিণযুবাকে, কখনও কোন বর্ষাসমাগমে ডাহুকীদম্পতিকে এক হয়ে যেতে দেখেননি, কোন মঞ্জুরিত বসন্তকালে ফুলদলে ভ্রমরের ঊর্ধ্বমুখী পশ্চাদ্দেশ দেখেননি? এসব তো আপনার কাছের ছিল, আঁখির সন্নিকটে ছিল?

দহনতপ্ত ঋষি উত্তর দেন, তেমন করে দেখা হয়নি আমার।

কখনও শোনেননি এই আপনার চারপাশের মানুষজনের বেঁচে থাকার সঙ্গীত? দেখেননি এরা কীভাবে মগ্ন প্রেমে জীবনকে ধারণ করে রাখে, স্বপ্নে উন্মত্তরাগে দেখে, মর্ত্যভূমিতেও দেবলোকের কল্পনা করে? কীভাবে প্রতিদিন অগ্নিময় মন্ত্রোচ্চারণ করে? এমন সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে, এই ভূমির শ্রেষ্ঠ ফুল মানুষ ছেড়ে আকাশের দেবলোকে কেন বিচরণ করছেন ঋষি? কল্পিত স্বর্গের দেবতাদের পেছনে এতদিন কেন এভাবে ব্যর্থ অতিবাহিত করলেন? ঋষি, বসুমিত্র আমার কাছে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি করে গেছেন — জীবন ছাড়া বেদাধ্যয়ন মিথ্যা।

তুমি ঠিকই বলেছ ভদ্রে। মিথ্যার পেছনে, শুধুই মিথ্যার পেছনে, অনন্ত মিথ্যায় গিয়ে দিক্‌চিহ্নহীন অলীকতায় দিশা হারিয়েছে আমার শিক্ষা।

জীবনকে বাদ দিয়ে জীবনাতিরেক কিছুই দেখা যায় না ঋষি। অবিদ্যার অহঙ্কার ক্ষমা করবেন। যাজ্ঞবল্ক্যও বলেছিলেন একদা, এই অক্ষয়কে না জেনে পৃথিবী ছেড়ে যাওয়া পলায়নের ভীরুতা, জীবন তো আপনার জন্য। এই দেখুন সমগ্র সৃষ্টির গোপন আকাঙ্ক্ষা জীবিতের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন, ভূতলের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেম এইখানে— এইখানে ব্যাপ্ত সে মহাজীবন, এইখানেই ব্রহ্মোপলব্ধি।

নগ্নিকা খুলে ফেলে তার অবশিষ্ট সামান্য আবরণ। নিপুণ শিল্পকারিকা চিত্রিত করেছে তার শরীর। গূঢ় জ্যোৎস্নায় মহিমময়ী হয়ে উঠল শরীর।

স্নায়ুতে প্রবল দুন্দুভি বেজে উঠল ঋষিকুমারের। চোখদুটি লোলুপ হয়ে উঠল। দুই চোখে তাকাতে পারেন না তিনি। অনির্বচনীয় বিভায় আলোকিত ত্রিভুবন। উদ্ভাসিত কারুকৃতিতে ফুটে আছে দুটি স্তনফুল। উন্মুক্ত বক্ষোদেশের দু'পাশ থেকে ছন্দিল ভঙ্গিমায় নেমে গেছে দুটি বাহু। গলা ঘাড় স্কন্ধদেশ পুড়ে যাচ্ছে সুরভিত অগ্নিময় কামনায়। আমোদিত এই শরীরপূজায় নিজেকে নিবেদন করলেন ঋষি। স্ফুরিত অধরে দিলেন চুম্বনের দাগ। দংশন করলেন স্তনফুলে। দুরন্ত তস্করের মতো শরীরময় ঘুরে বেড়ালেন মত্ত লুণ্ঠনে।

ক্রমে প্রভাত আসন্ন হল। আলো ফুটছে। চমৎকার নিদ্রায় ছিলেন ঋষিকুমার। হঠাৎ তীব্র আলোকচ্ছটায় জেগে উঠলেন। একি দশা হয়েছে তাঁর? কাপাস লুটোচ্ছে ধূলায়। কমণ্ডলুতে গঙ্গাবারির বদলে ভরা রয়েছে গন্ধবারি। অঙ্গে পরিহিত রমণীর বাস। পাশেই নগ্নিকা। অসহ্য নগ্ন রূপ তার। লাফ দিয়ে উঠলেন ঋষিকুমার।

ঘুমজড়ানো চোখে নগ্নিকা বলে উঠল, আজ আমি সার্থক।

এ আমি কোথায়?

মাটির পৃথিবীতে। প্রিয়ার কুটিরে।

তুমি আমার ধর্মনাশ করেছ।

বরং আমিই তোমাকে পরম ধার্মিক করেছি ঋষি, তোমাকে আমি জীবনের পাঠ দিয়েছি। দাও গুরুদক্ষিণা দাও।

কে তুমি? এমন শীলিত বাকচাতুর্য কার?

কার হতে পারে? অনুমান করো।

তুমি— তুমি—

আমিই মহাবেশ্যা নগ্নিকা। শূদ্রাণী।

অহো ঈশ্বর! এ আমি কী পাপ করলাম!

বিলাপ করো না কুমার। তুমি না ঋষি? তুমি না পুরুষ? তোমার পাপ কিসে? তোমার যাবতীয় পাপ তো আমি হরণ করেছি। স্কন্দপুরাণে ঋষিরাই বিধান দিয়েছেন, বেশ্যা একটি স্বতন্ত্র জাতি। তার সঙ্গে উচ্চবর্ণের কোন পুরুষের সম্পর্ক ঘটলে সে পুরুষ দণ্ডনীয় নয়।

শেষ পর্যন্ত আমি শূদ্রাণীর রন্ধনকৃত অন্নও স্পর্শ করলাম!

তাতে কী দোষ হয় ব্রাহ্মণ? আপৎকালে, দুর্ভিক্ষসময়ে ব্রহ্মবাদীকে দেখেছি হীনবর্ণের উচ্ছিষ্ট কুল্মাস(মাসকলাই) ভক্ষণ করছেন। উদর ব্রহ্মকেও ভক্ষণ করে নেয়, তাই না ঋষি? হে ঋষিকুমার, প্রয়োজনবোধে পুণ্যকে তোমরা বলো পাপ। আর পাপকে মহাপুণ্য বলে প্রণাম কর।

তুমি ছলনাময়ী মহাবেশ্যা। তোমার কাছে পাপপুণ্যের শিক্ষা নেব আমি? বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ?

হাসালে ঋষি। কেমন তোমাদের পাপপুণ্যের মানদণ্ড? রাজাকে তুষ্ট করতে তোমরা সব নিয়মকেই ভাঙতে পার। তোমাদের বিধানে গণিকা পাপী কিন্তু গণিকাগমনে পাপ নেই। গণিকা রক্ষণেও না। গণিকার দ্বারা পুণ্য অর্জনে পাপ নেই। যজ্ঞের দানে গণিকা গ্রহণেও পাপ নেই। গণিকার সম্পত্তি ভোগে পাপ নেই। তাদের দানগ্রহণে পাপ নেই। পরাজিত ঋষিকুমার কোন উত্তর খুঁজে পান না।

নগ্নিকা কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বলে, আজ তৃপ্ত এ মহাবেশ্যা। আজ সে ঋষিকে ধর্ষণ করতে পেরেছে। তার শরীরকে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পেরেছে।

ঋষিকুমার ক্রোধে জ্বলে উঠলেন।

আমি তোমার বিরুদ্ধে রাজার কাছে অভিযোগ করব।

জানি, আমার শাস্তি হবে। আমার যে অনেক পাপ? প্রলোভিত করা আমার পাপ, কিন্তু প্রলুব্ধ হওয়াটা তোমার পাপ নয়। কারণ তুমি পুরুষ। কিন্তু জেনে রেখো ঋষি। আমার যদি শাস্তি হয় তাহলে তোমাদের সবারই শাস্তি হওয়া উচিত।

ঋষিকুমার আবারও পরাজিত হন। কিন্তু এই পরাজয় তার ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কারে লাগে। রক্তচক্ষুতে অগ্নিধারণ করে তিনি তাঁর শেষ অস্ত্রটুকু প্রয়োগ করতে উদ্যত হন। বলেন, আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, নিজেকে বেশভূষায় সজ্জিত করে তৈলচিক্কণ দেহ নিয়ে তুমি এখনই তিতির পাখি হয়ে যাবে। কাল থেকে কালান্তরে তুমি একইভাবে ক্রেতা ডাকতে থাকবে। যেদিন তোমার ঘরে লোক আসবে সেদিনই তুমি খেতে পাবে, যেদিন আসবে না, সেদিন তুমি উপবাসী থেকে বিলাপ করবে।

একটু কেঁপে উঠল নগ্নিকা। কিন্তু তারপরই আদিত্যবর্ণ আলোর মতো হয়ে উঠল তার মুখমণ্ডল। এক প্রবল বোধি ধীরে ধীরে অন্তঃপ্রবাহিনী নদীর মতো প্রবাহিত হতে লাগল তার শরীর থেকে। অগ্নিবর্ণ একাগ্নীতে যেন সে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে তার চারপাশের নিষেধ বলয়, সমাজ নামক বিপুল পর্বতগাত্র বেয়ে সে উঠে এসেছে শিখরে, যেখান থেকে নিচের পুরুষকুল— অহঙ্কারী ম্লান তপস্বীকুল মানবকে মনে হচ্ছে বামন— পর্বতশিখরের মতোই নিজেকে অবিচল রেখে সে বলল ঃ

এই আমি পাখি হলাম না ঋষিকুমার। বরং সেই ভয়ঙ্কর কথকতার পাখিটি যেটি তোমাদের ভয়ে এতকাল ডানা গুটিয়ে ছিল, তাকে মুক্ত করে দিলাম আকাশে। প্রেমকে তোমরা নারীজীবনের স্বপ্নভূমি থেকে নির্বাসিত করেছ, অনুশাসনকণ্টকিত করে গড়ে তুলেছো এক অশুদ্ধতার বহুপ্রচারিত প্রাচীর— আমি তার ওপারে যেতে চাই, তাই তোমাদের অভিশাপের খাঁচাটাকে আমাকে ভাঙতেই হবে। যে ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কারে তুমি আমাকে অভিশাপ দিলে তা আসলে তোমার ছলমাত্র। আয়েসি, নিঃশ্রমী মানুষের ছলের অভাব হয় না। দুর্বল ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ক্রমে ক্ষত্রিয়ের রাজচ্ছত্রতলে প্রার্থী, ভিক্ষুক হয়ে পড়ছে। শূদ্রজাগরণের প্রাককাল এখন। অভিশাপ তাই নখদন্তহীন ব্রাহ্মণের অনেকগুলি পেশার মধ্যে একটি পেশামাত্র।

আমি ঋষি— ব্রহ্মজ্ঞানী, ত্রিকালদর্শী। মূঢ় নারী তুমি, ব্রাহ্মণের শক্তি তুমি কীভাবে পরিমাপ করবে?

তুমি ঋষিও নও, ব্রহ্মবেত্তাও নও। তুমি রক্তমাংসে গড়া ঐহিক মানুষ, শুধু মানুষ বললে ভুল হবে, এই উত্তরীয়ের আড়ালে তুমি একজন লোভী জৈবিক মানুষ। ঠিক এই পরিচয়টুকুই তো কৌশলে শাস্ত্রবেত্তাগণ প্রণয়ন করে গিয়েছেন। তোমার কর্তব্য যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান দেওয়া এবং দক্ষিণাগ্রহণ করা। কিন্তু কোথা থেকে শক্তিসঞ্চয় করবে ব্রাহ্মণ? তাই দ্বিতীয় জন্মের অবতারণা করা হল যার নাম উপনয়ন।

উপনয়নের পর ব্রাহ্মণ কিন্তু চাষ, গোপালন এবং কুসীদজীবিতা করতে পারবেন। কোথায় তোমার ব্রহ্ম— ব্রাহ্মণ— সবই তো ভূমির মাটির পৃথিবীর।

তুমি আমাকে জাতিভ্রষ্ট করেছ।

ঠিক, তবে আমরা দুজনেই তো জাতিভ্রষ্ট! এসো ঋষি, এই দুই জাতিভ্রষ্ট মিলে এই কালসন্ধিতে দাঁড়িয়ে একটি স্বতন্ত্র জাতির সৃষ্টি করি যার পরিচয় এই অচল বর্ণাশ্রমের দ্বারা চিহ্নিত হবে না, সে হবে জাতিকলঙ্কচিহ্নবর্জিত নির্মল শুদ্ধ মানুষ— জীবন্ত, সৃষ্টিশীল, ভবিষ্যৎকালের বিপুল শক্তিমান মহাস্থপতি— ঋষি, প্রেম ছাড়া এই মানবসরোবর তো বিপুল বদ্ধ জলাশয়, কাল সুখরজনীতে তুমি আমার সঙ্গে প্রেমে মগ্ন ছিলে, মৃদু প্রেমকূজনে মত্ত বালক থেকে অমিতবিক্রমশালী যুবকের মতো তোমার প্রেমস্পর্শ আমাকে নিয়ে গিয়েছিল দেবলোকে, যেখানে তুমি ছিলে দেব, আমি হয়েছিলাম দেবী। এই সত্য। সূর্যচন্দ্রপৃথিবীজলরাজির মতো স্বচ্ছ। এসো, তুমি তোমার জ্ঞান দাও, আমি দিই আমার মনোহর কারুকৃতিময় শরীরস্থাপত্য, জন্ম হোক সুন্দর এবং সজ্ঞান মানুষের।

থমকে যান ঋষিকুমার। এ কোন নবজীবনের বেদজ্ঞান শুনছেন তিনি! যেন নব ওঙ্কারধ্বনিতে জাগ্রত হয়ে উঠল প্রভাতকাল।

হাত দুটি ধারণ করলেন তিনি, নগ্নিকার। আলিঙ্গন করলেন তাকে। বললেন, আমাকে বিদায় দাও সুকন্যে। আমি আবার তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করব। আজ আমার নতুন সন্ন্যাস, এই দেখ, আমি অঙ্গে ধারণ করেছি তোমার প্রেমসুগন্ধিত কাষায় বস্ত্র।

নগ্নিকার চোখে জল। বিদায় নিলেন ঋষি। তাঁর পদক্ষেপে পৃথিবীর পুরাতন ধূলি উড়ে গেল। সে ধূলায় অশ্রুপাত করল নগ্নিকা। দাঁড়িয়ে রইল কালের কুটিরদ্বারে।

তারপর থেকে বহুকাল সে দাঁড়িয়ে আছে। বহুকাল সে অঙ্গসজ্জা করেছে। তৈলচিক্কণ করেছে দেহ। পুরাণযুগ থেকে বিজ্ঞানযুগ পর্যন্ত সে অপেক্ষা করেছে। জনপদ প্রত্যন্ত থেকে নগরীগভীরে। বহুকাল তার ক্রেতা এসেছে। কিন্তু একটিও প্রেমিক আসেনি। আজও একটি পাখিপ্রাণ কাঁদে ঃ ঋষি বড়ই বেদরদ, ঋষি বড়ই বেদরদ।

বৈকুণ্ঠপুর

নলিনী বেরা

মেইন লাইনের বর্ধমান লোকাল সুরঞ্জনকে নামিয়ে দিল ব্যান্ডেলে। ব্যান্ডেল জংসন। একের-এ, এক, দুই, তিন, চার ও পাঁচ—ছয় ছয়টা প্লাটফর্ম। তিন নম্বর প্লাটফর্মেই সুরঞ্জনকে রেখে গেল টু-থার্টিস-আপ।

খাঁচা ছাড়া মুরগীর ডানা-ঝাপটানোর মতই ট্রেন থেকে নেমে প্রথমে হাত-পা ঝেড়ে নিল সে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নমে এল সুড়ঙ্গে। এদিককার স্টেশন-প্লাটফর্মের বৈশিষ্ট্যই হল এই সিঁড়ি বেয়ে তিরতির করে টানেলে নামা, টানেলে নেমে যেদিকে ইচ্ছা যাওয়া। সুরঞ্জন বাঁয়ে গেল।

টানেলের মুখটায় এসে দেখল— বাস এখনও আসেনি। ব্যান্ডেল-নয়াসরাই মিনিবাস। ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে বাঁশবেড়িয়া যাবার একমাত্র 'মিনি'। চুঁচুড়া-কুন্তিঘাট মিনিবাস, মগরা থেকে ৪ নম্বর লোকাল বাসও আছে বৈকি— তবে সে ধরতে হলে রিক্সায় যেতে হবে জি.টি.রোড আর নয়ত বালীর মোড়। রিক্সোয় চার-পাঁচ টাকার ধাক্কা। আর তাছাড়া গাঁটের পয়সা খরচ করে জি.টি রোড কী বালীর মোড় পৌঁছলেই যে হাতে-গরম বাস, মিনিবাস পাওয়া যাবে— তার গ্যারান্টি কোথায়? সেখানেও অপেক্ষা আর অপেক্ষা—

অপেক্ষা যদি করতেই হয় তবে সুরঞ্জন এই ব্যান্ডেল-নয়াসরাই মিনিবাসের স্ট্যান্ডেই করুক। তার সময় কাটতে না চায় যদি তো একটু পিছিয়ে টানেলের ভিতর গিয়ে পত্র পত্রিকার স্টলে দাঁড়িয়ে সে কাগজ দেখুক। মানুষ দেখুক সুরঞ্জন, মানুষ। কত বিচিত্র মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিকে-ওদিকে। টানেলের মুখে গাদা গাদা মানুষ ঢুকছে। পরক্ষণেই গাদা গাদা মানুষকে টানেল-ই উগরে দিচ্ছে।

সুরঞ্জন কাগজের স্টলে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কাগজের হেডলাইন পড়ল। ১৯৯২-এর ৬ই ডিসেম্বর সেই যে কলকাঠি নাড়া হয়েছিল তার জের এখনও কাগজের পাতায়' পাতায়। বলতে কি— 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে', এতটুকুও বদলায় নি। বরঞ্চ তলে তলে বেড়ে দাঁড়িয়েছে দ্বিগুণ তিনগুণ। আদার কারবারী সুরঞ্জন, জাহাজের কারবারে সে ভয় পায়। কাগজের স্টল থেকে সরে দাঁড়াল ফের টানেলের মুখটায়।

একটা বট গাছের তলাকে আশ্রয় করে রিক্সা স্ট্যান্ড। কমসে কম চল্লিশ-পঞ্চাশটা রিক্সোর উপস্থিতি। রিক্সোওয়ালারা রিক্সোর সিটে বসে গুলতানি মারছে। প্যাসেঞ্জার দেখলেই এক সঙ্গে জোড়া জোড়া হর্ন বাজিয়ে স্থানীয় লোকেদের কানে তালা ধরাচ্ছে। রিক্সো যত বেশি, প্যাসেঞ্জার ততই কম। জোড়ায় জোড়ায় যে-কজন টানেলের মুখ থেকে বেরোচ্ছে তাদের এক একজন একটা গলির ভিতরে ঢুকে টেনে আনছে স্কুটার বা মোটর সাইকেল। তারপর হেলমেট মাথায় দিয়ে দুজনে সংযুক্তা-পৃথ্বীরাজের মতই উড়ে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে বিদ্যুদ্বেগে। হর্ন বাজাতে বাজাতে কেমন চুপসে গিয়ে রিক্সোওয়ালারা সংযুক্তা ও পৃথ্বীরাজদের নিয়ে

নিজেদের ভিতর হাসাহাসি করছে। তাই দেখে সুরঞ্জনের মুহূর্তে মনে পড়ল এইরকমই নৈহাটি কী হালিশহর কিংবা গঙ্গার ধারে অন্য কোন মফঃস্বল শহরের রিক্সোস্ট্যান্ডের রিক্সোওয়ালাদের নিয়েই সমরেশ বসু একটা গল্প লিখেছিলেন 'মানুষরতন'। একটা বেওয়ারিশ মড়াকে নিয়ে হাসতে হাসতে মজা করতে করতে অবশেষে নিজেদের আত্মীয় মনে করে কেমন তারা সত্যিকারের কেঁদে ভাসিয়েছিল। আশ্চর্য।

সুরঞ্জন এবার এসে দাঁড়াল বাস স্ট্যান্ডের ফাঁকা জায়গাটায়। একধারে পাশাপাশি দু-দুটো পান-সিগারেটের দোকান। একটা পাবলিক ইউরিনাল। আরেক দিকে একটা যেমন তেমন ছাউনি দেওয়া চায়ের দোকান। কাঠের তক্তার উপর ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই বসবার সুব্যবস্থা। টী-স্টলের মালিক একজন অবাঙালি। খুব মোটা, মাথায় টাক— হাতে আবার একটা লোহার বালা। মৌরসি পাট্টা গেড়ে সে বসলেও জায়গাটা যে তার পৈতৃক নয়— হয় খাস আর নয়ত মিউনিসিপ্যালেটির কিংবা রেলের— দেখলেই বুঝা যায়। স্টলের চালের উপর অজস্র শুকনো পাতা, স্টলের দেয়ালে সাঁটা ফিল্মস্টার ধর্মেন্দ্রর ছবিসহ 'অসলি খৈতান'-এর বিজ্ঞাপন।

এখন ক্রেতাও নেই বিক্রেতাও নেই— হয়ত কোন কাজে একটুর জন্য দোকানদার উঠে গেছে অন্যত্র। বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থেকে থেকে পা ধরে গিয়েছিল সুরঞ্জনের। তাছাড়া শীতের রোদটাও খুব কড়া ছিল। রোদ থেকে মাথা বাঁচাতে, পা দুটোকে একটু জিরেন দিতে টি-স্টলের কাঠ বেঞ্চিতে অ্যাটাচিটা রেখে একটুক্ষণ বসেছিল সে। দোকানদার ফিরে এসে গদীতে বসতে বসতেই জিজ্ঞেস করল— চা হোবে?

চা খাওয়ার অভ্যাস নেই, মাথা নেড়ে সুরঞ্জন বলল— না।

— তব বাহার যাও।

বাইরে যেতে বলছে লোকটা? লোকটা পিশাচ না নরাধম? একটা খদ্দের নেই, কে জানে কখন থেকে কাঠবেঞ্চিগুলো খালিই পড়ে আছে, বসবার লোক পর্যন্ত নেই। আর ঐ তো তার চা-করা— কোলের উপর দুধের খালি ডেকচিটা নিয়ে ডানহাতের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে রগড়ে রগড়ে ডেকচির গায়ে লটকে থাকা দুধ-সুধ সরটুকুকে জড়ো করে তার উপর জল ঢেলে হাত ধুয়ে— সেই হাতধোয়া দুধ-জল দিয়েই সে চা বানাবে আর সেই চা লোকে দাম দিয়ে খাবে? সে-চা না খায় না খাক— তা বলে তাকে বিনি মাগনায় একটুক্ষণ বসতে দিলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? সুরঞ্জন ভাবল— আমাদের কফি হাউসে ওরকম শ'য়ে শ'য়ে লোক কফি না খেয়েও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। কই, কেউ তো তাদের বসতে বারণ করে না?

রাগ হল সুরঞ্জনের, ভয়ানক রাগ।

লোকটা রুটি খায় না? তার দরকার হয় না গমের? লোকটা ভাত খায় না? তণ্ডুল? তার দরকার হয় না চালের? চা-দোকান চালাবার জন্য এত চিনি-ই বা পায় কোত্থেকে? নিশ্চয় খোলা বাজারের বেশি দামের চিনি কিনে তার মত ব্যবসায়ীর পোষায় না? তবে? তারবেলা? হাতে না মারুক ভাতেই মারবে তাকে সুরঞ্জন। রেশন কার্ড এখানে থাকে যদি তো তার দেশেও আছে এই অজুহাতে সে বাতিল করবে। আর না থাকে যদি তো বাছাধনকে তার কাছে আসতেই হবে। ব্যান্ডেল এলাকা তো সুরঞ্জনেরই 'জুরিসডিক্‌সন্'। এক্ষুনি আইডেনটিটি কার্ডটা বের করে তাকে দেখাবে নাকি সুরঞ্জন?

হাসি পেল, মনে মনে খুব হাসল। এরকম আইডেনটিটির দরকার কী— যা সামান্য চায়ের দোকানীকেও দর্শাতে হয়?

পাশাপাশি দু-দুটো পান-সিগারেটের দোকান। তার একটায় একটা বড় মাপের আয়না। টানেলের মুখ থেকে যে সমস্ত সানি দেওল, সঞ্জয় দত্ত, সলমন মিঠুন-মার্কা যুবকরা বেরোচ্ছে বা ঢুকতে যাচ্ছে তারা দু-দণ্ড আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। ফিল্মি কায়দায় অঙ্গভঙ্গ করে দেখে নিচ্ছে— মাথার টেরিটা ঠিকঠাক থাকল কী না। পান বিড়ি সিগারেট খাচ্ছে, হিপ পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে পয়সা দিচ্ছে। তাদের হিপ-পকেট থেকে মানিব্যাগের সঙ্গে যৎসামান্য উঠে আসছে হাতলওয়ালা লাল চিরুনি।

সুরঞ্জনেরও ইচ্ছে হল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা একবার আচড়ে নেয়। হাওয়ায় জানলার ধারে বসা তার মাথার চুলগুলোও তো ঘেঁটে গিয়ে হাড্ডুল মাড্ডুল। এগিয়েও গিয়েছিল সুরঞ্জন কিন্তু মনে পড়তেই দু-পা পিছিয়ে এল— কে জানে দোকানদার হয়ত হুট করে বলে বসবে পান-সিগারেট-বিড়ি একটা কিছু না কিনলে আয়নায় মুখ দেখাটাও বারণ। সে বলতেই পারে, বলতেই পারে।

অতএব খাড়া রোদে ব্যথাতুর পায়ে মাথায় হাড্ডুল মাড্ডুল চুল নিয়ে ব্যান্ডেল-নয়াসরাই মিনিবাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকল ফুড অফিসার সুরঞ্জন। সে পান খায় না, বিড়ি খায় না— সিগারেটও না। যারা পান খায় বিড়ি খায় সিগারেট খায়— এ যাত্রায় তারাই ভাগ্যবান, আয়নায় মুখ দেখতে পাবে তারাই। সুরঞ্জনের দুর্ভাগ্য— সে চুল আঁচড়াতে পারল না আয়নায় মুখ দেখে।

সে না পারুক, আর কিছুক্ষণ পরেই বাস এসে গেলে বাসে উঠে সে-দুঃখ ভুলেও গেল সুরঞ্জন। ব্যান্ডেল-নয়াসরাই বাস চলেছে গঙ্গার ধার দিয়ে। বালীর মোড় থেকে বাস বাঁদিকে ঘুরে এখন ছুটে চলেছে সোজা। ভিতরে গাদাগাদি ভিড়, বেশির ভাগই লাল নেভি ব্লু রঙের ইউনিফর্ম পরা কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ছেলেমেয়েরা, আর তাদের দিদিমণিরা। তারা নিত্যযাত্রী, বাস-ড্রাইভার বাস কন্ডাক্টারের সঙ্গে তাদের টুকরো টুকরো ঠাট্টা-তামাশার মিশেল দেওয়া কথাবার্তায়— সে চিহ্ন স্পষ্ট। স্কুল-গার্ল স্কুল-বয়েজরা ড্রাইভার-কন্ডাক্টারকে বলছে 'কাকু' আর ড্রাইভার-কন্ডাক্টার তাদের সম্বোধন করছে 'বাপি' কিংবা 'মামনি' বলে। দিদিমনিরা তো সর্বজনীন দিদিমনি, সব কালে। তাদের একজনের নীলপাড় শাড়ির আঁচল সুরঞ্জনের নাকের ডগায় মাঝে মাঝে ছুঁয়ে যাচ্ছে। সুরঞ্জন অস্বস্তিতে নাক সরিয়ে জানালায় মুখ রেখে দেখছে— ব্যান্ডেল-চার্চের গায়ে বাঁশের ভারা বেঁধে মিস্তিরিরা দেওয়ালের পলেস্তরা খসিয়ে কেমন মার্বেল টালি বসাচ্ছে। রোদে-মার্বেলে ঝকঝক করছে ব্যান্ডেল চার্চ। চার্চের মাঠে গঙ্গার দিকে মুখ রেখে বসে আছে কতক যুবক-যবতী, কতক শিশু-কিশোর।

সাহাগঞ্জ মার্কেট, ডানলপ ঘাট পেরিয়ে ডানদিকে চোখ গেলে এখন শুধু গঙ্গা আর গঙ্গা। যেন বাসরাস্তার সমান্তরাল ছুটে চলেছে, বহে চলেছে। ওপারে সোদপুর, ব্যারাকপুর, টিটাগড়, শ্যামনগর, নৈহাটি, হালিশহর, কাঁচরাপাড়া, কল্যাণী, এপারে শ্রীরামপুর, হুগলী, চন্দননগর, ডানলপ, বাঁশবেড়িয়া,ত্রিবেণী টিসু। ওধারে জুটমিল, ইটের পাঁজা, চিমনির ধোঁয়া— গঙ্গার পাড়ে পাড়ে ইতস্ততঃ দৃশ্যও। এধারে দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরের আদলে তৈরি ছোট ছোট মন্দিরের পাশ দিয়ে সিঁড়ির ধাপ নেমে গেছে গঙ্গায়। কেউ কেউ সিঁড়ি বেয়ে স্নানের নিমিত্ত নিচে নামছে, কেউ কেউ স্নান সেরে উপরে উঠে আসছে। এদিকে বাস কন্ডাক্টার মুহুর্মুহু হেঁকে চলেছে— লাটবাগান, কাঁসারিপাড়া, ডানলপবাজার, ডানলপঘাট, শিবতলা, বকুলতলা, বেলতলা, মহাকালীতলা, ধোবাঘাট, নন্দেশ্বরী, খেলারমাঠ, স্বপনপুরী, হংসেশ্বরী—

গঙ্গায় এখানে চর জেগেছে, দু-ভাগ হয়েছে, দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে জলমতী গঙ্গা। চরের পলিমাটি ভেদ করে শূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সবুজ বসুমতী। সেখানে কত রকম ফসল ফলিয়েছে চাষীমানুষরা। ঘর বানিয়েছে মাথা গোঁজার— নুন-লঙ্কা-তেল হরেক মুদীমালের অপেক্ষায় এই মুহূর্তে পথ চেয়ে হয়ত বসে আছে চাষী মেয়েমানুষরা। এপারের সাহাগঞ্জ বাজার থেকে সওদা সেরে শালতি বেয়ে আধখানা গঙ্গার জল তোলপাড় করে তো ফিরছে মানুষটা। তার সঙ্গে একনৌকায় ফিরছে তার কুকুরটাও— বাসে বসে থেকেও সুরঞ্জন স্পষ্ট দেখতে পেল। বাঁশবেড়িয়ার পৌরপথ বড সংকীর্ণ পথ— মুখোমুখি দু-দুটো গাড়ি এসে পড়লে আর এগিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। তার উপর ভ্যান, রিক্সো, ট্রেকার তো আছেই। ট্রেকার— ট্রেকার হল একরকম প্রায় হুডখোলা সুবিশাল জীপ গাড়ি। তার পিছনে পাদানি, ডান-বাম, ভিতর-বাহির লোকে লোকারণ্য — কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে আর কেউ কেউ না দাঁড়িয়ে না-বসে, ত্রিশঙ্কু! সে-ট্রেকার হোক, বাস হোক, মিনিবাস হোক এক সঙ্গে মুখোমুখি এসে পড়লে না-পিছিয়ে এগিয়ে যাবার উপায় নেই। পিছোতে পিছোতে কোন গৃহস্থের গেট সংলগ্ন ফাঁকা জায়গাটায় অথবা কোন গলিরাস্তার মুখে একপক্ষ একটুখানি পিছন ঠেকিয়ে কোনমতে কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, অপরপক্ষ তৎক্ষণে গোঁ গোঁ করে এগিয়ে যায়। মাঝের বিরতির সময়টুকু সুরঞ্জন জানলায় মুখ বাড়িয়ে দেখছিল— বাঁশবেড়িয়া সাব-এরিয়ার এ.আর. শপে রেশনের জন্য লম্বা কিউ পড়েছে আর নয়ত কেরোসিনের দোকানে টিন-বোতল হ্যারিকেন-ইটের টুকরো দিয়ে লাইন রাখার সুব্যবস্থা হয়েছে। এসময় মনে মনে একবার ঝালিয়েও নেয় বৈকি সুরঞ্জন এ সপ্তাহের 'স্কেলটা'— বয়েলড্ রাইস ১ কেজি, র'রাইস সাড়ে সাতশ গ্রাম, হুইট ১ কেজি, লেভি-সুগার ১০০ গ্রাম, পি.ডি আইটেমস্ অ্যাজ ইউজুয়্যাল, আটা ৫০০ গ্রাম, পাউচ্—

হংসেশ্বরীর মোড়ে সুরঞ্জন নেমে এল। বাস চলে গেলেও, একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সে। সামনে বাঁশবেড়িয়া হংসেশ্বরী রোড, পিছনে যাত্রী বিশ্রামাগার। যাত্রীদের প্রতীক্ষালয়। দু-চারজন যাত্রী বাঁধানো পৈঠার উপর ব্যান্ডেল কী মগরা কী পাণ্ডুয়া যাবার বাসের জন্য বসে আছে। তারা যেমন বসে আছে বসে আছে, তাদেরই গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে সার সার সাইকেল বিশ্রামাগারের মেঝেয় রেখে গল্পগুজবে মত্ত পাড়ার ছেলে ছোকরারা। তাদেরও ওধারে একটার পর একটা বাঁধানো সিঁড়ির ধাপ নেমে গেছে গঙ্গায়। গঙ্গা, গঙ্গা আর গঙ্গা। কোদাল-কাটা মেঘের মত এখন তার জলের উপরিতল। একেকটা বরফির উপর সূর্যের রোদ পড়ে ইলিশমাছের আঁশের মত ঝলকাচ্ছে। একটা ঝাঁকড়া মহীরূহ তার ডালপালা সমেত যেন মাথা নত করে আছে গঙ্গায়। পাশে দণ্ডায়মান সার সার রিক্সোওয়ালার 'পোঁক' 'পোঁক' হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিকে উপেক্ষা করে মনে মনে সুরঞ্জনও গড় করল— দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে—

হংসেশ্বরী রোড ধরে হংসেশ্বরী মন্দিরের দিকে একটু এগিয়ে গেলেই সুরঞ্জনের অফিস। রিক্সোয় নয়, পায়ে হেঁটেই এগিয়ে গেল সুরঞ্জন। কিছুদূর গিয়ে ইঁট-বাঁধানো রাস্তার বাঁয়ে ঘুরল সে। এ-পথেই বাঁশবেড়িয়া কিংবা আদিসপ্তগ্রাম রেল-স্টেশনে যাওয়া যায়। অতদূর যেতে হল না— তার আগেই মিনিট পাঁচেকের মধ্যে অফিসে পৌঁছে গেল সে। ঢোকার মুখটায় সামান্য কিছু লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। তারা সরে গিয়ে রাস্তা করে দিল সুরঞ্জনকে। তাদের দুয়েকজন হাত তুলে নমস্কারও করল— হাত তুলে প্রতিনমস্কার করতে সুরঞ্জনও ভুলল না।

নিজের অফিসঘরে বসতে না বসতেই আর্দালী এসে বলল— আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে চায় স্যার— এক জন মেয়েলোক।

স্টাফেদের হাজিরা খাতায় চোখ বুলোতে বুলোতে সুরঞ্জন বলল— আসতে বলুন।

বোধহয় চৌকাঠের ওধারেই দাঁড়িয়েছিল সাক্ষাৎপ্রার্থিনী, আর্দালীর ইসারা পাওয়ামাত্র ছেলের হাত ধরে হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়ল। ভিতরে ঢুকেই অপরাধীর মত এককোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তার ছেলেটি কিন্তু অকুতোভয়। মুখে হাডু-ডু খেলার মত বিড় বিড় করে কী বলতে বলতে অফিস ঘরময় ছোটাছুটি করছে। একবার সুরঞ্জনের চেয়ারের পিছনটায়ও ঘুরে গেল ছেলেটা।

হাজিরা বই থেকে চোখ তুলে সুরঞ্জন দেখল— অল্পবয়সী একজন গৃহবধূ, শাড়ি-সেমিজ পরিহিতা। মুখ-চোখ ধারালো, তবু শাড়ির খাঁজে খাঁজে জড়তা। তাকে চেয়ারে বসতে বলেছিল সুরঞ্জন, বধূটি বসেনি। কোনকিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সুরঞ্জন বুঝেছিল— রেশন কার্ড! মেয়েটি রেশন কার্ডই চাইবে, আর সে নির্ঘাত বাঙলাদেশী, সদ্য এসেছে ওপার থেকে! আইন মোতাবেক উনিশ শ একাত্তর সালের আগে এলেই ল্যাঠা চুকে যেত, একাত্তর সালের আগে আগে আসা ওদেশীদের কার্ড দিতে মূলতঃ কোন বাধা নেই।

— সাহেবকে সবকিছু খুলে বলুন।

বলেই আর্দালী তার টুলে গিয়ে বসল। সুরঞ্জনও বলল— হ্যাঁ, বলুন—

মেয়েটি ধীরে ধীরে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে যা বলল শুনে তো স্তম্ভিত হয়ে গেল সুরঞ্জন! তার অফিস করেছে কী! বধূটি আসমাবিবি, তার আব্বার নাম আলিকজান, জাতে সে মুসলমান। সে বিয়ে করেছে মগরার বৈকুণ্ঠপুরের লালমোহন দাসকে। লালমোহন হিন্দু। একজন মুসলমান মেয়ে একজন হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করেছে— বিয়েটা বৈধ কী না ধুয়ো তুলেছে অফিস, তারা ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের সার্টিফিকেট চায়।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল আসমাবিবি, তার হাতে ধরা বাপের বাড়ির দু'বছরেব পুরোনো ও বাতিল রেশন কার্ডটা। তাই দেখিয়ে সে বলল— আমার আব্বার কাছে আমার নামে 'কার্ট' ছিল কিন্তু আমাদের বিয়ে তো হয়েছে এমনি-এমনি, 'রেজিস্টালি' করে তো হয়ইনি— সাট্টিফিকেট পাব কোথায়? আব্বাজান আমার 'কার্টটাও' দিয়ে দিয়েছে— এই দেখুন ভাইজান!

স্যার নয়, সাহেবও নয়, সুরঞ্জনকে ভাই বলল আসমা! কার্ডটা হাতে নিল সুরঞ্জন, সেই সঙ্গে আরেকটা 'রোলকরা' কাগজ। খুলে দেখল— লালমোহন দাসও চুপচাপ বসে নেই, ইতিমধ্যে ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের সার্টিফিকেট জোগাড় করতে না পেরে সে দাখিল করেছে 'এফিডেভিট'। এফিডেভিট পড়েও দেখল না সুরঞ্জন, তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠাল অফিসের মুখ্যপরিদর্শককে।

— করেছেন কী মশাই? কোন্ ম্যারেজ অ্যাক্ট-এ বলা আছে মুসলমান হিন্দুকে বিয়ে করবে না? হিন্দু খ্রীষ্টানকে? তাছাড়া দেশে এখন যে রকম পরিস্থিতি— রীতিমত অপ্রস্তুত সি.আই.সাহেব তদন্ত-রিপোর্টটা মেলে ধরে দেখায় সুরঞ্জনকে— সেখানে স্পষ্ট লেখা K P। কে.পি. অর্থাৎ 'কীপ পেন্ডিং'। অফিসার-ই মূলতুবি রেখেছেন। মূলতুবি, মূলতুবি! সুরঞ্জন মনে মনে বলল— সেই কবে বিয়ে হয়ে গেছ আসমাবহিনের, সেই কবে থেকে সে মগরার বৈকুণ্ঠপুরে লালমোহন দাসের উঠোনের তুলসি চৌরায় গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রদীপ জ্বেলে শাঁখ বাজিয়ে সন্ধ্যাধূপ দিয়ে আসছে, আব্বা আলিকজান সেই কবে তার

আসমানতারাকে সওগত পাঠিয়েছে আসমা নামাঙ্কিত পুরোনো ও বাতিল রেশন কার্ডটা! সবাই সবকিছু করে দিয়েছে আগে ভাগে, সময়মত— আমরাই কেবল এখনও মূলতুবি রেখেছি, K P -- 'কিপ পেন্ডিং টিল দ্য প্রোডাক্সন অব্ ম্যারেজ-সার্টিফিকেট—'

সুরঞ্জন ঘস্‌ঘস করে মুহূর্তেই লিখে দিল ইস্যু-অর্ডার। প্লিজ ইস্যু আর. সি. ফর ওয়ান প্লাস ওয়ান। একটা কার্ড আসমাবিবির, আরেকটা তার ছেলের। খুশি হয়ে চীফ-ইনস্‌পেক্টারও ডেকে নিয়ে গেল আসমাকে, কার্ডগুলো লিখে আজই ডেলিভারি দেবে তাকে। আসমাবিবির অকুতোভয় ছেলেটা সুরঞ্জনের টেবিলে ফোন নিয়ে এতক্ষণ নাড়ানাড়ি খেলছিল, মায়ের ডাকে সে-ও চলে গেল। যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতে বুকের আঁচলটা টেনে ধরে ডানহাতের আঙুলগুলো ভাঁজ ও গভীর করে সামান্য উপরে তুলে মাথা ঝাঁকিয়ে আসমাবিবি বলল—আদাব!

মাথা নত করে সুরঞ্জনও বলল—আদাব।

অফিস ফেরত সুরঞ্জন আবার দাঁড়াল হংসেশ্বরী মোড়ে, যাত্রী 'প্রতীক্ষালয়ে'। ব্যান্ডেল নয়াসরাই মিনিবাসেই উঠবে সে। বাস রাস্তার প্রায় সমান্তরাল ফাঁকে ফাঁকে আবার দেখা যাবে গঙ্গা।

গঙ্গা, গঙ্গা।

বাস কন্ডাক্টর আবার হাঁকবে ধোবিঘাট, খেলার মাঠ, মহাকালীতলা, বেলতলা, বকুলতলা, ডানলপঘাট কাঁসারিপাড়া—। সুরঞ্জন আর কোন কিছুই দেখবে না, শুনবে না। সে শুধু সারা রাস্তা উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকবে একটা নামের জন্য— বৈকুণ্ঠপুর। বৈকুণ্ঠপুর, বৈকুণ্ঠপুর।

শুধু আজ বলে নয়। কাল। পরশু। দিনের পর দিন।

মাঠ খসড়া

আবুল বাশার

।। এক ।।

শাহাদত এক প্রখর মানুষ। মার্কসবাদী দলের জি বি নেতা কুশাল ঘরামীর সামনে মেঝেয় পায়ের কাছে পোষা ঘর-পালা জন্তুর ভক্তদেহের মত শাহাদতের দেহ জড়ো করা, পাকানো গোটানো কাতুরে কুণ্ডলি, দু'হাতে হাঁটু বেষ্টনী, হাঁটুর জোড়ে একনরি দাড়ির থুতনি রাখা, গায়ে ঘোড়ামুতের মতন হলদেটে লাল তুষের চাদর, চাদরের তলায় তুলোতুলো বেনিয়ান, ময়লা জ্যাকেট, পায়ে টায়ারের মাখন চটি, পায়ের কাছে আপাতত খুলে রাখা, কপালে সিজদার ধুলোট-সিটে মাথায় কাঁধ-অব্দি ঝুলন্ত ছাঁটা বাবরির উপর গোল টুপি, পরনে মারকিন কাপড়ের কস্তা ধোলাইহীন ধুতির কাপড়কে কেটে সেলাই করা দু'খানা লুঙ্গির একখানা পরেছে। চোখ ভয়ানক শুদ্ধ সাফ জলের মতন স্ফটিক, কিন্তু কেমন চোরা স্বার্থে ধারালো, দৃষ্টি তীব্র। লোকটা এসেছে কুশালের বউয়ের হাতে কাঁসার বে-গড়ন মোটা বেঢপ গেলাসে চা খেতে। রোজই আসে। ভোরের ফজর নামাজ শেষে ঝুঝকি কাক-ভোরে রোজই চা খেতে আসা তার একধারা পলিটিক্স। আ-গড়া কাঁসার গেলাসে চায়ের চুমকুড়িতেই রয়েছে নিয়ম-মাপা কমরেডগিরির আশ্বাস। লোকটি একজন মার্কসবাদী খতিব। পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। তার বিরাট গুষ্টির সকলেই নামাজী কমরেড। খতিবের মন্ত্র-বশা। যা বোঝায় তাই বোঝে, যা করায় তাই করে, আজ দুই দশক যাবত কাস্তে হাতুড়ি তারায় ভোটের ছাপ মারছে পটাপট, আঙুলে ভোটের কালির দাগ এক হপ্তা লেগে থাকে। মাটি কাটা ডোল পায় তারা, আরো কত কী পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেই কত কী যে আসলে কতখানি সবই তা বোঝার নয়। যেমন ভাগজোত, পাট্টা, এ-গুলো দুর্বোধ্য নয়। জমি জিনিসটা কত কী বৈকি! গরিবের কাছে বেহেস্ত পাওয়ার মতন রোমাঞ্চকর। খতিব এইসব ব্যাপারে ভয়ানক ভাল বক্তা। ধর্মের সাথে মার্কসবাদ মিশিয়ে গোল গোল করে সুরেলা ধ্যানে বলে যায় যেন মোয়া মোয়া লাগে সেইসব বৈঠকি বয়ান। সকাল বেলার এক গেলাস কাঁসার চা সেই দলীয় মুহব্বতের উপহার। গেলাসে পট্টি-লাগানো ছিদ্র ঢাকা। সেই চিহ্ন দেখে খতিব বোঝে প্রত্যহ একই পাত্র তার জন্য, অর্থাৎ তার মতন মুসলমানের জন্য নির্দিষ্ট। কুশাল ঘরামী মার্কসবাদী হিন্দু। কুশালের ঘরামী টাইটেল কেন সেই গল্পটাও খুব মুখরোচক। যা হোক, চা খেতে রোজই আসে শাহাদত খতিব। না এসে পারে না। কারণ সেটা তার পলিটিক্স। এ না করলে তার গুষ্টি বাঁচবে না। এ সবই তার জীবন সত্যের অন্তর্দৃষ্টি, গোপন বোঝাপড়া সবখানিই যে কোন একটা রহস্যময় চালাকি এমন ভাববার কোন কারণ নেই তা' বলে। খতিবেরও একটা নিজস্ব সবকিছুর বিচার আছে। যেমন ধর্ম ও মার্কসবাদ সম্পর্কে তার দৃষ্টির গড়ন গবেষণামূলক। সিধে। স্বচ্ছ। মরমী। সেইসব কথা কুশালকেও বোঝানোর চেষ্টা করে খতিব। রোজই চায়ের সংগে তত্ত্বচর্চা হয়। তার খানিকটা উদাহরণ আমরা নিচে তুলে দিচ্ছি।

কুণালের বউ সরমা খতিবের গুটানো পায়ের কাছে বাষ্পময় কাঁসার গেলাস রাখল প্রায় নিঃশব্দে। খতিব হাঁটু থেকে থুতনি ওঠালো। একটু চমকালো মাত্র। তারপর হাত বাড়ালো গেলাসের দিকে। শুধালো চায়ে পিপল দিয়েছে কিনা। পিপলের কেজি ষাট টাকা। পিপলের চা কফের ওষুধ। সরমা জানালো পিপল ফুরিয়ে গেছে, খতিব যেন হুদো থেকে পিপল এনে দেয়। হুদোর মসজিদের চারপাশে পিপল গাছে প্রচুর ফল ধরে। সেই মসজিদে মাসকাবারী বেতনে খতিব খুৎবা (ধর্মের উপদেশমূলক বক্তৃতা) পড়ায়। ফলে বিনে পয়সায় পিপল আনতে পারে। পিপলের চায়ে যে কী চমৎকার হেকিমী আছে সে কথা কুণালকে যুৎমতন বুঝিয়েছে খতিব। খতিবকে বুঝিয়েছিলেন বেলডাঙ্গার 'কারী' মুহম্মদ শা গোরপুরী, খতিবের ওস্তাদজী। গোরপুরীর কাছে খতিব কেরাত শিখেছে ছেলেবেলায়। কেরাত হল কোরানের আয়াত গলায় নির্দিষ্ট সুরে ও উচ্চারণে সাধা. সেই শিক্ষার অধিকারীকে 'কারী' বলা হয়। তিনিই পিপল চায়ের গুণ অগুণ বুঝিয়েছিলেন।গলা সাধলেই কারী হওয়া যায় এমন ধারণা যান্ত্রিক। যেমন, 'যান্ত্রিক-মার্কসবাদ' কথাটা কুণাল খতিবকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে, খতিবও বুঝিয়েছে 'কারী' হতে গেলে কেমন নম্র সহজিয়া মধুর স্বভাব চরিত্র সাধতে হয়। মার্কসবাদ আর ইসলামের একটা তুলনামূলক চর্চা না করলে সকালটা বাসি বাসি লাগে।

কুণাল আজও পুরনো গল্পটা আবার বলে। মাঝে মাঝেই বলে। কারণ এমন গল্পটা পুনরাবৃত্তি না করলে কুণালের ঠিক সোয়াস্তি হয় না। খতিবকে আপন করার গল্প সেটা, সেই গল্পের সংগে দেশ মাটি আর জীবনের একটা গূঢ় সম্বন্ধ আছে বলে কুণাল খতিবকে 'কন্‌ভিন্স' করতে চায়। খতিব চা খেতে খেতে গেলাসের পট্টি লক্ষ্য করে ভাবে কুণালের গল্পটা সত্যিই খুব সেয়ানা আর মধুর। মুসলমানের দোষলাগা গেলাসের চা তখন বেশ রম্য আর উপাদেয় ঠেকে। খতিব ভাবে, মুসলমান চিরকালই নির্বোধ। তা, সেটা হল মকর ক্রান্তি স্নানের ঘটনা।

কুণাল বলল— বিধবা পিসির ছুঁৎমার্গী ঘটনার কথা আগেও বলেছি, তুমি এলেই বউকে ঘটনাটা শোনাতে ইচ্ছে করে শাহাদত। কেমন করে বুঝলে খতিব, সরমারও ছুঁচিবাই বড় আদেখলে গোছের, ও কখনও নিজেকে কারেকশন করল না। অথচ সরমা তোমাকে সত্যিই ভালবাসে। ভালবাসা জিনিসটা বাস্তবিক অবুঝ, সেটা কোন লজিক মানে না। যেমন পিসির বেলা মোকাজুদ্দির ঘটনায় আমরা দেখেছি।

সে-ঘটনা আর শুনতে ইচ্ছে হয় না খতিবের। খতিব আজ একটু অন্য দরকারে এসেছে। শুধু চা নয়। আজ দৌলতডিহির প্রাইমারির মাঠে তাঁবু পড়ল কিনা মাঠখসড়ার, সেটাই তার এখনকার আদি খবর শোনবার জন্য আসা। গল্প শোনার আগ্রহ তাব নেই। খতিব শুধালো— গল্প তো রোজই হয় কমরেড। আজ কাজের কথা হোক কিছু। আজ কি তাঁবু পড়বে?

কুণাল বলল— পড়বে পড়বে তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? জমি তোমাব পালাচ্ছে না, জোতে যখন বেঁধেছ, তাছাড়া মাহেলা বেওয়ার সাধ্য কি তোমাকে ঠেকায়। লাঙ্গল যার জমি তার— সোজা ফরমুলা, ইজি সলভেশন। মার্কসবাদের নীতি কোথাও কোথাও খুব কঠোর শাহাদত। জানমাল সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে নবীর নীতিও খুব কড়া ছিল। তুমি তো সেইসব গল্প করেছ।

খতিব বলল— করেছি ঘরামি। কিন্তু জোত আমার, সম্পত্তি তো আমার নয়।

— আহা! সম্পত্তি তো মাহেলারই থাকছে. তুমি কি ছিনিয়ে নিচ্ছ নাকি? ভাগজোতের দখলীস্বত্ব কোন মালিকানার স্বত্ব নয়। চাষ আবাদের অধিকার। মাহেলা যাতে অন্যকে

চাষ খোঁড় করতে না দিতে পারে। এ'হল গরিবের দাবিদারী, বুঝলে? গরিবকে নবী ভালবাসতেন তুমিই বলেছ।

কুণাল খতিবের চায়ের বাষ্পে চোখ রেখে বলে ওঠে। গলায় চেপে থাকা চাদর খানিকটা আল্‌গা করে দেয়, যেন ভাল করে দম নিয়ে খতিবকে আরো কথা বোঝাতে চায়। কুণাল বলল— দ্যাখো খতিব, জমির রস দেহে না ঢুকলে, উপরস্বত্বভোগী জমিদারের জমির রস কাঙালের দেহে না ঢুকলে অশিক্ষিত লাঙ্গল-অলা প্রান্তিক ভূমিদার মার্কসবাদ ঠিক বুঝতে পারে না। ভাসা ভাসা কথায় তো দুনিয়া জয় করা যায় না, রসেবশে বুঝতে হয়। নাও, চা খাও। গল্পটা বলি। ওগো শুনছ, তুমিও এসো। বউকে গলা তুলে ডাক দেয় কুণাল ঘরামী, জি বি-র নেতা। (জি বি জেনারেল বডি)। খতিব কেমন বিপন্ন গলায় বলে— মাহেলা বেওয়া জমিদার নয় ঘরামী। ওর মাত্র তেরো কাঠা মাটি।

— আহা! তাতে কি হয়েছে! মাহেলা তো তোমার মতন গরুর পাছার সাথে দিনরাত কথা বলতে পারবে না। এই মেহনতের দাম নেই?

খতিব এ'সময় আর কথা বলতে পারে না। এই ফাঁকে কুণাল তার গল্পটা বলে যায়। বলে— মোকাজুদ্দি তাগড়া জোয়ান, ওর পুজো দেখা আর গঙ্গাস্নান দেখার নেশা ছিল চমৎকার। বাইশ প্রতিমার মণ্ডপে সাজগোজ করে সিগারেট ফুঁকত পিসির পয়সায়, পিসিকে নিয়ে গঙ্গাস্নানে যেত। সেবার পিসি বাতের চাপে মকরক্রান্তির স্নানে যেতে পারলনা, বাসেও খুব ভিড় উপচে পড়ে, অত কোমরের শক্তি নাই। পিসি মোকাজুদ্দিকে পেতলের বড় ঘটখানা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, গঙ্গা জল আনবি। আগে ভাল করে চান করে নিবি, তারপর জল ভরবি। সাবধানে আনবি, কোন মুসলমানের ছোঁয়া লাগাস না। কথাটা মনে থাকবে তো!

চায়ে শেষ চুমুক দেবার আগে কাঁসার তালির দিকে আর একবার ভাল করে চেয়ে দেখে খতিব। এখন তার কাছে মার্কসবাদের সংগে ধর্মের মিশেল দেওয়ার বয়ান আর যুৎসই লাগে না। খতিব বলে মনে মনে। অনেক হিন্দুই অমন একটা চালু গল্প মুসলমানকে শোনায়। কথাটা হল মোকাজুদ্দি আসলে বোকাজুদ্দি। ঘাড় নেড়ে বলল সে মুসলমানের ছায়াও ফেলতে দেবে না ঘটের গায়ে। বলবেই তো। ও কি আর পিসির ফুসলানিতে মজে গিয়ে আস্ত মুসলমান ছিল। আবর লোক। পুজো আর গঙ্গাচানের শোভা দেখে বেড়ায়। আর পিসিও সেই আবর হিন্দু, ঘরে মুসলমান পুষে বাইবে হামলায়। কথাটা চালু গল্প, খতিব অনেক শুনেছে। তা পিসির মনটা ছিল খুবই সিধে আর নোংরা। একথা বউকে হরদম শুনিয়েও ঘরামী সরমাকে নোংরাই রেখে দিল, সিধে করতে পারল না।

কুণাল বলে— আমরা ঘরামী নই খতিব। আমরা মুখুজ্জ্যে। কিন্তু ঠাকুদ্দা ভাল ঘর ছাইতেন বলে দেশের লোক তাঁকে ঘরামী বলত, সেই পদবীটা আমি নিয়েছি কেন জানো, মার্কসবাদ ছোটজাতকে স্নেহ করে। তোমাকেও আমি খুব স্নেহ করি খতিব। খতিব পায়ের কাছে অশুচি গেলাস সাবধানে রাখল। চা নিংড়ে খেয়েছে। বলল— মাহেলা গোবর-চাপড়ি আর ঘুঁটে বেচে। বাবুদের চিঁড়ের ঢেঁকি পাড়ে। তেরো কাঠার তিন কাঠায় তার ঘর আর কুমড়ো লাউয়ের মাচান, মুরগির খাঁচা, ছাগলের ঘর আর খুরপি-চাষের পুনকাপালং টম্যাটোর আবাদী, গড় আলু, রাঙাপাটি আলুর ওলের, মানের ঝাড়। বাকি দশ কাঠায় আমি জোত করি, রোজই চোখে চোখ পড়ে, খোশ গল্প করি, মই মারি, লাঙ্গল ঠেলি, নিড়ুনি দিই। এমন করে যে তাঁবু পড়ছে বেধবা সেকথা কি জানে?

কুণাল বলল— পিসি কখনও খেয়ালই করেনি, মেকাজুদ্দি আসলে লোকটা কে, এই নির্দোষ হিন্দুত্বও ঘটের জলে বাঁধা রইল, শাহাদত মুক্তি পেল না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুণাল ঘরামী। বলে— ধর্মই মানুষকে, গরিবকে এক হতে দেয় না শাহাদত। ভারি কষ্ট হয়।

শাহাদত মনে মনে বলল, আমার নবীর ধর্মই তো গরিবের ধর্ম কুণাল। আমার গুষ্টি তো আমার পার্টিকেই আজ বিশ বছর ভোট দিয়ে আসছে। আমার কারী আমাকে বলতেন, খাঁটি মোমিন হতে পারে গরিবরা। তাদের পক্ষে খাঁটি মুসলমান হওয়া সহজ। নবী হলেন গরিবগোত্র। নবীর একটা সুন্দর উপমার কথা তোমাকে বলেছি, সেইজন্যেই তোমার দলে আসা। নবীর দল আর তোমার দল তো আলাদা নয়। নবী বলতেন গরিব হও, গরিবের হও। নদী যেমন সমুদ্রে পাগল হয়ে দৌড়ায়, খাঁটি মুসলমান গরিবী হালতের পানে তেমনি দৌড়ায়। নবী বলতেন, আমাকে পাওয়ার শর্টকাট রাস্তা হল গরিবী। টাকা-অলা লোকের খাঁটি মুসলমান হওযার বাধা বিস্তর। ধন-সম্পদ বাধা। পয়সাঅলা বড়লোকের বেলা, রোজকেয়ামতে, বিচারের দিন চল্লিশ বছর লাইন দিয়ে অপেক্ষা করতে হবে টাটা বিড়লাকে। বিচারই করবেন না খুদা। প্রথমে ডাকবেন গরিবকে। .... খোদিজা ছিলেন বিধবা। সেই বিধবাই প্রথম মুসলমান হন। এক নম্বর মুসলমান। মুসলমান হওয়ার প্রথম শর্ত ছিল, সব ত্যাগ করে নিঃস্ব কাঙাল হয়ে এসো। খোদিজা, তাঁর সব ধন-সম্পদ গরিবকে বিলিয়ে দিয়ে মুসলমান হয়েছিলেন। বড়লোকের পথ তো খুবই ঘুর-পথ কুণাল। শর্টকাট নাই। তোমরাও বল গরিবের দল। শুনেছি মার্কস সাহেবের তেরো কাঠা জমিও ছিল না। গায়ের কোট বেচে মরা ছেলের কাফন (আসলে কথাটা কফিন) জোগাড় করেছিল। সেই জন্যে তো তোমার দলে এসেছি কুণাল। তবু কেন পর পর লাগে। মাহেলা আজও তেরো কাঠার গরমে বড়লোকের দল করে বেড়ায়। বড়লোকরা পাত্তা দেয় না। নবী বলতেন, বড়লোকের পাপ সাফা করার রুমাল হল গরিবরা। সেই গরিবই তোমার দলের পাপ মুছে ফেলতে গিয়ে পাপী হবে, এমন তো ভাবিনি কুণাল!

ভাবতে ভাবতে শাহাদতের মর্মমূল কাঁপে, গা কাঁপে। সে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায়। বলে— আমিও খুব মুসলমান কুণাল, পিসির দোষ নাই। চলি।

বাইরে বেরিয়ে আসে খতিব। কানে আসে স্বামী-স্ত্রীর কথার দাহ ও ফুলকি। কুণাল বলছে— কতদিন তোমায় বলেছি, ঐ গেলাসে চা দিও না। খতিব একজন ইম্পর্টান্ট কমরেড। বউ বলে— আমি যা খতিবকে দিই, তা অন্য নেতার বউরা কি দেয়? চা কিন্তু মাগনা হয় না। সেটাই খুব। তারপরে মুসলমানকে ঠাকুর-ঘরের গেলাসে চা দেব নাকি! মার্কসবাদ করলে এমন ভীমরতি হয় আমার জানা ছিল না। দশ কাঠা জমি পাইয়ে দিচ্ছ, তাতেও কি মানুষ বশ হয় না। নিজের জাত মেরে আমি মার্কসবাদ করতে পারব না। এই তোমায় বলে রাখলাম। জমিজিরেতের লড়াইতে ঘট, গঙ্গাস্নান এসব আসে কেন? খতিব যে মাহেলার জমি নিতে চাইছে না, তা ঐ ধম্মের হেতু, জেনে রেখো, খতিবের ধম্ম আছে। কুণাল ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার করে ওঠে—তোমার এই ধম্মই আমার ফিল্ড নষ্ট করে দেবে সরমা। গরিবকে এক হতে দেবে না।

— আর জমি?

— জমি?

— জমিও কি এক হতে দিচ্ছে? তোমার এই উঠোন-চষা রাজনীতির মুখে ঝাঁটা মারার লোক নেই। ছিঃ!

বউ গজরাতে গজরাতে সরে যায়। কুণালও যায়। শাহাদত দৌলতডিহির তাঁবুতে যায় না। যায় মাহেলার কাছে। শাহাদতের ছেলে যায় দৌলতডিহির প্রাইমারী স্কুলে। ভাগজোতের দখল পায় খতিব। ধর্ম আর রাজনীতির এইভাবে গলাগলি হয়। গাঁয়ে

ভাগজোতের ঢোল সহরত দ্রিমিদ্রিমি ডমডম বেজে ওঠে। চাউরায়। খতিব মাহেলাকে গিয়ে বলল— ঝান্‌কা বলদটার মুখে দু'ফোঁটা ওষুধ দিবি মাহেলা? তোর মরদের ওষুধ তো জানিস? লোককে দিস্‌। আমাকে দে। আসছে হপ্তায় তোর জমিনে চাষ ফেলব। এই জাড়ে গরু আমার পা ঝান্‌কায়, আলিস্যি করে। দে একটুকুন গরম ওষুধ।

মাহেলা কান খাড়া করে শোনে রবি মুচি ঢোলে কাঠি নাড়ছে ঃ

গতর যার জমি তার।
মাহেলা সাদাত মাগ ভাতার।।
ডম ডম ডডম ডম।
ডডম ডম ডডম ডম।।

দুই

খতিবের ধম্ম আছে। কথাটা সহসা মারাত্মক উদ্বেলতায় শাহাদতের মর্মে বিঁধে যায়। সেইদিন থেকে সারা দিনরাত্রি সমস্তক্ষণ কথাটা তাকে পেঁচিয়ে ধরে। মুখের পাতলা মিহিন লম্বা দাড়ি হাতের মুঠোয় চেপে ধরলেই একটা দৃশ্য তৈরি হয় মনের উঠোনে। নিজেকে সে ওই অবস্থায় মাহেলার উঠোনে বসে থাকতে দেখে। মনের উঠোন আর মাহেলার উঠোন একাকার হয়ে যায়। ইয়া তৌবা! হায় খুদা।

মনে মনে বিড়বিড় করে শাহাদত। পায়ে পায়ে খুব ভেবে ফজরের নামাজ পড়ে খতিব। মাহেলার বাড়ির দিকে রওনা দেয়। পৃথিবীতে তখন নূরের হাওয়া বয়। বাতাসে লেগে থাকে ফেরেস্তার নিঃশ্বাসের গন্ধ। তখন শাহাদত কারীর মোলায়েম স্বাদু কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। মনে পড়ে এইধারা ভোরে বেলডাঙ্গার পথে একলা হেঁটে গেছে শাহাদত। গেরস্তর বাড়ি দিয়ে উঠোনের এক কোণে সালাম দিয়ে দাঁড়াত। গেরস্ত উঠে নেমে আসত সালাম দিতে। তাকে দেখে ক্ষীণ ভদ্র হাসি হেসে শুধাত

— আজ আমার এখানে খাবে নাকি বাপজী?

— জী! আজ আপনার বাড়ি জিয়াফত আমার! জিয়াফত কবুল করেন চাচা। বলতে গিয়ে কিশোর শাহাদতের গলা ভিজে বুঁজে আসতে চাইত। এইভাবে প্রতিদিন তাকে জিয়াফত (নিমন্ত্রণ) আদায় করে নেবার জন্য ভোরে উঠেই তৈরী হতে হত। বুঝত না, ভিখিরির চেয়ে অধম কিনা একজন তানবিলিম (তালেবুল এলেম শিক্ষার্থী)। কেমন তার মনে মনে অকারণ কান্না পেয়ে যেত। বুঝে উঠতে পারত না, এই জীবনের কোথাও কোন গ্লানি আছে কিনা, বা মর্যাদাই বা কিসে! খাওয়া দাওয়ার পর দু'এক পারা কোরান মুখস্থ শোনাত কারীর ঢঙে, গেরস্তের জন্য দোয়া করত। সেই সময় সে সাদা কলিদার লুঙ্গি আর অনুক্ষণ মাথায় টুপি-পরা বালক। মুখে কখনও ক্ষুর ছোঁয়ায়নি, এমনই সাফ মুসলমান।

মনে পড়ে জুব্বার মুন্সীর জিয়াফতের কথা। জুব্বার মুন্সীর বউ ছিল ভয়ানক নাদুস আর ঢিলে মহিলা, হাত-পা চালিয়ে ভাল মতন গেরস্তি চালাতে পারত না। গা ঢিলে, হাত পা থলথলে। থপ্‌থপ্‌ হাঁটা চলা। দড়ি টেনে কুয়োর জল তোলাতেও ছিল ভীষণ আলিস্যি। পুকুরের জলে ভাত রাঁধত। সেই পুকুরের এক কোণে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিল একটা ঝাঁকড়া গাব-গাছ আর মিঠেকুমড়োর গাছ। সেই গাছে এক ঝাঁক পায়রা আর বাদুড় বাসা বেঁধে ছিল, পুকুরের জলে ওরা পায়খানা করত। সেই জলের ফুটানো ভাত খেতে হত। একদিন বাষ্পময় ভাতের তলায় চটা বিষ্ঠা ফেঁসো জড়ানো অবস্থায় খেতে পেয়েছিল শাহাদত। ভাত ফুটতে ফুটতে হাঁড়ি ধরে যেত। তখন বউটি থপ্‌থপ্‌ করে পুকুরে কলসি নিয়ে এসে জল ভরে নিয়ে যেত। সেই কাঁচা জল ঢাকনা তুলে পোড়াভাতে ঢেলে দিত। সেই দৃশ্য এখনও টলটল করছে মনের তলায়। দেখতে পাচ্ছে জল ঢালছে গোলাকার নাদুস মুন্সী বউ। বিষ্ঠা

তখনও ভাতের সংগে গলেনি সেদিন। কাঁচা পানি ঢেলেছে, গোটাই ছিল পাখির চটা মল। কোন রকমে ভাত মুখে গুঁজে কোন কথা না বলে শাহাদত ছুটে পালিয়ে এল পথে। তখন সবে সন্ধ্যা, মুদি খানায় ধূপ-সন্ধ্যার গন্ধ। পথ তখনও অস্পষ্ট রেখায় দেখা যায়। পথের এক পাশে হড়হড় করে বমি তুলতে লাগল শাহাদত। কিছুক্ষণ বাদে ক্লান্ত অবসন্ন লাগছিল। বমি তুলে দাঁড়িয়েছিল সে। এমন সময় কোথা থেকে সেই প্রকাণ্ড দারুণ স্বাস্থ্যবান কুকুরটা ছুটে এল। কালো! চুকচুকে তৈলাক্ত কালো একটা অলৌকিক জীব। এসেই পথের পাশে পড়ে থাকা বমির তাজা ভাত তরকারি চটাস চটাস শব্দ করে জিভের স্বাদ ছড়িয়ে খেয়ে যেতে লাগল। পুঁচে চেটে খেয়ে শাহাদতের গা শুঁকে, যেন মুখ মুছতে চাইছে, শাহাদত ভয়ে সিঁটিয়ে যায়, গা শুঁকে নিয়ে কোথায় আবার দৌড়ে চলে যায় কুকুরটা। প্রত্যেক গাঁয়ে এই ধারা স্বাস্থ্যবান কোন একটা ভয়ানক কালো কুকুর থাকে। শাহাদত সেই স্মৃতি ভুলতে পারে না। কারীর কোলে মুখ গুঁজে এশা (মধ্যরাত্রির আগে)-র নামাজ পর, শাহাদত ফুঁপিয়ে ওঠে। হুজুর! এ কেমন ইজ্জতের জিন্দেগী! কারী মুহম্মদ শা' গোরপুরী ছাত্রের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন— আমরা নিঃস্ব বলেই তো নবীর গোত্র শাদাত! নবী তো মরেন নি। উনার মউৎ নাই বাপ। আমার তোমার মতন দরিদ্র কাঙালের হায়াতের মধ্যে তিনি চিরকাল জীবিত থাকবেন। চির হায়াতের নবীর আশ্রয় সৎ সাচ্চা উম্মতের দেহ।

— সাচ্চা তন্ তো সাচ্চা মন। আপনি কি এই জন্যেই বলেন? কাঁদতে কাঁদতে বলে ওঠে শাহাদত।

— হ্যাঁ বাপ। হালাল রুজি, সাফ জুবান। নমক হারামী নয় বাপজী, নমক হালালী করে বাঁচবে। গরিবের সতরে থাকবে। আমিরকে দূর থেকে সালাম জানাবে। দূর থেকে। ব্যস! তোমার মনটা আমিই গড়া পিটা করলাম, এই দীল্-এ আমার ছাপ রইল। পাঁচবেলা ওজু করবে, এই দেহ হারাম খেয়ে পচিয়ে ফেল না।

বলতে বলতে আয়াত পড়ে শাহাদতের মাথায় ফুঁ দিতেন কারী। শাহাদত কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ত! কারীর মন্ত্রস্বর ভাসত— স্বপ্নে নবীকে ধ্যান করো পাগল। তিনি আসবেন। মাত্র একচুল তফাতেও তিনি নেই। তিনি তোমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে বইছেন। তিনি হায়তে মাহমুদ। তাঁকে ধ্যান করো। ফাস্ট ক্লাশ মুসলমান কখনও বড়লোক হয় না বাপ। ধ্যান করো। তিনিই তোমার কউম। তোমার গোত্র। তোমার দল। ভয় কি বাছা!

অথচ কালো কুকুরটাকে তাবৎ জিন্দেগী ডরিয়ে থাকল শাহাদত খতিব। এ-গাঁয়েও সেই কুকুরটা আছে। মাঝে মাঝে পথচলতি দেখা হয়ে যায়। প্রচণ্ড একটা ভয় কলিজা আঁকড়ে ধরে। কুকুরটার এত খিদে, এত লোভ! এত নীচ একটা প্রাণী। নোংরা। লোলুপ। খুব দাপুটে। জেদী। একগুঁয়ে। ছিঃ!

এখন আরো দ্রুত পা চালায় শাহাদত। মাহেলার বাড়ির দিকে। এতক্ষণে সে মনে মনে ধর্ম চর্চা করছিল। সরমা বলেছিল খতিবের ধর্ম নিশ্চয়ই আছে। চলতে চলতে সজোরে দাড়ি মুঠো করে চেপে ধরে শাহাদত। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলে। দ্যাখে, সামনে সেই কুকুরটা দাঁড়িয়ে. লেজ অব্দি নাড়ছে না। স্থির। পাথরের অনড় ভাস্কর্য যেন বা। অনড়।

. খতিব খানিকটা শিক্ষিত লোকও বটে। বেলডাঙার হাই মাদ্রাসায় শুদ্ধ বাংলা শেখারও ব্যবস্থা ছিল। সামান্য বিজ্ঞানও পড়েছে, আবার আলেয়া মাদ্রাসার কারী সাহেবের কাছে কেরাত শিখেছে। হাই মাদ্রাসায় ক্লাস নাইন অব্দি পড়ার পর আর বেতন চালাতে না পেরে বরাবরের জন্য আলেয়ায় আরবী শিক্ষায় এফ এম পড়েছে। কিন্তু যদি শাহাদতের হাই মাদ্রাসা পাশ করা সার্টিফিকেট থাকত, স্কুল-ফাইনাল ইক্যুইভ্যালেন্ট সার্টিফিকেট

থাকলে সে কোন একটা হাই স্কুল বা মাদ্রাসায় ছেলে পড়ানোর চাকুরি জোগাড় করতে পারতো। আধুনিক চাকুরি। তা না হয়ে তাকে হতে হল হুদোর খতিব। আর এ-ও আশ্চর্য, সে পঞ্চায়েতের বামপন্থী উপ-প্রধান হয়েছে সামনের ঐ কুকুরটার ভয়ে নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু কেন হয়েছে তারও স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা মুস্কিল। অবশ্য কুকুরটা যে একেবারেই ছিল না, তাইবা কেন? ছিল। ড্রাইডোল পাচ্ছে ওর গুষ্টি, বানের সময় ত্রিপল পেয়েছে এবং দু'পাঁচটা পাট্টাও হয়েছে। বেনাম জমির উদ্ধার করেছে গরিবের দল। এই সব ঘটনায় কি কুকুরটা আছে?

শিক্ষিত লোক বলেই খতিব, তাছাড়া মানীও বটে, সেকারণে কুকুরটাকে জিন মনে করবে না, পরন্তু ভুত ভাববে তা নয়, অর্থাৎ ওটা ভূত নয় বটে, কিন্তু জিন হতে পারে, আলেয়ার শিক্ষা, কারীর কেরাত, মাদ্রাসার সেই বমি খাওয়া কুকুরের মতন জীবন, যে কোন একটা ভয়ানক কুকুরকে অলৌকিক জিন ভাবতেই পারে। কুকুরটা কখনও চিৎকার করে না, কাঁদে না। কোন কুকুর ওর সংগে মারামারি করে না। একলা একলা খুব নিঃশব্দ দাপটে সারা সংসার ঘুরে বেড়ায়, এটা সন্দেহজনক। কুকুরটা তখনও নড়ছে না। মাহেলার বাড়ি ঝাপসা চোখে পড়ে। আরো কতক রসি পথ ডিঙ্গোলেই মাহেলার উঠোন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খতিব ভাবতে থাকে, মাহেলার কাছে পৌঁছনোর পথ আটকে দাঁড়ালো কেন 'ও'? পেছনে পাতলা আঁধারে কে যেন খতিবের নাম ধরে টেনে টেনে প্লুতসুরে ডাকে। একবারই মাত্র খতিব সেই ডাক শুনতে পায়। পেছনে ঘাড় ফেরায়। কাউকে দেখতে পায় না। এটাও ধন্দ। মাঝে মাঝে এই রকম ডাক শোনে খতিব। মাত্র একবার। তারপর কিছুই থাকে না। কে অমন করে ডাকে? সত্যিই কি ডাকে? পেছনে থেকে সামনে ঘাড় ফেরায়, খুব আশ্চর্য হয়। কুকুরটা নেই। চোখের সামনে থেকে কোথায় গায়েব হল বুঝতে পারে না। তখনই মনে হয়, ওটা কুকুর নয়। ঐ ডাকটাও মানুষ ডাকেনি।

খতিব আর মাহেলার কাছে ভোরবেলা যেতে পারে না। বাড়ি ফিরে আসে। আজ শুক্কুরবার নামাজ পড়াতে আর নীতিকথামূলক আরবী ভাষণ, খুৎবা পড়ে শোনাতে হুদোয় যায়। (খুৎবা পাঠকের নাম খতিব)। এক ব্যাগ পিপুল নেয়। জুম্মার মানত পায় জালি ভাত কুমড়ো, শশা, দু'টি বেগুন। মাস কাবারী বেতন পায় শাহাদত, জনগণের মুঠি তোলা চাল গমের বিক্রি বাবদ টাকা থেকে। জীবনটাই সব সময় উপরসত্ত্ব, হাত-তোলা, মাটিতে শেকড় নেই। এই ভাবনাই খতিবের সর্বনাশ করেছে।

জীবনের শেকড়ও গাছের মতন মাটিতে থাকে। কুণাল ঘরামী কথাটা বুঝিয়েছিল নবীর ধর্ম ছিল মরুভূমির বালিতে। যাযাবর মরুযাত্রীরা ছিল তাঁর উম্মত। সেই ধর্ম যখন বাংলায় আসে, তখন তার চেহারা খুলে যায় কমরেড। গরিবেরও শেকড় দরকার। নইলে ধর্ম বাঁচে না। খতিবী করো ক্ষতি নেই। কিন্তু উপরসত্ত্বে পরগাছা হয়ে থাকলে ইসলামও তোমার উড়ু উড়ু করবে। চাষবাস করো। মাটির সংগে ধর্মকে মেশাও। গরিবী ভাল, নবীর পছন্দ। কিন্তু মিশকিনী তো নবী চান নি। মিশকিন মানে ভিখিরি। মিশকিন কখনও বিপ্লব করে না। মার্কস আর নবী দু'জনই খুব জেহাদী লোক।

কুণালরা মুসলমানকে বোঝানোর ভাষাও জানে। শুনতে শুনতে মনে হয়, তাই তো! ধর্মকে মাটির সংগে মেশাতে হলে মাটি দরকার। জোত দরকার। এই বাংলায় ইসলাম কেবলই উড়ু উড়ু করে। কুণাল বলেছিল, রাশিয়ার জার (জমিদার) মুসলমানের হাত থেকে কোরান কেড়ে নিয়েছিল, বিপ্লবের পর ১৯১৭ সালে লেনিন সেই কোরান নিজে হাতে মুসলমানকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। গরিবের দল আমরা, আমরা তোমার শত্রু নই শাহাদত।

উপরসত্ত্বে, হাত তোলায় বাঁচা সহ্য করল না শাহাদতের জীবন। কথা হল, সংগ্রাম করলে বেনাম মাটি, খাস মাটি খতিব পাবে। বড়লোকের চোরা মাটি পাবে সে। সেইখানে শেকড় গড়বে জীবন আর ধর্ম। কে জানত, শেষ অব্দি সেই মাটির নাম মাহেলা বেওয়া।

আকাশে ফুটফুটে চাঁদ। ভাঙ্গা হটর হটর কিচকিচ করা, পিঁ করে চিৎকার করা শিসালো সাইকেল হাঁকিয়ে, কাঠের প্যাডেল লাগানো সাইকেল হাঁকিয়ে খতিব জুম্মা রাতে হুদো থেকে সোজা বাড়ি না ঢুকে মাহেলার উঠোনে পৌঁছয়। আকাশের মাঝখানে মহাশূন্যে চাঁদ ঝুলছে, খুব উপরে উঠেছে আজ, ফিনিক দিচ্ছে। উঠোনে দাঁড়ালে পায়ের তলায় ছায়া পড়ে। মাহেলা ঘর থেকে নেমে এল। খতিবের কাছে এসে আধমিনিট দাঁড়িয়ে থেকে দৌড় দিল ঘরের মধ্যে। ভেতর থেকে শিকলি তুলে দিল। ঝনাৎ শব্দ করল নিশুতি রাত্রি। আকাশে চাঁদ জ্যোৎস্নায় ফেটে যাচ্ছে। আকাশটা চাঁদকে নিয়ে আজ অসম্ভব উপরে উঠেছে। পাকাটি আর গমের খড়ি মেশানো চাল শিশিরে জ্যোৎস্নায় চকচক করছে। শিশির টোপাচ্ছে, তখন মনে হচ্ছে পিচ্ছিল জ্যোৎস্নার একটা সরীসৃপ ধরনের শরীর প্যাকাটির গায়ে গায়ে চালের উপর ছুটে বেড়াচ্ছে। পাখিটা ডাকছে খুব বিশ্রী। খুব কুহকী গলায় টি টি করে টানছে। মন খারাপ করছে খতিবের। সংগে সংগে বেলডাঙার পুকুরঘাটকে মনে পড়ে যায়। সেখানে সে সাবান মেখে স্নান করছে। গরিবকে খুব সাবধানে সাবানের ক্ষয় লক্ষ্য করে সাবান মাখতে হয়। সেইভাবেই মাখছে শাহাদত। নতুন মোড়ক-খোলা সাবান। হঠাৎ হাত ফসকায়। জলের মধ্যে সাবান তলিয়ে যাচ্ছে, দেখতে পায়। কিন্তু কেমন অবশ চোখে মুখে ফেনা, চোখে টোপানো ফেনায় তীব্র ঝাঁঝ, দেখতে দেখতে তলিয়ে যায়, ধরতে পারে না। কী যেন ঠিক সেইভাবে তলিয়ে যাচ্ছে। সাবান নয়। সম্মান। বিশ্বাস। তারও চেয়ে অন্য কিছু। অন্যরকম কিছু।

মসজিদে কথা উঠেছিল এই জমি নিয়ে। ঐ জমি বেচে কাফন কেনার রাস্তা মাহেলার থাকল না। ভাগ জোতের জমি কিনবে না কেউ। শাহাদতের বড় ছেলে গাঁয়ের ষণ্ড। লেঠেল। মহরমের লাঠি খেলে পাখোয়াজী করে। হালাল হারামের প্রশ্ন উঠল একজন খতিব তাই। নইলে এ ঘটনা আকছার ঘটছে। কুণাল তুমি হিন্দু বলে বুঝবে না খতিবের হাত তোলা সম্মান কত ভয়ানক কষ্ট দেয়। কত তার ওজন। ভাবতে ভাবতে খতিবের গাল বেয়ে তামাটে জলের আঠার মতন অশ্রু গলে পড়ে। থুতনি বাদে তাবৎ গাল চকচকে টাকের মতন পিছল। সেই গালে জ্যোৎস্না ঠিকরোয়। কঞ্চির জানালায় চোখ রেখে মাহেলা সেই নিঃশব্দ কান্না দেখতে পায়।

মাহেলা মৃদু রোষে বলে ওঠে— দাড়িতে মুঠো বেঁদে বুলেছিলে খতিব খুদা-কছম ভাগ জোত করবে না। এমুন বে-ইনছাপী ইমানে সইল তুমার? গরিবের গুষ্টিই আজ গরিবকে মারছে গো। ওই উঠানে বসে গাওনা করেছিলেন, মুনে আছে স্বাদগোৎ (কুটুম্ব)। লোকে বুলে, তুমি আমার সাদের নাঙ্ (অবৈধ প্রণয়ী)। ইস! কী আমার গরিবের গুষ্টি রে! সব ওই লাল পার্টির দালাল। তুমি খতিব, নিদয়া কাফের হয়্যাছ। এই তুমার ভাষণ? বাদুড়! যে মুখে খায়, সেই মুখে ওগলায়। দেও, উব্বান(বমি) করো জমিন। কুত্তার মুতন উব্বান করো আমার জমিনের ভাত। পরের খেয়ে খেয়ে এক হাত জিভ্যা (জিহ্বা) সাত হাত করয়াছ। তিক্! তিক্ তুমার জিনগিনি (জিন্দেগী)! হায় আমার দুশমন! আমার স্বাদগোতরে, নাঙ্ রে! যাঃ! চলে যা ইখ্যান থেক্যা। পালা!

খতিব উঠোন ছেড়ে চলে যাবার আগে জুম্মার মানতের ব্যাগ ঘরের জোৎস্না-বিদ্বেষী দাওয়ার ছায়ায় নিঃশব্দে রেখে দেয়। রাস্তায় পিঁ করে শিসায় সাইকেল। খতিব দেখতে পায়, রাস্তার পাশে কালো কুকুরটা বমি করবার তাড়নায় অসম্ভব কষ্টে ছুটে বেড়াচ্ছে। পারছে না। কিছুতেই পারছে না। কুকুরের বমি করার কষ্ট চোখে সওয়া যায়না।

তিন

কিন্তু মানুষ তো আসলে কুকুর নয়। যেমন নয় লাল পার্টি করলেই, কোন খতিব একজন সত্যকার কমরেড। কিন্তু আজ শাহাদত বমি করতে চাইছে। জমির রসেবশে

কত মুসলমানই আজ দাড়ির অসম্মান করে এই বাংলায়। নবীর সুন্নৎকে ভাবে ড্রাইডোলের টুকন (টোকেন)। ভাবতে ভাবতে সাইকেল ছোটায় শাহাদত খতিব। হুদোমুখো। সাইকেলের ক্যারিয়ারে পাছামোটা, পুষ্ট ভরাট বুকের বেওয়া মাহেলা শাড়ির কোঁচায় হাফ ডজন ডিম নিয়ে হুদোর মাঠ-খসড়ার ক্যাম্পে চলেছে। আজ এই দু'জনের সম্পর্কের প্রকাশ্য প্রদর্শনী চলেছে রাস্তায় ছুটন্ত। আর গোপন রইল না কিছুই।

আবার দেখা যাচ্ছে ওরা ক্যাম্প থেকে ফিরে আসছে বিকালের আলোয়। আকাশে প্রকাণ্ড দিনান্তের চাঁদ ভীষণ বিষণ্ণ। দৌলতডিহির পর ক্যাম্প উঠে গিয়েছিল হুদোয়। সেখানে ওরা ডিমের ঘুস দিয়ে নাম কাটাতে এসেছিল। বাবুরা কাণ্ড দেখে হেসেই আকুল। ডিম নিল একজন হোমগার্ড। কিন্তু নাম কাটা গেল কিনা বোঝা গেল না। মাহেলাকে আশ্বাস দিতে দিতে ক্যারিয়ারে করে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে খতিব। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। হুদোর দিগন্তবিস্তারী মাঠে সূর্য ডুবে গেল। শিশির পড়তে লাগল। চাঁদ হাহাকার করে উঠল। খতিব আর মাহেলাকে টানতে পারছে না। জ্যোৎস্নার মেটে আলোয় পথ কিঞ্চিৎ অস্বচ্ছ। চোখও ঈষৎ নরম। গাঁ দেখা যাচ্ছে না কোন দিকে। পথ ভয়াবহ নির্জন। মাঠের মাঝখানে ওরা। শির-পথে সাইকেল যাচ্ছে। সহসা সাইকেলের সামনের চাকা একখানা অসভ্য পড়ে থাকা ইটে উঠে গিয়ে পিছলে যায়। খতিব আর সামলাতে পারে না। মাহেলা স্খলিত হয়ে পথের ধুলোয় পুঁটুলির মতন মৃদু শব্দে পড়ে যায়। কোমরে মচকানো ঘা লাগে। মাহেলা মৃদু ককিয়ে কেঁদে ফেলে।

সাত তাড়াতাড়ি দ্রুত হাতে সাইকেল পথের উপর শুইয়ে ফেলে খতিব মাহেলাকে বাহু মূলে হাত লাগিয়ে দু'হাতে ওঠাতে চেষ্টা করে। মাহেলার গায়ে জামা নেই। খতিবের আঙ্গুল গায়ের মাংসল খাঁজে ডুবে যায়। ঘাম আর আশ্চর্য উষ্ণতা এবং দশ কাঠা মাটির গন্ধ মেশানো মাহেলার শরীর খতিবের নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ঢুকে পড়ে। বাঁজা মেয়ে। স্বামী খেয়েছে ভরা যৌবনে। কামে গিয়ে মরদ দেওয়াল চাপা পড়ে মরেছে। তারপর একলা গাঁয়ের দুর্নাম কুড়াচ্ছে। খতিবই তার রক্ষক ও ভক্ষক। মাহেলা উঠতে পারে না নাকি ইচ্ছে করেই উঠছে না খতিব বুঝতে পারে না। ঘাম লাগে হাতে। মাটির উষ্ণতা লাগে হাতে। ভরাট নরম স্বাদুময়ী যুবতীর দেহ কী সুঠাম আর পেলব। গায়ে জামা অব্দি দেয়নি। গরিবরা আজও এদেশে জামা পরতে শিখল না। গরিবরা বোরকার কাপড় কিনতে পারে না। অথচ ছেলে বগলে করে পাঁউরুটি চুসতে চুসতে লালপার্টির মিছিল গায়। মাহেলা কখনও লালপার্টিতে এল না। দশ কাঠা মাটির গরম কি মোহ-মেদুর। কী ঘন তার আকর্ষণ! যতবার তুলতে চেষ্টা করে ততবারই গা এলিয়ে কেমন বুক চিতিয়ে দেয় মাহেলা। কাঁদে। কঁকায়। তারপর খতিবের ঠোঁটের কাছে মুখ তুলে বলে— দিব। যা দিইনি, চাও তো তা-ও পাবে খতিব। আমার জমিন ফিরায়ে দেও। আমার সন্মান। আমার ইজ্জৎ। আমার ওই দশকাঠা মাটিই যে বুরকা আর কাফুনের ছিট গো খতিব!

খতিব মাহেলাকে হাত থেকে খসিয়ে ফেলে ফের বুকের কাছে তুলে ধরে বলে আমি তোকে নিকে করব মাহেলা!

মাহেলা তখন পথে বসে পড়ে। উঠে দাঁড়িয়ে পাছার ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে খলখল করে হেসে ফেলে। বলে— তাই কহ। জমিও খাবে, আমাকেও খাবে। পুরুষের নিশ্বেসে ধমনীর খবর পায় নারীলোক। জানি। কিন্তুক তা হবার লয় খতিব। তুমাকেও একবার দেহখান ঘুস খাওয়াব বুলেছি, তার বেশি লয়। আমার জমিনে তোর ভাগ কিসের স্বাদগোতের কাফের।

বলেই মাহেলা সন্ধ্যার তুমুল জ্যোৎস্নায় দৌড় দিয়ে গাঁয়ের দিকে ছুটতে থাকে। তার পেছনে সাইকেল শিসিয়ে ওঠে। তীব্র।

পরের দিন দশ কাঠায় হাল জোড়ে খতিব। পাগলের মতো গরু ঠেঙায়। ঝানকা বলদ পা টান করে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে। পায়ের গাঁটে লাঠি পেটায় খতিব। বারবার অন্যমনস্ক চায় মাহেলার বাড়ির দিকে। মাহেলাকে দেখতে পায় না। সহসা ঝানকার পায়ে ফাল বিঁধে যায়। অনেকখানি। সেই ফাল অনেকক্ষণ ছাড়াতে পারে না শাহাদত। যখন কোন প্রকারে ছাড়ায় উষ্ণ ভাপালো মাটিতে রক্ত চুইছে গল্‌গল্‌ করে। কেঁদে ওঠে-- 'মাহেলা!' ওষুধ আনো মাহেলা। ঝানকা মরে যাচ্ছে।

মাহেলা এখনও আসে না। গরু নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফিরে আসে খতিব। অনেক রাত্রে মাহেলা ওষুধ বেটে এনেছে খতিবের কাছে। খতিব বিছানায় শুয়েছিল বৈঠকে। উঠে বসে। খুব কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে মাহেলা। কাপড়ের তলা থেকে খুরি (বাটি) বার করে। ওতে ওষুধ এনেছে। মুখ খুশিতে ভরে ওঠে খতিবের। এমন সময় বাড়ির মধ্যে বউ অর্থাৎ খতিব-পত্নী তার ছেলেকে লাঠি এগিয়ে দেয়। বলে কত্তাবিকে কপাল ফাটিয়ে দিয়ে আয়। যা সুলতান। মাগী নাঙ্‌ মারাতে এস্যাছে বুড়ার কাছে। ওষুধ না হাতি।

সুলতান বাপের সামনে এসে দাড়ায় লাঠি হাতে। শুধায়-- মাহেলাকে তুমি নিকা করবা বাপ? মাহেলা ও খতিব চমকে ওঠে। হঠাৎ ছেলের লাঠি এসে বাপের মাথায় আছড়ে পড়ে। কপাল সত্যিই ফাটে। রক্ত চুঁইয়ে নামে। তখন ঝানকা গরু গোঁ করে আর্তনাদ করে শুয়ে পড়ে। তা দেখে পাগলের মতন রক্তাক্ত খতিব ছুটে যায় গোয়ালে। ঝানকার সটান পা আর নরম হয় না। জিভ বেরিয়ে পড়ে।

টুপিয়ে টুপিয়ে রক্ত খতিবের জিভে এসে ঠেকে। সেই রক্তের স্বাদ কেমন বলতে পারে না খতিব। মাথা ঘুরে শাহাদত পড়ে যায় মাহেলার কোলে। ছেলে কেমন হতভম্ব হয়ে পড়েছে। বাপও কি মরে যাবে নাকি? বাপকে ছুঁতে পারে না। এক সময় মাহেলা খতিবকে কোল থেকে নামিয়ে গোয়ালের মাটিতে রাখে। মুখে মৃদু শব্দ করে — হায় আল্লাহ্‌!

ধর্ম আর রাজনীতি আর মাটি একসাথেই আছে। নবী বেঁচে আছেন দূষিত উম্মতের পরমায়ুর মধ্যে। মাটি আজ বিধবা, তার যৌনতা ক্রূর। ঝানকা বলদে জীবনের শিকড় পোঁতা আহাম্মকী। মানুষের সব অনুভূতি বক্র করে দিয়েছে তেরো কাঠা মাটি। সেই মাটিতে বলদ নেই। কোদাল চালাচ্ছে খতিব। মাটি সে এখনও ছাড়তে পারেনি। কারণ কুণাল তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে, মাটি আর মানুষের ধর্ম চিরকালই বিবাদী খতিব। তোমাকে আর মাহেলাকে একহতে দিল না। যাক গে। চা খেতে যেও। তোমার জন্য বউ একটা স্টেনলেস স্টীলের ভারি চমৎকার কাপ কিনেছে।

সেদিন ভোরে চা খেতে এল খতিব। ওরা আবার তত্ত্বচর্চা করবে। গরুর লোনের দরখাস্ত লিখছে কুণাল ঘরামী। পঞ্চায়েতে বীজ আর প্রান্তিক সার এসেছে। ওরা চা খাচ্ছে।

এমন সময় মাহেলা এসে কুণালের টেবিলের সামনে দাঁড়াল। বলল— আপনার লালপার্টিতে আমাকে লিবেন ঘরামী? মিছিল গাইব। জমির রেকটখান কাটান কর‍্যা দ্যান। জোত-রেকট।

কুণালের বাড়ির কাঠ-দরোজায় একটি ভয়াল কালো স্বাস্থ্যবান হিংস্র ক্রূর কুকুর দু'পা তুলে আঁচড়াচ্ছে আর অদ্ভুত শব্দ করছে মুখে। থামছে না।

সুসময়

কঙ্কাবতী দত্ত

লেবু-মধুর জল খেয়ে সবে চায়ে চুমুক দিয়েছে, এই সময় দরজায় ঘণ্টা। সকাল সাতটা সাড়ে সাতটা বাজে। এখনও অল্প অল্প কুয়াশা, লালচে আলো, অনন্যা বালিশে ঠেস দিয়ে হেডলাইনে চোখ বুলোচ্ছিল, মুখের সামনে থেকে খবরের কাগজ সরাল। খুলে দেওয়ার মতো কেউ কি ওদিকে নেই? রান্নাঘর থেকে মানদার খুন্তি নাড়ার ছ্যাঁকছ্যাঁক শব্দ ভেসে আসছে। মা বাবা দুজনেই গেছে বাজারে, ভাইও নেই। সে দুবার মানদা? মানদা! বলে ডাকল। বীরুকাকুর আসার কথা আজ, বাবা বার বার করে বলে গেছেন, তাঁর ফেরা পর্যন্ত যেন তাঁকে জোর করে বসিয়ে রাখা হয়।

বাবার এই বাল্যবন্ধুটি এমন খেয়ালী, বাড়ি ফাঁকা দেখে হয়তো চলেই যাবেন। অথচ একবার যদি আড্ডা দিতে বসে যান, তাহলে আবার ওঠার কথা খেয়াল থাকে না। নানান বিষয়ে উৎসাহ তাঁর, দারুণ গানের গলা, একটু লেখা-লেখিও করেন। সম্প্রতি আবার এসবের ওপর আরো একটি বিদ্যা যোগ হয়েছে— হাত দেখতে পারেন। আর আশ্চর্য ব্যাপার হলো তাঁর বেশ কয়েকটা প্রেডিকশান মিলে গেছে। হতে পারে কাকতালীয়, তবু তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

জ্যোতিষ—এই একটি ব্যাপার যা মানুষ মাত্রকেই টানে, অন্তত তরুণী মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এর জুড়ি নেই। সুতরাং বাবা-মা'র অন্যান্য বন্ধু এলে অনন্যা যেমন উদাসীন থাকে, বীরুকাকুর ক্ষেত্রে তেমন নয়। কদিন আগেই হাত দেখাবার ছলে তার নিজের কয়েকটা সমস্যার কথা বলেছে তাঁকে। তিনিও পরামর্শ দিয়েছেন। মানদার সাড়াশব্দ না পেয়ে খাট থেকে নেমে হাওয়াই চটি পায়ে গলাল। এমনিতে এতো ভোরে আসার পাত্র বীরুকাকু নন। আজ তাঁর একটা বিশেষ কাজ আছে অনন্যার বাবা সম্বিৎ সেনের সঙ্গে। জ্যোতিষ সম্পর্কে তিনি একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন, তাঁর ইচ্ছে সম্বিৎ সেটাতে চোখ বুলোন। যেহেতু সম্বিৎ পেশায় সাংবাদিক, হয়তো কোথাও ছাপিয়ে টাপিয়ে দিতে পারবেন।

অনন্যা করিডোর পেরিয়ে দরজা খুলে দিয়ে দেখে, চুয়া দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে একটা খুশির ভাব ফুটে উঠলো তার চোখে। বীরুকাকা নন, চুয়াই বেল দিচ্ছিল এতক্ষণ, তাই এত অস্থির, অধৈর্য, ঘন ঘন ঘণ্টা। ঘুম থেকে উঠেই চলে এসেছে বলে মনে হচ্ছে, চুল এলোমেলো, গায়ে একটা ঢিলেঢোলা জংলা ডিজাইনের সালোওয়ার কামিজ।

'ওমা তুই!'

'তোর কাছে পঞ্চাশ টাকার খুচরো হবে? ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিই—'

'পঞ্চাশ টাকা! না তো!' বলে অনন্যা মাথা ঝাঁকালো। পঞ্চাশ টাকা একটা মস্তো বড় অঙ্ক তার কাছে। নিজের কোনো রোজগার নেই তার, এমন কি হাতখরচটাও চেয়ে নিতে হয়। তবু সে বললো, 'দাঁড়া দেখছি, মানদার কাছে থাকতে পারে, তুই ভেতরে আয়।'

চুয়া অনন্যার ঘরে পা দিল। ঘরের কোণে একটা ইজেল; অনেককাল আগে, অনন্যার তেরো বছরের জন্মদিনে তার দিদিমা কিনে দিয়েছিলেন, এখনও ব্যবহার করে। ছেলেবেলা থেকেই আঁকিবুঁকি কাটার অভ্যেস তার, দেওয়ালে লেখার জন্য কতোবার বকুনি খেয়েছে; তার খুব শখ ছিলো, মাধ্যমিক পাস করে আর্ট কলেজে ভর্তি হবে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার রেজাল্টটা খুব ভালো হয়ে গেল। সকলে বললো, ছবি তো আঁকাই যায়, এতো ভালো রেজাল্ট নিয়ে সায়েন্স পড়া উচিত। সে নিজেও কেমন টলে গেলো, ভর্তি হয়ে গেলো যাদবপুরে, তারপর স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকা। এখন আক্ষেপ হয়, ছবি আঁকাতেই তার আসল ক্ষমতা লুকিয়ে ছিলো, এতোদিনে বুঝেছে। সব সিদ্ধান্ত ভুল হয়েছিলো। চুয়া তার হাতব্যাগটা খাটের ওপর ছুঁড়ে দিলো। খাটের পাশে কতকগুলো ক্যানভাস দাঁড় করানো আছে। গত দু মাস সারা দিন-রাত ছবি এঁকেছে অনন্যা।

চুয়া একটা আঙুল তুলে বললো, 'রামায়ণ?'

'হুঁ।'

'এই সিরিজের ছবিগুলো এক্জিবিশনে দেওয়ার কথা ছিলো তোর?'

'হ্যাঁ। ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি জানতাম না, টুয়েন্টি থার্ডই লাস্ট ডেট ছিল।'

বলতে বলতে চুয়ার মুখে তার চোখ থেমে গেলো. এতোক্ষণ ভালো করে দেখেনি, এবার লক্ষ করলো, চুয়ার চোখের তলায় কালি পড়েছে। মুখের ভাব অস্বাভাবিক উদ্বিগ্ন। গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে বললো, 'অনন্যা, অরূপের বাবা মা বারো দিনের জন্য দিল্লি গেছেন।'

অনন্যা একটু অবাক হয়েই বললো, 'তাতে এতো এক্সাইটেড হওয়ার কি হলো?'

'বাহ! এক্সাইটেড় হবার নেই?' বলে চুয়া এমন ভাবে তাকালো যে, ইঙ্গিত বুঝতে এক মুহূর্তও সময় লাগলো না অনন্যার। দুই বান্ধবীর মধ্যে নিঃশব্দে বোঝাপড়া হয়ে গেলো।

চুয়া চোখ নামলো। 'আমি সে কটা দিন ওর বাড়িতে থাকছি।'

'অ্যাঁ!' বলে দরজার কাছে গিয়ে ছিটকিনিতে হাত দিলো অনন্যা। 'দাঁড়া, আগে দরজাটা বন্ধ করি। কে কোথা দিয়ে শুনে নেবে। তোর সাহস তো কম না! বাড়িতে কি বলেছিস?'

'বাড়িতে? মা জানে তোর এখানে আছি।'

অনন্যা দরজায় ছিটকিনি তুলে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। 'আমি যদি কাল ফট করে তোর ওখানে চলে যেতাম?'

চুয়া খাটের ওপর পা তুলে বসে একটা নিঃশ্বাস ফেললো। 'আমি জানতাম তোর সেই এন্ আই ডির বন্ধুরা এসেছে, তুই শহর দেখাতে বিজি থাকবি।'

অনন্যা চুয়ার মুখোমুখি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসলো। ঝুঁকি যতো বড়োই হোক, অরূপের সঙ্গে কয়েকদিন সহবাস, এ নিশ্চয়ই এক অসামান্য অভিজ্ঞতা চুয়ার কাছে। রোমাঞ্চে, উচ্ছ্বাসে, খুশিতে ঝলমল করার কথা ছিলো তার, কিন্তু কই, তেমন তো কোনো লক্ষণ তার মুখে দেখছে না, বরং তাকে কেমন যেন বিপন্নই দেখাচ্ছে।

অনন্যা চিন্তিত ভঙ্গিতে গালে হাত দিল। কোনো এক রহস্যময় কারণে চুয়ার বাবা-মা অনন্যাকে খুব ভরসা করেন। 'অনন্যার বাড়ি যাচ্ছি' বা 'অনন্যার সঙ্গে আছি' বললে তাঁরা নিশ্চিন্ত, যেন সে কোনো অনুচিত কাজের সঙ্গী হতে পারে না। অথচ চুয়াদের বাড়িতে বসেই তারা কতোবার কতো উদ্দামতা, কতো খেয়ালীপনা করেছে, তার ঠিক নেই। এর কারণ হলো, বাড়ির বাকি অংশের থেকে চুয়ার ঘরটা একেবারে আলাদা। প্রবেশ পথ স্বতন্ত্র।

বন্ধুরা কখন যাচ্ছে, কখন আসছে, কেউ অতো খেয়াল করে না। এই তো শেষ যেদিন চুয়ার বাড়ি রাত কাটিয়েছে, সেদিনই আরেকটু হলে দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছিলো, প্রাণ হাতে নিয়ে বেঁচেছে। সন্ধ্যার দিকে সঞ্জিত এসেছিলো, তিনজনে বসে আড্ডা মারছে, এই সময়ে চুয়ার ভাই বাপ্পা এসে বললো, দিদি, রাজীবদের নতুন মারুতি এসেছে, ও বলছে, চলো, সবাই মিলে একবার চক্কর দিয়ে আসি। রাজীব হলো বাপ্পার বন্ধু। গুজরাটী ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে, রাজপুত্তুরের মতো চেহারা, স্বভাবেও বেশ মধুর।

গাড়ি ছুটছিলো ষাট থেকে সত্তরে, সত্তর থেকে আশি কিলোমিটার স্পিডে। দূরে এঁকে-বেঁকে মিলিয়ে গেছে রেড রোডের সোডিয়াম আলো, ঈষৎ লালচে আভা ছুঁয়ে দিচ্ছে।

'অনন্যা, আলোগুলো দ্যাখ।'

অনন্যা বললো, 'ছোটবেলায় 'হাইওয়ে ম্যান' কবিতাটা পড়েছিলি তোরা?'

'হ্যাঁ।' বলে চুয়া দারুণ উৎসাহে আবৃত্তি করলো ঃ

'ওই, লাইফ ইজ আ গ্লোরিয়াস সাইকল/অফ সং/আ মেলডি অফ ইউফোরিয়া/ অ্যান্ড লভ ইজ আ থিং দ্যাট কান্ট গো রং/ আন্ড আই অ্যাম মারী অফ রিউম্যানিয়া....'

সে যেন তার ছেলেবেলায় ফিরে গেছে। হাওয়ায় উড়বে। অনন্যা জানলা দিয়ে মুখ বার করলো। কি বিশাল বিশাল জানলা, মসৃণ গতি, উপভোগ্য যাত্রা। এবার যেন বুঝেছে অর্থের মহিমা।

'রাজীব, আমায় চালাতে দে, একবার একবার প্লিজ'— অনেকক্ষণ ধরে বলছিলো চুয়া।

রাজীব বলছিলো, 'আরেকদিন, চুয়া। এই অন্ধকারে একদম সামলাতে পারবে না—'

চুয়া বলছিলো, 'চুপ কর তো! আমি বারো বছর থেকে গাড়ি চালাই জানিস— '

পেছনের সিটে বসে অনন্যা মুচকি হাসলো। এটা বেমালুম মিথ্যে কথা। আগে দু একবার চুয়া স্টিয়ারিং ধরেছে বটে, কিন্তু সে গাড়ি চালাতে জানে একথা কখনই বলা যায় না। তবে তারই জিৎ হলো অবশেষে। রাজীব সরে গিয়ে চালকের আসনে তাকে বসতে দিতে বাধ্য হলো। ঝাঁকানি দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিলো চুয়া। অনন্যা একটু সন্ত্রস্ত হয়েই সীটের মাথা চেপে ধরলো। আসার সময় একটা পার্কে জোড়ায় জোড়ায় বসে থাকতে দেখেছে কয়েকটি ছেলেমেয়েকে। দেখে মনে হয় ফুটো পয়সাও নেই। তবু তাদের আদৌ দুর্ভাগা মনে হলো না। সে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে গাড়িটার মসৃণতায়, এখন আর সেটা তাকে আলাদা করে সুখ দিচ্ছে না।

অনন্যা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো, এই সময় হঠাৎ প্রচন্ড শব্দে আর ঝাঁকুনিতে গাড়ির ভেতরটা কেঁপে গেলো। সামনে একটা ঠেলার গায়ে জোরে ধাক্কা মেরেছে চুয়া। কোথা থেকে লোকজন ছুটে এলো, ঘিরে ফেললো গাড়ি। ভাগ্যক্রমে ঠেলাওয়ালার গায়ে আঁচড় লাগেনি, বেশ কিছু টাকা খসিয়ে তারা সে যাত্রা ছাড়া পেলো। এরকম কতো কি, কতো বার! চুয়া বলে, 'দেখেছিস তো, আমাদের লাকটা কি খারাপ? অথচ তুই আর আমি এতো ভালো। কেন রে, আমাদের এতো ব্যাড লাক?'

অনন্যা খাটের দিকে এগিয়ে এসে বললো, 'আচ্ছা চুয়া, 'চিত্রাঙ্গদা'য় সোলো গাওয়ার কথা ছিলো না তোর?'

'দিলো না রে! ভাস্বতী চিত্রাঙ্গদা হয়েছে—'

অনন্যা উত্তেজিতভাবে বললো, 'সে কি! তুই এতো ভালো গাস! ভাস্বতীর আবার সুরজ্ঞান আছে নাকি—'

চুয়া নিরাসক্তভাবে বললো, 'ওই! পঙ্কজদার ভাইঝি যে—'

'তুই তাহলে গাইছিসই না?'

'গাইছি, সকলের সঙ্গে...'

চুয়া খাটের ওপর জোড়াসন হয়ে বসলো। 'অনন্যা, তুই একবারও ভেবে দেখেছিস, এ বছর আমার তেইশ বছর বয়েস হবে?'

'না। তোর বুঝি দুঃখ হচ্ছে, সে কথা ভেবে—'

'হ্যাঁ, ভাবছিলাম, কি করলাম, এতোগুলো বছর—' বলতে বলতে চুয়া কপালের দু'পাশে আঙুল দিয়ে চাপ দিলো। অনেক গুণ আছে চুয়ার। সে নাচতে পারে, খুব ভালো গান গায়, কিন্তু কোনো কিছুতেই ঠিক মন লাগাতে পারেনি। মানুষটা খুব চঞ্চল আর উচ্ছ্বাসপ্রবণ বলে অনুশীলনের অভাব ছিলো সব কিছুতেই। অথচ যে কোনো লোক যে চুয়ার গান শুনেছে, অভিভূত হয়েছে। তার গলায় একটা দরাজ প্রসার আছে, কখনও তা গগনচুম্বী উচ্চতায়, কখনও পাতালে পৌঁছে যায়। একদিন সে সারা রাত গান শোনালো অনন্যাকে, জানালার ধারে বসে। তাদের চোখের সামনে ভোর হলো, দূরে একটা মসজিদ থেকে ভেসে এলো আজানের শব্দ। সে রাতটা আজও মনে পড়ে। অনন্যা চুয়াকে বলেছিলো, 'চুয়া, তুই আবার রেওয়াজ শুরু কর—'

'করবো!' বলেছিলো চুয়া, কিন্তু এর কিছুদিন পরেই তার মেজো কাকা মারা যাওয়ায় বাড়িতে সব ছন্নছড়া হয়ে গেলো।

অনন্যা চুয়ার দিকে তাকালো। সত্যিই তো, জীবন অতিক্রম করবে না তো তাদের? জীবন কি শিল্পের বিকল্প? সে ছবিগুলো আঁকতে পারবে তো? ফোটাতে পারবে তো, যা কিছু চেয়েছিলো? অবশেষে চব্বিশ, সময় বেশি নেই, দেখতে দেখতে তিরিশ বছর হবে, তারপর পঁয়ত্রিশ, চল্লিশ, তার যৌবনের একেকটা বছর, একেকটা দিন, ফোঁটা ফোঁটা রক্তের মতো মূল্যবান। সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির বিরুদ্ধে তারা, আর তাদের যৌবন— তাদের যন্ত্রণার কারণ, তাদের বেদনা, তাদের অহংকার, তাদের ধৈর্য্যহীনতা।

চুয়া অনন্যার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে বললো, 'মাঝে মাঝে মনে হয় কোথাও পালিয়ে যাই!'

অনন্যা হাসলো। 'পালাবি কোথায়? দা জার্নি ইজ ইনসাইড—'

চুয়া বললো, 'তোর মাঝে মাঝে খারাপ লাগে না? সবাই এতো কিছু করছে, সেখানে আমরা একটা গুড ফর নাথিং, ফেইলিয়ার্স—'

'কী করছে সবাই?'

'সঞ্চিত কতো বড়ো কম্পানিতে জয়েন করেছে, দীপিকা বিয়ে করে ঘর সংসার করছে, সেখানে আমি ভালো করে একটা নাচের প্রোগ্রামও অ্যারেঞ্জ করতে পারলাম না— আর তাছাড়া... তাছাড়া, আমার ব্যক্তিগত জীবনও কেমন নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে।'

এই নাটকীয় কথাটা শুনে অনন্যা কৌতূহল ও মনোযোগের ভঙ্গিতে ভুরু দুটো সামান্য কুঁচকে বললো, 'কেন?'

চুয়া জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো, 'আমি অরূপের ওখানে আর পেরে উঠছি না। কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠেছি।'

'সে কী রে!' অনন্যা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালো, মাত্র গত শনিবারই চুয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, এর মধ্যে গাল দুটো যেন খানিকটা চুপসে গেছে, চোখের তলায় অল্প অল্প কালি, দৃষ্টিতে কি অসম্ভব ক্লান্তির ছাপ!

সে চুয়ার চোখে চোখ রেখে বললো, 'কি হয়েছে কি, আমায় বল..

'সেটাই তো মুশকিল, কিছুই হয়নি। রোজ সন্ধ্যায় ভাত রেঁধে খাচ্ছি, সন্ধেবেলা অরূপের সঙ্গে বসে টিভি দেখছি। দিব্যি থাকার কথা। কিন্তু...' বলতে বলতে সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালো। কয়েক মুহূর্তে তার দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলো অনন্যা। মন্থর সকাল। দূরে কোথাও থেকে মিস্ত্রিদের হাতুড়ি পেটার শব্দ ভেসে আসছে।

চুয়া ঠোঁট খুললো। 'আমি অরূপ কেউই বোধ হয় কারো মনের নাগাল পাচ্ছি না। অথচ এতো কাছাকাছি আছি। আগে অরূপ কানপুরে পড়তো, শারীরিকভাবে দূরে দূরে থেকেও আমরা সব সময় দুজনে দুজনের চিন্তায় মশগুল হয়ে থাকতাম।'

অনন্যা হাঁটুতে থুতনি রেখে শুনছিলো। তার স্পষ্ট মনে আছে, অরূপের বাইশ বছরের জন্মদিনে কি দারুণ ঘটা করে বাজার করেছিলো তারা। প্রত্যেকটা বছরের প্রতীক হিসেবে একটা করে উপহার, অর্থাৎ সব মিলিয়ে বাইশ রকম জিনিস সাজিযে একেবারে বিয়ের তত্ত্বের মতো ডালা পাঠানো হয়েছিলো।

কানপুর আই আই টি-তে ইঞ্জিনিয়ারিঙের ছাত্র ছিলো অরূপ, দারুণ ব্রিলিয়ান্ট, একের পর এক পরীক্ষা দিচ্ছে আর উতরে যাচ্ছে, এই সময় একবার পুজোয় কলকাতা এসে চুয়ার সঙ্গে আলাপ হলো। সঞ্চিতের ছেলেবেলার বন্ধু তারা দুজনেই, অথচ আগে কখনও চাক্ষুষ দেখেনি পরস্পরকে। সেই যে দেখা হলো, দেখতে দেখতে গভীর প্রেম। চলে যাওয়ার পরও অরূপ একের পর এক চিঠি পাঠাতে লাগলো। কোনোটা চারপাতা, কোনটা দশপাতা, এখনও মনে আছে খামের ভার দেখে সে হেসে ফেলেছিলো। বাঁ দিকে আবার গোটা গোটা অক্ষরে লেখা থাকতো, 'ব্যক্তিগত'। চুয়াও কেবল দিন গোনে, আবার কবে দেখা হবে। শুধু চিঠি নয়, সে আবার টেলিগ্রামে প্রেমের বার্তা পাঠাতো। একবার টেলিগ্রাম ফর্মের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার ব্যাকুলতার কথা লিখছে, পোস্ট অফিসেব লোকটি দেখেটেখে বললো, 'হুঁ— এতো দরকার নেই। লিখুন কাম শার্প।'

প্রেমের এমনই তাগিদ, সেই অরূপ আই আই টি-তে পড়াশুনো শেষ না কবেই চলে এলো। চুয়ার জন্য। আপাতত চাকরি খুঁজছে। শিগগিরই বিয়ে করবে ওরা।

চুয়া বলে চললো, 'তখন বুঝিনি, আসলে একেবারেই মনের মিল নেই আমাদের। নয়তো ও চলে আসার পর এতো অল্পদিনের মধ্যেই এতো বিটারনেস, খিটিমিটি?'

'ডেফিনিট কোনো কারণ আছে, তা নয়—' অনন্যা ভুরু কুঁচকালো। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। সব কিছুবই একটা কারণ তো থাকে।'

চুয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'জানি না। হয়তো আমরা বড্ড বেশি আশা করেছিলাম পরস্পরের থেকে, ভেবেছিলাম প্রত্যেক মুহূর্তে একটা দারুণ থ্রিল থাকবে।'

'প্রত্যেক মুহূর্তে থ্রিল? তা তো হয় না চুয়া—'

চুয়া ঠোঁট কামড়ালো। 'আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না তোকে। তুই হয়তো আমায় খুব শ্যালো ভাবছিস। কিন্তু ... কিন্তু তা না... আমাদের.. সব কথা যেন ফুরিয়ে গেছে। এমনকি গল্প করার মতোও তেমন কিছু নেই। আমি কবিতা ভালোবাসি, গান ভালোবাসি, ওর জগৎটা একেবারে অন্য, জানিস—'

অনন্যা বললো, 'ও ওরকম মনে হয়। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

চুয়া বিষণ্ণভাবে বললো, 'এতো প্রবলেম, এতো বাধা পেরিয়ে আবো ভয়ানক একটা সমস্যার মুখোমুখি হলাম আমরা। সত্যি বলছি, জীবনে কোনোদিন এতো ডিপ্রেসড ফিল করিনি'— বুকের ভেতরের একটা অদ্ভুত চাপা কষ্ট নিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো চুয়া। বললো, 'অনন্যা বলতে পারিস, কবে আমি আবার সহজভাবে হাসতে পারবো, গান গাইতে পারবো?'

অনন্যা তার দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ে বললো, 'শোন চুয়া, প্রেম মানে তো শুধু কবিতা আর শিল্পের কথা বলা নয়, সে সব তো সেমিনার-টেমিনারেও আলোচনা করা যায়। কমিউনিকেশন হলো নিজের সবচেয়ে ব্যক্তিগত কথাগুলো বলতে পারা। ছেলেবেলার কথা, কি স্বপ্ন দেখলি তার কথা...'

চুয়া তাকে থামিয়ে দিয়ে বিষণ্নভাবে হাসলো, 'আমি তোকে কিছুই বোঝাতে পারছি না।' বলে উশখুশ করার ভঙ্গিতে শব্দ করে আঙুল মটকাতে লাগলো। তারপর একসময় জানালার ধারে উঠে গিয়ে চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ। কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পর আস্তে আস্তে বলে উঠলো, 'বিয়ে আমি শিগগির করবো। দেরি করে কী লাভ? দ্যাখ, মা-বাবা এখন আছেন, চিরকাল তো আর থাকবেন না; আর মাকে ছাড়া আমি কি করে ওই একই বাড়িতে দিন কাটাবো? তার চেয়ে এখন থেকেই অভ্যস্থ হওয়া ভালো, ইজন্ট ইট? তাছাড়া দেখতে দেখতে আমাদের তিরিশ বছর বয়েস হবে...'

অনন্যা যান্ত্রিকভাবে মাথা নাড়ালো, কিন্তু মন থেকে ঠিক সায় দিতে পারলো না। চুয়া যে এতো প্র্যাকটিকাল হয়ে যাবে, এটা মেনে নেওয়া কঠিন। একজনকে জীবনসঙ্গী করতে চলেছে, তার পিছনে এই কি যথার্থ যুক্তি?

চুয়ার পাশে জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়ে অনন্যা বললো, 'কেন জানি মনটা খুব খারাপ লাগছে, চুয়া।'

'কেন রে?'

'জানি না।'

'বল, একটু ভেবে বল আমায়, প্লিজ—'

অনন্যা বললো, 'হয়তো আমার মনে হচ্ছে, জীবনের একটা পর্যায় শেষ হয়ে গেলো।'

চুয়া বললো, 'তোর কি মনে হচ্ছে, আমাদের হাসিখুশির দিনগুলো শেষ?'

'হ্যাঁ, হয়তো তাই—'

অনন্যা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। জানালার দিকে পিঠ, একটা গ্রিলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, চুলগুলো অল্প অল্প উড়ছে হাওয়ায়, দূর থেকে সিটি বাজিয়ে চলে গেলো মেট্রো রেল। তাদের বাড়ির কাছেই মেট্রো রেলের শব্দটা খুব আধুনিক, যেন একুশ শতকীয়। প্রায় যেন মনে হয়, রকেট ছাড়তে চলেছে। কি গতি, কি উত্তেজনা, তার আর চুয়ার জীবনের মতোই যেন। গত এক বছরে সে আর চুয়া কতো নতুন নতুন অভিজ্ঞতা, জায়গা, বন্ধু, বান্ধবী আবিষ্কার করেছে। তাদের মধ্যে একজন ছিলো মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের ছেলে, খুব লম্বা, কপালে একটা কাটা দাগ, চোখে অদ্ভুত ঠান্ডা নিরাসক্ত ভাব খেলা করতো।

ফোর্ট উইলিয়ামে একটা বাংলোতে থাকতো। তার বাড়ির নুড়ি বিছানো ছাদে বসে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলতো, 'অনন্যা, আমি রাতে ঘুমোতে পারি না, ব্লুস্টার অপারেশনের সময় আমি নিজে হাতে গুলি চালিয়েছি। একটা লোক আমার চোখের সামনে...' — বলতে বলতে সে চোখ বুজে মাথা ঝাঁকাতো। 'আমি শুধু রক্ত দেখি। রক্ত, রক্ত—'

তার পুরুষালি, লম্বা-চওড়া চেহারায় এতো আর্তি, এতো যন্ত্রণা ফুটে উঠতো যে অনন্যার কষ্টই হতো তার দিকে তাকিয়ে। মাত্র চব্বিশ বছর বয়েস ছেলেটার। বাবা-মা থাকেন পাঞ্জাবে। বাড়ি ছেড়ে কতো দূরে, কতো জটিলতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

সে সহমর্মিতার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আপন মনেই মাথা ঝাঁকাতো। 'তুমি সার্ত্রের 'আয়রন ইন্ দ্য সোল' পড়েছো?'

ছেলেটি মাথা তুলে বেদনার্ত লালচে চোখে তাকাতো। 'না তো, কী আছে তাতে?'

অনন্যা বলতো, 'আসলে কেউই কাউকে ঘৃণা করে না। যে মারে, তার যন্ত্রণাটা মৃতের কষ্টের চেয়ে বেশি।'

ছেলেটি জানালার শিক শক্ত করে ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতো। অনেক গাছ দেখা যেতো তার বাড়ি থেকে, কৃত্রিমভাবে তৈরি উঁচু-নিচু টিলা।

চুয়া জানালার ধার থেকে সরে এসে বললো, 'সেদিন আমার কি মনে হচ্ছিলো জানিস তো?'

'কবে?'

'যেদিন গাড়িতে আমরা রাজীবদের সঙ্গে যাচ্ছিলাম। তুই মাথাটা পেছন দিকে সামান্য ছুঁড়ে দিয়ে মিউজিক শুনছিলি, তোর চুল উড়ছিলো। আমার কি মনে হচ্ছিলো জানিস? হঠাৎ বুকের ভেতর কেমন ধক্ করে উঠলো, হঠাৎ কেন মনে হলো, অনন্যা যদি মারা যায়, আজ যদি অ্যাক্সিডেন্টে ও মারা যায়, আর কেউ জানবে না, ও কে ছিলো, ও কি ভাবলো, জীবনে কী চাইতো, এমন কি অর্জুনও জানবে না।'

অনন্যা হাসলো। 'মারা যাবো— শারীরিকভাবে, না মরালি?'

চুয়া বললো, 'মরালি— যদি তুই ছবি আঁকা ছেড়ে দিস।'

অনন্যা বলছে, 'আর তুই নাচটা আবার শুরু কর তো। তোর সত্যিই ট্যালেন্ট আছে!'

চুয়া বিষণ্ণভাবে হাসলো। 'আমি জানি সেটা। কিন্তু কিছু হচ্ছে কোথায়। যাই করতে যাচ্ছি, একটা না একটা বাধা আসছে।'

অনন্যা উঠে দাঁড়িয়ে একটা তোয়ালে কাঁধে ফেললো। 'তুই একটু বোস চুয়া, আমি মুখ ধুয়ে আসছি। ততক্ষণ...' বলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে চোখ দিয়ে কি খুঁজলো অনন্যা। বললো, 'ততক্ষণ এই ম্যাগাজিনগুলো দ্যাখ। অ্যানা পাভলোভা বিষয়ে একটা রাইট-আপ আছে, পড়—' বলে কয়েকটা পত্রিকা তার দিকে ছুঁড়ে দিলো।

চুয়া সেগুলো লুফে নিলো। 'আমি ট্রাই করছি পড়তে, কিন্তু আজকাল বসে বইও পড়তে পারি না।' বলে সে ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, 'আহ অনন্যা, সব ঠিক হয়ে যাবে, কি বল? গুড টাইমস উইল কাম...'

'অফ কোর্স!' বললো অনন্যা।

চুয়া হঠাৎ উঠে বসে বললো, 'তুই থিয়েটার রোডে সেই আর্ট ডিলারের কাছে গিয়েছিলি? আমি কি ভাবছিলাম জানিস, তোর দু-একটা ছবি বিক্রি হলে কিছু পয়সা হাতে আসবে, কদিনের জন্য শান্তিনিকেতন ঘুরে আসবো সবাই মিলে—'

অনন্যা বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো। একেকটা সময় যায় একরকম, যখন মানুষ বাজিতে হারে, ভুল তাস তুলে নেয়। কিছুই যেন ঠিক লাগছে না, যেখানে যাচ্ছে, ব্যর্থ হতে হচ্ছে। বিদেশে পড়তে গিয়েছিলো, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় কোর্স কমপ্লিট না করেই ফিরে আসতে হলো। চুয়ার কথামতো গিয়েছিলো থিয়েটার রোডে এন মালহোত্রা বলে এক আর্ট ডিলারের কাছে, তিনি দেখাও করলেন না। অনন্যা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে কল খুললো। একটা অন্যমনস্ক ভাব ফুটে উঠলো তার চোখে। চুয়া ট্যালেন্টের কথা বলছিলো। ট্যালেন্ট কি, সে ঠিক বোঝে না, এটুকু জানে, ছবি আঁকতে বসলে সে সব ভুলে যায়— এটা অতি প্রিয় বিনোদন। কিন্তু রঙ, ক্যানভাস, তারপিন তেল—আজকাল বড্ড দাম এসব জিনিসের। অয়েলে আঁকা প্রায় যেন বিলাসিতা হয়ে

দাঁড়িয়েছে, তাই সাধারণত জল রঙ বা প্যাস্টেলই সে ব্যবহার করে, কিন্তু মাঝে মাঝে তো ইচ্ছে হয় মস্ত দশ বাই বারো ক্যানভাসে হাত দেবে, বা একটা দেওয়াল জোড়া মিউরালের কাজে মশগুল হয়ে থাকবে। সে সুযোগ কেউ কি তাকে দেবে কোনোদিন? কাজের সুযোগ পেলেই হলো, তা সে যে শর্তেই হোক, এমনকি রুবেন্স, হলবাইন, টিশিয়ানের মতো মহৎ শিল্পীরাও তো পোষ্য ছিলেন রাজার। সে মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে আলতো করে তোয়ালে চেপে মুখ মুছলো। চুয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিলো, এন মালহোত্রা বলে এক আর্ট ডিলার বম্বে থেকে এসেছেন, তিনি নাকি তরুণ শিল্পীদের ছবি কিনতে ইচ্ছুক। থিয়েটার রোডের একটা অফিসে যোগাযোগের ঠিকানা দেওয়া ছিল, জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদে ভিড়ের বাস ঠেঙিয়ে অনন্যা আর সৌমিল্য সেখানে গেলো। দুটো ক্যানভাস অনন্যার বগলদাবা করা, সৌমিল্যর হাতে তিনটে। গরমে দুজনেরই কপালে দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ভিড়ের মধ্যে প্রায় পিষ্ট হতে হতে অনন্যা কোনোমতে ক্যানভাসগুলো বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, এই সময় পাশ থেকে এক ভদ্রলোক এমনভাবে ধাক্কা দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেলেন যে যন্ত্রণায় অনন্যার মুখের রেখাগুলো কুঁচকে গেলো।

থিয়েটার রোডে একটা বহুতল বাড়ির সাততলায় সেই অফিস। লোডশেডিং। লিফট চলছিলো না বলে সিঁড়ি ভেঙেই উঠতে হলো। সৌমিল্য কপালে রুমাল চেপে ঘাম মুছলো। 'আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি। তুমি ঘুরে এসো।'

ক্যানভাসগুলো নিয়ে খানিক পরেই ফিরে এলো অনন্যা। ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করেননি। সৌমিল্য চোখের কোণের খুশি খুশি ভাবটা গোপন করতে গিয়ে হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেলো। অনন্যা লক্ষ করেছে, তার অসুবিধের মুহূর্তে সৌমিল্য যেমন বন্ধুর মতো ঘনিষ্ঠ হয়ে পাশে দাঁড়ায়, তেমনি তার এই সব মুশকিলগুলো যেন উপভোগও করে। যেন তাকে অনিরাপদ, অসহায় দেখতেই সে চায়।

বাথরুমের দরজায় কে যেন দুম দুম করে ধাক্কা দিচ্ছে। অনন্যা দরজা ফাঁক করলো।

চুয়া দরজার কাছে এসে গলা নামিয়ে বললো, 'তোর সেই বীরুকাকু না কে, তিনি এসেছেন।'

অনন্যা ছিটকিনিতে হাত দিলো। 'আমি আসছি। তুই একটু বসতে বল ওঁকে। জানিস তো, বীরুকাকু দারুণ হাত দেখতে পারেন।' একটু মুচকি হাসতে হাসতে দরজা বন্ধ করলো। সে জানে, এতো বড়ো আকর্ষণ আর কিছুতেই বোধ করবে না চুয়া। অনেকেরই হাত দেখানোর শখ থাকে, কিন্তু চুয়ার এ ব্যাপারে উৎসাহটা একটু যেন বেশী। খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী সে, জীবন থেকে অনেক কিছু আশা করে, হয়তো সেইজন্যই এতো প্রবল আগ্রহ। কোথায় কোন সাধুবাবা আছেন, খুঁজে খুঁজে যায়। অথচ আজ অবধি জ্যোতিষীরা যা কিছু বলেছেন, সবই মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে তার জীবনে। এটা মনে করিয়ে দিলে অবশ্য হেসে ফেলে। কিছুদিন আগে অনন্যা এক জায়গায় দরখাস্ত করেছিলো, কিন্তু চাকরিটা তার হয়নি। সেই থেকে চুয়া ধরে পড়েছে, একটা গোমেদের আংটি নাকি পরতেই হবে তাকে। কোন এক জ্যোতিষী নাকি স্পেশাল অর্ডার দিয়ে সেটা করিয়ে রেখেছেন। অনন্যাও কিছুতেই পরবে না। এই নিয়ে দুজনের কতো বিতর্ক।

অনন্যা ঝপাঝপ স্নান শেষ করতে লাগল। বীরুকাকুকে আবার বসিয়ে রাখা চলবে না। একেকজন লোক থাকে রাগী, অহংকারী ধরনের, তিনি বালকের মতো চঞ্চল। এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসতে হলেই একটু উশখুশ করেন। বছর সাতেক হলো তাঁর স্ত্রী নীলিমা ক্যান্সারে

মারা গেছেন। সেই থেকে জ্যোতিষী নিয়ে পড়েছেন। শুধু বই পড়া বিদ্যা নয়, সাধুসঙ্গও করেন। তাঁর ওই নতুন শখটি নিয়ে কোনো চটুল মন্তব্য বা রসিকতা করলে তিনি হেসে চোখ দুটো সামান্য কুঁচকে বলেন, 'দ্যাখো বাবা, রবীন্দ্রনাথও প্ল্যাঞ্চেট করতেন।'

রসিকতা অবশ্য বড়ো একটা করে না কেউ, বরং তিনি এলে হাত দেখানোর হিড়িক পড়ে যায়, যদিও মুখে অনেকেই কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেয়। এমন কি অনন্যাও তাঁর সামনে হাতের পাতা দুটো মেলে দিয়ে বলেছিলো, 'দেখো তো কাকু, একটা কিছু হবে কি না।'

'একটা কিছু মানে? কি হওয়ার কথা বলছিস?' জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি।

অনন্যা ঘাবড়ে গিয়ে মাথা চুলকেছিলো। 'আমি যা-ই কবতে যাচ্ছি, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছি না।'

বীরুকাকু মৃদু হেসেছিলেন, তাই দেখে অনন্যা ব্যস্ত হয়ে বললো, 'হাসছো যে?'

বীরুকাকু দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, 'করবিটা কী, এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে?'

বসার ঘরে পা দিয়ে অনন্যা দেখলো, বীরুকাকু ঝুঁকে পড়ে চুয়ার হাত দেখছেন। বেশ অনেকক্ষণ ধরেই পরীক্ষা চলছিল বলে মনে হলো। অবশেষে হাতের পাতাটা একবার আলতো করে উল্টেই ছেড়ে দিলেন।

চুয়া প্রায় তাঁর গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'বলছেন বিয়ে হবে? শিগগিরই?'

'সম্ভবত।' বললেন বীরুকাকু।

'সুখী হবো?'

চুযার অধীর কাঁচা মুখখানার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন বীরুকাকু। একটা হাল্কা হাসি ফুটে উঠলো তাঁর ঠোঁটের কোণে। এই হাসি অনন্যা চেনে। বড়ো বিপজ্জনক এই হাসি। এর মানে বীরুকাকু এ ব্যাপারে আর মন্তব্য করবেন না, অথচ তাঁর মনের ভাবটাও ধোঁয়াটে থেকে যাবে।

এ প্রসঙ্গে চুয়ার পীড়াপীড়ি এড়াতে অনন্যা তাড়াতাড়ি যোগ করলো, 'জীবনে প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি এসব পাবে ও?'

'পাবে।'

'কবে পাবো? আমার সুদিনটা কবে আসবে?' নাটকীয়ভাবে বলে উঠলো চুয়া।

অনন্যা বীরুকাকুর দিকে তাকালো। দুই যুগেরও বেশি বয়েসের ব্যবধান তাঁদের মধ্যে, তাই বোধ হয় তাঁকে ঠিক বোঝানো যাবে না, চুয়ার সমস্যাটা কতো গুরুতর। যে জিনিসটাকে এতোদিন মোক্ষ ভেবে এসেছে, তাই-ই শূন্য হয়ে ধরা দিয়েছে। এর চেয়ে বড়ো যন্ত্রণা কি হতে পারে আর!

বীরুকাকু চশমা খুলে মুছতে মুছতে বললেন, 'অসাধারণ জীবন তোমাদের দুজনেরই। এতো ভালো দুটো হাত সচরাচর দেখা যায় না।'

'মানে?'

'তোমরা দুজনেই খুব ভাগ্যবতী, সুসময়ে ভরা জীবন।'

চুয়া উদ্‌গ্রীব হয়ে জিগ্যেস করলো, 'তা আমাদের জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়টা কবে আসবে?'

বীরুকাকু চশমা চোখে দিয়ে বললেন, 'কেন, এটাই তো সবচেয়ে ভালো সময়।'

বীরেন্দ্র রায় দুটি নিরাশ তরুণ মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মানুষ অপেক্ষা করে, শুধু অপেক্ষা করে, কখনও অ্যানুয়াল পরীক্ষার, কখনও চাকরির, কখনও বিয়ের। তাঁর বয়েস যখন অনন্যার মতো, তখন তাঁরা বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। একবার সম্বিৎ তাঁর কাছে চলে এসেছিলো বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে। পকেটে পয়সা ছাড়াই তাঁরা চলে গিয়েছিলেন দীঘা। ঝাউবনে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তখন কিন্তু বোঝেননি, এটাই সবচেয়ে ভালো সময়, এই মুহূর্ত!

সরোজিনী

সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়

বুড়ো শিবতলায় বাস থেকে নেমে ধন্দে পড়ে গেল গোলক।

স্টপটার নাম বুড়ো শিবতলাই বলেছিল বটে চন্দ্রনাথ। দুস্টপ আগেই কনডাকটর মনে করিয়ে দিয়েছে। তো সেই তখন থেকেই ছেলেটাকে কোলে নিয়ে রেডি হয়েছিল। গোলকের ডান কোলে ছেলে, বাঁ কাঁধে ঢাউস একটা ব্যাগ। টাল সামলানোই মুশকিল। ভিড় বাসে এর তার গা জ্বালানো কথা শুনতে শুনতে এই সন্ধের মুখে বাস থেকে নেমে হাঁ করে চারদিকটা পরখ করছিল সে।

ছেলেটা বাপের পাঞ্জাবির খুঁট শক্ত করে ধরে আছে। হাওড়ায় জুজুশ্বরের বাসে ওঠার পর মল্লিকফটকের কাছে এসে একবার বমি করেছিল, তারপর বাপের কোলে নেতিয়ে পড়ে ছিল সারাটা রাস্তা. এতক্ষণে বুঝি পায়ে ভর হল। বাসরাস্তার ওপর কয়েকটা কুকুর হল্লা করছিল. সেদিকে চোখ পড়তে ছেলে ভয় পেয়ে বাপের কোমর জড়িয়ে ধরল। জন্মের পর থেকেই এরকম। রোগা, দুবলা আর ভীতু। কে বলবে সামনের ফাল্গুনে এ ছেলে সাত পেরিয়ে আটএ পড়বে?

বাসস্টপের কাছেই একটা মাঝারি সাইজের বটগাছ. নিচে একটা বাঁশের মাচা বাঁধা আছে। গাঁয়ের লোকেরা বোধ হয় এখানে বসে আড্ডা-ফাড্ডা দেয়। তবে এখন কেউ নেই। পায়ে চলা পথটা বটগাছের পাশ দিয়ে গিয়ে একটা ঠাসবুনোট বাঁশবাগানের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে। আকাশে এক টুকরো আলতা ছোপানো মেঘ দেখল গোলক। বহুকাল এসব জিনিস খেয়াল করে দেখা হয় না। একটু গা-ছমছম করলেও গাছ-গাছালির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গোলক বুঝতে পারে পৃথিবীর সব আলো মরে যায়নি এখনও। সবে সন্ধে হল।

গোলক ছাড়া এখানে আর কেউ নামেনি। লোকজন কাউকে দেখাও যাচ্ছে না। ও জায়গায় দাঁড়িয়ে আশেপাশে কোনও জনবসতি আছে কিনা বোঝা মুশকিল। হাইরোড বোধ হয় খুব দূরে নয় এখান থেকে, মাঝে মাঝে লরি চলাচলের গুম গুম শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। বাঁশবাগানের পথটা ধরে এগোনো ছাড়া আপাতত আর কোনও উপায় নেই। গোলক ব্যাগের চেন খুলে দু ব্যাটারির টর্চটা বার করে নিল। ভাদ্র মাস শেষ হতে চলেছে, গুমোটের শেষ নেই। ঘাম হচ্ছিল খুব। কী কান্ডজ্ঞান চন্দ্রনাথটার! গোলক কতবার করে বলে রেখেছিল, বাসস্টপে যেন থাকে। এত বলা সত্ত্বেও...

অবশ্য চন্দ্রনাথকে ঠিক দোষও দেওয়া যায় না। বকুলতলার কাছে একটা ট্যাংকার উল্টেছে সকালে, প্রবল জ্যাম-এ বাসটা আটকে ছিল অনেকক্ষণ, ঘণ্টাখানেকের ওপর তো বটেই। হয়তো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ফিরে গেছে সে। পা বাড়ানোর আগে গোলক বলল, হ্যাঁরে দাশু, তোর চাঁদুকাকা বুড়ো শিবতলাই বলেছিল তো?

একটা ঢোঁক গিলে দাশু বলল, তাই তো বলেছিল মনে হয়!

ধীরে ধীরে আবার চনমনে হয়ে উঠছে ছেলেটা। একটা চোরা হাওয়ার ঝাপটা খেল দুজনেই। বৃষ্টি আসছে নাকি? গোলক আকাশের দিকে তাকাল। মাথার ওপর দিয়ে পাখিদের একটা বিশাল ঝাঁক পশ্চিমে ভেসে যাচ্ছে, দাশু হাঁ করে দেখছিল। গাছ-গাছালির ছায়ায় অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে, সারাদিনের শেষে বাঁশবাগানে ফিরে এসে ধানশালিকগুলো তারস্বরে ডাকছিল। একটু পরেই চুপ মেরে যাবে। তখন ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে আড়মোড়া ভেঙে ঝিঁঝিরা বেরোবে। এখনই তাদের দু-একটা ডাক শোনা যাচ্ছে।

ছেলের কথা শুনে অন্যমনস্ক গোলক বলল, ঠিক ঠিক মনে আছে তো রে?

— হ্যাঁ, বাবা। বুড়ো শিবতলাই, মনে পড়ছে!

বলে বাপের ডান হাত শক্ত করে ধরল দাশু। ডান হাতে টর্চটাও ধরা আছে, বাঁ হাতে ব্যাগ। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে গোলক বলল, হাত ধরিস না, আমার পেছন পেছন আয় তুই।

বাঁশ বাগানে ঢুকেই ওয়াক করে থুতু ফেলল গোলক। গাঁয়ের লোকেরা বোধ হয় বাঁশঝাড়তলাটাকে ল্যাট্রিন হিসেবে ব্যবহার করে। দুর্গন্ধে টেঁকা মুশকিল। চারদিকটায় একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। টর্চের গোল আলো পড়তেই পথের রেখাটা স্পষ্ট হল। লম্বা পা ফেলছিল গোলক। পেছন পেছন ছেলেটা প্রায় ছুটছে।

চন্দ্রনাথের চাপাচাপিতেই আসা। কিন্তু আসাটা ঠিক হল কি? চন্দ্রনাথ বলেছিল, মেয়ে আমাদের দেখতে শুনতে খারাপ নয়, গোলকদা। গায়ের রংটাই যা একটু মাজা মাজা, বয়সও তিরিশের ওপর। তোমার সঙ্গে বেশ মানাবে, দেখো। যদি এখানে কাজটা কর তবে মা-বাবা-হারা মেয়েটার একটা গতি হয়, আমিও বেশ বাঁধনছাড়া হতে পারি। সংসারে ওই একটাইতো বাঁধন আমার!

বলে কেমন উদাস চোখে তাকিয়েছিল চন্দ্রনাথ। সন্ধেবেলায় দোকানের কাউন্টারে তখন কাস্টমারদের ভীড়, ছোকরা কর্মচারিটা তাল সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। ওপরের তাক থেকে গুঁড়ো সাবানের প্যাকেট নামাতে গিয়ে হুড়মুড় করে ফেলল সব। মশা তাড়ানোর ধূপের বান্ডিল, নারকোল তেলের কৌটো, আমূলের টিন। যেন ভূমিকম্প হচ্ছে দোকানে। আগুন চোখে ছেলেটাকে দেখছিল গোলক। অন্যদিন হলে চড়চাপড় যাহোক একটা কিছু পড়ত। চন্দ্রনাথ সামনে থাকায় বেঁচে গেল।

চন্দ্রনাথ এলেই গোলমালগুলো হয়। বাঘাযতীন স্টেশনের বাইরে গোলকের স্টেশনারি কাম-গ্রসারি— সিটি ভ্যারাইটি স্টোরস। অফিস-ফেরত বাবুরা প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমেই তার দোকানটাকে সামনে পায়। টুথব্রাশ, পেস্ট, সাবান, বিস্কুট। মেয়েদের প্রসাধনী, বেবিফুড। চাল, ডাল, নুন, তেল। সবই রাখে গোলক। সাউথ সেকশনে কাজে বেরোলে চন্দ্রনাথও আসবে ঠিক এসময়। পূর্ববঙ্গের একই গাঁয়ের ছেলে। একাত্তর সনে রাজাকার বাহিনীর ঠেলা খেয়ে এসে উঠেছিল আগরতলার হাঁপানিয়া ক্যাম্পে। তখন সদ্য যুবক, দু'বন্ধুতে চলে গেল মুক্তিযুদ্ধে। দেশ স্বাধীন হবার পর জন্মভূমিও ফিরিয়ে দিয়েছিল দুজনকে, কলকাতা ফেরায়নি। কলকাতা কাউকে ফেরায় না। রাজাকারদের হাতেই কাটা পড়েছিল চন্দ্রনাথের বোন-ভগ্নিপতি। ভাগনি তখন খুব ছোট, কী করে যেন খাটের তলায় লুকিয়ে বেঁচেছিল। পাড়া সম্পর্কে এক জ্যাঠার আশ্রয়ে ছিল অনেকদিন, পরে একবার চোরাই পথে গিয়ে ভাগনিটাকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিল চন্দ্রনাথ।

তুই কি আমাকে পাগল করবি, চাঁদু? ছেলে বড় হচ্ছে, বয়সও আর নেই। এখন আর নতুন করে ঝামেলায় জড়াতে পারব না!

একটা শ্বাস ফেলে গোলক বলেছিল। শ্যামলীর মৃত্যুর পর থেকে ভেতরটা কেমন ফাঁকা হয়ে আছে। আজ ছ'বছর হতে চলল। ও জায়গা এ জন্মে আর ভরাট হবার নয়। গোলক জানে।

হাওড়ার মঙ্গলা হাট থেকে জামাকাপড় নিয়ে ক্যানিং-লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে ফিরি করতে যায় চন্দ্রনাথ। মাঝে মাঝে রায়চক হয়ে কুঁকরোহাটার দিকেও চলে যায় সে। বাঁধা সব খদ্দের। পাতানো দিদি, বউদি। সামান্যই আয়। তবে সে সব নিয়ে মাথাব্যথা নেই তার। একা লোক, বিয়ে-থা করেনি। ত্রি-সংসারে থাকার মধ্যে আছে ওই ভাগনি।

গোলকের কথা শুনে চন্দ্রনাথ হেসেছিল, কী যে বল তুমি, গোলকদা! কত আর বয়স হবে তোমার? মেরেকেটে পঁয়তাল্লিশ? পনেরো বছরের ছোটবড় কি খুব বেশি হল? তাছাড়া মরবার আগে বউদিকে আমি কথা দিয়েছিলাম...?

ডায়লগের এই জায়গাটায় এসে থেমে যায় চন্দ্রনাথ। কী কথা দিয়েছিল সে দাশুর মাকে? সত্যি দিয়েছিল? শেষের মাসখানেক তো শ্যামলী কথাও বলতে পারত না। ড্যাব ড্যাব করে শুধু তাকিয়ে থাকত। ন'মাসের দাশু তখন সবে হামাগুড়ি দিতে শিখেছে, পাড়ার দিদি-মাসিদের কোলেই বড় হচ্ছিল সে।

বাঁশবাগান পেরিয়ে একটা কাঠের পোল। নিচে একটা খাল আছে। একটা মাছই বোধহয় খলবলিয়ে উঠল সেখানে। ভয় পেয়ে বাপের হাত আবার জোরে আঁকড়ে ধরেছে দাশু। আকাশে চাঁদ নেই, তারাও দেখা যাচ্ছে না। মেঘ করল নাকি? পোলের ওপরে উঠে গ্রামের আদলটা ঠাহর করবার চেষ্টা করছিল গোলক। খালের পাড় থেকে একটা পায়ে চলা পথ এঁকেবেঁকে ঢুকে গেছে গ্রামের ভিতরে। একটু দূরে খানকতক দোকানও দেখা যাচ্ছিল। দোকান মানে চালাঘর। তবে ইলেকট্রিকের আলো আছে। আজকাল সব গাঁয়েই ইলেকট্রিকের লাইন ঢুকে গেছে। কত উন্নতি হচ্ছে দেশের। শুধু কলকাতাটারই কিছু হল না।

রোবরার দেখেই একদিন আসতে বলেছিল চন্দ্রনাথ। কয়েকটা রোববার বাদ দিয়ে সেই আসা হল। শ্যামলীর মৃত্যুর পর এই প্রথম কলকাতার বাইরে বেরোনো। শ্যামলী বেঁচে থাকতে কালেভদ্রে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হত। বিদ্যেধরপুর স্টেশনে নেমে ভ্যান রিকশায় মাইল পাঁচেক। এরকমই বাঁশবাগান, পানাপুকুরে হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক, সন্ধেবেলায় আকাশ ডিঙিয়ে পাখিদের ঘরে ফেরা। তো হুট করে মরে গেল বউটা জরায়ুর ক্যানসারে। বড় কষ্ট পেয়েছিল শেষের দিকটায়।

একটা মুদিখানা, একটা সেলুন, গোটা দুই চায়ের দোকান। হতদরিদ্র চেহারার খদ্দের দুচারজন দেখা গেল। মুদির দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে একটু অস্বস্তি হচ্ছিল গোলকের। একবার মনে হল— দূর, না এলেই হত। দুপুরে জমিয়ে একটা ঘুম দেওয়া যেত বেশ। সপ্তাহের এই একটা দিনই দোকানের ঝাঁপ ফেলা থাকে। কিন্তু সেই কোন সকালে ঘুম থেকে উঠেই ছেলেটা ঘ্যানোর-ঘ্যানোর শুরু করেছে, বাবা, আজ চাঁদুকাকার বাড়িতে যাবে বলেছিলে! চাঁদুকাকা বলে গেছে আমাকে বঁড়শি দিয়ে মাছধরা শেখাবে।

মাছধরার কথা আবার হল কবে? গোলক বলেছিল।

সেই যে একদিন রাতের বেলায় এল, বৃষ্টি হচ্ছিল বলে তুমি যেতে দিলে না, মনে নেই? সেদিনই-তো বলল।

বলে আজও সকালবেলায় কেমন চোখ গোল গোল করে তাকিয়েছিল দাশু। তখনও দোনোমোনো ছিল গোলকের। কাজের চাপে দুদিন শেভ করা হয়নি। শ্যামলীর কথা

ভাবতে ভাবতেই ভাল করে শেভ করেছে সে, যত্ন করে চুল পাট করেছে। চুল অবশ্য খুব বেশি নেই, ব্রহ্মতালুর কাছটা ফাঁকা হয়ে এসেছে প্রায়। সিঁথি অনেকখানি নামিয়ে বাঁ দিকের চুল এনে সে জায়গা ঢাকতে হয়। বাসের হাওয়া পেয়ে ওলটপালট হয়ে আছে সব এখন। মনে পড়তেই হাত দিয়ে চুল ঠিক করল সে।

দোকানের সামনে অচেনা লোক দেখে বুড়ো মুদি দোকানি বলল, কিছু চাইছেন, দাদা?

লাজুক হেসে গোলক বলল, আমরা কলকাতা থেকে আসছি। চন্দ্রনাথ রুদ্রপালের বাড়িটা কোনদিকে বলবেন?

বাঙাল চন্দ্রনাথ?

গোলক মাথা নাড়ল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তার মানে ঘটি চন্দ্রনাথও একজন তাহলে আছে এ গাঁয়ে! লোকটা খানিকক্ষণ গোলককে জরিপ করে নিয়ে বলল, ওই রাস্তা ধরেই চলে যান সোজা। সামনেই একটা পুকুর পাবেন। পুকুরটা ছাড়িয়ে বাঁদিকে ঘুরলে মাঠের ধারে চন্দ্রনাথের বাড়ি দেখতে পাবেন। কিন্তু তাকে কি এখন ঘরে পাওয়া যাবে?

গাঢ় হয়ে অন্ধকার নামছিল। কৃষ্ণপক্ষ চলছে বোধ হয়। টর্চের আলো ফেলে এগোচ্ছিল গোলক। এদিকে বোধ হয় কদিনই জোর বৃষ্টি চলছে। পথের গর্তগুলোতে জমা জল সাবধানে ডিঙিয়ে যেতে হচ্ছিল। দাশু ভয় পেয়ে মাঝে মাঝে পাঞ্জাবির খুঁট ধরে এমন টানছিল যে দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছিল।

পুকুর ছাড়িয়ে বাঁ দিকে ঘুরে খানিক এগোতেই মাঠটা পাওয়া গেল। গজ পঞ্চাশেক দূরে একটা উঁচু ঢিবি মতোন জায়গা টর্চের আলোয় আবছা দেখতে পাওয়া গেল, সেখানে পাশাপাশি দুটো মেটে ঘরই বোধ হয়, টিমটিমে একটা আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।

সর্বনাশ করেছে! এ কোন ভাগাড়ে এসে বাড়ি করেছে চন্দ্রনাথ! গোলক আলো ফেলে চারদিকটা দেখল একবার। এ মাঠটায় বোধ হয় ফসল জন্মায় না। ঘাস নেই, আগাছাও নেই। বৃষ্টির পর কাদায় ফুটবল খেলেছে বোধ হয় ছেলেরা, অজস্র পায়ের ছাপ ফুটে আছে। তারই ভেতরে অস্পষ্ট একটা রেখা খুঁজে পাওয়া গেল। চন্দ্রনাথ একবার একটা বিশাল চন্দ্রবোড়া সাপের গল্প করেছিল। তার বংশধরেরা নিশ্চয়ই আশেপাশেই থাকে।

ছেলেটা ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গেছে, গোলক সাহস দিয়ে বলল, ভয় পাসনে, আমার পেছন পেছন আয়। ব্যাগটা নিতে পারবি মাথায়?

দাশু ঘাড় হেলিয়ে বোঝাল, পারবে।

ছেলের মাথায় ব্যাগ চাপিয়ে মাঠ পেরোল গোলক। ঢিবিটায় ওঠবার জন্যে চন্দ্রনাথ বোধ হয় সিঁড়ির মতো করে মাটি কাটিয়ে রেখেছিল, বর্ষার পর এখন তার আভাসটুকু আছে মাত্র।

ওপরে উঠে ছোট্ট একটা উঠোনে পড়ল দুজনে। চমৎকার করে নিকোনো। চারদিক ঘিরে বড় বড় সব গাছ ঘন হয়ে আছে। টর্চের আলো ফেলে গোলক দেখল উঠোনের এক কোণে একটা গোরু অলসভাবে জাবনা খাচ্ছে। গোয়ালই মনে হয় তবে ওটা, ওপরে খোলার চাল দেখা যাচ্ছিল। বেশ লক্ষ্মীশ্রী আছে বাড়িটায়। তবে প্রবল মশা, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা মুশকিল। মুখোমুখি ঘরটার দাওয়ায় হ্যারিকেনের আলো জ্বলছিল।

দাশু মাথা থেকে ব্যাগটা দাওয়ার ওপর নামিয়ে রাখল। একটু আগে দেখা পুকুরটা তার মাথায় ঘুর ঘুর করছিল। ওই পুকুরটাতেই কি বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরা হবে?

লোকজন কাউকে দেখা যাচ্ছে না, গোলক গলা খাঁকারি দিয়ে ডাকল, চাঁদু! চাঁদু বাড়ি আছিস?

কোনও উত্তর নেই। প্রায় অনুমানের ওপর ভর করে এই অজ জায়গায় এসে এরকমভাবে ডাকাডাকি করতে অস্বস্তি হচ্ছিল গোলকের। একটু কেমন লজ্জা লজ্জাও করছে। না এলেই হত। কিন্তু খুব অনিচ্ছায় এসেছে কি সে? তা বোধ হয় নয়। মনের খুব গভীরে একটা ইচ্ছের বীজ কবে যেন পুঁতে দিয়েছিল চন্দ্রনাথ, আজই প্রথম টের পাচ্ছিল।

আর একবার ডেকে দেখবে কিনা ভাবছিল গোলক, কিন্তু গলায় কী যেন একটা বেঁধে আছে, ডাকা যাচ্ছে না। ছেলেকে দিয়ে ডাকালে কেমন হয়?

ঠিক এই সময় ঘরের ভেতর থেকে একটা নারীকণ্ঠ ভেসে এল, আপনারা বসুন। মামা একটু বেরিয়েছে, এক্ষুণি আসবে বলে গেছে।

কথাটা যে বলল তাকে দেখা গেল না, কারণ ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। এই তাহলে সেই মেয়ে? চন্দ্রনাথের ভাগনি? গলাটা বেশ কচি কচি ঠেকছিল। বুকের ভেতরটা কেমন গুড়ু গুড়ু করে উঠল গোলকের। এতক্ষণে হ্যারিকেনের আলোয় দাওযার কোণের দিকে পাতা চেয়ারদুটোর দিকে চোখ গেল।

চেন খুলে হাতের টর্চটা ব্যাগের ভেতরে চালান করে দিল সে। তারপর চেয়ারে বাবু হয়ে বসে আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলে দিল বাপ-ছেলে। উত্তরের আকাশ বোধ হয় মেঘে মেঘে ভারী হয়ে আসছে, একটা ভিজে হাওয়ার ছোঁওয়া পাওয়া যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। কিন্তু চন্দ্রনাথই বা কোথায় গেল এই ভর সন্ধেবেলায়?

প্রশ্নের উত্তরটা এল ঘরের ভেতর থেকে, মামা বোধ হয় আপনাদের জন্যেই বুড়ো শিবতলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুপুরেও গিয়েছিল, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ফিরে এল।

গোলক লাজুক গলায় বলল, আসলে বকুলতলার কাছে জ্যাম-এ পড়ে এই অবস্থা হল। নইলে কখন পৌঁছে যেতাম।

ঘরের ভেতরে আর একটা আলো জ্বলল এতক্ষণে, কাঁপা কাঁপা আলোটা দেখে মনে হচ্ছে টেমিই হবে। খুটখাট শব্দ আসছিল ভেতর থেকে। ঘাড়টা কেমন আড়ষ্ট হয়ে আছে, দরজার দিকে ঘুরে তাকাতে গিয়েও পারল না গোলক। ভাগনির বয়স তিরিশ না বত্রিশ কী একটা বলেছিল চাঁদু। গলাটিও ভারি মিষ্টি। তাছাড়া গ্রামের মেয়েরা যে রকম লাজুক আর আড়ষ্ট টাইপের হয় সে রকমও মনে হচ্ছে না। দিব্যি তো কথা বলে যাচ্ছে। সামনে আসছে না কেন কে জানে? চোরা দৃষ্টিতে একবার ছেলের মুখখানা দেখল গোলক। ভনভনে মশার মধ্যে ছটফট করছে ছেলেটা।

অ্যাই, তোমার নাম কী? দরজার আড়াল থেকে প্রশ্ন এল।

তাকেই প্রশ্নটা করা হচ্ছে কিনা দরজার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে সেটা বুঝতে একটু সময় নিল দাশু, তারপর মিন মিন করে বলল, দাশরথি রায়।

ডাকনাম কী?

দাশু।

ভেতরে আসবে?

দাশু বাপের মুখের দিকে তাকাল, গোলক অভয় দিয়ে বলল, যা না, লজ্জা কিসের?

দাশুর ভেতরে যাবার ইচ্ছে নেই, মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, গোলক এবার তাড়া দিয়ে বলল, যা যা ভেতরে গিয়ে বোস। এখানে যা মশা, ম্যালেরিয়া বাধালে আর রক্ষা নেই।

নিতান্ত অনিচ্ছায় দরজার দিকে এগোচ্ছিল দাশু। ভেতর থেকে চন্দ্রনাথের ভাগনি বলল, কলকাতায় তো ম্যালেরিয়া বেশ জাঁকিয়ে বসেছে।

চন্দ্রনাথের কাছ থেকে তার ভাগনির নামটা জানা হয়নি। জিজ্ঞেস করতে গিয়েও পারল না গোলক। আসুক চন্দ্রনাথ, তার হাঁকডাক থেকেই নামটা জানা হয়ে যাবে। কিন্তু কলকাতার ম্যালেরিয়ার খবর ওই মেয়ে জানল কী করে? অন্ধকারে উঠোনের ওপর ঝুঁকে থাকা গাছগুলোর জাত চেনা যাচ্ছেনা, তবে কাছেই কোথাও বোধ হয় একটা কামিনী ফুলের গাছ আছে। মিষ্টি গন্ধ আসছিল বাতাসে।

গোলক বলল, হ্যাঁ, জাঁকিয়েই বসেছে বটে, তবে আমাদের পাড়ায় ও জিনিস এখনও ঢোকেনি, এই যা রক্ষে। এত সব খবর তুমি জানলে কী করে?

বারে, খবরের কাগজে তো প্রায়ই বেরোয়!

তুমি আবার খবরের কাগজ পড নাকি?

হ্যাঁ। মামা মাঝে মাঝে বাংলা কাগজ আনে, তাতেই দেখি।

গোলক একটু দমে গেল। শেষ কবে সে খবরের কাগজ পড়েছে মনেও পড়ে না। সময় নেই, তাছাড়া কোন রাজনৈতিক নেতা কত টাকা চুরি করল, কোথায় কটা ডাকাতি বা খুন হল সে সব জানবার আগ্রহও তার নেই। দরকারি দু-চারটে খবর দোকানের খদ্দেরদের মুখ থেকেই জানা হয়ে যায়। কিন্তু এ মেয়ে তো দেখা যাচ্ছে বিদুষীও বটে!

ঘণ্টা দুয়েক বারান্দায় ঠায় বসে কেটে গেল। চন্দ্রনাথের দেখা নেই। কী বে-আক্কেলে লোক রে বাবা! দাশু সেই যে ঘরের ভেতরে সেঁধিয়েছে আর বেরোবার নামটি নেই। মাঝখানে চন্দ্রনাথের ভাগনি ছেলের হাত দিয়ে কাঁচালঙ্কা-পেঁয়াজ-তেল দিয়ে চমৎকাব একবাটি মুড়িমাখা আর চা পাঠিয়েছিল। তারপর থেকেই চোখ কেমন ঘুমে ঢুলু ঢুলু হয়ে আসছে। আশ্চর্য কাণ্ড! এখন তো সন্ধেরাতই বলা যায়, কলকাতায় অন্যদিন এসময় সিটি ভ্যারাইটি স্টোরস-এ খদ্দেরদের ঠাসা ভিড় সামলাতে দু-দুটো লোক হিমসিম খেয়ে যায়।

ঘুমই এসে গিয়েছিল। হঠাৎ কাছেই কোথায় বাজ পড়ার প্রবল শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ মেলে গোলক দেখল ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। আকাশ জমাট কালো। তীব্র স্বরে ব্যাঙ ডাকছে উঠোনের কোণে। বৃষ্টির রকম দেখে মনে হচ্ছে এ জিনিস সহজে থামবার নয়। বেশ ভালরকম একটা দুর্যোগের আভাস পাচ্ছিল গোলক। দুশ্চিন্তাও হচ্ছে। কাল পর্যন্ত এ জিনিস চললে কী হবে? এসব গাঁ-গেরামের দিকে এই ওয়েদারে বাসটাস চলবে কিনা তাই বা কে জানে? এদিকে ছেলের সাড়াশব্দ নেই, ঘরের ভেতরে কী করছে এতক্ষণ সে?

দাশু! দাশু! গোলক ডাকল।

দাশু খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। মশারি টাঙিয়ে দিয়েছি। আপনিও এবার খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ুন।

ভেতর থেকে উত্তর এল। ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার কপাট ঘেঁষে আবছা একটা মূর্তি দেখতে পেল গোলক, পেছনে টেমি থাকায় মুখখানা ঠাহব করা গেল না। একটু ইতস্তত করে গোলক বলল, চন্দ্রনাথ আসুক না, একসঙ্গেই বসা যাবেখন।

মামার কোনও ঠিক আছে? ফিরবেই না মনে হয় আজ আর। কারও বাড়ির দাওয়ায় পড়ে থাকবে হয়তো।

একটা শ্বাস ফেলে গোলক বলল, চন্দ্রনাথটার আর কাণ্ডজ্ঞান হল না!

মেয়েটা বোধ হয় হাসল একটু, মামা তো ওই রকমই!

বাইরে বৃষ্টির শব্দ জোর হচ্ছিল। দূরে গুড় গুড় করে মেঘ ডাকছে আবার। ভিজে বাতাসে কামিনী ফুলের গন্ধটা গাঢ় হয়ে উঠেছিল। মেয়েটার সঙ্গে বলার মতো কয়েকটা কথা খুঁজছে গোলক এখন। পাচ্ছে না।

আপনাকে খেতে দিয়ে দিই। রাত অনেক হল।

অনিশ্চিত গলায় মেয়েটি বলল। গোলক হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। বিজয়গড় কলোনির বাড়িতে সন্ধে ছ'টার মধ্যে রাধির মা ভাত-ডাল-তরকারি করে একেবারে ফ্রিজে তুলে রেখে যায়। ঘরে ফিরতে গোলকের সাড়ে আটটা-ন'টা হয়ে যায়। গোলক ঘরে ফেরার পর বাচ্চা কাজের মেয়েটা ছুটি পায়। খাবার গরম করে বাপ ছেলের খেতে খেতে সাড়ে ন'টা-দশটা। তারপরের আধঘণ্টার মধ্যে দু'জনেই গভীর ঘুমে। ভোর পাঁচটায় এসে কাজের মেয়েটা কড়া নাড়ে। তারপর ছেলেকে তড়িঘড়ি স্কুলের জন্যে তৈরি করতে হয়, ঠিক ছ'টায় বড় রাস্তার মোড়ে স্কুল বাস এসে দাঁড়াবে।

খেতে বসে অবাক হয়ে গেল গোলক। এরই মধ্যে কখন তিন-চার পদ রান্না করে ফেলেছে মেয়েটা। ডাল, আলুভাজা, পুঁটিমাছের ঝাল। পটলের ডালনাও আছে। ঝকঝকে করে মাজা কাঁসার থালা গ্লাস। কলকাতায় এসব জিনিসের ব্যবহার কবে উঠে গেছে! শ্যামলীর মৃত্যুর পর কেউ কি এত যত্ন করে কখনও খেতে দিয়েছে তাকে? বুকের ভিতরে একটা হাওয়া পাক দিয়ে উঠল। মনটা কেমন ধারা হয়ে গেল হঠাৎ।

শোবার ঘরের মেঝেতেই খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। লাগোয়া রান্নাঘরের কপাটের আড়াল থেকে মেয়েটির গলা ভেসে এল, আর একটু ভাত দেব?

না, না, আর কেন?

গোলক বলল। দারুণ রেঁধেছে মেয়েটা। তার ওপর এই আগুনে খিদে। খাওয়াটা কি রকম হাভাতের মতো হয়ে গেল। গোলক উঠতে যাচ্ছিল, রান্নাঘরের ভেতর থেকে গলা পেল, উঠবেন না, বসুন। আপনাদের জন্যে মামা মিষ্টি এনে রেখেছে।

চিনেমাটির ডিশে চারখানা প্রমাণ সাইজের রাজভোগ এল। এই ফাঁকে মেয়েটার মুখখানা দেখে নেওয়া যেত, কিন্তু গোলকের কেমন লজ্জা করছিল, মুখ নিচু করেই সে বলল, এতগুলো খাওয়া অসম্ভব। দু'খানা তুলে রাখ।

মেয়েটি জোর করল না, নিঃশব্দে মিষ্টি তুলে নিয়ে গেল।

বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে আঁচাল গোলক। উত্তরের ঘরটা বোধ হয় চন্দ্রনাথের, সেখানে ঢুকে দেখল উঁচু তক্তপোশে টানটান মশারি টাঙানো। ভেতরে ঘুমে হাল্লাট হয়ে আছে দাশু। জানলার কাছে ছোট্ট টেবিল, সেখানে প্লাস্টিকের জাগে খাবার জল, পাশেই উপুড় করে রাখা কাচের গ্লাস। ঘরের ভেতরে হ্যারিকেন থাকার জন্যে পোড়া কেরোসিনের একটা মৃদু গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। গাঁয়ে ঢোকার মুখে ইলেকট্রিকের আলো দেখেছিল, চন্দ্রনাথের ঘরে এসে তা কবে পৌঁছবে কে জানে? বাইরে বৃষ্টি বোধ হয় একটু মিইয়ে এল, পুকুরের দিক থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে আসছিল।

বাইরের দাওয়া থেকে ব্যাগটা ঘরে এনে কোন ফাঁকে চেয়ারের ওপর যত্ন করে তুলে রেখেছে মেয়েটি। ধুতি বার করে লুঙ্গির মতো করে পরল গোলক।

একখানা প্লেটে দু'খিলি পান নিয়ে এতক্ষণ পর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল চন্দ্রনাথের ভাগনি, পান খান তো আপনি?

পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে মেয়েটিকে দেখছিল গোলক। চন্দ্রনাথ বলেছিল তিরিশ। মিথ্যে কথা। এ মেয়ের বয়স তেইশ-চব্বিশের বেশি হতেই পারে না। বড় বড় চোখদুটিতে লুকনো কৌতুক ঝিকমিক করছিল।

পানদুটো মুখে ফেলে চিবোচ্ছিল সে। মেয়েটি চুপ করে থেকে বলল, আপনাকে একটা কথা বলব?

গোলক মুখ তুলে তাকাল।

আপনি কেন এসেছেন জানি। মেয়েটি বলল।

কী করে জানলে? মামা বলেছে?

না। তারাপদদা বলছিল।

সে আবার কে?

মামার এক বন্ধুর ছেলে। সালকের দিকে থাকে। মাঝে মাঝে মামার সঙ্গে আসে এখানে। বলে আঙুলে আঁচলের খুঁট জড়াচ্ছিল চন্দ্রনাথের ভাগনি।

কী বলেছে তারাপদ?

সব।

মেয়েটির গলা বুঝি একটু কেঁপে উঠল। একটু কান্নার ছোঁওয়া আছে, গোলক টের পাচ্ছিল। ভেতরটা কেমন দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছিল। ছল ছল চোখদুটি তুলে মেয়েটি তাকিয়ে আছে এখন। হাত বাড়িয়ে মেয়েটির রোগা হাতখানা ধরল গোলক। দুপুরবেলায় ঘর থেকে সমস্ত শরীরে অদ্ভুত একটা জ্বরভাব নিয়ে বেরিয়েছিল সে, এখন হঠাৎ যেন ঘাম দিয়ে সেটা ছেড়ে যাচ্ছে। কী কাণ্ড, এসবের মধ্যে আবার শ্যামলীর মুখখানাও যেন দেখতে পেল একবার! মানুষের মন এক অদ্ভুত বস্তু, কখন তার মধ্যে কী ক্রিয়া ঘটে বোঝা মুশকিল! গোলক ভাবছিল।

মেয়েটির হাতখানা ছেড়ে দিয়ে ফস করে একটা শ্বাস ফেলল সে, মাথায় হাত রেখে বলে ফেলল, তোমার কোনও ভয় নেই!

ভোরবেলায় চন্দ্রনাথের হাঁকে ডাকে ঘুম ভাঙল গোলকের, অ গোলকদা, সাতটা বেজে গেছে কখন! ওঠো!

বাইরে বেরিয়ে গোলক দেখল চারদিক ঝলমল করছে রোদে। কে বলবে কাল রাতে এত দুর্যোগ গেছে? দাশু কখন ঘুম থেকে উঠেছে টেরও পায়নি সে, দাওয়ায় মাদুর পেতে বাটিভরতি মুড়ি নিয়ে বসেছে এখন। সঙ্গে নারকোলের নাড়ু। বাড়িতে একটা কিছু গেলাতে গেলে কত সাধ্য-সাধনা করতে হয়, অথচ এখানে এসে হাতের কাছে যা পাচ্ছে দিব্যি খেয়ে যাচ্ছে।

অ সরো, গোলকদা উঠেছে রে, মুখ ধোবার জল দিয়ে যা!

বলে একগাল হাসল চন্দ্রনাথ। কী রকম কাণ্ডজ্ঞানহীন একটা লোক! মাঠের ধারে এই ফাঁকা বাড়িতে মেয়েটাকে একা রেখে দিব্যি বাইরে রাত কাটিয়ে এল। এখন আবার দাঁত কেলিয়ে হাসছে। গোলকের গা-পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল। মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। কিন্তু সরো মানে কী? সরস্বতী? সরোজিনী?

ফুলকো লুচি করেছে সরো। তার সঙ্গে আলুর দম। দাওয়ার সিঁড়িতে বসে গম্ভীরমুখে খেয়ে যাচ্ছিল গোলক।

চন্দ্রনাথ একটু অপরাধী ভাব করে বলল, আমার ওপর রাগ করেছ, গোলকদা? সরোজিনীকে তো বলেই রেখেছিলাম তোমাদের কথা। তোমরা আসছ না দেখে বাসুদেবপুরে গিয়েছিলাম, বৃষ্টিতে আটকে গিয়ে এই কাণ্ড হল।

সরোজিনী? হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তোর ওপর রাগ করে লাভ নেই। ওকে আমি আজই সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছি। গোলক বলল।

একগাল হেসে চন্দ্রনাথ বলল, তা নিয়ে যাও, এবার যদি ওর কপালটা খোলে! তোমার কাছে ও ভালই থাকবে, আমি তো আর তেমন যত্নটত্ন করতে পারি না ওকে।

বলতে বলতে চুপ করে গেল চন্দ্রনাথ।

ঘর থেকে বেরোতে দশটা হয়ে গেল। এ বেলা আর দোকান খোলা হল না। রাতের বৃষ্টিতে ভেজা কাঁচারাস্তা ভাল করে শুকোয়নি এখনও।

চন্দ্রনাথের কাঁধে ব্যাগ, আগে আগে হাঁটছিল। সরো আর দাশু অনেকটা পেছনে পড়ে গেছে। কাঠের পোলটার কাছে এসে দু'বন্ধুতে দাঁড়াল। ছেলেটাকে হাজারবার বারণ করা সত্ত্বেও হাওয়াই চটি পরে এসেছে, কাদার ছিটে লেগে প্যান্টের পেছনটা গেছে নিশ্চিত। রোদের তাতে মুখখানা লাল হয়ে এসেছে গোলকের, তবে বুকের ভেতরে বেশ একটা ভরাট ভাব টের পাচ্ছিল সে।

আমার কাছে ব্যাগটা দে এবার, চন্দ্রনাথ। গোলক বলল।

থাক না আমার কাছে।

দূরে মুখ নিচু করে লাজুক পায়ে হেঁটে আসছিল সরোজিনী। তার একটা হাত ধরে আছে দাশু, বকবক করে কী বলে চলেছে সে-ই জানে। বাপকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে চেঁচিয়ে বলল, তোমরা এগোও। আমি তো সরোদিদির সঙ্গেই আসছি!

চন্দ্রনাথ হাঁ করে তাকিয়ে গোলকের থমধরা মুখখানা দেখছিল। একটা শ্বাস ফেলে গোলক বলল, তোর মতো কাণ্ডজ্ঞানহীনের কাছে এ মেয়েকে ফেলে রাখা যায় না। শ্যামলীর খুব মেয়ের শখ ছিল, তাই নিয়ে যাচ্ছি ওকে। বে-থা যা দেবার আমিই দেব, তোকে আর এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না!

আগুনের ছবি

সুদর্শন সেনশর্মা

খুব জরুরী তলব পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসতে হয়েছে বিমলকে। রবিরার ছুটির দিন সে তখন বৌ-বাচ্চাকে নিয়ে বেড়াতে যাবার তোড়জোড় করছিল। তাদের এমন হয়। ফোনটা আর একটু বাদে এলেই... সে যাকগে। মোদ্দাকথা সকাল পৌনে আটটায় ফোন পেয়ে তাকে দ্বিতীয় গন্তব্যে ছুটতে হয়। আর হাসপাতালে পৌঁছে মাথা তোলারও সময় পাচ্ছেনা সে। সারা শরীর পুড়ে যাওয়া কেরোসিন গন্ধময় এক সঙ্কটাপন্ন নারীদেহ। এসে পৌঁছয় দশটা কুড়ি কি পঁচিশে।

সেই থেকে চলেছে— একের পর এক। মহিলার বয়স বাইশ তেইশ হবে। অগ্নিদগ্ধ শরীরটা এমন হয়েছে, তাকে চেনা যাচ্ছেনা। অতি দাহ্য শাড়িটা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে জায়গায় জায়গায় শরীরে সেঁটে রয়েছে। নার্সকে সঙ্গে নিয়ে জবানবন্দী নেবে বিমল। খুব কাছাকাছি পৌঁছে বীভৎস দৃশ্যে তারা আঁৎকে উঠেছিল।

পনেরো মিনিট হয়েছে-কি-হয়নি একতলার মেলওয়ার্ড থেকে ওয়ার্ড বয় জগন্নাথ ছুটতে ছুটতে এসে বলল স্যার একতলাতেও এক পোড়া রোগী এসেছে। পার্টি খুব হল্লা করছে। নার্সদিদি বললেন আপনাকে ডাকতে। ...দিদি ইনজেকশন দিয়েছেন, স্যালাইনও চলছে.. এই মহিলার স্বামীটাই... বিষণ্ণ হাসে বিমল। একেকটা দিন এমন যায়। মহিলার জন্য প্লাজম আনাতে কাগজপত্র ঠিক করছিল সে, মুখ ফিরিয়ে বলল তুমি যাও। আমি আসছি। দিনটা যেন বলছে আজ সারা দিনই হনন শৈলী দেখতে হবে। ওরাই তো একটু আগে কী সব বলে গেল, তাই না সিস্টার?

একতলার ওয়ার্ডে ঢোকার মুখে বিমল দেখলেন স্বাগতা দাঁড়িয়ে। অ্যানাসথেটিষ্ট। ওয়ার্ডের খোঁজ নিতে এসে পড়েছেন। বিমল বলে—

এই যে আপনি এসে গেছেন, আপনাকেই এসময়ে আমি খুঁজছিলাম, স্বাগতা।

স্বাগতার চোখে প্রশ্নচিহ্ন।

আপনি স্যার পারেনও! দেন ইউ আর নাউ অ্যাটেন্ডিং দিস ক্রিমিনাল। আর আজ তো আপনার আসারই কথা নয়। কালকে আপনি কি কি অপারেশন রেখেছেন দেখতে এসে শুনলাম আজ আপনাকে অন্যের অনুপস্থিতিতে তলব করা হয়েছে এবং আসা অব্দি ইউ আর ফাইটিং। গুড আই হেল্প ইউ! স্যার—

বিমল হাসল।

অন্যকথা বলি একটু। এই তো আপনি গানের লোক। চলুন লোকটাকেও দেখি। বুঝলেন সম্ভবতঃ একষট্টি নম্বর স্বরলিপিতে গানটা আছে।

স্বাগতার চোখে কিসের ম্লানিমা। দুই ভুরুতে প্রশ্ন চিহ্ন। মুখে হাসির আভাস এনে সে বলল—

স্যার আপনি পারেনও। এখনও আপনার গান আসছে?

খুব স্বাভাবিক। লাইনগুলো শুনবেন তো..না শুনেই বিমল বলছে ঐ যে..“ছিলনা প্রেমের আলো, চিনিতে পারোনি ভালো এখন বিরহানলে প্রেমানল জ্বলিয়াছে...”

মিসইন্টারপ্রিটেশন স্যার! আই বেগ টু ডিফার। বিরহানল প্রেমানল কিছু নয়— লোভানল বলতে পারেন। আত্মকেন্দ্রিক সব। আপনি এখন মেলাতে পারবেন না। সিস্টার, ও.টি-তে লোক পাঠান। এটাকে নিশ্চয়ই এখন ড্রেস করবেন স্যার।

স্বাগতা বিষণ্ণ। মুখে মেঘভার। গুন গুন করে সে আনমনে— ‘আপন বিরহ্ লয়ে আছি আমি ভালো, কী হবে আঁধারে নিমেষের আলো/আশা ছেড়ে ভেসে যাই...”

আপনার ওপরের রোগীটিও খুব অদ্ভুত তাই না স্যার? গায়ে কেরোসিন ঢেলে দিল... তাও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবি। ‘না না ওকি আর দেশলাই জ্বালাবে..’স্টুপিড। স্বাগতার রাগ রাগ গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন বিমল।

ওয়ার্ডের ঠিক বাইরে বারান্দায় চার পাঁচজন চোয়াড়ের একটা দল। ঘোঁট পাকাচ্ছে? বিমলরা শুনতে পাচ্ছেন—

এই চীনে লাট্টুটা কতদিন আমদানি হয়েছে রে? খাল ধারে খেতে যায়। কথাবার্তা ভালো। কিছু বললে দাঁড়িয়ে শোনে... এখনও ফাঁট নেই।

একটু সমঝাতে হবে মনে হচ্ছে। দোকান করে?

নাহ্, শুধুই হাসপাতাল।

তবে তো ধুর আছে। সমঝাতেই হচ্ছে। চলতো পট্‌লা।

গুরু ঝামেলা কোরনা। আমরা কিন্তু রং সাইডে আছি।

ধুর—

এই বাঁদরগুলোই তখন ফিমেল ওয়ার্ডের সামনেও জ্বালাচ্ছিল। বিমলের বেশ মনে আছে। একটা রোগী নিয়ে পড়ে থাকলেই হবে আপনার? শুধু ফিমেল ওয়ার্ডে খেললে হবে? অলরাউন্ডার হতে হবে তো... চলুন চলুন। নীচেও একটা পোড়া রোগী আছে আমাদের। দেখতে হবে।

বিমল তো তখন আনমনা। তার দৃষ্টির চরাচর জুড়ে শুধুই মাসীর হাত ধরা সেই বছর ছয় সাড়েছয়ের ছেলেটি— বিমলেরই ছেলের বয়সী। বিপন্ন উদভ্রান্ত চাউনি... হাতে ধরা নিজের আঁকা একটা ছবি। বিমল গম্ভীর গলায় ছেলেগুলোকে রোগীর কাছে নেমে যেতে বলেছিল।

আপনারা যান। সিস্টার দেখছেন—আমি সময়মত যাবো।

বিমলের কানে তখনও বেজে চলেছে অভাগা মেয়েটির বোনের সেই করুণ আর্তি—

দেখুন ডাক্তারবাবু আমার দিদির ছেলেটা আঁকার স্কুলে গিয়ে একি ছবি এঁকেছে— তুই কি জানতি বাবা আজ আমাদের এমন সর্বনাশ হবে।

বাচ্চাটির মাথায় হাত বুলিয়ে ডুকরে কাঁদছিল তার মাসি।

পারা যায় না। ওই আবার হুজ্জোত শুরু করেছে।

ডাক্তার কোথায়? ডাক্তার?

আবার দাপিয়ে উঠছে।

বিমল বলল— এই তো বলুন। তবে একজন। এত জন একসঙ্গে...

বেশ করেছি। আপনি মানুষ? একটা পোড়া রোগীকে উপুড় করে শুইয়ে রেখেছেন— যদি শ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যায়?

বিমল চিবিয়ে বলল—

উনি আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন তো তাই পেছন থেকে ওর অনন্যোপায় স্ত্রী শেষবারের মত ওকে জাপ্টে ধরায় আপনাদের বন্ধুর পিঠ পেছন পাছা সব পুড়েছে তো— উপুড় করে তো ভাই তাই রাখতেই হবে—

তোমাকেও ট্রান্সফার হতে হবে হে— দলটার কেউ আড়াল থেকে বলল ঐ সময়।

আগল ভেঙ্গে স্বাগতা বেরিয়ে আসে—

লজ্জা করেনা ওর হয়ে আবার চীৎকার করতে এসেছেন আপনারা। ছুটির দিন রোববার আঁকার স্কুলে ছেলেকে পাঠিয়ে যে অমানুষ বৌ-এর গায় আগুন দ্যায়—

কত্ত জানে। আপনি সব জেনে ফেলেছেন দিদিমণি।

চুপ করুন তো...

বিমল ধমক লাগান...

ভদ্রভাবে কথা বলার চেষ্টা করুন।

ছেলেগুলো তড়পায়—

নাঃ দেখছি এটাকে তাড়াতেই হচ্ছে। চলতো আটোদার কাছে। দলের সবচাইতে ছোট ছেলেটা বলল।

অটোদা কে ভাই— বিমল তাও বললেন..

অটোদাকে চেনোনা বে। আমাদের এম. এল এ। ওনার সব অটোমেটিক। তাই ওকে আমরা গুরু মেনে অটোদা বলি...

খুব ভালো, তাই যদি করে দিতে পারেন আপনাদের অটোদা। আমার তো আলাপ নেই। কিন্তু কলকাতার আপনাদের এরোপ্লেনদা যে বললেন ছমাসের আগে আমার বদলি হচ্ছে না। ও হ্যাঁ, এরোপ্লেনদাকে চেনেন তো!

ও রে ত্বা...বা। গুরু যে একেবারে পাতায় পাতায়। এরোপ্লেন দেখাচ্ছে।

স্বাগতা চীৎকার করে বললেন—

এদিকে আপনাদের বেশি যাতায়াত না করাই ভালো.. ওর স্ত্রী যা বলেছেন তাতে কিন্তু পুলিশ...

আরে পুলিশ দেখাচ্ছে... চল চল— ছেলেগুলো এক পা দু'পা করে পিছিয়ে যাচ্ছে।

স্বাগতা অন্যমনস্ক। হয়তো আত্মমগ্ন। নিজেকে নিয়েই সাত পাঁচ ভাবছে। বিমল গলা খাঁকারি দেয়—

ধৃতরাষ্ট্র যেমন লোহার ভীমকে চেপে ধরে ছিলেন। এই পুয়োর লেডি তেমনই হাজব্যান্ডকে...। স্বাগতা, আপনি ভাববেন না। এফ.আই.আর হবে। স্বামীর পাশে পুলিশ পিকেট বসবে। ওর তো পঞ্চাশ শতাংশের ওপরে পোড়া। গভীর ক্ষত হবে। চামড়া বসাতে হবে—

পড়ে থাক পড়ে থাক— স্বাগতা বলে। ওকে আমার অজ্ঞান করতে বয়ে গেছে।

স্বাগতা, কলকাতায় একটু ডাঃ বি চ্যাটার্জীকে ধরবেন— বার্নস ইউনিট... এই ফোন নম্বর...

কাকে পাঠাবেন স্যার, স্বামীটাকে?

ওকেও পাঠাতে হবে তবে আজ নয়। যদি বৌটাকে একটু সামলানো যায়— পাঠানোব মত অবস্থায়ও আনা যায়... ওর ছেলেটার সেই আতঙ্কের চাউনি ফ্যাল ফেলে দৃষ্টি...

আমি যেতে চাইনি জোর করে আমায় পাঠালো... আমি তো জানতাম বাবাটা একদিন জ্বালিয়ে দেবে।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই মারা গেলে বিপদ আছে তো... পরপারে গিয়েও তো স্বামীটা মারবে— নার্স বললেন বাবাটাকে বাঁচাতে হবে অন্তত— ছেলেটা আছে না? কত ছোট!

ওঃ সিস্টার ডোন্ট বি সিলি, স্বাগতার গলায় হতাশা— আপনি পরপার মানেন বুঝি? ওই বাপ ছেলেকে দেখবে? আর ছেলেটাও যাবে ভেবেছেন বাবার কাছে?

স্বাগতার মুখ ভার, বিমলের দিকে সে তাকাল— স্যার আসলে আপনিও তো পিতৃতান্ত্রিক সেই...

না না স্বাগতা। বিমল প্রতিবাদের করেন— আমিও নারীবাদী। আমি মনে প্রাণে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগরকে...

স্বাগতা কথা কেড়ে নেয়—

সতীদাহ ঘোচেনি স্যার। বিধবারাও সুখে নেই। আগে স্বামীর লোকজন, পরিজনরা স্বামীর চিতায় তুলে দিত স্ত্রীকে। আর এখন মরার আগেই পতিপরমেশ্বর নিজের হাতেই কাজটা সারছে...

স্বাগতা ফিসফিস্ করে— "মাই অফারিংস আর টু টিমিড টু ক্লেইম ইয়োর রিমেমব্রান্স অ্যান্ড দেয়ারফোর..."

বিমল মাথা দোলায়, আমিও জানি স্বাগতা— "ভীরু মোর দান ভারসা না পায় মনে সে যে রবে কারো— হয়তো বা তাই তব করুণায় মনে রাখিতেও পারো।"

বিমলের ঠোঁটের কোনায় হাসি— রবি ঠাকুর কি ভেবে যে লাইনগুলো নামিয়ে ছিলেন....

স্বাগতাও তো হাসছে— আপনার দিন আমি আর অ্যানেসথেসিয়া দেবো না স্যার। আমি ও.টি পাল্টাবো।

বিমলের মনে পড়ে, পাশাপাশি মিশনারী ছেলেমেয়েদের দুটি স্কুল। মেয়েদের স্কুলের ক্লাশ এইটের মেয়েটির সঙ্গে পাশের স্কুলের ক্লাশ নাইনের ছেলেটির ভাব ক্রমশ জমাট বাঁধতে বাঁধতে....

কি ভাবছেন স্যার?

বিমল ভাবছে আনমনে.....

ছেলেটি কম্প্যুটার ইঞ্জিনিয়ার হলো, আমেরিকা গেল। মেয়েটির বাবা খুব সাহায্য করেছিলেন। আমেরিকা পৌঁছে প্রথম প্রথম ছেলেটির চিঠির পর চিঠি, ঘন ঘন টেলিফোন। তারপরে টেলিফোন আস্তে আস্তে দুমাসে একবার, ছমাসে একবার হতে হতে বন্ধ। চিঠিও তাই। সাড়ে তিন বছরের মাথায় ছেলেটি হঠাৎ ফিরে এসে মেয়েটিকে বলল বিয়ে করতে এসেছি। বিয়ে হল। মেয়েটিও তার নিজের এলেমেই ততদিনে আমেরিকার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছিল, জেদে। কিন্তু বছর না ঘুরতেই মেয়েটিকে ফিরে আসতে হল আমেরিকা থেকে, কপর্দকহীন।

স্যার কথা বলছেন না। রাগ হল? ও.টিতে আসব না বললাম.....

বিমল হতাশা ঢাকতে পারেন না— কই না তো! তারপর বিড় বিড় করেন "ইন দি ড্রাউজি ডার্ক কেভস অফ মাইন্ড ড্রিমস বিল্ড দেয়ার নেষ্ট উইথ বিটস অব থিংস ড্রপড ফ্রম ডে'স ক্যারাভান"!

স্বাগতা হেসে ওঠে —স্যার এই সব ভাবছেন এখন। আমিও জানি—

"ঘুমের আঁধার কোটরের তলে স্বপ্ন পাখির বাসা, কুড়ায়ে এনেছে মুখর দিনের খসে পড়া ভাঙা ভাষা।"

এগেইন ট্যাগোর। অলসো রিটেন অন দি ওয়াল অব এলগিন এন্ট্রাস অব রবীন্দ্রসদন মেট্রো—

সিস্টারের দেয়া চায়ের কাপটা এক চুমুকে সাবড়ে দিয়ে প্রতিবাদিনীর মত স্বাগতা বলে উঠল— সিস্টার, আমি কিন্তু মেয়েটার দলে। আমি কি করেই বা দল পাল্টাই!

লজ্জার মাথা খেয়ে এদিকে বিয়ে করতে চলে এলি, আর তুই যে তিন বছর ধরে মেমের সঙ্গে লিভ টুগেদার করছিস সেটা ভাঙবিনা....

সত্যি সত্যি সিস্টার ওই দেখুন দেয়ালে টিকটিকি ডাকল।

মেমের কাছে শুনতে হবে হাই! আই অ্যাম থ্রি ইয়ারস সিনিয়র টু ইউ, প্লিজ অ্যাডজাষ্ট। স্বাগতা সান্যাল অমন বান্দা নয়।

বিমলের চশমার কাঁচ ঝাপসা হচ্ছিল। পুরো দগ্ধ মহিলার ছেলেটির হাতে ধরা ছবিটা তার মাসী দেখাতে দেখাতে ডুকরে কাঁদছিল। পেন্সিল স্কেচ। চতুর্দিকে হলদে লাল আভার আগুন ছড়িয়ে পড়ছে... আগুন বন্দী ক্যানভাসে আলতো আভাসে এক নারীমুখ যেন মিলিয়ে যাচ্ছে।...

স্বাগতা তখন আবার মজা করছিল।

নিরাপদ বিপদ ভঞ্জন শল্য চিকিৎসকের হৃদয় কাঁপছে? কাঁপে স্যার বলুন না! স্বাগতা তার সুন্দর লম্বা হাতখানা বাড়িয়ে বলল স্যার ছবিটা আমাকে দিন। প্লীজ—

আটচল্লিশ ঘণ্টারও পরে বিপর্যস্ত বিমল শহরতলীর বাসায় ফিরে স্ত্রী সুমিতাকে অগ্নি সংযোগের গল্পটা পুরো বলে ফেলল অগ্নিদগ্ধা রমণীর বয়ানেই। আফসোসের গলায় বিমল বলছিল— সুমিতা মানুষ কী হয়ে যাচ্ছে! তোমাদের ফেলে বেরনো ফেলে হাসপাতালে হঠাৎ না উপস্থিত হলে এরকম হননশৈলী— গুণধর ভাই ঘুমন্ত দাদার মাথা দা দিয়ে নারকোলের মত ফাটিয়ে দিচ্ছে— ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে বৌ-এর গায়ে অগ্নি সংযোগ করছে মূর্তিমান স্বামী। বড্ড চিন্তায় আছি সুমিতা, পুলিস প্রহরায় থাকা বউ-পোড়ানো লোকটাকে কলকাতায় পাঠাতে বলে এসেছি। এদের পাঠানো নিয়ে বড্ড টালবাহানা হয়। সুপার সাহেব কে দিয়ে লেখাতে হয়। আজ নিচ্ছি কাল নিচ্ছি বলে। কাস্টোডি ডেথ হলে আবার....

ও পুড়ল কী করে।

সারা শরীরে আগুন নিয়ে বৌ জাপ্টে ধরেছিল পেছন থেকে।

বেশ করেছে। বেশ করেছে। সুমিতা বলে উঠল গল্পটা বল।

ডাক্তারবাবু, ও তো আমায় ভালোটালো বাসতই না। আজ রোববার হঠাৎ একটু কেন যেন অন্যরকম মনে হল। ভাবলাম সবাই তো পাল্টায়— ও হয়তো...। আমাদের সাড়ে ছ বছরের ছেলেটাকে সকালে হঠাৎ খুব আদর করতে লাগল। বলল— তুই আজ আঁকার স্কুলে যাবি না? চল চল ক্যাডবেরি কিনে দেব। একটা দারুণ ছবি এঁকে আনবি তো আজ! ছেলেটা যেতে চাইছিল না কিছুতেই। বলছিল আমি মায়ের কাছেই থাকবো। ও জোর করল— চল চল বলে আঁকার স্কুলে ছেলেটাকে স্কুটারে চাপিয়ে নিয়ে গেল। ফিরে এল ঠিক পনেরো মিনিট বাদে। এসে কোনদিন, বহুদিন যা করেনা তাই করল। আমায় ভালো ভালো কথা বলতে লাগল। আলমারি খুলে একটা ভালো শাড়ি বের করে বলল এটা পর। এটার নাম জান? কলাক্ষেত্র।

আমি বললাম... এসবে আর কি হবে...

আহ্ পরই না। ও হাসছিল। অনেক দিন কোথাও যাইনা। চল আজ হংসেশ্বরী মন্দির... তারপর আমার বাবার ওপর জুলুম করে যে চন্দ্রহারটা মাস তিনেক আগে আদায় করেছে সেটা আমায় পরতে বলল। কী রকম লাগছিল আমার। আমার নিজের গায়ে চিমটি কাটতে ইচ্ছে করছিল... জেগে আছি তো। পরলাম। বলল, বাঃ, তোমায় সাজলে তো

খুব সুন্দর লাগে। তুমি তো ভারী সুন্দরী। সাজবে। রোজ সাজবে। আমি আপ্লুত হয়ে, ভেসে গিয়ে একটু সেন্ট নিয়ে আসি। ও ছুটে বাইরে চলে গেল। আমি আয়নার দিকে তাকিয়ে খোঁপা ঠিক করছিলাম। হঠাৎ আমার গায়ে গতদিন বাজার থেকে কিনে আনা কেরোসিনের টিনটা ও উপুড় করে দিল।

আমি বললাম... একি তুমি কেরোসিন... তুমি কেরোসি... তুমি কেরো... কে...

পুরো শরীর পুড়ে যাওয়া, মুখ চোখ বিকৃত হয়ে যাওয়া মৃত্যুপথযাত্রী তরুণীটি অব্যক্ত ব্যথায় কঁকিয়ে বলে ডাক্তারবাবু ওর হাতে আয়না দিয়েই দেখি দেশলাই বাক্স। আমি পেছন ফিরি। ও সিগারেট ধরাল, ভাবলাম যাক বাঁচা গেল। ও নিশ্চয়ই অমন অমানুষ নয়। অমন অমানু... অমন অ...

ডাক্তারবাবু আমি না ভাবতেই পারিনি— ঝগড়াঝাটি করুক-মারধর করুক—ছেলের সামনেই, এতদিন একসঙ্গে আছি, যে করেই হোক আছি তো। দেশলাই কাঠি নিশ্চয়ই গায়ে ছুঁড়ে দেবে না। জানেন দুটো কাঠি ও পর পর জ্বালাল। আমার দিকে তাকাল। হাসল। মেঝেতে ফেলে দিল। পা দিয়ে মাড়াল। তৃতীয় চতুর্থ কাঠিটাও। আমি বেপরোয়া বললাম একি করলে বলত কেরোসিন নিয়ে আমি হংসেশ্ব.....

ভাবিনি ডাক্তারবাবু এ সময়েই পঞ্চম কাঠিটা আমার শাড়ির ওপর। ডাক্তারবাবু মুহূর্তে আমার সর্বশরীর আগুনে খেয়ে নিল। কি ব্যথা... আমি জ্বলছি... ও পালিয়ে যাচ্ছিল। কতদিন ওকে পাইনি আমি, ছুটে গিয়ে পেছন থেকে জাপ্টে ধরলাম। আমার ছেলেটা... ডাক্তারবাবু, আমার ছেলেটা আঁকার স্কুল থেকে ফিরেছে? কতোদিন ও আমাদের দেখেনা। হ্যাঁ খড় কুটোর মতো জলে ডোবা মানুষের মত আজ ওকে জাপ্টে ধরেছি... ওকেও আসতে হবে... একবার আসবেন না ডাক্তারবাবু... আমায় মেরে ফেলুন। পারছি না... না না আমায় আপনি বাঁচান... আমার ছেলে... তুই কি জানতিস বুবাই.... আজ কী ছবি আঁকবি... রে...

পরদিন আবার হাসপাতাল। রোজকার মত ট্রেনে ওঠার আগে প্লাটফর্মের কাগজওয়ালার থেকে আর একটা কাগজ কেনা। কাগজটা খুলে তৃতীয় পাতাতেই চমকে আটকে গেল বিমল— তারই লেখা ইংরাজীতে মহিলার মৃত্যুকালীন জবানবন্দীর বাংলাটা। আবার নাম টাম দেয়নি তো তার... যাচ্চলে... যাক ছেলেটার সাঙ্গপাঙ্গদের পুলিস ধরেছে... হাসপাতালের পথ হাঁটতে হাঁটতে আবার বিমর্ষ হতে থাকে বিমল। ''আকাশ ধরারে দু'হাতে বেড়িয়া রাখে, তবুও আপনি অসীম সুদূরে থাকে...''। সব্বাই দূরে সরে যাচ্ছে... সব বজ্র আটুনি ফস্কা গেরো হয়ে যাচ্ছে। বিচ্ছিন্নতাবাদ? স্ত্রী পুত্রর থেকে স্বামী বিচ্ছিন্ন। পিতা থেকে পুত্র বিচ্ছিন্ন। মা মেয়ে বিচ্ছিন্ন। জমিয়ে এক বিচ্ছিন্নতাবাদ উত্তর-আধুনিকতার সিঁড়ি বেয়ে লিভিংরুমে ঢুকে পড়েছে...

একি! হাসপাতালের সামনে এত ভিড় কেন? এতগুলো পুলিসের গাড়ি! কি ব্যাপার! সেই বউ-পোড়ানো লোকটার কিছু হয়নি তো! নিয়ে যায়নি! আরে অর্ণব না? ও কাঁদছে কেন? এই অর্ণব-এই অর্ণব—

একি গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছেনা কেন বিমলের? ওকে তো বিমল কলকাতায় থার্ড ইয়ারে পড়িয়েছে। ওর সঙ্গেই তো প্রথম।...

ইমার্জেন্সীতে ঢুকে পড়ল বিমল। অনেকটা সরু পথ। কিচেন। ওয়ার্ডমাস্টারের ঘর। এদিকটায় রাতে ভবঘুরেরা, দালালরা, উল্টোপাল্টা লোকেরা ঢুকে বসে থাকে। ওই তো সুপার সাহেব এদিকেই আসছেন। ঐ তো সিস্টার... আরে সিস্টার আপনিও কাঁদছেন কেন...

কি হয়েছে স্যার! এত ভিড় চাদ্দিকে! অজানা আশঙ্কায় বিমলের গলা বুজে আসে। খুব খারাপ খবর ডাঃ চক্রবর্ত্তী— সুপার বলেন।

হয়েছে কি? মেল ওয়ার্ডের আমার ওই রোগীটা কি...

না না সে তো কালকেই আপনি যাবার পরে কলকাতায় চলে গেল। ভর্ত্তিও হয়ে গেছে। চলুন চলুন আমার ঘরে চলুন বসবেন।

ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে পরশু রাতে মিস লড়ি বলে এক মহিলা আমায় ফোন করে ডাঃ সান্যালকে চাইছিলেন। আমি বাড়ির ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিই। উদ্ভ্রান্ত বিমল বলে ওঠে— কে সে?

ঐ তো অর্ণব বাবু এসে গেছেন। আপনিই বলুন। স্যার সত্যদার গার্লফ্রেন্ড মিস লড়ি পরশু বার চারেক ফোন করে জানায় সত্যদা সুইসাইড নোটে সব সম্পত্তি দিদিকে দিয়ে গেছে... দিদি তো ফোনই ধরছিল না...আমি শেষে...

হু ইজ সত্য? বিমল চিৎকার করেন।

ঐ তো স্যার, দিদির সঙ্গে যার-যাঁর জন্য দিদি...

বিমল সুপারকে বললেন স্বাগতাকে ডাকুন আমি কথা বলব... কিছু তো আমি....

হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে এসময় অর্ণব। সারা রাত দিদির ঘরে কাল আলো জ্বলেছে। সকালে খুব স্বাভাবিক গলায় বলল ভাই একটু বাজারে যা তো— ভালো করে বাজার করে আনবি আজ রাঁধবো... এসে দেখি...

কি বলবে তো... অর্ণব প্লিজ... আমি বুঝতে পারছি না।

অর্ণব থেমে কান্না আটকে যাওয়া গলায় বলে বাজার থেকে ফিরে দেখি দিদির ঘর থেকে ধোঁয়া বেরচ্ছে। হাই ভল্যুমে স্টিরিওতে অগ্নিবন্দনা চলছে। রবীন্দ্র সঙ্গীত— "ওরে আগুন আমার ভাই..."

অর্ণব কাঁদছে— দরজা ভেঙ্গে ঢুকি—সব শেষ ততক্ষণে... কিছু বুঝতে দিল না— হঠাৎ কি হল ওর।

বিমল টেব্‌লে চাঁটি মেরে দিল, চীৎকার করে বলল— স্বাগতা কোথায়?

সুপার দুহাত ওপরে তুলে বিমলকে বলেন— আপনাকে যখন ফোন করেছি তখন আপনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। আপনার জন্যই আমরা অপেক্ষা করছিলাম। চলুন না ও.টিতে পরম বিশ্রামে শুয়ে আছেন স্বাগতা।

ডাঃ বিমল চক্রবর্ত্তীর দুই পা উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ঠক ঠক করে কেঁপে উঠল। সুপারকে সে বলল— স্যার আমি একটু বসি— জ-ল।

অনন্যোপায় সুপার তখন বলছেন, টেক ইয়োর টাইম। আপনাকে কিন্তু পোষ্টমর্টেমে থাকতে হবে স্বাগতার ইচ্ছাও তাই... সুপার রুমাল বার করলেন।

সাড়ে ছ বছরের ছেলেটাতো মায়ের দহনের ছবিটা বাবার উপেক্ষা বঞ্চনা তিরস্কার এইসব দেখে ভেবে ফেলেছিল, সম্পূর্ণ করেছিল। তোমার কি হল স্বাগতা? তোমাকে তো খুব শক্তপোক্ত ভেবেছিলাম। তুমি গড়পড়তা মেয়েদের মতও তো নও স্বাগতা। তোমার দহনের এই ছবিটি তবে কার? কে সে? সত্য? নাকি আমাদের এই জীবনাগত মানিয়ে নিতে না পারা বা মানিয়ে নিতে বাধ্য হওয়া যাবতীয় মিথ্যা? সবাই দেখল বিমল চক্রবর্ত্তী টেবিলে দু'হাত ছড়িয়ে, মাথাটা নামিয়ে ফেললেন।

দহন

সুতপন চট্টোপাধ্যায়

বিজনবিহারী মিত্র নারকোল কুড়ো দিয়ে মুড়ি খেতে ভালবাসেন। বর্ষায় চারদিক জলে থৈ থৈ করলে অপলক চোখে তাকিয়ে গুনগুন করে গান করেন। অনেকদূর কোন আত্মীয় হঠাৎ চিঠি লিখে নেমন্তন্ন করলে বিহ্বল হয়ে ওঠেন। সেখানে বেড়াতে যাওয়ার জন্য কোন ঋতু ঠিক উপযুক্ত সে নিয়ে বন্ধুবান্ধব মহলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করেন। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে কোন ট্রাভেল এজেন্সী কোথায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তার খবরাখবর সব নখ-দর্পণে। তিনি শিশুদের ভালবাসতে চান—ট্রামে চাপতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। কিন্তু জেলখাটা মানুষদের ভীষণ ঘৃণা করেন। তাঁর ধারণা জেলে যাওয়ার মতো অন্যায় মানুষ সহজে করতে পারে না। অনেক নীচে নামতে হয়। তাই জেল থেকে বেরিয়ে মানুষের মধ্যে ফিরে আসাটা একেবারেই অশোভন। যদিও ফিরে আসে, বসবাস করে —তবু আগের মানুষটার একবিন্দু রক্তও শিরা উপশিরা দিয়ে বয় না। তিনি কোনদিন রক্ত পরীক্ষা করে দেখেননি। তবে তাঁর ধারণা পরীক্ষা করলে তো ব্যাপারটা নিশ্চিত ধরা পড়বে। তিনি আরো বিশ্বাস করেন, জেলখাটা মানুষের সমাজে ফিরে আসার কোন অধিকার নেই। পাঁচ বছর, দশ বছর জেলে কাটানোর পর কেউ মুখ তুলে কি করে মানুষের দিকে তাকিয়ে হাসে ভাবতেই পারেন না তিনি। তাঁর কেবলি মনে হয় জেল থেকে কয়েদীদের মুক্তি দিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে পাইল করার পিছনে একটা গোপন ষড়যন্ত্র আছে। মাঝে মাঝে তিনি খুব বিরক্ত হন। জেলফেরত কোন লোকের সঙ্গে দেখা হলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন। উপায় না থাকলে দু-একটা কথা বলতে বলতে মনে হয় লোকটার চোখের কোণে এখনো দু এক চিলতে বদমাইসি উঁকি দিচ্ছে। দু-দশ ঘা চাবকে দিই। সমস্ত লোক দিনের আলোয় দেখুক অন্যায়ের শাস্তি অনির্দিষ্টকাল চলতে পারে।

তিনি না চাইলেও জেলফেরত লোক কখনো কখনো তাঁর সঙ্গে কথা বলে। বিনা কারণে মানুষ যে ভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলার লোভ সামলাতে পারে না। মুহূর্তে বিজনবিহারী ভাবেন এই লোকটা জেলে ছিল। তিনি তার পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত তীক্ষ্ণ চোখে দেখেন। শরীরে কোন কাটা দাগ আছে কিনা। চামড়ার রঙ কেমন। চোখের মণির দুপাশে লাল শিরা ফুলে উঠেছে কিনা। কিন্তু বেশীক্ষণ দেখতে পারেন না। ভয় হয়, যদি সন্দেহ করে। এমনি কোন লোক তার দিকে তাকিয়ে হাসলে তিনি টের পান এটা তার জেলফেরত নকল হাসি। ছেলেবেলা থেকে ওই হাসি সে হাসতে শেখেনি। নকল হাসির উত্তরে তিনি তাঁর আসল হাসি হাসবেন, তাঁর আত্মসম্মানে ছুঁচের মতো বেঁধে। খুব অসহায় লাগে। তিনি দুচার ঘা চাবকাতে পারেন না, মুখ ফুটে বলতে পারেন না 'ঘৃণা করি'— কিংবা নকল হাসি হাসতে পারেন না। বুকের ভিতরে কষ্ট হয়। দশবছর আগে জেল থেকে বেরিয়ে সংসার করে জুলপির চুল পাকিয়ে ফেলেছেন এমন কেউ ভদ্রতাবশত তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করেন 'কেমন আছেন' কিবা 'কোথায় চললেন'— তিনি

খুব তাড়াতাড়ি সেই লোকটি যে দিকে যাচ্ছে তার উল্টো দিকের নাম বলেন। হনহন করে হাঁটতে থাকেন। যাতে লোকটির সঙ্গে দূরত্ব তাঁর ক্রমাগত বেড়ে যায়।

বিজনবিহারী জানেন, জেল মানে একটা উঁচু পাঁচিল ঘেরা জায়গা। পাঁচিলের মাঝামাঝি একটা লোহার গেট। গেটের দুদিকে চারজন করে আটজন পুলিশ। তাদের পায়ের ফাঁক দিয়ে তাকালে সামনে একটা গম্বুজ। লাল রঙের রহস্যঘেরা বাড়িটার সামনে একটা ছোট গেট। যার ভিতরটা বাইরে থেকে বাইনাকুলারেও দেখা যায় না। জেল, — এইটুকুই জানেন তিনি। এর বেশী জানার ইচ্ছাও ছিল না। ভেবেছিলেন এমন একটা জায়গা যা মানুষকে মানুষের থেকে আলাদা করে দেয় সে সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান হয়েছে তাঁর। এইটুকু ধারণা নিয়েই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। জীবনটাই ভালো ক'রে জানার সুযোগ হল না— তো জেল। আজ পঞ্চান্ন বছর বয়সে সেই বিশ্বাসটা কেমন ভেঙে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন স্থির কোন সিদ্ধান্তে আসতে হলে আরো অনেক কিছু জানতে হবে। শুধু জেলের বাইরেটা জানলে কিংবা জেল-কয়েদীদের ঘৃণা করলে চলবে না। ভিতরের কথাও ঠিকঠাক জানা দরকার। কিভাবে তারা থাকে? কি করতে হয়? কি কি খায়? জেলের ভিতরে অন্য কোন জেল আছে কিনা? এসব ভাবতে ভাবতে বিজনবিহারী কয়েদীদের ঘৃণা করার কথা ভুলে গেলেন। তারা অনেক নীচে নামতে পারে. নকল হাসি হাসে মতলব নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ভাবতে ভালো লাগল না। তারা সমাজের অবাঞ্ছিত— কিংবা শত্রু মনেই পড়ল না। তিনি তাদের সমবয়সী কিংবা একটু কমবয়সী বন্ধু ভাবতে চেষ্টা করলেন। কিছুক্ষণ সময় লাগল। কেননা তিনি জানেন, বন্ধু না ভাবতে পারলে সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আবার তাঁর ভয় হয় ঠিক ঠিক না জানতে পারলে সিদ্ধান্ত ভুল হবে। ভুল করলে ভীষণ অন্যায় করবেন তিনি। সে অন্যায়ের কি শাস্তি হতে পারে বিজনবিহারী জানেন না। তাই খুব সতর্ক হলেন ভিতরে ভিতরে। তিনি স্থির করলেন যা যা শুনবেন সব বিশ্বাস করবেন না। যেটা সত্যি মনে হবে সেটা ছাড়া।

ইলেকট্রিক মিস্ত্রি পবন বস্তিতে থাকে। খালের পাড়ে বাড়িটায় বিজনবিহারী দাঁড়ালেন। দুয়ারে বসে পবন বিড়ি খাচ্ছিল। বিকেলের আলো কমে আসছে। বলল 'কি ব্যাপার? এদিকে কোথায় বাবু?'

বিজনবিহারী খুব শান্ত গলায় বলল, তোমার কাছেই এলাম।

আসুন ঘরে আসুন— একটা বাঁকারির পিঁড়ে দিল একটা মেয়ে।

কি ব্যাপার— লাইনের গণ্ডগোল?

তুমি একদিন আসতে পারবে?

কাল পারলে যাবে।

বিজনবিহারী গল্পের ছলে বললেন, তুমি তো জেলে ছিলে পবন?

অল্প হেসে পবন বলল, হ্যাঁ— তা কদিন ছিলাম বৈকি?

জেলের ভিতরটা কেমন বলতো?

বাঁকা চোখে তাকাল পবন। ছোট্ট টালির ঘরের আবছা অন্ধকারে পবনকে স্পষ্ট চেনা যায় না। রং মিশমিশে কালো। চোখ দুটো নাকের দুপাশে নক্ষত্রের মতো জ্বলছে। লম্ফোর সলতেটা একটু বাড়িয়ে বলল 'যেমন দেখছেন— এমনি।' উত্তর দেওয়ার ভঙ্গিতে বিজনবিহারী টের পেলেন পবন তাকে হুবহু জেলের কথা বলবে না। তাছাড়া পুরানো দগদগে স্মৃতি নতুন করে ঘাঁটতে কারই বা ভাল লাগে। আবার তা যদি হয় জেলের অভিজ্ঞতা।

তাই পবনের কথামত জেল বলতে বুঝলেন একটা অন্ধকার ঘর। চারপাশে ছেচাবেড়ার দেওয়াল। দেওয়ালে প্রাচীন মাকড়সার জাল। এককোণে দু তিনটে মাটির হাঁড়ি। পুরোনো

তোরঙ্গটা প্রায় মাটির ভিতর পোঁতা। চৌকির পায়ার নীচের দিকটা আলকাতরা লাগানো। চৌকাঠে লক্ষ্মীপুজোর আলপনা। কুলুঙ্গিতে বাবা তারকেশ্বরের ছবি। তার পাশে ক্যালেণ্ডারে সিনেমার নায়িকা। প্রতিমার মতো মুখ। এক কোণে একটা পেটমোটা কলসী। মুখে প্লাসটিকের লাল লিপ্‌স্টিক্‌।

বিজনবিহারী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি কি খেতে দেয়?'

বাড়ির মতন। যে যা খেতে চায়।

ঠিক তখনি পাশের ঘর থেকে কানে এল, আজ কি রান্না হবে?

বাঁধাকপির পাতাগুলো আছে তো? আমি গুগলি আনছি একটু পরে।

কাঁচালঙ্কা এনো।

বিজনবিহারী এবার পবনের দিকে তাকালেন। বললেন, কি ভাবে থাকতে দেয়?

পবন উঠে পড়ল। একটু বিরক্ত হয়ে বলল, কেন? কে আছে?

সতর্ক হয়ে এড়িয়ে গেলেন তিনি। বললেন, না— এমনি জানতে ইচ্ছে হল— তাই।

সেই মুহূর্তে মনে পড়ল ভাস্করকে যে কোন জায়গায় খুন করবে তার শত্রুপক্ষ। গতকাল গলির মোড়ে অন্ধকারে তাকে শুনিয়ে বলেছে, 'মালটা গায়েব হল কোথায়? শালা পেলেই মুণ্ডু নিয়ে লোফালুফি হবে নফর দাস লেনের গলিতে।' ভোজালি দিয়ে চিরে ফেলবে পাঁজরা কিংবা রিভলবার দিয়ে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেবে ভাস্করের তেইশ বছরের বুক। একজন চ্যালেঞ্জ নিয়েছে মাত্র দুদিনের মধ্যেই ভাস্করের মুণ্ডু মারবেলের মতো গড়িয়ে দেবে ভাস্করের বাড়ির সামনে।

রিক্সা স্টানডে চায়ের দোকানে দেখা হয়ে গেল বিবেক মণ্ডলের সঙ্গে। বিবেকের বয়স কুড়ি কি একুশ। খোঁচা খোঁচা চুল। মুখভর্তি দাড়ি। মুখ থেকে চড়া গন্ধ নাকে এল। এক কাপ চা নিয়ে গল্প করতে করতে বিজনবিহারী বললেন, বিবেক,— রিক্সাটা নতুন কিনলি নাকি? একটু হেসে বিবেক বলল, না স্যার। জমা নিয়েছি।

কেমন চলছে?

কোনরকম। তারপর একমুখ হেসে বলল, জেলের সুখ ছেড়ে কি এসব ভালো লাগে?

বিবেক চিরকালই ডাকাবুকো। সমস্ত কিছু সে বুক চিতিয়ে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে ভালবাসে। সারা মুখে তার চরম রুক্ষতার ছাপ। রিক্সা টানতে টানতে চিৎকার করে সে গান গায়। কেউ তাকে সামান্য ধমক দিলে তার চোখদুটো লাল হয়ে উঠে।

বিজনবিহারী সুযোগ বুঝে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, তুই তো জেলে ছিলি, জেলের ভিতরের ব্যাপারটা বলতো শুনি।

মুঠোর মধ্যে সিগারেটের শেষ প্রান্তটা ধরে টুস্কি দিয়ে ছাই ঝাড়ল সে। বলল, জেল মানে তো স্বর্গ স্যার। বেশ ছিলাম চার বছর। খাও-দাও-ফুর্তি কর। ওখানে যা চাইবেন— সব পাবেন।

তাই নাকি? অবাক চোখে তাকান বিজনবিহারী।

এমন কি সাট্টা খেলাও যায়। পায়ের উপর পা তুলে মেয়েমানুষের গল্পও চলে। কেউ কিস্‌সু বলে না। জেল থেকে বেরিয়েই মনে হচ্ছে জেলে ঢুকেছি।

কোন কাজ করতে হয় না, বসিয়ে খাওয়ায়?

বিশ্বাস হচ্ছে নাতো? সত্যি কোন কাজ নেই। বসে বসে খাওয়াটাই কাজ। দেখুন না স্যার, না খেয়ে খেয়ে চেহারাটা কেমন কঙ্কালসার হয়ে যাচ্ছে। —বলেই হাতের পেশীগুলোকে সে দেখানোর চেষ্টা করল।

তাহলে শাস্তি বলে কিছু নেই।

কিসের শান্তি? আসল শান্তি তো বাইরে। সেই বৌ-এর মুখঝামটা সামলাও। কচি ছেলেটা পায়খানা করেছে— সামলাও। রেশনে লাইন মারো।.....

বিজনবিহারী টের পেলেন বিবেক তার নোংরা দিনগুলোকে আড়াল করছে মিথ্যে বলে। বলুক। তিনি শুনবেন। আর তার মধ্যে থেকে আসল সত্যিটা তিনি জেনে নেবেন। না জানতে পারলে ভাস্করের প্রতি চরম অন্যায় করা হবে। যদিও তিনি ভাস্করকে দেখেছেন এক রাতে গলির মুখে ছেলেবেলার বন্ধুর জন্য ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে থাকতে। পরদিন সকালে বন্ধুর মড়া কাঁধে তুলে ক্যাওড়াতলার দিকে হরিবোল বলতে বলতে হেঁটে যেতে। তবু ভাস্করের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা একটা ভীষণ সমস্যা। তাকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই... লিক্ একটা সতরঞ্জি রং-এর গেঞ্জি গায়ে চপ-কাটলেটের দোকানের সামনে আড্ডা মারছে। বিজনবিহারী দেখতে পেলেন। লিকের বয়স চল্লিশ। দেখলে মনে হয় ত্রিশ ছুঁই ছুঁই। লিক পড়াশোনা করেছিল কিছুটা। বাপের সম্পত্তি উড়িয়েছে কিছুদিন।

মাছের ব্যবসা করেছে জুলুম পুঁজি করে বছরখানেক। আর বেশি সময়টা কাটিয়েছে জেলে। লিক্‌কে দেখে উঠে গেলেন তিনি। একটু ইতস্তত করলেন। এ সময় ভয় করলে চলবে না। সাহস চাই— এমনি একটা কথা বুকের মধ্যে নড়ে উঠল।

লিক— কেমন আছো?

হালকা হাসি হাসল লিক! যার মানে ভাল কিংবা মন্দ ঠিক বোঝা গেল না। কিংবা দুটোই। কি ভাবে শুরু করবেন ভাবতে লাগলেন। মনে মনে ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারছেন না। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। লিক নিজেই বলল, কিছু একটা বলবেন মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ— মানে— কবে ছাড়া পেয়েছ। হঠাৎই বলে বসলেন বিজনবিহারী।

লিক আবার হাসল। যার মানে আমাকে আর ওসব জিজ্ঞাসা করা কেন। কিংবা ধরা আর ছাড়ার মধ্যে তো আমি একটুও ফাঁক দেখিনি জীবনে। দুটোই হতে পারে। সতর্ক হলেন তিনি, মুহূর্তে বুঝতে পারলেন মনে মনে না চাইলেও তাঁর মুখে কিছু দুর্বলতার ছাপ.ফুটে উঠেছে। কথা বলতে বলতে গোপন ইচ্ছেটা অসাবধানতার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। বিপদ সেখানেই। তাই তিনি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, লিক্— জেলের ভেতরটা কেমন?

চলুন না একবার— দেখে আসবেন।

হো হো করে হেসে উঠলেন। একটা ব্যবস্থা করো তো একবার— বলে একবার রাস্তার দিকে তাকলেন। তারপর বললেন, তা যাওয়ার আগে তোমার কাছে কিছুটা শুনি।

লিক দীর্ঘ লম্বা টান দিল সিগারেটে। বলল, জেল মানে সাড়ে পাঁচ হাত জায়গা। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ একতলা উঁচুতে একফুট বাই এক ফুট ভেনটিলেটারে। সূর্য ওঠে, অস্ত যায় এই ভেনটিলেটার-এর ফাঁক দিয়ে ট্রামের শব্দ, বাসের কিংবা বোমার শব্দও ওই একই রাস্তা দিয়ে... বলেই লিক গুছিয়ে বলার হাসি হাসল। বিজনবিহারী অবাক। জেলে থাকলে মানুষ এভাবে কথা বলতে শেখে। তবে তো আরো সতর্ক হতে হয়। কেননা কথার মার প্যাঁচ থাকলে সত্যির থেকে মিথ্যে ঢুকবে বেশি।

আসলটাই হারিয়ে যাবে।

জেলে কি কি করতে হয়...লিক?

বিশেষ কিছু না। শুধু ব্যায়াম। দিনের বেলা শরীরের, রাতের বেলা মনের।

মানে?

মানে আর কি? দুবার খেতে দেয়। আর দেখবেন বুক চিরে দেখাবো? মনটা কবে ছিঁড়ে ফেলেছি।

আর কি করতে হয়?

আর যা, তা জেলের বাইরে ভিতরে একই। ধান্দা... কবে মুক্তি পাব।

বিজনবিহারী বুঝতে পারেন লিক তাকে এর বেশী কিছু বলবে না। যা তিনি শুনেছেন তা থেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দেরী করলে চলবে না। তিনি একদিন দেখেছিলেন ভাস্কর দাঁড়িয়ে আছে কবরখানার পিছনের অন্ধকারে। হঠাৎ সে একটা ছেলের বুকের কলার চেপে একটা হাত সজোরে চালিয়ে দিল ছেলেটার পাঁজরের ভিতর। একটা গোঙানির শব্দ হল অন্ধকারে। আর ঠিক তখনি চারদিকে চারটে বোমার শব্দ এক সঙ্গে কাঁপিয়ে দিল পাড়া।

ভাস্কর লুকিয়ে পড়ল মুক্তাঞ্চলের আড়ালে। মিনিট দশেকের মধ্যে পাড়ার সমস্ত মানুষের মুখে খই ফোটার মতো একটা শব্দ ফুটে উঠল 'স্ট্যাব'। জেলের খবরগুলো বিজনবিহারী পর পর সাজালেন।

(১) জেল মানে স্বর্গ কিংবা নরক হতে পারে—এ দুটো জগতের কোনটাই তিনি দেখেননি জীবনে। তাই এতে তাঁর কিছু আসে যায় না।

(২) জেল মানে যেভাবে মানুষ বাস করে....তাহলে আর মুক্তি কোথায়?

(৩) জেল মানে ফুরতি-টুরতি-মেয়েছেলের গল্প— তাতে তাঁর মাথাব্যথা নেই।

(৪) জেল মানে খেতে দেয়—যা বেঁচে থাকার পক্ষে সবচেয়ে জরুরী।

দুদশদিন বেঁচে থাকতে হলে সব অপমান, অত্যাচার বিজ্ঞানসম্মতভাবে হজম করিয়ে দেয় খাবারের এনজাইম। তারাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। নিজের ছেলেকে বিজনবিহারী দুবেলা খেতে দিতে পারেননি, অথচ তিনি বাবা। বউকে মনোমতো শাড়ি, গয়না দিতে পারেননি, অথচ তিনি স্বামী। মেয়েকে বিয়ে দিতে পারেন না অথচ তিনি চান ছেলেমেয়ে স্ত্রী সবাই বেঁচে থাকুক। এনজাইম-এর সাহায্যে বেঁচে থাকতে থাকতে তিনি এতদিন নানান সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু আজ সিদ্ধান্ত নেওয়ার মধ্যে তেইশ বছরের ভাস্করের বেঁচে থাকা ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে।

এই পৃথিবীতে অন্তত কিছুদিন ভাস্করকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে জেল—একথা মনে হল তাঁর। যেখানে থাকলে ভাস্কর মানুষের তালিকায় থাকবে অন্তত কিছুদিন। কিন্তু কি ভাবে তিনি জেলের ভিতর পাঠাবেন ভাস্করকে?

তিনি কি থানায় দাঁড়িয়ে বলবেন তেইশ বছরের ভাস্করকে বাঁচাতে জেলের দরজা খুলে দিন? ওভাবে তিনি কথা বলেননি কোনদিন। তিনি কি পুলিশ কমিশনারকে ফোন করবেন? তাঁর সন্দেহ হয় পুলিশ কমিশনার কি কাউকে জেলে ঢোকানোর ক্ষমতা রাখে আজকাল?

একবার মনে হল দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে পাঁচিল টপকে জেলের মধ্যে ফেলে দিলে কেমন হয়! নিজের ফেলে আসা যৌবনের তেইশ বছর বয়সের কথা মনে পড়ল তার। এই বয়সকে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।! তার ইচ্ছে অনিচ্ছাগুলোকে কাঁচি দিয়ে মানানসই ছেঁটে ফেলা। একেবারেই অসম্ভব। ঠিক ঠিক মাপের মানুষ হবার দরকারি মশলা এই বয়সটাতে সহজে মেশে না। এমনই মসৃণ।

বিজনবিহারী নিজের বড়ির কথা ভাবলেন। সেটাও অনেকটা জেলের মতো. কিন্তু সেখানে ভাস্করকে লুকিয়ে রাখা নিরাপদ নয়। আঘাত এলে তাঁর বাড়ি নড়ে উঠবে। তাহলে কোন জেল বাঁচাতে পারে ভাস্করকে? কোন জেলের প্রাচীর আগলাতে পারে এই তেইশকে অন্তত কিছুদিন। এসব ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরছিলেন বিজনবিহারী। রাস্তার মোড়ে একটা লরি নব্বুই ডিগ্রি বাঁক নিল। তিনি ফুটপাত বদল করলেন। রাত দশটার কিছু বেশি! প্রথম সিদ্ধান্ত থেকে আরো গভীরে যেতে চান তিনি। নিঃসন্দেহ হতে চান কোন জেল? তিনি কিছুতেই মানতে রাজি নন ভাস্করের জীবন আর মাত্র দুদিন। এই অল্প সময়ে ভাস্কর হারিয়ে যাবে তেইশ বছরের তালিকা থেকে। আর সেই সঙ্গে হারিয়ে যাবে তাঁর নিজের তেইশটা বছর। কেননা তেইশ বছর আগে একবুক আশা নিয়ে ভাস্করকে পৃথিবীতে আনতে নিজেকে নিংড়ে দিয়েছিলেন তিনি। এক রাতে।

অথচ জলোচ্ছ্বাস

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়

নীলুকে আজ দারুণ দেখাচ্ছে। নীল জীনস্-এর ওপরে হলুদ গেঞ্জি। একমাথা চুল কেমন অনাদরে ছড়ানো। ও অন্যদিকে তাকিয়ে আছে।

আমাদের ব্যালকনিতে দাঁড়ালে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। এখানে এসে দাঁড়াতে আমার ভালো লাগে। হয়তো কাগজটা দেখছি, হঠাৎ কী মনে হল সেটা হাতে নিয়েই এসে দাঁড়ালাম। দাঁড়ালেই যে কিছু দেখতে হবে তার কোন মানে নেই। কোন একদিকে তাকিয়ে থাকি বটে, তবে কিছুই হয়তো তেমন করে দেখি না। অনেক দূরে কোথায় যে দৃষ্টি মিলিয়ে যায়!

সেদিন বুলা এসে বলল, 'একা একা দাঁড়িয়ে তুই কার কথা ভাবিস রে?'

শুনে আমি অবাক। বললাম, 'তার মানে?'

'ন্যাকা।' বুলা হেসে গড়িয়ে পড়ল। বলল, 'সেদিন যাচ্ছিলাম তোকে দেখে তিন চারবার ডাকলাম। ইশারা করলাম। সাড়াও দিলি না। তাকিয়েও দেখলি না।'

বললাম, 'বাড়িতে এলি না কেন?'

'একদম সময় ছিল না হাতে। দাঁড়িয়ে থাকবে তো।' কথাটা বলে চোখের অদ্ভুত ভঙ্গি করে মুচকি হাসল।

আমার এইরকম হয়। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি নিজের মনে। কোথায় যাবো সেটা মোটামুটি ঠিক আছে তো ব্যস। আর কোনোদিকে নজর নেই।

কতবার যে আমাকে শুনতে হয়েছে রাস্তায় আমি নাকি কাউকে দেখেও দেখি না অথবা দেখেছি কিন্তু কথা বলিনি। এইসব। অনেকে ভেবেছে আমার আবার অত ঢং কিসের। যার দেখবার মত কিছু নেই তার তো অত দেমাক থাকলে চলে না।

তবে বুলা আসে। ওরও অভিযোগ আছে অনেক, তবু কেন যে আসে বুঝি। ইদানিং ওর জীবনে রোজই নতুন কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে। সেসব কথা আমাকে শোনাতে আসে। ওর অফিসের একটি ছেলের সঙ্গে ঘোরাফেরা করছে আজকাল। সেসব কথা বুলা বার বার নানারকম ভাবে আমার কাছে বলতে চায়। তা ও যে জন্যেই আসুক কেউ যে আমার কাছে আসে এটাই তো অনেকখানি।

আমার মত ভালো শ্রোতা ও পাবে কোথায়! ও বলে যাচ্ছে আর আমি নিজের কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকাচ্ছি, আর সায় দিচ্ছি। ও ভাবছে সবই শুনছি আমি। আসলে আমার মন তখন এলোমেলো ছুটে বেড়াচ্ছে। যে আসনটা বুনছি তার ফুল পাখি লতা-পাতার নকশা ঠিক হচ্ছে তো, একটা রঙের পাশে অন্য রঙটা মানানসই হল তো এসব নিয়ে আমার ভাবনার অন্ত নেই।

শুনেছি একদিকে মানুষের কিছু কম থাকলে ভগবান নাকি অন্য দিক থেকে পুষিয়ে দেন।

বুলা বলে, 'তোর মত হাতের কাজ যদি পারতাম?'

ওর কথা শুনে আমি হাসবো কি কাঁদবো বুঝতে পারি না। বলি, 'ছেলেটি কি হাতের কাজ দেখতে চেয়েছে?'

'না না, ও দেখতে চাইবে কেন। যেখানেই যাই সেখানেই তোর হাতের কাজের প্রশংসা। মা তো আমাকে উঠতে বসতে যা তা বলে। আমি না কি কোন কম্মের না।' বুলা হেসে ওঠে। 'মা কি বলে জানিস?'

আমি বুলার দিকে তাকাই।

'বলে তোর পা ধোয়া জল খেতে।' বলেই বুলা বেদম হাসতে থাকে।

ও যত হাসে আমি ততই ভিতরে ভিতরে গুটিয়ে যাই। মনে হয় বুলার হাসি থেকে টিটকিরি ছিটকে এসে লাগে আমার গায়ে।

নানা ধরনের সেলাই, হাতের কাজ এসব করতে পারা ছাড়া আমার তো আর কোন গুণই নেই। একা বসে কত যে নকশা তুলেছি। যাও পাখি বল তারে, সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে তারপর পতি পরম গুরু এইরকম আরও অনেক। সব করতে হয়েছিল মার তাগাদায়। মার ধারণা হাতের কাজ দেখলেই সবাই মুগ্ধ হয়ে আর অন্যকিছু নজর করে দেখবে না।

এই ধারণাটা যে কত ভুল তা মা বেঁচে থাকতেই টের পেয়ে গিয়েছিল। আমাকে নিয়ে খুব ভুগতে হবে, মা বোধ হয় আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল, তা না হলে জ্বর তো অনেকেরই হয়, আবার সেরেও যায়। মা কেমন অনায়াসে চিরকালের জন্য পালাবার পথটা পেয়ে গেল।

মা চলে যেতেই আমি আর জঞ্জালগুলি ঘরে রাখিনি। যখনি কেউ এসে প্রশংসা করেছে দিয়ে দিয়েছি। কালেভদ্রে যতটুকু হাতের কাজ করি তা ঠেকায় পড়ে। যাদের জন্য করি তারা আমার অবস্থাটা বোঝে। পারিশ্রমিক দেয়। নিজস্ব পয়সার একটা অন্যরকম নেশা আছে। একটু একটু করে সব জমিয়ে রেখেছি কখনো দরকার হতে পারে একথা ভেবে।

বুলার হাসি গায়ে মাখলে শতেক জ্বালা, না মাখলে কোন সমস্যাই নেই। বুলা সুন্দরী লেখাপড়া জানা তার ওপর চাকরি করে। সামান্য হাতের কাজ যা আমার মত কাউকে পয়সা দিলেই ডজন ডজন করিয়ে নেওয়া যায় তা নিয়ে ওকে মাসীমার অত কথা বলা ঠিক হয়নি।

পেট্রোল পাম্পের কাছে যে গোলাপী রঙের বাড়ি তার তিন তলায় থাকে রুমারা। সুন্দর সেতার বাজায় ও। আঙুলগুলো এত সুন্দর যে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। ওর মা যদি ওকে কখনো আমার কাছে পাঠায় গোল করে রুটি বেলা শিখবার জন্য কিংবা ঝকঝকে করে বাসন মাজা শিখবার জন্য সেটা কি ঠিক হবে?

ব্যালকনির ফাঁকা জায়গাটুকু আমার খুব প্রিয়। এখানে দাঁড়িয়ে আমি নিজের সঙ্গে কথা বলি।

নিজের সঙ্গে বকর বকর করতে করতে কত রকম প্রশ্ন যে আমার মাথায় এসে জড়ো হয় তার ইয়ত্তা নেই। বাবা যদিও এখন আর বলে না, আগে মাঝে মাঝেই বলত, 'ঝুমুর, তুই যদি একটুও তোর মার মত হতি!' বাবার দীর্ঘশ্বাস টের পেতাম। সামনা সামনি রাগ হত বাবার উপর। আড়ালে গিয়ে কাঁদতাম।

মার সঙ্গে রাস্তায় বেরুতে আমার লজ্জা করত। যখন বেরুতাম হাঁটতাম বেশ খানিকটা তফাত রেখে। মনে হত মার সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটলে রাস্তায় লোকজন মনে করবে আমি বুঝি বাড়ির কাজের মেয়ে। যেমন মাঝে মাঝে দেখা যায় রাস্তায় একজন সুন্দরী মহিলার পাশে ছোট খাটো গাঁটকপি ধরনের মেয়ে। ফ্রকের আড়ালে শরীরটা বাড়তে গিয়েও যেন মাঝে মধ্যেই হঠাৎ হঠাৎ থেমে গেছে? কপালটা উঁচু। সামনের দিকে চুল নেই। কথা না বললেও

দাঁত ছাড়িয়ে মাড়ি বেরিয়ে থাকে। কালো চামড়ার ওপর শীত হোক গ্রীষ্ম হোক কেমন খড়ি ফোটার দাগ। আয়নায় নিজেকে দেখলে আমারই ইচ্ছে হত ফাইফরমাস খাটাতে।

মার পাশাপাশি হাঁটতে যে আমার এত লজ্জা এত সঙ্কোচ মা টের পেত। জোর করে আমার হাত ধরে নিজের কাছে টেনে রাখত। ভুল করেও কখনো মার হাতের কোন জিনিসপত্র আমার কাছে দিত না। মার কষ্ট হলেও আমি আগ বাড়িয়ে কিছু নিতামও না। শাড়ি কেনার পর সেটা বাক্সে ভরে দোকানের কর্মচারী যখন আমার দিকে এগিয়ে দিত তার আগেই মা হাত বাড়িয়ে সেটা নিত। সবার সামনে আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলত মা যেন আমি দয়া করে সঙ্গে এনেছি তাই আসতে পেরে ধন্য হয়ে গেছে। কথা বলতে বলতে আমাকে জড়িয়ে ধরত। সব দেখে শুনে দোকানের কর্মচারী অপ্রস্তুত হয়ে তাকিয়ে থাকত আমাদের দিকে। আমি মরমে মরে যেতাম। কি এক কষ্টে মার মুখের রেখাগুলি ভাঙচুর হয়ে কেমন দুঃখী করে তুলত। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারতাম।

আমার মা গরীব ঘরের সুন্দরী মেয়ে। আমার দাদু মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য আমার ঠাকুরদার কাছে হাত জোড় করে একেবারে নুয়ে পড়েছিলেন। মেয়ের বিয়ে দিতে পারবেন এই ভাবনাতেই মনে করেছিলেন তাঁর জীবন সার্থক হয়ে গেল।

ঠাকুরদাও কৃতার্থ হয়েছিলেন। তবে ভাবটা গোপন রেখেছিলেন। হাজার হোক ছেলের বাবা তো! আমার দাদুর যদি অবস্থা ভালো হত তবে কি এই বিয়ে হতে পারত! দাদু তো ভাবী জামাইকে দেখেছিলেন। বিরাট একটা মাথার সঙ্গে চৌকো চোয়াল। পুরু দুটো ঠোঁট যেন সব সময় হাঁ করে আছে। কালো রঙের একটা ছোট খাটো শরীর। চোখদুটো খুদে খুদে কোটরের ভিতরে ঢোকানো। এসব দেখেও তিনি মেয়ের কথা একটুও ভাবলেন না! অমন সুন্দরী মেয়েটার যে ভালোমন্দ বোঝবার বয়স হয়েছে, ইচ্ছে অনিচ্ছে কিছু থাকতে পারে, সেকথা একবার মনেও হল না! মেয়েটাকে ভালো খেতে পরতে দিতে পারেননি। বিয়ের পরে মেয়েটা দুটো পেট পুরে খেতে পারবে এছাড়া আর কিছু ভাবনায় ছিল না।

আমি দেখতে হয়েছি আমার বাবার মত। মার গায়ের রঙটাও কি পেতে পারতাম না। অমন পাতলা ঠোঁট, টানা টানা এক জোড়া চোখ, মা কি আমাকে এসবের কিছুই দিতে পারত না? আমার আর কোন ভাইবোন হয়নি। এটা যে কোন পরিকল্পনার ফল তা বোধহয় নয়। কেন না আমার ঠাকুরদা চেয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে গণ্ডায় গণ্ডায় রাঙা টুকটুকে নাতি নাতনি ছোটাছুটি করে বেড়াক, এইসব ভেবেই পয়সার শব্দ শুনিয়ে আমার মায়ের মত এক সুন্দরী মেশিন কিনে এনেছিলেন।

বংশধররা সুন্দর হবে এই স্বপ্নে বিভোর থেকে আমাকে দেখেই মনে হয় বুড়োর চটকা ভেঙে গিয়েছিল। এতটা অপদস্থ বোধ হয় তাকে কখনও হতে হয়নি, পয়সা দেখিয়ে এই অবস্থাটা সামলানোর নয়।

মার কোলে আমাকে দেখে প্রথমদিন বাবার মুখটা যে কেমন হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করতে পারি। মায়ের সঙ্গে বাবাকে যখনই কথা বলতে দেখেছি মনে হয়েছে বাবা যেন চুরির দায়ে ধরা পড়েছে।

মাঝে মাঝে মনে হত মার সঙ্গে বিয়ে হওয়া উচিত ছিল এমন একজনের, যে সুন্দর। মার থেকেও লম্বা। ফরসা গায়ের রঙ। তাহলে? তাহলে আমি এইরকম দেখতে হতাম না। কথাটা ভেবেই মনে হত তবে কি আমিই আসতাম এই পৃথিবীতে। কি করে তা হত? আমি মানে তো এই বাবার মেয়ে। যার কুৎসিত চেহারা। যার বিয়ে হবে কি না ঠিক নেই। যে পাশের বাড়ির বৌদির অনুরোধে তার বরের জন্য সোয়েটার বুনে দেয়। সে কি আর জন্ম নিত! জন্মাত অন্য একজন। সোনাবরণ কন্যা যার মেঘবরণ কেশ। ভাবতেই আমার বুকের ভিতরটা কেমন যেন

হা হা করে উঠত। আমি নেই তাহলে অমন সুন্দর স্বপ্ন দেখার প্রয়োজনটা কোথায়! চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হত আমার, মনে হত সবকিছু ভেঙে তছনছ করে দিই। ভগবানকে গালাগালি করি, এতখানি নিষ্ঠুর সে কেন হল! কিছুই করতাম না, চুপ করে থাকতাম অভিমানে। সবার কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আমার ইচ্ছে হত গভীর অন্ধকারে বসে থাকি। এর মধ্যেও টের পেতাম হাওয়ার পরিবর্তন।

এক এক ঋতুতে এক এক ধরনের হাওয়ায় গাছের পাতার দুলুনি যেত বদলে, ওরাও কি বুঝতে পারত আমার মত? প্রথম বৃষ্টি শুরু হলেই ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ বুক ভরে টেনে নিতাম। আকাশ জুড়ে মেঘের ওড়াউড়ি, এসব দেখতে দেখতে সময় যে কোথা থেকে কেটে যেত! ব্যালকনিতে বসে রাতের আকাশের তারা দেখতে দেখতে অনেকটা সময় কেটে গেলে মনে হত এবার বুঝি ঐ তারাগুলি দল বেঁধে ছুটে আসবে আমার সঙ্গে কথা বলতে। আসতও। এসব ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে হত না আমার।

আত্মহত্যা করার কথা ভেবেও করতে পারিনি। যতবারই নানা ধরনের উপায়ের কথা ভেবেছি ততবারই ভিতর থেকে কারা যেন প্রবল বাধা দিয়েছে।

অনেকদিন আগেকার কথা—তখন আমার বয়স কতো হবে তেরো কিংবা আর একটু বেশি। হালিশহর গিয়েছি মামার বাড়িতে। মামাতো দিদির বিয়ে। দু'তিন দিন থাকবো বলেই গিয়েছিলাম। আমি আর মা। বাবা যেতে রাজি হয়নি, মাও দ্বিতীয়বার বলেনি।

সেখানে গিয়ে দেখা হল শুক্তি কুসুম পিয়ালী আর অনুরাধার সঙ্গে। কেউ মামাতো বোন, কেউ মাসতুতো, ওদের সঙ্গেই ওঠাবসা। একসঙ্গে খাওয়া ঘুমনো।

মেলামেশা করছি ঠিকই তবে বুঝতে পারছি কোথায় যেন একটু তাল কেটে যাচ্ছে। আমি যদি নিজের থেকে এগিয়ে না যাই, আমি আগ বাড়িয়ে কথা না বলি তাহলে ওরা নিজে থেকে কেউ কিন্তু আমাকে ডাকছে না। হয়ত আমি একটু অন্যমনস্ক, ততক্ষণে ওরা নিজেদের মধ্যে কি একটা গোপন কথা বলে হাসতে শুরু করেছে। হাসির শব্দ শুনে আমিও হাসি মুখ নিয়ে ওদের কাছে গিয়ে বলছি, 'কী হয়েছে বল না।'

সঙ্গে সঙ্গে হাসি বন্ধ হয়ে গেছে ওদের। শুক্তি বলে উঠেছে, 'কি রে বাবা। কোন কথা বলার উপায় নেই। সব কথা ওর শোনা চাই!'

'সবেতেই তোর অত দরকার কি রে? শুধু আমাদের সঙ্গে ঘুর ঘুর করছিস!' অনুরাধার কথা যেন আত্মায় হুল ফোটানো।

পিয়ালী কিছু বলেনি। ওর সুন্দর মুখে অহংকার যেন টইটম্বুর।

আমি আব যাবো কোথায়। দুপুরে যখন খাওয়ার সময়, আমি তখন সব ভুলে ওদের জন্য জায়গা রেখে ডেকে এনে বসিয়েছি। পিয়ালী আমাকে ডেকে বলেছে ভালো পাতা আনতে। ফুটো মাটির গ্লাসটা বদলে দিতে। জল এনে সবাইকে দিতে। কোথায় নুন লেবু আছে তা খুঁজে নিয়ে আসতে। আমি একবারও না বলিনি, সব করেছি। ভেবেছি বিয়ে বাড়িতে কাজ করাটাই তো আনন্দের।

খাবার সময় মাছ দিচ্ছিল বসন্তদা। আমি ওব দিকে তাকিয়ে হাসতে গেলাম। আমার দিকে তাকিয়েও দেখল না। অনুরাধাকে মাছ দিয়ে পিয়ালীকে দুটো টুকরো দিল। আমাকে মাছ দেবার কথা বলতে গেলাম, অনুরাধা বলল, 'চুপ করে খা তো। অসভ্যের মত চেঁচাস না।'

আমি চুপ করে রইলাম। মনে মনে ভাবলাম রাতে খাওয়ার সময় না হয় একটা বেশী খেয়ে নেব।

সন্ধ্যাবেলা যখন চারদিকে আলো জ্বলে উঠল, শুক্তি কুসুম অনুরাধা আর পিয়ালী যেন রঙীন প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াতে লাগল। ওরা যখন সাজছিল তখন নিজেদের মধ্যে

আলোচনা করছিল কে কেমন ভাবে চুল বাঁধবে, কোন শাড়িটা পরবে এইসব। আমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। কেউ ওরা আমার পরামর্শ নেয়নি। আয়নার কাছে গিয়ে আমি দাঁড়াতে পারছিলাম না। আমি কি পরবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমার গলার কাছটা কেমন ভারি হয়ে আসছিল। চোখের সামনে সব কেমন ঝাপসা। পিয়ালীর কথায় আমি ওর শাড়ি এগিয়ে দিলাম। বারান্দায় অনেকের জুতোর সঙ্গে মিশে ছিল ওর সোনালী চটি, আমি আলাদা করে এনে রেখেছিলাম ওর পায়ের কাছে। আমি চাইছিলাম উৎসবের রাতটিতে ওরা যেন আমার সঙ্গে একটু ভালো করে কথা বলে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে দেয়।

বসন্তদা ভিড়ের মধ্যে আমার কানের কাছে এসে বলল, 'পিয়ালী কোথায় রে?'

পিয়ালীকে আমিও খুঁজছিলাম। ওরা যে বিয়েবাড়ির ভিড়ের মধ্যে কোথায় হুটহাট করে চলে যাচ্ছে বুঝতেও পারছি না। আমি একা একা শুধু ওদের খুঁজছি।

বসন্তদা এর আগে আমার সঙ্গে কথা বলেনি, পিয়ালীকে খুঁজে আমি বসন্তদাকে জানানোর পর আর কথা বলল না।

রাতে একটা ঘরে আমরা একসঙ্গে শুয়ে আছি। শুক্তি অনুবাধা কুসুম আর পিয়ালীর কত যে গল্প কিছুতেই আর শেষ হতে চায় না। রাত তখন কত জানি না! বসন্তদা এল। বলল, 'কোথাও একটু শোয়ার জায়গা পাচ্ছি না। তোমাদের এখানে বসবো।'

'আমি আগ বাড়িয়ে বললাম, হ্যাঁ।'

বসন্তদা আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। তার মনে তখন শুধু পিয়ালী আর পিয়ালী।

কুসুম বলল, 'তুই ঐ দিকে সরে যা না।'

আমি একেবারে দেওয়ালের গা ঘেঁষে শুলাম।

শুক্তি অনুরাধা সরে জায়গা করে দিল। বসন্তদা বসল পিয়ালীর পাশে। কুসুম আমাকে ঠেলল, 'সব না। একেবারে গাযের ওপর এসে পড়েছে।'

দেওয়ালটা কিছুতেই সরল না।

বসন্তদার কি একটা মজার কথায় সবাই হেসে উঠল। আমিও। আমার হাসি শুনে সবাই চুপ করে গেল।

কুসুম বলল, 'তুই এখান থেকে যা তো।'

আমি নড়লাম না। কোন কথাও বললাম না। আমার মরে যেতে ইচ্ছা করছিল।

ঘরের আলোটা নেবানো। জানালার ওপরের পাল্লা দিয়ে বাইরের প্যাণ্ডেলের আলো এসে পড়েছে। কুসুমের কোন সাড়াশব্দ নেই। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। শুক্তি অনুরাধাও মনে হয় জেগে নেই। টের পাচ্ছিলাম শুধু পিয়ালী আর বসন্তদা জেগে আছে। আমি তো আছিই।

'হাতটা অসভ্য।' পিয়ালীর অস্ফুট কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'কি হচ্ছে?'

আমি সন্তর্পণে ওদের দিকে ফিরে শুলাম। দুটো ছায়া শরীর পরস্পর জড়িয়ে ধরে আছে। বসন্তদার মুখ পিয়ালীর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল, আমি সময় গুনছি। মনে হচ্ছে যেন কত যুগ কেটে যাচ্ছে। আমার অবস্থা বোবায় ধরার মতো। দুটো পা অসাড়। কোথাও পালিয়ে যাবার উপায় নেই। সেই প্রথম আমি অনুভব করলাম শরীরের প্রতিটি কোষে তীব্র জ্বালা। আগুনের হলকা যেন ত্বক ঝলসে দিচ্ছে আমার। চোখের জলে দু'হাতের তালু ভিজে গেল।

বাড়িতে ফিরে এসে কয়েকটা দিন কেমন ঘোরের মধ্যে রইলাম। মনে হতে লাগল আমার 'বেঁচে থাকার কোন মানে নেই। যতদিন বেঁচে থাকবো কত যে অপমান আমায় সহ্য করতে হবে কে জানে!

একদিন সুযোগ এল। বাড়িতে আমি একা। সব সময়ের কাজের লোক সাতদিনের ছুটিতে। মা বেরুবার সময় আমাকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন, আমি যাইনি।

সমস্ত আয়োজনটা করতে আমার বেশি সময় লাগেনি। ভিতর থেকে রাগ অভিমান ক্ষোভ আমাকে কেমন যেন অস্থির করে তুলেছিল। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়. এইরকম একটা বোকা বোকা কথা লিখে রাখবো ভেবেছিলাম একবার। তারপর ভাবলাম লিখবো কেন! আমার মৃত্যু যদি কাউকে হয়রান করে, আমার মৃত্যু যদি কোনও রহস্য তৈরি করে তবে দু'দিনের জন্য হলেও লোকে আমাকে নিয়ে ভাববে। কুসুম শুক্তি অনুরাধা যখন শুনবে! পিয়ালী, বসন্তদা?

জানালাটা খোলা ছিল। দড়ির বৃত্তের মধ্যে মাথাটা গলিয়ে দেবার আগে বড় করে শ্বাস ফেললাম। ঝুলে পড়তে কষ্ট হবে কি না এ নিয়ে আমার ভাবনা নেই। অন্য কথা মনে এল। আর কিছুক্ষণ বাদে আমি থাকবো না। ভাবতেই চারিদিক থেকে যেন সবাই বলতে লাগল, তুমি থাকবে না। তুমি থাকবে না। তুমি থাকবে না। দেয়াল ছাদ দরজা আসবাবপত্র সব কেমন যেন ঘুরতে লাগল। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। সব কেমন ঘুরছে। গাছপালা একখণ্ড আকাশ ঘুরতে ঘুরতে ছোট বিন্দুর মত হয়ে টিপের মত আটকে গেল দুটো ভুরুর মাঝখানে।

জানালার সামনে যে পেয়ারা গাছটা তার ডালে একটা কাঠবিড়ালি উঁকি দিয়েই আবার আড়ালে চলে গেল। আমি দড়িটা দুহাতে মালার মত ধরলাম, কাঠবিড়ালিটা আবার এল। এদিক ওদিক খানিকক্ষণ ছোটাছুটি করে কোথায় যে উধাও হল। আমার মনে হল একটু বাদে নিশ্চয়ই আসবে।

সত্যিই এল। সামনের দুটো পা মুখের কাছে তুলে কুটুর কুটুর করে কি একটা খেল যেন। তারপরেই আড়ালে। আমি নেমে জানালার কাছে এলাম। কোথায় লুকোবে কাঠবিড়ালিটা। আবার আসবে নিশ্চয়ই। অপেক্ষায় থাকতে থাকতে মনে হল আমি না থাকলেও কাঠবিড়ালির এই খেলা তো ফুরবে না।

আমি তাড়াতাড়ি দড়িটা খুলে ফেললাম। সব সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিক যেমনটি আগে ছিল তেমন করে রেখে দিলাম।

মা ফিরে এলেও বুঝতে পারবে না কি সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছিল।

বুকের ভিতরে কেমন ছলাৎ ছল শব্দ। আমি ছুটে খাটের ওপরে গিয়ে আছড়ে পড়লাম! ফাঁকা ঘরে শব্দ করে কেঁদে উঠলাম। সে কান্না যেন কিছুতেই শেষ হতে চায় না।

এইভাবে আর একদিন কেঁদেছিলাম। সে অনেকদিন পরে। আমার বয়সী মেয়েরা ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরেছে। আমাকে ফ্রক পরে থাকতে দেখে তাদের কি টিটকিরি। আমি নাকি কচি খুকি সাজতে চাই। বাধ্য হয়ে আমিও শাড়ি পরা ধরলাম।

শাড়ির অভাব রাখেনি মা। কত রঙ-বেরঙের শাড়ি জমা হতে লাগল। আমার চেষ্টার অন্ত থাকে না, কিন্তু কোন শাড়িতেই আমি প্রজাপতি হয়ে উঠতে পারি না। আয়নার সামনে দাঁড়ালে মনে হয় যেন একটা গুবরে পোকা। কি ঘেন্না।

কিছুই ভালো লাগে না। বই নিয়ে বসি একটা অক্ষরও দেখতে ইচ্ছে করে না। চোখের সামনে সব কেমন ঝাপসা হতে থাকে। কি পড়ি কি না পড়ি এই নিয়ে বাবা কিছু বলে না। মাও একদিন বলা বন্ধ করল।

লতা মায়া গীতা সে যেই হোক না কেন সকলের বইয়ের ভিতরেই কখনও না কখনও পাওয়া যেত চিঠি। সেই চিঠি নিয়ে কত না রহস্য। সব সময় কেমন ঢাক ঢাক গুড় গুড় ভাব। চলাফেরায় কি দেমাক। পাছে কেউ কিছু জেনে ফেলে বুঝে ফেলে এই ভয়ে শঙ্কিত আবার সব সময় এমন একটা ভাব যেন কাউকে কিছু না জানাতে পারলে শান্তি নেই।

আমি ওদের এড়িয়ে যেতাম। যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে আমি তাহলে কি বলবো ওদের? আমার কাছে লুকনো কোন চিঠি নেই যা নিয়ে আমি অহংকার করতে পারি। আমার শরীরে এমন কোন গোপন স্পর্শ নেই যা মনে করে আমি শিহরিত হতে পারি।

ওদের দু'চারটে কথা যা কানে আসত শুনলে বুকের ভিতরটা আমার জ্বলে যেত ঈর্ষায়। চোয়াল শক্ত হয়ে আসত। দুটো হাত মুঠো হয়ে টান টান হয়ে যেত শরীর। মনে হত আমাকে কেউ চিবিয়ে খেয়ে ফেলুক। আমাকে কেউ পিষে মেরে ফেলুক দু'হাতের থাবায়।

একদিন স্কুল থেকে ফিরছি, আমি, দোলা আর জয়া। কিছু দূরে যেতে না যেতেই দেখি চার পাঁচটা ছেলে আমাদের পিছনে আসছে। কাছাকাছি এসে একটা ছেলে বলল, 'এই পেয়ারা খাবি?'

কারও নাম ধরে বলেনি। আমার যে কী হল, ভাবলাম বুঝি আমাকেই বলেছে। ছেলেটির দিকে তাকিয়ে হাসলাম। পেয়রাটা হাতে ধরাই ছিল। আমার হাসি দেখে ছেলেটি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

দোলা আমার হাত টেনে ধরে জোরে হাঁটতে শুরু করল। বলল, 'ওরা বাজে ছেলে। আবার পেয়ারা সাধতে এসেছে, তাড়াতাড়ি চল।'

জয়াও তাড়াতাড়ি হাঁটছিল।

বললাম, 'বাজে ছেলে হতে যাবে কেন, আমাকে পেয়ারা দিতে চাইছিল।'

'ইস ওকে পেয়ারা দিতে চাইছিল! শখ কত।'

আমার রাগ হয়ে গেল, বললাম, 'চাইছিল তো। তোদের জন্যই তো দিতে পারল না।'

দোলা দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, 'যা গিয়ে পেয়ারা নিয়ে আয় দেখি কেমন দেয়।'

'দেবেই তো।' জোর দিয়ে কথাটা বললাম।

ছেলেগুলি এগিয়ে আসছিল। তবু আমিই এগিয়ে গেলাম। যে ছেলেটি পেয়ারা দিতে চাইছিল তার কাছে গিয়ে চোখে চোখ রেখে হাত পাতলাম, বললাম, 'দাও'।

'তোকে দেব কেন?' ছেলেটি বলল।

আমি হাত নামিয়ে দিতে পারলাম না। কিছুক্ষণের জন্য ভিখিরির মত দাঁড়িয়ে রইলাম। ফিরে গেলে জয়া দোলাকে কিভাবে মুখ দেখাবো!

ছেলেটি বলল, 'তুই যদি ওদের ডেকে আনতে পারিস তাহলে এই পেয়ারাটা তোকে দিতে পারি।' পাখিতে ঠুকরে খাওয়া একটা পেয়ারা আমাকে দেখাল।

জয়া দোলার কাছে আমি হেরে যাবো না কিছুতেই। গিয়ে বললাম, 'আমাকে অনেকগুলি ভালো পেয়ারা দিতে চেয়েছিল। নিলাম না। বললাম তোদেরও দিতে হবে। ওরা রাজি হয়েছে, চল।'

ঠাস করে একটা চড় আমার গালে এসে পড়ল। দোলা রাগে চিৎকার করে বলল, 'আবার যদি উল্টোপাল্টা কথা বলিস তো আবার মারবো।'

জয়া আর দোলা চলে গেল। আমি রাস্তা থেকে বইগুলি কুড়িয়ে নিতে নিতে শুনলাম ছেলেগুলি হাসছে। বাড়িতে তো ফিরতেই হবে। খানিকটা এগোতেই আমার কান ঘেঁষে কিছু একটা এসে সামনে পড়ল। আর একটু হলেই জোর লাগত। তাকিয়ে দেখি ইঁট পাথর নয়, একটা আধখাওয়া পেয়ারা।

দোলা জয়ার জন্য রাস্তার ছেলেরা পাগল হয়। পেয়ারা দিতে চায়। দু-একটা বছর যেতে না যেতেই পেয়ারার বদলে আসে সিনেমার টিকিট।

একদিন দোলা এসে আহ্লাদে দুলে দুলে ফুচকা খাওয়ার গল্প করে। জয়া একটা নকশা আঁকা নীল কাগজে লেখা দেখায়। অহংকারে ওর দুটি বিনুনী পাখনার মত উড়তে থাকে।

সিনেমার আধো অন্ধকারে যে হরেক রকম দুষ্টুমি লুকিয়ে থাকে সেসব বলতে বলতে দোলার ঠোঁট ভিজে ওঠে।

নীল রঙের চিঠি, দুটি বুকের ভাঁজে যত্ন করে রেখে দেয় জয়া।

আমার চড় খাওয়া গালের চামড়ায় জ্বলুনি শুরু হয়। একটা আধ খাওয়া পেয়ারার টুকবো দ্রুত বেগে আমার দিকে ছুটে আসতে থাকে যেন।

স্কুলের গণ্ডীটা কেঁদে কঁকিয়ে হাত-পা-কাটা জন্তুর মত গড়িয়ে শেষ পর্যন্ত পেরিয়ে গেলাম। ঐখানেই শেষ।

মা তখন চারিদিকে লোক লাগিয়ে পাত্রের খোঁজ করছে। জয়া দোলা শুভা চামেলিদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বিয়ে থা করে একেবারে গিন্নিবান্নি।

একদিন লেক মার্কেট থেকে বাজার করে ফিরছি দেখি চন্দ্রা। বেশ মোটা হয়েছে। ফর্সা রঙ যেন ফেটে পড়ছে। কোলে ছোট্ট দুধসাদা একটা ডল পুতুল। আমাকে দেখতে পেয়ে ডাকল। বলল, 'কেমন আছিস?'

আমি কেমন আছি সেটা সত্যি করে বলাও যায় না। আর বললেও ধৈর্য ধরে শুনবে না কেউ। বললাম, 'তুই কেমন?'

'আর বলিস না কি বিচ্ছু হয়েছে না একখানা। একটু স্থির হসে বসতে দেয় না।'

বাচ্চাটি এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছিল। বাস ট্রাম দোকানের আলো মানুষজন, আপনমনেই হাসছিল।

আমি ডাকলাম, 'এই যে সোনামণি। এদিকে তাকাও। তাকাও বাবুন সোনা।'

গলার আওয়াজে ফিরে তাকাল। দুটো হাত এগিয়ে দিলাম। বললাম, 'কোলে আসবে?'

একটু সময়ের জন্য তাকাল আমার দিকে। তারপরেই ঠা ঠা করে কেঁদে উঠল। আমি অপ্রস্তুত।

চন্দ্রা হেসে ফেলল। 'মা ছাড়া কারও কাছে যেতে চায় না রে। বাচ্চাটিকে দুলিয়ে থামাতে চেষ্টা করল। কিছুতেই থামে না। চন্দ্রা বলল, 'আমি যাই রে।'

কি আর বলবো। চন্দ্রা চলে গেল। আমি চুপচাপ ওর চলে যাওয়া দেখলাম।

মার উদ্যোগ একটু একটু করে কমে আসছিল। পাত্রপক্ষ আসে, মার সঙ্গে কথা বলে। খাওয়া দাওয়া করে। বাবা আড়ালেই থাকে। মার কড়া নির্দেশ।

কেউ কেউ বলে মতামত পরে জানিয়ে দেবে। তাদেব খবরের অপেক্ষায় থেকে দিন যায়। কেউ আবার খাওয়া-দাওয়া সেরে মার সমানেই রুমালে হাত মুছতে মুছতে মুখেব ওপর বলে যায়, 'আপনার মেয়ে বলে বিশ্বাস হয় না।'

মার অসুখে বাবাকে দেখেছি দিনরাত সেবা করতে। অনুগত চাকরের মত মার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকত। ডাক্তারবাবু যেভাবে মাকে থাকতে বলেছিলেন যে নিয়মে ওষুধ খেতে বলেছিলেন সেসব পালন করায় বাবার কোন ত্রুটি ছিল না। মা কিন্তু বাবার দিকে ফিরেও তাকাত না। দেখে মনে হত মা আমাদের কাছে আর থাকতে চায় না। তবু বাবা কোন অপমান গায়ে না মেখে যা করবার সবই নিয়ম মাফিক করে যেত।

মার যেন জেদ চেপে গিয়েছিল। শেষ কদিন চূড়ান্ত অনিয়ম করল মা। রাত দুটোয় বাথরুমে জল ঢালার শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। দেখি বাবা বারান্দায় পায়চারি করছে। অথচ সাহস করে দরজায় কড়া নেড়ে ডাকতেও ভরসা পাচ্ছে না। আমি চিৎকার

করে মাকে ডাকলাম। চারিদিকে বাড়ি ঘর পাড়া প্রতিবেশী। বেশি ডাকারও উপায় নেই। কি হয়েছে জানবার জন্য তারা যদি ছুটে আসে তাহলে এই কেচ্ছা ছড়িয়ে পড়বে গোটা পাড়ায়।

আধঘণ্টা বাদে যখন দরজা খুলল তখন মার চোখের ঘোলাটে চাউনি দেখে চমকে উঠেছিলাম। মাথা থেকে পা পর্যন্ত জলে ভেজা। শুকনো তোয়ালে নিয়ে মার কাছে যেতেই মা এক ঝটকায় আমাকে সরিয়ে ঐ অবস্থায় বিছানায় শুয়ে পড়েছিল।

মা নেই। বাবা কেমন যেন হয়ে গেল। এই বাড়িটা ছাড়া আরও সম্পত্তি বাবার পাওয়ার ছিল, সবই আমার দুই কাকা কুক্ষিগত করে ফেলল। কোন কিছুর উপরেই যেন বাবার টান ছিল না। এমনকি আমার উপরেও।

একদিন বোমার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি দেড়টা। একটা দুটো তিনটে...। অজস্র বোমার শব্দে বিছানার ওপরে আমি ভয়ে জড়োসড়ো।

মনে হল দরজায় ধাক্কা দিল কেউ। খাট থেকে নামতে ভয় করছিল। আবার শব্দ হল দরজায়। হয়ত বাবা। আমি ধীরে ধীরে নামলাম। সত্যি বাবা তো, না অন্য কেউ ভাবতে ভাবতে খুলে ফেললাম দরজাটা। আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ঘরে ঢুকল নীলু। দরজায় ছিটকিনি তুলে দিয়ে হালকা নীল আলোটা নিভিয়ে দিল।

মনে হয় যেন সেদিনের কথা। কতই বা বয়স তখন, রাস্তায় সবার সঙ্গে বল খেলছিল, এত জোরে পা চালাল যে বল সোজা এসে আমাদের দোতলাব জানালার কাচের শার্সিতে। ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়তেই ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালাম। সবাই আঙুল তুলে নীলুকে দেখাল। ও ছাড়া অমন জোরালো শট আর কেই বা মারবে। কি সুন্দব চেহারা ছেলেটার!

সেই ছেলে চোখের সামনে কেমন চড়চড়িয়ে বড় হয়ে উঠল। ওকে দেখে কেউ বলত কেষ্ট ঠাকুর। আড়ালে আবডালে কত রকম যে কথা। বয়সে তো আমাদের হাঁটুর কাছাকাছি। তবু ওকে নির্জনে পেলে...। কথাটা বলে চোখের অদ্ভুত ইশারা করে অনেককে দেখেছি বড় করে শ্বাস ফেলতে। কি রকম যে হয়ে উঠত ওদের চোখ মুখ! আমার মনে হত ওরা সবাই মিলে নীলুকে যদি কখনও নির্জনে পায় তাহলে আস্ত রাখবে না। ছিঁড়ে কামড়ে শেষ করে দেবে।

আমি এমন পোড়াকপাল, গোপনেও কিছু ভাবতে ভয় পাই। মনে হয় কেউ টের পাবে। অন্য মেয়েরা বউরা যা কিছু বলে তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু আমি বললেই তো মুখ টিপে হাসি। টিটকিরি। নানারকম কথা শুরু হবে। বলা যায় না কেউ হয়ত নীলুর কানেই কথাটা তুলে দিল। ছিঃ।

বাইরে তখনও বোমাব আওয়াজ। আমাদেরই বাড়ির সামনে যেন শুনলাম কার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। নীলু আমাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'অতীনটাকে বাঁচাতে পারলাম না ঝুমুরদি। আমি পালিয়ে এলাম।' কথাটা বলেই নীলু আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে কাঁদতে শুরু কবল।

বাইরের আর্তনাদটা থেকে থেকে কয়েকবার শোনা গেল। চিৎকারটা যতবারই হচ্ছিল নীলু আমাকে জড়িয়ে ধরছিল। মনে হচ্ছিল ভয়ে ওর সমস্ত শরীর কেঁপে উঠছে। ওর মাথাটা আমি চেপে ধরে রেখেছিলাম। মনে হল আমার হাতে কিছু লাগল। বোধ হয় রক্ত। নীলুর মাথায় হাত বোলাতেই যন্ত্রণায় কাতরে উঠল।

বাইরের আর্তনাদটা থেমে যেতেই ও নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসতে চাইল। ওর কান্না তখনও একটুও থামেনি। আমি ওকে দুহাত দিয়ে সজোরে চেপে ধরলাম আমার বুকে।

এক সময় দেখি কিছুতেই কান্না থামাতে পারছি না।৮

সেদিন যদি পাইপ বেয়ে কার্নিশে ভর দিয়ে আমাদের ছাদে না উঠতে পারত তাহলে অতীনের সঙ্গে নীলুকেও মরতে হত। আচমকা আক্রমণ করায় ওরা একেবারে তৈরি হওয়ার সুযোগ পায়নি।

কেন যে এই আক্রমণ, কেন যে এই সমস্ত খুনোখুনি, আমার মাথায় ঢুকত না।

তবে বোমা পাইপগান পুলিশ সি আর পি এসব ছিল আমার দু'চোখের বিষ।

তখন অস্থির সময়। কাউকে ডেকে দুটো ভালো কথা বলার উপায় ছিল না। মনে হত যাই বলি না কেন সব কিছুরই উল্টো অর্থ বুঝবে।

দূর থেকে দেখতাম নীলুকে। ডেকে বলতে ইচ্ছে হত, এইসব খুনোখুনিব মধ্যে ও যেন না থাকে। কাকে বলব! কাছাকাছি তার দেখা পেলে তো। তাছাড়া দেখতে পেলেও কি আমি সত্যিই কিছু বলতে পারতাম ওকে। সে দিনের পর থেকে কি এক সঙ্কোচ যে আমাকে ঘিরে ধরেছিল।

তারপর থেকে নীলুও আর কখনও আসেনি।

সেই অস্থির সময় এখন আর নেই। লোডশেডিংয়ের ঝুপ্পুস অন্ধকারে ডুবে থেকেও মানুষজন কেমন শান্ত! জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম নাগালে আনতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়েও মানুষজন কত স্বাভাবিক! যারা একদিন দুনিয়াতে ঝড় তুলবে বলে পণ করেছিল তারা এখন আকাশটাকে শান্ত দেখে।

আমার ভিতরের সমস্ত অস্থিরতা ইঁট চাপা ঘাসের মত। কোন উত্তেজনা যেন নেই। এই একটা জীবন আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে! ভাবলেই নিজের ভিতরে গুটিয়ে যাই। এত বর্ণ গন্ধ স্পর্শ—কিছুই আমার জন্য নয়?

লোকগুলি বহুক্ষণ ধরেই আমার পিছু নিয়েছিল বুঝতে পারছিলাম। এত অসহায় মনে হচ্ছিল নিজেকে। মনে হল কেন যে মরতে বেরিয়েছিলাম। আরো কটা দিন থাকবার জন্য বলেছিল রাঙামাসি। শুনলাম না। প্রায় পনেরো দিন বাড়ি ছেড়ে আছি।

অন্য কোথাও গেলে একদিন বড় জোর দুদিন। তারপরই বাড়ি বাড়ি করতে থাকে মনটা। আমার নিজের ঘরটায় এসে ঢুকলে স্বস্তি পাই। রাঙামাসির মেয়ে সুমুব বাচ্চা হয়েছে। সংবাদটা জানাতে এসেছিল রাঙামাসি নিজেই। দু চার কথার পর আমাকে সঙ্গে যাবার কথা বলল। বলবে এটা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। রাঙামাসি এইরকমই। মা মারা যাওয়ার পরে মাঝে মাঝেই ভাঙা কুলোর খোঁজে এখানে আসে। সেবার যখন রাঙামাসির অসুখ হল তখন মেসোমশাই আর সুমু এসেছিল আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। এমন আন্তরিক কথাবার্তা বলল বাবার সঙ্গে, শুনে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। গাড়িতে উঠে মাঝপথে রাঙামাসির অসুখের খবরটা জানাল ওরা। তারপর গোটা সংসারটাই আমার কাঁধে। মেসোমশাইয়ের অফিস ঠিক চলছে। সুমু একদিনও কলেজ কামাই করেনি। রাঙামাসি বিছানায় শুয়ে। আর আমি গোটা বাড়িটায় চরকিপাক খাচ্ছি। কাজের যেন আর অন্ত নেই।

এবারও তাই হল। রাঙামাসি নাতিকে ছেড়ে নড়তেই চায় না। সুমুর তো নড়বার উপায় নেই। আমি কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওদের ঘরে যাই। বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে থাকি। চোখের পলক পড়তে চায় না। ছোট্ট একটা শিশু হাত পা নেড়ে খেলছে। আপনমনে হাসছে। কখনো বা ঠোঁট উল্টে কান্নার ভঙ্গি।

দেখতে দেখতে আমার বুকের ভিতরটায় কেমন এক মোচড়। শরীরের ভিতরটায় কি এক আকাঙ্ক্ষায় আকুলি বিকুলি। তলপেট ছাড়িয়ে এক তীব্র স্রোত যেন নামতে থাকে নীচের দিকে।

রাঙামাসি আমার দিকে খর চোখে তাকিয়ে বলে, 'তুই এখানে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? স্নানের জল গরম করেছিস! যা তাড়াতাড়ি যা।'

সুমু বাচ্চাটিকে কোলে তুলে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে ঘুরে বসে।

আমি তাড়া খেয়ে চলে আসি রান্নাঘরে। কাজের যেন আর শেষ নেই। বাচ্চাটির গু মুতের কাঁথাও পরিষ্কার করি আমি। যখনি একটু অবসর পাই রাজ্যের পুরনো শাড়ি এনে আমার সামনে জড়ো করে রাঙামাসি। বলে, 'বারান্দায় বসে সেলাই কর।'

দরজা বন্ধ করে দেয়। বাচ্চাটি আমার চোখের আড়ালে। কাঁথায় সেলাইয়ের ফোঁড় তুলতে তুলতে আমি বাচ্চাটির মুখ মনে করবার চেষ্টা করি। মনে হয় আমার পেটের ভিতরে বাচ্চাটি যেন হাত পা ছুঁড়ছে।

একদিন ভোরবেলা উঠে বললাম,'আমি বাড়ি যাবো।'

রান্নাঘরে ডাঁই করা এঁটো বাসনপত্র। ঘরগুলোতে বাসি বিছানা। জানালা দরজা খোলা হয়নি তখনও। রাঙামাসি ঘুম থেকে উঠেছিল বাথরুমে যাবার জন্য। ঘুমে চোখ ঢুলু ঢুলু। বাথরুম থেকে বেরিয়েই আবার বিছানায় শোবে। চা করে আমাকেই ঘুম ভাঙাতে হবে সবার।

কথাটা শুনে রাঙামাসি কেমন থমকে গেল। বুঝবার চেষ্টা করল আমি কি বলতে চাইছি।

আমি সেই কোন ভোরে স্নান করে ব্যাগ গুছিয়ে একেবারে তৈরি। রাঙামাসি আর দ্বিতীয়বার শুতে গেল না। চোখে মুখে জল ছিটিয়ে এসে বলল, 'আরো কটা দিন থাক। এ তো তোর নিজেরই বাড়ি।'

আমি কোন কথা বললাম না।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে রাঙামাসি বলল, 'এই সকালে না খেয়ে দেয়ে চলে যাবি! যদি যেতেই হয় তাহলে দুপুরে খাওয়া-দাওযা করে যা।'

আমি রান্নাঘর সাফসুরোত করলাম। জানালা দরজা খুলে আলো ঢোকালাম। বাচ্চাটার কাঁথা জামা সব ধুয়ে শুকোতে দিলাম ছাদে।

কাজের লোক খুঁজে হয়রান হয়ে গেছে রাঙামাসি। পায়নি। পেলেও যদি চলে যেতে চাইত তাহলে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে যেতে বললেও কি তারা শুনত?

রান্নাবান্না করলাম মন দিয়ে। সুমু আর রাঙামাসিকে যখন খেতে দিচ্ছি তখন ওরা আমাকে জোর করে ওদের সঙ্গে বসতে বলল।

এতদিন বাদে এই প্রথম ওদের সঙ্গে খেতে বসে খাবার যেন আমার গলা দিয়ে ঢুকছিল না।

বার বার থাকবার কথা বলছিল রাঙামাসি। সুমুও। শুনতে শুনতে কেমন একটা রোখ চেপে গেল আমার। ভাবলাম যাবো যখন ভেবেছি, যাবোই।

বিকেলে বিকেলে বেরুব ভেবেছিলাম। হল না। রাঙামাসি বলল, 'একটু চা খেয়ে যাবি না!'

দু'কাপ চা করে নিয়ে এসে ওদের সামনে রাখতেই রাঙামাসি বলল, 'কি রে তোর চা কোথায়?'

বললাম, 'খেতে ইচ্ছে করছে না।'

তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার নামেনি। স্টেশনে ঢুকতেই মনে হল যেন বেশ রাত হয়ে এসেছে। চারিদিকে জোরালো আলো। টিভি চলছে, রেলের কুলি না নেওয়ার কি হেনস্থা একজনের তা দেখাচ্ছিল তখন।

স্টেশনে লোক গিস গিস করছে। কোন প্লাটফর্মেই গাড়ি নেই। শুনলাম বিকেল থেকেই গাড়ির গণ্ডগোল। লোকজন এসে জমা হচ্ছে তো হচ্ছেই।

টিকিট কেটে নিয়েছিলাম। তবু একবার মনে হল রাঙামাসির বাড়িতে ফিরে যাই। এই রকম ট্রেনের গণ্ডগোল হলে যে কি অবস্থা হয় তা তো বাবার কাছে শুনেছি। পরক্ষণেই মনে হল রাঙামাসির বাড়িতে ফিরে গিয়ে কি বলবো? গাড়ির গণ্ডগোল। তারপরে কি কালই আবার ছাড়বে?

রান্নাঘরটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। আবার রান্নাবান্না। সবাইকে খাওয়ানো। ভেবেই আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল। মনে মনে ঠিক করলাম। যেভাবেই হোক বাড়ি ফিরবোই। তখনই শুনতে পেলাম গাড়ি ছাড়ার খবর কি যেন বলছে। শোনবার কি উপায় আছে! চারিদিকে এত হইচই চিৎকার। কান পেতে শুনলাম। একটা গাড়ি নাকি আসছে। কিছুক্ষণ বাদে ছাড়বে।

গাড়িই এই বহুক্ষণ পরে। ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি। কেউ কাউকে জায়গা ছেড়ে দেবে না। সামনে যে কামরাটি পেলাম উঠে পড়লাম। লোকজন ঠেলে। ব্যাগটাকে কোন রকমে জাপটে ধরলাম।

দম চাপা অবস্থা। একটুও হাওয়া ঢুকছে না ভিতরে। একটা মাত্র পাখা গোটা কামরায়। সেটাও বিকল।

গাড়ি না ছাড়ায় সব লোকজন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝেই লেগে যাচ্ছে ঝগড়া। একদিকে থামে তো অমনি অন্যদিকেশুরু হয়। যাদের হাতে গাড়ি চালাবার দায়িত্ব তাদের যে কি পরিমাণ গালমন্দ করল সবাই মিলে! সে সবের সামান্য একটুও যদি কানে যেত তাদের, তাহলে হয়ত ঘেন্নায় চাকরি ছেড়ে দিত।

গাড়ি ছাড়তেই বড় করে শ্বাস ফেললাম। মনে হল এখুনি না ছাড়লে হয়ত মারাই যেতাম। গাড়িটা চলছিল ঢিক ঢিক করে। রাতও হয়ে গেছে অনেক। এগারোটার আগে বাড়ি পৌঁছতে পারবো বলে মনে হয় না।

এক একটা স্টেশনে গাড়ি থামলে লোকজন নামা তো দূরের কথা, মনে হচ্ছে যেন উঠছে আরও। তবু তো গাড়ি চলছে। আমাকে তো আর রাঙামাসির বাড়িতে ফিরে যেতে হয়নি।

হঠাৎই আলো নিবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লোকজনের প্রচণ্ড চিৎকার। যেন প্রলয় ঘটে গেছে। চিৎকার চেঁচামেচিটা খানিকক্ষণ বাদে থিতিয়ে এল। মানুষজনের ফাঁক ফোঁকর দিয়ে জানালার দিকটায় তাকালাম। বাইরে ঘন অন্ধকার।

একজন ছোলা বাদাম বিক্রি করতে উঠেছিল। ভিড়ে আর নামতে পারেনি। ঝুড়িটা মাথায় তুলে জড়োসড়ো হয়ে সে এতক্ষণ লোকজনের গালাগালি শুনছিল। দেশলাই ঠুকে মোমবাতি জ্বালিয়ে ঝুড়িতে রাখল লোকটা। অবস্থটা কিছুটা যেন স্বাভাবিক হয়ে এল।

বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়ায় গা-টা কেমন গুলিয়ে উঠেছিল। গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। লোকজনের কথা শুনে বুঝলাম স্টেশন বেশ খানিকটা দূরে। সেখানে কোন রকমে যেতে পারলে বাস অথবা অন্য কিছুতে চলে যাওয়া যাবে।

লোকজন নামতে শুরু করছিল দু'একজন করে। তাদের দেখাদেখি আরও অনেকে নামল। কামরাটা প্রায় খালি। কি করবো ভাবছি। ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে কি লাইনের ওপর নামতে পারবো? একবার যদি পা ফসকে যায়, কোন গর্তে পা ঢোকে তাহলে আর দেখতে হবে না।

আর একটু অপেক্ষা করার কথা ভাবলাম। ট্রেনটা চলতেও তো পারে! যদি চলে তাহলে যারা নেমে হাঁটছে আমি তাদের আগে পৌঁছবো।

একটা নোংরা জামা-কাপড় পরা পাগলাটে ধরনের লোক শুয়ে আছে। ঐ লোকটা ছাড়া একা আমি কামরায়। হঠাৎ উঠে বসে ওয়াক তুলতে শুরু করল লোকটা। গা ঘিন ঘিন করে উঠল আমার। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

লাফটা খারাপ দিইনি। শেষ পর্যন্ত যে সোজা হয়ে উঠে হাঁটতে পারছি এই তো ঢের। তাড়াতাড়ি হেঁটে লোকজনের কাছাকাছি গেলাম। গাড়ি যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে মুখ করে হাঁটতে লাগলাম। চারিদিকে এত অন্ধকার যে কতটা হাঁটলে স্টেশনে যেতে পারবো তা বুঝতে পারছি না।

'কোতায় যাবে গো মেয়ে?'

তাকিয়ে মনে হল এক মাঝবয়সী মেয়েলোক। মুখ চোখ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। কথার ধরন দেখে মনে হল হয় কোন বাজারে আনাজ বিক্রি করে, নয়ত কোন বাড়িতে ঝি খেটে এল।

রেল লাইনের ওপর দিয়ে না হেঁটে ডানদিকে একটা রাস্তা আছে সেটা দিয়ে গেলে নাকি স্টেশনে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। মেয়েলোকটির কথা শুনে ভাবলাম ভালোই হল। এতক্ষণ একা একা যাচ্ছিলাম। কথা বলতে বলতে এখন তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। যদি বাস পাই তো ভগবানের দয়া। তা না হলে তো বাড়তি খরচ।

ডানদিকে বাঁদিকে বাড়ি ঘর দোকান এসব ফেলে এ কোথায় এলাম আমরা! জিজ্ঞেস করতে গিয়ে দেখি মেয়েলোকটি নেই। নির্জন ফাঁকা মাঠ। চারিদিকে তাকিয়ে জোরে ডাকলাম।

নিজের গলার আওয়াজ যেন ফিরে এসে আঘাত করল। তাহলে কি যে পথে এসেছি সেটা দিয়েই ফিরে যাবো! আসবার সময় তো এলাম একথা সেকথা বলতে বলতে। খেয়ালও করিনি সব কিছু। মনে হয় ফিরতে গিয়ে আবার রাস্তাঘাট গুলিয়ে ফেলবো না তো!

খুব ভয় করছিল। ঘড়ি দেখার উপায় নেই। রাত কত হল কে জানে। কিছুটা এগোতেই মনে হল কারা যেন পিছনে আসছে। দাঁড়ালাম। তিন চারটে লোক। এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'স্টেশনে যাবার রাস্তাটা কোথায় একটু বলে দেবেন?'

'স্টেশনে যাবার রাস্তা?' একজন বলল, 'ওই তো ওদিকে।'

আমি হাঁটতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম লোকগুলিও আমার পিছনে পিছনে আসছে। মেয়েলোকটির কথা ভেবে নিজের ওপরেই খুব রাগ হল। কেন যে মরতে ওর কথা শুনতে গেলাম।

রাস্তা কিছুতেই পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে মাঠ ছেড়ে ধান ক্ষেতে নেমেছি। আর কত দূরে গেলে রাস্তা পাবো? আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

লোকগুলি আমার কাছে এসে দাঁড়াল। বলতে গেলাম, এত দূর হেঁটে এলাম স্টেশনের রাস্তা কোথায়? তার আগেই আমার হাত থেকে ব্যাগটা কেড়ে নিল একজন।

চিৎকার করে বললাম, 'তোমরা চোর।'

হেসে উঠল একজন। আমার বাঁ হাতটা ধরে মুচড়ে ঘড়িটা টানা হ্যাঁচড়া করে নিয়ে নিল। চিৎকার করে উঠলাম। আবার কিছু বলবার আগেই মুখটা চেপে ধরল।

নিশ্বাস নিতে পারছি না। ছটফট করছি। দু-হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম লোকটিকে। পারলাম না। আমাকে জড়িয়ে ধরল লোকটি। বুকের মধ্যে নিয়ে যেন পিষে ফেলতে চাইছে।

বাধা দেওয়ার সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেললাম আমি। পুরুষ মানুষের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস আমার মুখের উপরে। পুরুষের শরীরের গন্ধ যেন আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কেমন নেশার মতো লাগছে।

বাঘের মত শক্ত থাবায় আমাকে পিষে ফেলুক। ওর দু হাতের নখ গভীর হয়ে বসুক আমার শরীরে।

কোনদিন কেউ আমাকে এভাবে কাছে টেনে নেয়নি। আমার শরীর কারও কাছে এতখানি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি কখনও। কেউ ফিরেও তাকায়নি আমার দিকে।

শুধু একটি লোকই নয়। বুঝতে পারছিলাম আরও তিন জন আমাকে টেনে হিঁচড়ে কাছে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছিল। ওবা কেউই পেরে উঠেছিল না আগের লোকটির সঙ্গে। মনে হচ্ছিল আমাকে জ্যান্তই ওরা দাঁতে ছিঁড়ে ফেলবে।

ওদের কথা তো নয়, চাপা গর্জন। সবই শুনতে পারছি।

লোকটি আচমকা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। চোখ মেলে তাকালাম। হাতের বাঁধন আলগা হয়ে এল লোকটির। মনে হল এক ঝটকায় কেউ যেন তুলে নিল ওকে। শুধুমাত্র গোঙানির শব্দ লোকটির মুখে। বাকি লোকগুলির আর তর সইল না। আর একটু সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল না ওরা!

বুক ঠেলে কান্না এল আমার।

অন্ধকারের মধ্যেই মনে হল খুব মারপিট হচ্ছে।

'সব কটাকে ধরে রাখ। মেরে আধমরা করে তারপর পুলিশের হাতে দেবো।'

কথাটা শুনে আমি তাড়াতাড়ি নিজেকে ঠিক করে নিলাম। নীলু বলল, 'পান্না, তুই ঝুমুরদির সঙ্গে যা। বাড়ির সামনে পৌঁছে দিয়ে আসবি! আমবা এই হারামজাদাগুলোকে যা করার করছি। দুলাল, তুই মেয়েলোকটাকে যে করে হোক ধর।'

আমার সামনে এসে পান্না বলল, 'চলুন।'

বললাম, 'আমার ব্যাগ।'

টর্চের আলো ঘুরতে লাগল এদিক ওদিক। চকিতে দেখলাম নীলুকে। দুটো পা দুদিকে ছড়িয়ে বিশাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর পায়ের কাছে কীটের মতো কয়েকটি লোক।

তখনও আমার শরীরে দংশনের রিমঝিম যন্ত্রণা। আমি সেই লোকটির মুখ দেখবাব চেষ্টা করলাম।

টর্চের আলো আমার ব্যাগটা খুঁজে দিল।

আমার ঘড়িটাও ফিরে পেয়েছিলাম সেদিন। যত্ন করে সেটাকে তুলে রেখেছি। নির্দিষ্ট একটা সময়ে ঘড়ির কাঁটা দুটো স্থির হয়ে আছে। তারিখও বদলায়নি। সেটাকে আর সারাইনি।

মাঝে মাঝে ঘড়িটা দেখি আমি। দেখলেই সেইদিনের সেই সময়ের ঘটনা আমার মনে পড়ে যায়। নীলুকে মনে পড়ে। ও সেদিন ঠিক সময়ে এসে না পড়লে সেদিন আমি লুঠ হয়ে যেতাম। নোংরা হয়ে যেতাম।

দু হাত দিয়ে এলোমেলো চুলগুলিকে পিছনের দিকে ঠেলে দিল নীলু। ঠিক এই ভঙ্গি টাতে ওকে কি সুন্দর যে দেখায়! একটা সিগারেট ধরাল। জ্বলন্ত কাঠিটা মাটিতে ফেলে দেশলাইটা পকেটে রাখতে রাখতে এদিকে তাকাল। হয়ত আমার দিকে নয়। তবু আমি ব্যালকনি থেকে সরে ঘরের ভিতরে চলে এলাম।

ওর মুখ দেখতে চাই না আমি।

তিরিশ ঘণ্টা

শ্যামল মজুমদার

বাইশে নভেম্বর: সকাল সাড়ে সাতটা বেজে যেতে চমকে উঠল মণিদীপা। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিযে চায়ের জল বসাল। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বারান্দায় এসে তাকাল রাস্তার দিকে। হেমন্তের শেষ। তবু শহরে শীতের ফিকে ছোঁওয়া লেগেছে মাত্র। হালকা কুয়াশা ভেঙে গাড়ি চলছে অল্প অল্প। পেরিয়ে যাচ্ছে কয়েকটা রিকশা। বাজারেব থলি হাতে চলেছে কয়েকজন। নিখিলেশ রোজ মর্নিং ওয়াক থেকে বাজার করে ফেরে। কাগজের টাটকা খববের সঙ্গে এক কাপ চা না হলেই মাথাগরম। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে এক কালো রোগাটে হাতের ফুটপাথ থেকে এই ফ্ল্যাটের তিন তলার বারান্দায় নির্ভুল লক্ষ্যে ছুড়ে দেওয়া খবরের কাগজের মতো নিখিলেশের ফেবাব ঠিক সময়ের মধ্যে টেবিলে পৌঁছে যায় চায়ের কাপ। মাথাগরমের সুযোগই দেয় না মণিদীপা। তবু আজ একটু দেরি। ফ্ল্যাটের দরজার পাশে রাখা প্যাসচুরাইজড টোন্ড মিল্ক। ভাগ্যিস নিখিলেশের আজ শবীর শানিযে ফিরতে দেরি হচ্ছে।

বোজকার মতো কাল রাতে খাওয়ার টেবিলে কত কথা হয়েছে স্বামীর সঙ্গে। দেশের সরকার থেকে বাজার সরকার। অফিসে মাইনে বাড়ার ব্যাপার নিযে ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনায যারা বসবে নিখিলেশ তাদের একজন। বলতে বলতে এমন গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে যেন তার সামনে স্ত্রী বা সন্তানেরা নয়, ইউনিয়নের সঙ্গে মিটিং করছে। স্বামীর ভঙ্গি নকল করে মণিদীপার হালকা ইয়ারকি। উৎসব ও উর্ত্তরিয়া মায়ের সঙ্গে পেস্তা বাদামের হাসির কুচি ছড়িয়ে দিতে দিতে হালকা করার চেষ্টা করতে করতে ঘড়িতে রাত সাড়ে এগাবোটা।

তবু নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম ভেঙেছে নিখিলেশের। অভ্যাসে আলো ফোটার মুহূর্তে পা দিয়েছে রাস্তায। হাঁটতে হাঁটতে এক কিলোমিটার দূরে পৌঁছে গেছে ভেজা গড়ের মাঠে। এখন তিনি সেখানে।

আর এখানে মণিদীপার ঘুম ভাঙল একটু দেরিতে। পাশ ফিরতে বুঝল বিছানায় সে একা। দূরে নিখিলেশ এখন কুয়াশায় ঢাকা। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করল। কিন্তু চোখ বুজলে জড়ানো ভাবনায় শিশির আর ঘাসে মাখামাখি নর্থ স্টার পরা ভারী পা যেন এগিয়ে আসছে ক্রমশ। কাছে, আরও কাছে। দরজায শব্দ হল যেন। এভাবে কি শুযে থাকা যায়! তাড়াতাড়ি উঠে চায়ের জল চাপিয়ে বারান্দায় একা এখন। দরজার দিকে তাকাল ফের। কোথায়! রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ভেসে আসা কোনও ডাকে ভুল করে পিছন ফিরে তাকানোর মতো ফ্ল্যাটের অন্য দরজার আওয়াজ ঘুরে আসে নিজের দরজায়।

।। ২ ।।

সকাল ন'টা—

স্নান সেরে উৎসব বেরিয়ে আসতে মণিদীপা প্রায় দৌড়ে এল, তোর বাবার আজ কী হল বলতো?

— বাজার সেরে ফিরতে দেরি হচ্ছে হয়তো।

— কখনও তো এমন হয়নি। তাছাড়া অফিস আছে। বলতে বলতে নিজের মনে বিড়বিড় করে, এতক্ষণে মানুষটার খাওয়া হয়ে যায়। তুই খেতে বসলে সে তখন জুতো মোজা পরে জোয়ান মুখে দিয়ে চেয়ারে বসে পাঁচ মিনিট। তার পর ছেলের দিকে তাকাল, একটা কথা বলব?

— কী?

— আজ দেরি করে অফিস গেলে হয় না? মানে তোর বাবা ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা....

— তোমার কথা বুঝেছি। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আয়নার মধ্যে মাকে দেখল একবার, তুমি যা ভাবছ তা নাও হতে পারে। তা ছাড়া আমার মাত্র তিন মাসের চাকরি। যদি তেমন কোনও প্রয়োজন হয় তো আমার অফিসে ফোন করে দিলে চলে আসতে পারি। সেভাবে প্রয়োজনে চলে এলে অফিসের কিছু বলার থাকে না। তার গ্রাউন্ড আলাদা।

— এই গ্রাউন্ড যে আমার ভাবনার থেকে আলাদা নয়, সেই বিষয়ে তুই কী করে নিশ্চিত হতে পারলি?

— রিয়া কোথায়?

— হয়তো বারান্দায়। নাম ধরে ডাকল মণিদীপা। উত্তর পেল না রিয়ার। বারান্দায় গিয়ে রাস্তার দিকে তাকাতে নজর করল, গেটে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। ডাকল আবার।

উঠে এল উত্তরিয়া। ডাকছিলে?

— মানে তোর বাবা...

— আসছে না দেখে নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একজনের সঙ্গে দেখা। তাই কথা বলছিলাম। বলতে বলতে ও দাদাকে ইশারা করল। তার পর মাকে আড়াল করে ঘরে এল দু'জনে। উত্তরিয়ার মুখ কেমন ফ্যাকাশে, রাস্তায় শিশিরকাকুর মেয়ের সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করতে জানলাম, সাতটা নাগাদ ফিরে এসেছে। যতদূর জানি বাবার সঙ্গে মর্নিং ওয়াকে শিশিরকাকু যায়। ও থেমে ঢোক গিলল বার কয়েক, তুই একবার খবর নিবি? প্রথমে শিশিরকাকুর কাছে জানতে হবে বাবা তাঁর সঙ্গে ছিল কি না। এর পর প্রয়োজনে গড়ের মাঠে। মাকে এখন কিছু বলার দরকার নেই।

— গড়ের মাঠে বিশেষ কাউকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

— জানি। তবু খোঁজ নিতে হবে আমাদের। অবশ্য এর মধ্যে ফিরে আসলে ভাল।

— ঠিক। একটুও সময় নষ্ট না করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল উৎসব। পিছনে থেকে মায়ের ডাক শুনেও ছেলেবেলার মতো উড়িয়ে দিল কথা।

।। ৩ ।।

দুপুর বারোটা—

উত্তর দেওয়ার তেমন কিছু নেই। কাছেই থাকে মণিদীপার বোন। খবর পেয়ে চলে এসেছে। একটার পর একটা প্রশ্ন করে যাচ্ছে। কখনও উত্তর দিচ্ছে উত্তরিয়া, কখনও বা উৎসব। অথচ তাদের বুকের ভেতর যে অসংখ্য প্রশ্ন, কে তার উত্তর দেবে! ঘর থেকে ড্রয়িং রুমে এল উৎসব। আর একবার বাবার অফিসে ফোন করলে কেমন হয়!

ঘণ্টা কয়েক আগে ফোন করেছিল। পায়নি বাবাকে। পাওয়ার কথাও নয়। তবু কোথায় যেন পাওয়ার কথা থেকে যেতে পারে সেই ভেবে ও ডায়াল ঘোরাল আবার। ও পাশ থেকে গলা ভেসে আসতে উৎসব চমকে উঠল অন্যমনস্কে। বাবা নয়, তবু যেন বাবা। এ মুহূর্তে না দেখা কোনও পুরুষের গলা যেন বাবা। ও কেটে কেটে উচ্চারণ করল বাবার নাম।

— আজ অফিসে আসেননি।

— জানি।

— মনে হচ্ছে আজ উনি আসবেন না।

— এটাও জানি। বলতে গিয়ে থেমে গেল উৎসব। সব জানার মধ্যে না জানা এত তাড়াতাড়ি জানা হয়ে যাবে এটা মেনে নিতে পারছে না। সেই জন্য ফোন করা। মর্নিং ওয়াক করতে গিয়ে গেঞ্জি আর হাফ প্যান্ট পরে কেউ অফিসে চলে যায় না, এটা সে জানে। তবু খোঁজ নেওয়া। ভাবতে গিয়ে শুনল, ও পাশ থেকে জিজ্ঞেস করছে, আপনি কে?

হঠাৎ গলার স্বর আটকে গেল উৎসবের। দু'জনের মাঝখানে এক ফোনেটিক শূন্যতা। কী উত্তর দেবে! নিজেকে আর আড়াল করে রাখার মানে হয় না এই দুপুর বারোটায়। কোনও ভূমিকা না করে উত্তর দিল, ওঁর ছেলে। বাড়ি থেকে ফোন করছি।

— তাহলে!

– ট্র্যাজেডি এখানেই। আপনার বিস্ময় বাড়ি থেকে ফোন করায়। আমাদের বিস্ময় বাবাকে নিয়ে। আসলে বাবা... উৎসব ভোর থেকে শুরু করে সংক্ষেপে বলতে লাগল। ভোরের ফিকে আলোয় বাবা ছিল স্পষ্ট। কিন্তু আলো ফুটে উঠতেই বাবা কেন যে হয়ে গেল অস্পষ্ট, এই দুপুর বারোটাতেও তা স্পষ্ট হয়ে উঠল না। সেই জন্য খোঁজ নেওয়া। এখন কী যে করব' গলা থেকে অদ্ভুত এক আওয়াজ বেরিয়ে আসতে শুনল ভদ্রলোক বলছে, আমরাও খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। তবু যদি কোনও প্রয়োজন হয়....

— অবশ্যই জানাব। রিসিভার নামিয়ে রাখল উৎসব। এ বার কোথায় খবর নেবে! কোথায় কোথায় যেতে পারে সেই জায়গাগুলো খুঁজতে হবে। এই বিরাট শহরে কোথায় যে বাবার স্পন্দন!

দ্বিতীয় হুগলি সেতুর ওপর একটা মিনিবাস উল্টে যাওয়ার খবর এনেছে পাড়ার সেলুনের ছেলেটা। উৎসবের দুই বন্ধু ছুটে গেছে সেখানে। এবং সন্দেহ কাটিয়ে ফিরে এসেছে সন্ধের আগেই। অথচ নিশ্চিন্ত হতে পারেনি কেউ। বাবা কী অবস্থায় আছে এটা কোনও গুরুত্বপূর্ণ নয় এই মুহূর্তে। বাবাকে জীবন্ত অবস্থায় ফিরে পাওয়াটাই বড় কথা। কিছুক্ষণ পরেই ফোন এল থানা থেকে। যশোর রোডের ওপর এক ব্যক্তিকে পাওয়া গেছে অজ্ঞান অবস্থায়। শরীরের কয়েক জায়গায় ক্ষতের দাগ। এখন হাসপাতালে ভর্তি। ফোন পাওয়ার পর বেরিয়ে পড়ল উৎসব। সঙ্গে মাসতুতো ভাই কৌশিক। একটা ট্যাক্সি নিয়ে দু'জন যখন ছুটে যাচ্ছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে, বাড়িতে তখন অনেক লোক। নিখিলেশ নামের একটা আধলা থান ইট জলে পড়তে তার খবরের ঢেউ কাটতে কাটতে সারা তল্লাট এখন।

॥ ৪ ॥

সন্ধে ছ'টা—

ডিভানের পাশে এলোমেলো মণিদীপা।

কোনও দিকে খেয়াল নেই। এই মাত্র কী যেন বলতে ভুলে গিয়ে চলে গেল অন্য প্রসঙ্গে। এক সময় বলল, মানুষটা যে কোথায় এখন! সারা দিন খাওয়া হয়নি হয়তো। কোথায় যেতে পারে! চারপাশে যা ঘটেছে তারই আশঙ্কায় কেঁপে উঠেছে বার বার। কে যেন জিজ্ঞেস করল, মর্নিং ওয়াকে যাওয়ার সময় কিছু বলেছে?

— না, আমি তখন শুয়ে। রোজকার মতো চলে গেল দরজা বন্ধ করে নিঃশব্দে।

— ক'দিন ধরে কোনও ব্যাপারে খুব চিন্তায় ছিল?

— মনে হয়নি। এ বার উত্তর দিল উত্তরিয়া, বাবা যদিও খুব উঁচু পজিশনে চাকরি করেন। খানিকটা টেনশন ছিল হয়তো আব পাঁচ জনের মতো। তবে দুর্ঘটনা ঘটার মতো মারাত্মক কিছু নয়।

— আসলে আমি বলতে চাইছি, আড়াল থেকে কেউ হুমকি টুমকি দিচ্ছিল কি না। মারাত্মক কিছু ঘটার আগে তার আভাস পাওয়া যায়। ছাপ পড়ে মনে। বৃষ্টি আসার আগে যেমন মেঘ করে, ডাক শোনা যায়। হয়তো তার হতো এ সব। কেউ টের পায়নি। তা না হলে আচমকা এমন..

বেশ রেগে গেল উত্তরিয়া। সব সময় বৃষ্টির আগে আকাশে মেঘ করবে, আর ডাক শোনা যাবে— এমন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই প্রকৃতির। কথাটা বলতে গিয়ে চেপে গেল। এ সময়ে রেগে যাওয়া মানায় না। অনেকেই অপ্রিয় উক্তি করে যাবে। জ্ঞান দেবে সুযোগ বুঝে। বাবা যে কতটা সরল, তাদের চেয়ে আর বেশি কে জানে। ভাবতে গিয়ে শুনল দু'জন লোক তার কাছে এসে কী যেন জিজ্ঞেস করছে। শুনতে পেল না ঠিক। চোখ তুলে তাকাতে কে যেন জানতে চাইল, আপনারা কোন কাগজ থেকে এসেছেন?

মানে সাংবাদিক! বেশ মিইয়ে গেল উত্তরিয়া। নাঃ, কেউ কোনও খবর পৌঁছে দিতে আসেনি। বাবাকে খবর করতে এসেছে। এ সব তো সে চায়নি। যেমন চায়নি বিকেলের দিকে তাদের ফ্ল্যাটে পুলিশ আসা। তখন জবাব দিয়েছে দাদা। এখন সে নেই। ইচ্ছে না থাকলেও জবাব দিতে হচ্ছে তাকে। এভাবে যখন সে একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে তখন উৎসব ট্যাক্সি নিয়ে ছুটে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট জায়গায় যখন সে নামল তখন গাঢ় অন্ধকার।

এক ঝলক হাসপাতালটা দেখে নিয়ে তাকাল কৌশিকের দিকে। এই হাসপাতালের কথাই বলেছে তো থানা থেকে। ঘাড় নাড়ল কৌশিক। দ্রুত ভাড়া মিটিয়ে গেট পেরিয়ে ভেতরে যেতে শরীর কেঁপে উঠল কেমন। তবু খবর নিল অনুসন্ধান অফিসে। তারপর কথা মতো সিঁড়ি ধরল দোতলার। বারান্দা পেরিয়ে হলঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। চার পাশে সাদা বিছানা। হালকা আলোয় জ্যোৎস্না রাতের কবরখানা। কোন বিছানার চাদরে বাবা আড়াল করেছে নিজেকে! তবু বাবাকে যে পেতেই হবে। হাসপাতালের লোকটিকে অনুসরণ করে ও এগোয়। বাবার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকবে একবার! কাঁচা পাকা চুল, পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা, দারুণ ফর্সা মানুষটাকে খুঁজে বের করতেই হবে। কোথায়! কোন জন যেন। প্রচণ্ড এক অস্বস্তি। কানা মাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি....এক জায়গায় এসে লোকটি থামতে বিছানার মানুষটাকে দৃষ্টিতে ছুঁয়ে ফেলল উৎসব। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা মানুষটার ওপর ও ঝুঁকে পড়ল। ভাল করে নজর করতেই সরে গেল। ধরে রাখা এতটা পথের টেনশন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো। এক মুহূর্তের জন্য মনে হল, দুর্ঘটনায় আক্রান্ত বাবাকে যদি এভাবেও পাওয়া যেত। সারা

শরীর জুড়ে উৎসবের কান্না ঘাম হয়ে ভিজিয়ে দিতে থাকে তাকে। যে তাকে পৃথিবী চেনাল এই পৃথিবীতে তাঁকে খুঁজে পেতে এত কষ্ট!

।। ৫ ।।

তেইশ নভেম্বর, সকাল আটটা—

দিনের কাছে এই পৃথিবীকে বন্ধক রেখে রাত্রি নিখিলেশের মতো উধাও। তবু দিন রাত্তিরের কোনও তফাত নেই এ বাড়ির কারও। মণিদীপা বিশ্বাস করে একটা দিন পেরিয়ে যায়নি। সূর্যকে পুব আকাশে বসিয়ে নিখিলেশ সেই যে বেরিয়েছে,এখন তো সূর্য সেই পুব আকাশেই। মর্নিং ওয়াক সেরে তার ফেরার কথা সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ। বন্ধ ঘড়ির মতো মণিদীপার কাছে থেমে গেছে সময়। স্বামীর না ফেরা পর্যন্ত ঘুরবে না ঘড়ির কাঁটা। এক কুয়াশা ঢাকা সকাল হাতের মুঠোয় চেপে ধরে মণিদীপা স্থির। অথচ ভেতরে অস্থির। আর এই অস্থিরতা আবার নাড়িয়ে দিয়ে গেল আজকের খবরের কাগজ। ইনসাইড পেজ বা ফিলার নিউজ নয়। এক্কেবারে প্রথম পাতায় বক্সে ছাপা। খবরের মাঝখানে বাবা।

ছবির দিকে তাকিয়ে কেমন যেন মোচড় খেল উত্তরিয়া। জলে ভরে এল চোখ। যার জন্য শহর তোলপাড় করে এত কিছু, সে খবর হয়ে গেল, সেই খবরের মানুষটার কি চোখে পড়বে? খবর পৌঁছে গেছে মন্ত্রীমহলে। পুলিশের ওপর মহল রীতিমতো উদ্বিগ্ন। কাগজটা হাতে করে উত্তরিয়া পাশের ঘরে বসা মায়ের সামনে বিছিয়ে দিল, খবরটা বেশ গুরুত্ব দিয়ে চোখে পড়ার মতো করে ছেপেছে।

ঠোঁট ওল্টায় মণিদীপা, সবার চোখে পড়ে লাভ কী! আসল মানুষটা নিজেই চোখের আড়ালে চলে গেল।

— আসলে বাবাকে পাওয়ার ব্যাপারে খবর এবং ছবি ছাপার প্রয়োজন তো আছে।

— হয়তো আছে। তবে এই পোশাকে তোর বাবাকে আমি দেখতে চাই না।

উত্তরিয়া চুপ। অ্যালবাম থেকে নেওয়া বাবার এই কোট প্যান্ট পরা ফটো মা দেখতে চায় না। পেতে চায় না বাবাকে মর্নিং ওয়াকের পোশাক ছাড়া অন্য কিছুতে। যেমন মায়ের কাছে ঘড়ির কাঁটা থেমে আছে সকাল সাড়ে সাতটায়। কোনও কথা না বাড়িয়ে ঘর ছেড়ে উত্তরিয়া চলে এল নিজেই। বারান্দায় পা রাখতে খেয়াল করল দাদা একটা ইংরেজি পেপার পড়ছে মন দিয়ে। হালকা প্রশ্নে উত্তরিয়া ডাকল দাদাকে, নতুন কোনও ইনফরমেশন দিয়েছে?

— তেমন কিছু নয়।

— আচ্ছা, কাল রাতে কে ফোন করেছিল?

— কখন? এ বার মুখ তুলল উৎসব।

— খাস খবরে বাবার খবরটা বলার পর?

— একবার তো ধরতে গিয়ে কেটে গেল।

— না না, তারও পরে। ফোনে তুই বেশ উত্তেজিত।

— ও হো!

মনে পড়ে গেল উৎসবের। একটা ক্রেডিট কার্ড পাওয়া গেছে। বাবার নামের প্রথম অক্ষর এবং পদবীর মিল আছে। লালবাজার থেকে সেটা ভেরিফাই করার জন্য ফোন করেছিল। নো প্রোগ্রেস।

— তা হলে আরও একজন হারিয়েছে।

নিজের মনে ও বলল কথাটা। এবং সেই বাড়িতে হয়তো কোনও এক উৎসব অথবা উত্তরিয়া প্রচণ্ড উত্তেজনায় চোখের সামনে মেলে ধরেছে আজকের কাগজের ডানা। খবরে নিজের বাবাকে খুঁজতে গিয়ে পেয়ে যাচ্ছে অন্য এক বাবাকে।

হঠাৎ ফোনের আওয়াজ শুনতে পেল। তাড়াতাড়ি উত্তরিয়া ধরতে গিয়ে কেটে গেল ফোনটা। ঠিক তখনই বাইরে কলিং বেলের আওয়াজ। তাড়াতাড়ি দরজা খুলতে ভুবনবাবু। কেমন শুকনো মুখ। ভেতরে আসতে অনুরোধ করল উত্তরিয়া। এক ঝলক গোটা ফ্ল্যাটে চোখ বুলিয়ে খুব চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, তোমার বাবার কোনও খবর পাওয়া গেল?

— না।

কাগজ হাতে উঠে এসেছে উৎসব। ইনি যে আসবেন এটা তার জানা। এই ফ্ল্যাটের মালিক ভুবনবাবু। কিছু বলবেন?

— না, মানে বলছিলাম কী, নিখিলেশবাবু কোনও হ্যান্ড নোট লিখে রেখে......

এটা সম্পূর্ণ দুর্ঘটনা। বেশ রেগে গেল উৎসব। কাগজে খবরটা পড়েই ছুটে এসেছে হয়তো। কোম্পানির চুক্তিতে নেওয়া ফ্ল্যাট। সেই কারণে একটু ঝালিয়ে নিতে এসেছে। হঠাৎ ও চুপ করে গেল। বাবা যদি না ফেরে তা হলে থাকবে না তার চাকরি। এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে হবে তাদের। ও আর ভাবতে পারছে না। ভুবনবাবুর নজর ছেড়ে চলে এল। ফোনটা যেন কার ছিল! জানে না।

।। ৬ ।।

দুপুর একটা—

ঘরে কারও কোনও কথা নেই। বাইরে আওয়াজ করে ছুটে যাচ্ছে গাড়ি। সকাল সকালের মতো, দুপুর দুপুরের। একটা দিন পেরিয়ে গেল। বিছানায় মণিদীপা। শাড়ির খোলা আঁচল খাট ছেড়ে বেশ খানিকটা ছড়ানো মেঝেতে। উদাসীন। অথবা অজান্তে নিজেই মেঝেতে বিছিয়ে রেখেছে আঁচলের কার্পেট। অপেক্ষা, শুধু একজনের পা রাখার অপেক্ষা।

বাবার অফিসে যাওয়া ঠিক করল উৎসব। ফেরার পথে থানায় ঘুরে আসবে একবার। একটু ঝুঁকে ঘড়ি দেখতে গিয়ে চোখ পড়ল বারান্দায় দাঁড়িয়ে উত্তরিয়া। ও বারান্দায় গেল। রাস্তার দু'দিক অনেকটা দেখা যায়। হাতে ধরা কাগজের দিকে তাকাল একবার। আজ গোটা কাগজ জুড়ে একটাই খবর। বর্ডারে ছাপা। সেই বর্ডার এঁকে বেঁকে নদীর মতো যেন এক মানচিত্র। মাঝখানে যে হারিয়ে যাওয়া মানুষের ছবি সেই অবয়বে ভেসে উঠছে বাবা। মেরা দেশ মহান।

তবু জট ছাড়াতে পারছে না একটুও। এমন ঘটনা শুনেছে এবং পড়েছে কাগজে। কিন্তু তাদের জীবনে ঘটে যাবে ভাবতে পারেনি। ইলেকট্রিকের ফিউজ উড়ে গেলে যেমন সব অন্ধকার। একটা মানুষকে ঘিরে একটু একটু করে বেড়ে ওঠা, গড়ে ওঠা একটা পরিবার। তারই অনুপস্থিতি কী যে মারাত্মক! বাবা সম্পর্কে অনেকে অনেক কিছু ভাবতে শুরু করেছে। দু'চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে উৎসবের। খামচে ধরে বারান্দার রেলিং। বাবা যা নয়, তাই তাকে করে তুলেছে কেউ কেউ। কিছু করার নেই। হজম করতে হচ্ছে তাদের। ভুবনবাবুর আসার কারণ সে জানে। এই ফ্ল্যাট বাবার চাকরির খাতিরে

কোম্পানিব সঙ্গে চুক্তিতে পাওযা। বাবাব না থাকা মানে ছেড়ে দিতে হবে ফ্ল্যাট। কাল থেকে অনেকে এসেছে, বাবা কতটা হাবিয়েছে তাব খোঁজ নিতে।

ফিউজ উড়ে গেলে তাব অস্তিত্ব পাওযা যায। কবা যায মেবামত। কিন্তু কীভাবে পাবে বাবাব অস্তিত্ব! নানা ধবনেব নিখোঁজেব কাবণ পড়েছে। যাবা নিখোঁজ হয, তাবা কাবও না কাবও তো বাবা। যেমন শিশুবা হাবায বাবাবা হয নিখোঁজ। কিন্তু কী তাব কাবণ থাকতে পাবে! বাবাকে নিযেই বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য। অথবা বাবাব সঙ্গে মিল আছে এমন ব্যক্তিকে তুলতে গিযে কিডন্যাপ কবেছে বাবাকেই! তাদেব উদ্দেশ্য শুধুই পণ চাওযা! কত টাকা! জানে না। তা হলে একটা ফোন আসাব কথা! অচেনা কণ্ঠস্বব অথবা বাবাকে – না, আব ভাবতে পাবছে না। ও বেলিং ধবে দাঁড়িযে থাকে চুপচাপ। ববাববেব জন্য বাবাবা নিখোঁজ হয না। হতে পাবে না। আসলে থেকে যায সন্তানেব গভীবে, উৎসব এবং উত্তবিযাদেব মধ্যে।

পদযাত্রা

শৈলেন চৌধুরী

মারাঠা ডিচের নীল জল যেখানে লকগেট পেরিয়ে গঙ্গায় এসে পড়েছে, ওখান থেকে পাড় ধরে সামান্য এগোলেই বিচালিঘাট। শতাধিক বছরের পুরোনো এই বাজারটি আজও বড়ো বড়ো নৌকায় বিচালি নিয়ে বিকিকিনি করে।

একটু এগোলেই হরিসভা। লঞ্চঘাট। বাঁ পাশ দিয়ে টানা লম্বা রেললাইন পোস্তা ছাড়িয়ে আর্মেনিয়ান ঘাটের দিকে গেছে। ডানদিকে গজিয়ে ওঠা অসংখ্য ঝোপঝাড় উৎরাই ধরে নিচে নেমে গেছে। কয়েকটা বুড়ো বটগাছ ডালপালা ছড়িয়ে অনেকখানি জায়গার দখল নিয়েছে। এদিকে ওদিকে মাটি বা পাথর দিয়ে গড়ে তোলা নানাধরনের ভারতীয় দেবদেবীরা সেবাপ্রার্থী হয়ে নিশ্চল। গ্রীষ্মের দুপুরে ক্লান্ত পথিক এখানে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী বা পাড়ার মাস্তান ওয়াগন ভাঙিয়েরা গাঁজার ধোঁয়াকে ধর্মীয় ছাড়পত্রে মুড়ে পুণ্য সন্ধান করে।

আর একটু এগিয়ে যেতে হবে। সারি সারি স্নান ঘাট। লাগোয়া, কলকাতা কর্পোরেশন, পুলিশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গজিয়ে ওঠা বেআইনি খাটাল। রেললাইনের সঙ্গে বেঁধে রাখা গরু মোষেরা রাস্তা জুড়ে শুয়ে দাঁড়িয়ে অভুক্ত শরীরে হাঁপায়। এখানে ওখানে ছড়ানো ছেটানো গোবর-গোমুত্রের এবং ওপাশের বস্তির পরিত্যক্ত রাশিকৃত জঞ্জালের গন্ধে নাকে রুমাল চেপে এগোতে হতে পারে। আর একটু এগোলেই কাশী মিত্রের শ্মশান। শ্মশানেশ্বর ভূতনাথ স্বয়ং উড়িষ্যাবাসী বামুনের নিত্য সেবা পান। যোগে পার্বনে হিন্দু সতীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে ফলমূল দুধ ঢালেন। শিবের মাথায় পাহাড় তৈরি করে অন্তরের গোপন ইচ্ছাটি পেশ করেন।

সঙ্গত কারণেই এখানে ফুল এবং ফলের দোকান, চায়ের দোকান. ভাতের হোটেল, বিড়ি সিগারেট স্টেশনারি মুদি, মড়ার ফটো তোলার দোকান, মায় গুঁড়িয়া ঠাকুরের স্নানের সামগ্রীর পসরা। এরই পাশে শ্মশানের উলটোদিকে মুখ করা বস্তির লাগোয়া সেই বাড়িখানা, বাড়ি বলতে একখানা বড়ো সাইজের ঘর। তাও জীর্ণ। সারা শরীরে বয়সের ছাপ। নোনাধরা ইট মাঝে মাঝে খসে গিয়ে এদিকে সেদিকে জানলার মতো ফাঁক ফোকর হয়েছে। তা হোক, তবু ওর নজর কাড়ার মতো গড়নটি দেখলে শতোত্তীর্ণ কোনো পোক্ত বৃদ্ধের ফোকলা দাঁতের নির্মল হাসিটি স্মরণ করিয়ে দেবে।

গঙ্গার দিকে মুখ করে প্রশস্ত টানা বারান্দা। বড়ো ঘরখানার ভেতরে ছোটো ছোটো কয়েকটা খোপ মতো। এখানেই এক সময়ে গঙ্গাযাত্রীরা দিন গুনত। সামনের দিকে একটি মাত্র দরজা। তিনদিকে জানলা না থাকার জন্যে প্রায়ান্ধকার। ইদানিং খসে যাওয়া দেওয়ালের ফোকর দিয়ে রোদ আসে। সামান্য আলোর মুখ দেখা যায়। বারান্দার মাঝামাঝি তিন ধাপ সিঁড়ির লাগোয়া গোল থাম দু'খানা এককালে হৃষ্টপুষ্ট ছিল, এখন খসে গিয়ে দু'জন কৃশকায় গেরুয়াধারীর মতো অতীত ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে।

একটা পাথরের ফলকও সাঁটা আছে। কালের পলি পড়ে লেখাগুলো বিবর্ণ, অনেক চেষ্টা করেও সবক'টা অক্ষর উদ্ধার করা যায় না। তবে অনুমান করে নেওয়া যায়, উনিশ শতকের কোনো পুণ্যবান জমিদার মশাই তাঁর ধর্মীয় সেবামূলক কাজের নিদর্শন স্বরূপ অন্তর্জলি যাত্রার জন্যই এই পুণ্যগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। এবং তাঁর কোনো পুণ্যবান নিকট আত্মীয়ের নামে বাড়িটি উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। তবে এর বেশিটাই অনুমান করে নিতে হবে।

আগে এ বাড়ি বেওয়ারিশ গোরুর রাতের আশ্রয় ছিল। বস্তির বয়ে যাওয়া দুঃসাহসী যুবকদের মদ গাঁজার আড্ডা বসত। জুয়ার আড্ডা জমত। তবে সবই দিনের বেলায়। রাতের দিকে কেউ বড়ো একটা ঘেঁষত না এদিকে। কেননা লৌকিক-অলৌকিক নানা গালগল্প চালু আছে এ অঞ্চলে বাড়িটাকে ঘিরে। এখনো নাকি ও ঘরের আনাচ কানাচ জুড়ে অশক্ত মৃত বৃদ্ধদের অদৃশ্য আত্মার নিশ্বাসের কোরাস শোনা যায়। গভীর রাতে কারা নাকি ককিয়ে কাঁদে।

অন্তর্জলি যাত্রায় অনিচ্ছুক নায়কদের সেই কষ্টকর কাতরানির শব্দ এখনো নাকি এখানের মানুষ শুনতে পায়। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।

পদা বলে, এসব বাজে কথা। তোদের মনের পাপ রে শালারা। মানুষ মরে যদি ভূত হত তবে এ অঞ্চলের লোককে উদ্বাস্তু হয়ে পালাতে হত। কাশী মিত্রের বয়স কত জানিস? রোজ কত মড়া পোড়ে?

পদাকে কেউ বড় একটা ঘাঁটায় না। মানবিক সীমানার কোন্ প্রান্তে ওর অবস্থান এ নিয়ে এখানের মানুষের সন্দেহ এখনো কাটেনি। বছর কয়েক আগে কেমন করে যেন এখানে এসে জুটেছিল। চাল নেই, চুলো নেই, বাড়িটা থেকে গোরু মোষ তাড়িয়ে সাফসুফ করে বলেছিল, আমি এ বাড়ির কেয়ার টেকার। কোনো বদমাইশি এখানে চলবে না, এটা হল ধর্মের জায়গা। শ্মশানযাত্রীদের ডেকে আনত, দূর থেকে এসেছেন? এখানে জিরিয়ে নিন, কী করবেন, শ্রাদ্ধ? পইতে? স্বপিণ্ডিকরণ? বেশ তো— এখানেই করুন না, আমি সাফসুফ করে দিচ্ছি। তবে হ্যাঁ, আমি হচ্ছি কেয়ার টেকার। নগদ আট আনা দক্ষিণা তো দিতেই হবে, তাছাড়া চালটা আনাজটা সিধে হিসেবে দেবেন। বিড়ি সিগারেটটা ফাউ হিসেবে ধরে। ইদানিং জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবার দরুন পদা রেটও চড়িয়ে দিয়েছে। এক টাকার কমে কথাই বলে না। কেউ আট আনা দিলে দশ কথা শুনিয়ে দেয়, আট আনায় আজকাল এক কাপ চা হয় মশাই?

যাত্রী যদি গরিব এবং বিনয় করে কথা বলে তাহলে অবশ্য পদা পয়সাটা নেয় কিন্তু শোনাতে ছাড়ে না। কখনো মনের মিল হলে প্রাণটি খুলে দিয়ে আলাপ করে ভালো মন্দের খোঁজ খবর নেয়। এই রকম সময়ে পদা সাধারণত ইংরিজি বলে। হয়তো যাত্রী জিজ্ঞেস করল, মশায়েব কোন জাত?

পদা দু'আঙুলের ফাঁকের বিড়িটায় কষে টান লাগিয়ে বিজ্ঞোচিত হেসে বলবে— প্যারাসাইট, পরগাছা।

যাত্রী হয়তো অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে এই অদ্ভুত অজানা জাতটি সম্পর্কে কৌতূহলী হবে, সেইটি মুহূর্তে অনুমান করে নিয়ে পদা গম্ভীর হয়ে বলে যাবে— মানে হচ্ছে জাত বামুন, ঘোষাল, কলকাতায় চোদ্দ পুরুষের বাস। এই যে বাড়িটি দেখছেন, এটি আমার পূর্বপুরুষের তৈরি, বুড়োদের গঙ্গায় ডুবিয়ে মারার জন্যে বানানো হয়েছিল।

বলেন কী? বিস্ময়ে যাত্রীটির চোখ গোল হয়ে যাবে।

ঠিকই বলছি! পদা গম্ভীর হয়ে ধমক লাগাবে, তখনকার মানুষ মশাই ধর্মপ্রাণ ছিল, মানুষের উপকার করত, ধর্মকর্ম করত।

বুড়ো মানুষকে গঙ্গায় ডুবিয়ে মারা ধর্ম হল?

কেন নয়? পদা রেগে খিঁচিয়ে উঠবে। বলবে, কে চায় মশাই আশি নব্বই বছরের বুড়ো বুড়িরা বিছানায় হাগুক, মুতুক, ছেলেদের সুন্দরী বউয়েরা তা মুক্ত করুক। তাই এই ঘরে এনে ওঠাত। গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে রেখে বলত— তুমি স্বর্গে যাচ্ছ, সগ্‌গের পথ তো, যাবার সময়ে একটু কষ্ট দুঃখ তো পাবেই। তবে মশায় এখানে কাউকেই বেশিদিন কষ্ট পোয়াতে হত না। রোজ ডুবুনি খেয়ে প্রাণপাখি খাঁচা ছেড়ে ডায়মণ্ডহারবারের দিকে দৌড়োবার পথ করে নিয়ে বাঁচত। কেন মশাই, এটা কম ধর্মের কাজ হল?

নির্বিকার পদার মুখের দিকে তাকিয়ে হয়তো যাত্রীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত, লোকটা পাগল নাকি!

কিন্তু বলতে সাহস হত না। উলটোটা বলে পদাকে খুশি করতে চাইত,আগের যুগে ও রকম হত—

পদা লাফিয়ে উঠত— আগের যুগে কেন, এখন হচ্ছে না! এই তো কিছুদিন আগে হর্তুকিবাগানের এক বুড়িকে নিজেদের অস্টিন গাড়ি করে ছেলেরা নিয়ে এসেছিল এই ঘরে। বুড়ি নাকি নিজে এই মরণ চেয়েছে।

ইন্টারেস্টিং ! তা কী হল?

চুটিয়ে পাপ করবার আইনের ছাড়পত্র মশাই ওদের হাতে, শালাদের পয়সা আছে। হেঁকে বসলাম, ঘর ভাড়া রোজ দশটাকা লাগাবে। ছেলেরা তাতেই বাজি। রেখে গেল বুড়িকে। চাকর বাকর রইল। ছেলেরা দু'বেলা আসত গাড়ি করে। বুড়ির বিছানায় পায়খানা পেচ্ছাব। চাকরেরা মুক্ত করত। কখনো সখনো আমি মেথর ডেকে দিতাম। বুড়িকে জিজ্ঞেস করেছিলাম— এমন দুর্বুদ্ধি হল কেন ঠাকুমা, দেশে কি ডাক্তার কবরেজ, হাসপাতাল নেই?

ফোকলা দাঁতে বুড়ির কী হাসি! যেন সবাইকে কলা দেখিয়ে কেটে পড়ার আনন্দ। শেষে থেমে থেমে বলেছিল, ছেলেরা বউয়েরা বড়ো কষ্ট দেয়। চাকরবাকরেবা বুড়িকে ধরে দিন দুই গঙ্গায় ডুবিয়ে দিতেই বেচারির আত্মারাম খাঁচা ছাড়ল। এ এলাকার মানুষ সবাই জানে, শ'য়ে শ'য়ে লোক ভিড় করে এ দৃশ্য দেখেছে। বিশ্বাস না হয তাদের জিজ্ঞেস করে দেখুন না।

এসব কাহিনী শোনার পর কম লোকই পদাকে ঘাঁটাতে সাহস করে। শালা হয়তো আধপাগল, হয়তো আচ্ছা নাস্তিক। কেউ কেউ পেছনে বলত—ওটা মানুষই নয়, মানুষের ছায়া। না হলে কেউ ভুতুড়ে বাড়িটাকে আঁকড়ে থেকে ওখানে রাত কাটায়, শ্মশান চত্বরে নির্জন রাতে ঘুরে বেড়ায়?

পদা কিন্তু অদ্ভুত কথা বলে। সে বলে— ঢেউয়ের শব্দ শুনি, পাপের হিসেব করি, গঙ্গার ঢেউগুলো সব সাক্ষী হয়ে আছে। ওরা কলকল করে হাসে, ধিক্কার দেয়।

কখনো ডোমদের খাবারে ভাগ বসায়। ওদেরই খাটিয়ায় শরীর ছুঁইয়ে পাপের জরিমানা গোনে। বুড়ো ডোম মুখিয়া, তিনকুড়ি পেরিয়ে যাওয়া বয়স। এখনো টানটান শরীর। নেশার ঝিমুনি কাটানো সতেজ একখানা মুখ। পুরু ঠোঁট। কুৎসিত একপাটি কালো দাঁত বার করে হাসে। পদার পাশে বসে, ডাকে— ছোটোবাবু!

পদা তাকায়। মুখিয়া বলে, আমাদের পাপ আর বাড়াসনি।

কেন রে শালা? পদা ধমকায়।

তুই বামুন, আমাদের সাথে খাস, ওঠা বসা করিস, ইতে আমাদের নরক হবে।

মুখিয়ার নেশার শরীর দোলে। অল্প অল্প হাসে। পদার পাগলাটে দু'চোখের তারায় আটকে যায় ওর চোখ। একটা ভীরু ভাবনার আতঙ্ক ওর শরীরে জড়িয়ে থাকে। পদা হাসে, প্রাণখোলা সরব হাসিটা শ্মশানের চত্বর ছাড়িয়ে গঙ্গার ঢেউয়ে গড়িয়ে যায়। বলে, তোদের আর কী নরক হবে রে শালা, কোন্ স্বর্গে আছিস? তারপর গলা নামিয়ে চুপিচুপি বলে— হিসেব হচ্ছে রে মুখিয়া, একদিন গুনেগুনে সব হিসেব বুঝিয়ে দিতে হবে।

ছোটোবাবুটা পাগল হইছে বটেক। ওর কথা মুখিয়া বোঝে না। কেবল কতগুলো বিস্ময় ওর নেশার নিশ্চিন্ত আশ্রয়টুকুকে নাড়ায়। মানুষের সহজাত বোধ ওকে পদার কাছে ঘনিষ্ঠ করে। একান্ত কাছের মানুষের সান্নিধ্য পায়। ওরা বসে বসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া মানুষের জ্বলন্ত চিতার আগুনের শব্দ শোনে। গঙ্গায় বয়ে যাওয়া জলের শব্দ। ওরা জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে সরু পথটার ওপর দাঁড়িয়ে হিসেব করে, মানুষের পাপেব হিসেব।

কখনো গভীর রাতের অন্ধকারে পদা গঙ্গার পাড় ধরে ঘুরে বেড়ায়। শ্মশানের আশেপাশে অনেকেই পদাকে দেখে অনেক সময়ে চমকে গেছে। চিৎকার করে উঠেছে। পদা হাসে, হেসে গড়ায়। বলে শালাদের মনের পাপ, আজন্মের পাপ।

আবার কখনো উছলে পড়া জ্যোৎস্না রাতে ভাটার গঙ্গার উতরাই ধরে হেঁটে বেড়ায়। ঝোপ জঙ্গল পেরিয়ে মানুষের তাবৎ কোলাহল ছাড়িয়ে পদা নির্জন একান্তে বসে রাতের গঙ্গার সঙ্গে একা একা কথা বলে, বিড়িবিড় করে। অনেকের চোখে তা পড়েছে।

এমনি এক রাতে কতকগুলো পরিচিত শব্দ শুনে চমকে গিয়েছিল পদা। কতকগুলো লোভের শব্দ। পাপের শব্দ। হেঁটে এগিয়ে গিয়েছিল পাড় থেকে অনেকখানি নিচে। এক সময়ে এখানে বাঁধানো ঘাট ছিল। জল পর্যন্ত নেমে যাওয়া সিঁড়ি কবে ভেঙেচুরে স্মৃতি হয়ে গেছে। এখন আগাছার জঙ্গল। স্নানযাত্রীরা এদিকে আসে না। দিনের বেলায়ও কেমন ছমছমে ভাব। পাড়ার বয়ে যাওয়া মস্তান, হাফ মস্তানেরা এখানে মুখ গুঁজে পাপ ঢাকে। হেই— কোন্ শালারে, কে ওখানে?

পদার চিৎকারে কতকগুলো ত্রস্ত পা ছুটছাট সরে গিয়েছিল। একটা চাপা আক্রোশের শব্দ কানে এসেছিল পদার— শালা পাগলা ভাম, একদিন দোব শালাকে ন্যাপালার এব ঘা বসিয়ে।

পদা এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। লাল সিমেন্টের বাঁধানো চত্বরটায় পড়ে থাকা নগ্ন শরীরটাকে দেখে মেটে জ্যোৎস্না আলোয় সনাক্ত করতে পেরেছিল। পাঁচি। গলায় অস্ফুট শব্দ তুলে পদাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল লজ্জায়। অবশ হাত তুলে কাপড়খানা হাতড়েছিল। বসার চেষ্টা করে লজ্জা ঢাকতে চেয়েছিল।

শালা পাপ, পদা গর্জে চিৎকার করেছিল। দূর থেকে কাপড়খানা কুড়িয়ে এনে ছুঁড়ে দিয়েছিল পাঁচির গায়ে। তারপর উলটো দিকে মুখ করে ঢালু পাড় ধরে কাদা ভেঙে শ্মশানের দিকে দ্রুত হেঁটেছিল। পেছনে থেকে একটা চাপা কান্নার শব্দ ওর কানে এসে লেগেছিল। মেয়েটা কাঁদছে। শালি থুঃ তোর মুখে, ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিতে গিয়েও থমকে গিয়েছিল। কী মনে করে আবার ফিরে এসেছিল। মেয়েটা ততক্ষণে উঠে বসেছে। পদাকে ফিরতে দেখে চমকে গিয়েছিল। কান্না থামিয়ে ওকেই দেখেছিল খানিকক্ষণ। পদা দেখছিল পাঁচিকে। এই সেদিন গঙ্গাঘাটে এসে জুটেছিল। একটা স্বামী ছিল, সেটাকে পোড়াতে এসেই পদার মরণঘরে উঠেছিল। আর যেতে চায় না। পদা বলেছিল— গঙ্গাযাত্রীর ঘর, থাকতে হলে ভাড়া লাগবে।

কোথায় পাব, আমার যে কেউ নেই। কান্নায় শোক উথলে উঠেছিল পাঁচির। পদা বলেছিল— চুপ কর শালি, কে আবার কার জন্যে থাকে রে? খেটে খা।

সেই থেকেই গঙ্গার ধারে। কখনো কারো বাড়ির ঠিকে ঝি, কখনো নাকুর হোটেলের বাসন ধুত। যোগে পার্বনে রাস্তায় কাপড় বিছিয়ে বসে পুণ্যার্থীদের দয়া কুড়োত। পদা হিসেব করত, একটা পেটের জন্যে লড়াই করতে নেমে মেয়েটার নাকানিচোবানি। শুকিয়ে যেতে লাগল। একদিন পাড়ার হাফ মস্তানেরা মাল খেয়ে এনে তুলেছিল পদার মরণঘরে। মেয়েটার আছাড়ি বিছাড়ি কান্না, আমারে ছেড়ে দে—

ওরা পদাকে বলেছিল— কোনো কথা বলবি না পাগলা ভাম, কাজ হলে টাকা পাবি।

পদা শ্মশানের চিতা থেকে একখানা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল— শালা নরকের পোকা, ফোতো মস্তানি, একটাকেও ফিরতে দেব না।

চিৎকার শুনে ছুটে এসেছিল ডোমেরা, হোটেলওয়ালা, বামুনঠাকুর। জ্বলন্ত কাঠের দু'এক ঘা পিঠে পড়তেই মস্তানদের নেশা ছুটে গেছল। তারপর থেকে আর এমুখো হতে সাহস করেনি।

পদা বলে, থুঃ শালি তোর মুখে।

মেয়েটা এবার পায়ে পায়ে খানিকটা দূর এগিয়ে আসে পদার দিকে। বলে— আমারে ঘেন্না করছ ঠাকুর, আমার উপায় নেই।

পদা চেঁচায়— কেন, সাথে একখানা কাটারি রাখতে পারিসনে, নামিয়ে দিতে পারিসনে দু'একটা? চেঁচাতে পারিসনে?

মেয়েটার স্বর এবার নরম হয়ে আসে, পেটটারে কোন্ কাটারি দে কাটব ঠাকুর? বড়ো খিদে এই পোড়া পেটে, শুধু খিদের জন্যি... এবার থমকে যায় পদা। মেয়েটার দিকে তাকাতে পারে না। গঙ্গার ঢালু পাড় ধরে হাঁটতে থাকে মরণঘরের দিকে। আর পিছনে ফিরে তাকায় না। দূরে কয়েকখানা মালবাহী নৌকোয় আলো দেখা যায়। ওদের কথাবার্তার শব্দ এই নির্জন রাতে ঢেউয়ে ভেসে আসে। শ্মশানের অনেকগুলো চিতা একসঙ্গে জ্বলছে, আকাশমুখো আগুনের শিখায় সামনেটা লাল, বাতাসে পোড়া মানুষের গন্ধ। এই পরিচিত প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহ পদা স্বাভাবিকভাবে নিতে চায়। তবু কোথায় যেন একটা যন্ত্রণা হাতুড়ি-পেটা হয়। পদা তখন নিজের মনে বিড়বিড় করে, গঙ্গার সাথে, তার ঢেউয়ের সাথে কথা বলে। পৃথিবীর তাবৎ মানুষের ওপর ঘৃণায় থুথু ছেটায়। এইভাবে এখানে ভোর হয়।

ভূতনাথের মন্দিরে ঘন্টা বাজে। উড়ে ঠাকুর নানারকম দেবতায় ঠাসা দোকানের ঝাঁপটি খুলে ধুনো দেয়। হরিনাম করে। পুণ্যসঞ্চয়ী প্রাতঃস্নানকারীরা গঙ্গার জলে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে। শ্মশানযাত্রীরা মড়া নিয়ে অপেক্ষা করে। আর ডোমের দল একগাদা কাচ্চাবাচ্চা বউ নিয়ে রাস্তার ওপর পা ছড়িয়ে বসে চা রুটি সহয়োগে ব্রেকফাস্ট করে। ফুলওয়ালা হাঁকে, সারি সারি কাপড় বিছিয়ে বসা ভিখিরিরা জায়গার দাবি নিয়ে ঝগড়া করে।

পদা তারও আগে ওঠে। স্নান সেরে দিব্যি বাবুটি হয়ে দাঁড়িয়ে যাত্রী ডাকে। তাদের ব্যবস্থা করে দেয়। মরণঘর ঝাঁট দেয়। সাফসুফ করে। তারপর শ্মশানের খাটিয়ায় বসে অর্ডার করে চা আন্ মুখিয়া।

ট্যাক থেকে বিড়ি বার করে ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে। মুখিয়া বুড়ো আগের রাতের খোয়ারি ভাঙে। পদার দিকে তাকিয়ে সবক'টি দাঁত বার করে সস্নেহে হাসে।

পদা বলে, কত বয়স হল রে মুখিয়া? অনেকদিন পৃথিবীতে আছিস?

— তা তোমার থেকে পেরায় দু'কুড়ি বড়ো হবেক।

মুখিয়া হিসেব করে, হয়তো আরো বেশি হতে পারে। সময়ের বয়স বেড়েছে। পদার ঠাকুর্দ্দাকে নিজের হাতে পুড়িয়েছে। ট্রাম লাইনের ওপারে ওদের বাড়ি ছিল। বড়ো গেট। বড়ো উঠোন। ঠাকুর মন্দির। মুখিয়া এসব দেখছে। ছোটোবাবুর তখন কী ডাঁটফাঁট। আজকের পদাকে দেখে কি আর চেনা যাবে? পদার মাকেও নিজের হাতে পুড়িয়েছে মুখিয়া। কাঁচা বয়স ছিল, যেন দুর্গা প্রতিমা, পোড়াবার সময় কত গণ্ডগোল। থানা পুলিশ হল। পদা তখন বাচ্চা ছেলে। চিতার সমানে দাঁড়িয়ে হাউ হাউ করে কী কান্না! মুখিয়া কোলে করে সরিয়ে দিয়েছিল। মনে আছে সব। পদার মাকে নাকি ওর বাপ গলা টিপে মেরেছিল। ছোটোলোকের পাড়ায় এসব আলোচনা হত। বড়ো বাড়ির কথা নিয়ে আরো কত গুজব। চরিত্রহীন ছোটো বউয়ের এ শাস্তি না হলে অন্য বউগুলো পোষ মানবে কেমন করে? লোকে আরো অনেক কথা বলত। ছোটো বউয়ের সন্তানরা সব জারজ, এমনকী পদাও।

এসব কতকাল আগের কথা! চোখের সামনেই সেই ঘোষালবাড়ি মাড়োয়ারির কাছে বিক্রি হয়ে গেল। শেষ বয়সে পদার বাপের একটা অঙ্গ ধরে গেছল। চলতে পারত না। কোথায় কোন্ গাঁয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলো বউগুলোর হাত ধরে।

পদা হাসে, কী ভাবিস মুখিয়া? — পরকাল?

মুখিয়ার নির্লিপ্ত চোখ দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে গঙ্গার ওপারের নীল অকাশে হারিয়ে যায়। চোখের পাতা কাঁপে। তারপর হাঠাৎই পদার সবর হাসি শুনে চমকে তাকায়। পদা বলে— মিথ্যে কথা, পরকাল কীরে শালা? সবই এই কাল,এই কালেই গুনে গুনে সব শালাকে পাপের মাশুল দিতে হয়। লোভের পাপ, অন্যায়ের পাপ, অবিচারের পাপ।

মুখিয়া তখন হাসে। বলে, তুই পাগল আছিস বটে ছোটোবাবু।

মুখিয়ার সস্নেহ ধমকটুকু গায়ে মাখে না পদা। পৃথিবীর ওপর একটা অসীম আক্রোশে ও তাবৎ মানুষকে গাল পাড়ে। কখনো নিজেকেও। বেলা বাড়ে। গঙ্গাপাড়ের জীবন পালটায়।

দু'তিনটে মড়ার ভিড় লেগে যেতেই এখানের ঝিমুনি হঠাৎই চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মণ মণ কাঠ আসে। ফটো-তোলা বুড়ো দৌড়াদৌড়ি করে। চায়ের দোকান, মিষ্টিওয়ালা ডেঁটে কথা বলে। পদার মরণঘরে যাত্রীরা পা বাড়ায়।

একটু বসার জায়গা, বিশ্রামের জায়গা হবে?

শ্রাদ্ধ বা পইতের মানুষ থাকলে পদা তখন তাদের হাঁকিয়ে দেয়, ওই বটগাছের ছায়ায় বসুন গে, দেখছেন না বাবুরা এখানে পাপের বোঝা টানছেন।

মানে? যাত্রীরা বিস্ময়ে তাকায়।

সামলে নিয়ে পদা বলে, উপোসি চোদ্দপুরুষের মুখে জল দিচ্ছেন, তাঁরা এখন খাওয়া দাওয়া করছেন, ডিসটার্ব করবেন না।

কাজের সময় পদা বারান্দার উঁচু মতো জায়গাটায় বসে থাকে। যাত্রীর চেহারা দেখে তার সামাজিক অবস্থানটি অনুমান করে নিয়ে হাত বাড়ায়, একটা সিগারেট দিন তো।

অবস্থা ভেদে বিড়ি চায়। যাত্রীরা পদাকে নিরীক্ষণ করে ওর দাবিকে সাধারণত অস্বীকার করতে পারে না। একগাদা ধোঁয়া ছেড়ে পদাপাগলা সময়ে সময়ে যাত্রীদের সঙ্গে ঠাট্টা রসিকতা করে। অনেক সময় যাত্রীরা আপত্তিও করে— একটা শুদ্ধ কাজ হচ্ছে, তুমি একটু তফাতে বোসো তো হে, ছোঁয়াছানি লেগে যাবে।

পদা পাগলা তখন খুব গম্ভীর। বলে— গঙ্গাতীরে এসে গেছেন মশাই, এখানে জাত বেজাত নেই, গঙ্গাজলে সব শুদ্ধ, নিজের মনটাকে একটু শুদ্ধ করুন দেখি।

মানে? নবাগত ব্রাহ্মণ যাত্রীটি চমকে তাকাবে ওর কথা শুনে। পদা বলবে, মশাই কোন্ শ্রেণীর বামুন। রাঢ়ী না বারেন্দ্র?

যাত্রীটি জবাব দেবে, আমরা বৈদিক।

পদা হেসে উঠবে, সেকী মশাই! সে তো ছোটো জাতের বামুন। তা আমি হলাম মশায় ঘোষাল, বারেন্দ্র কুলীন।

ওর চেহারার সঙ্গে বেমানান কথাটি শুনে যাত্রীটি অবিশ্বাসী চোখে তাকাবে, সন্ধে আহ্নিক করেন? পইতেটি আছে তো?

পদা হাসে, ট্রেড মার্কটির কথা বলছেন? আজ্ঞে না ওটি নেই, তবে গায়ত্রী মনে আছে, শুনবেন? বলেই শুরু করবে, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং...

যাত্রীটি হে হে করে উঠবে, থামুন থামুন মশায়— পাগল নাকি? এভাবে কেউ গায়ত্রী উচ্চারণ করে?

পদাপাগল থেমে গিয়ে অল্প অল্প হাসবে। বলবে, কালে কালে ওসব আর কেউ উচ্চরণই করবে না। ওর গায়ে অনেক পাপের ধুলো জমেছে, গঙ্গাজলেও শুদ্ধ হবে না। পদা বিড়বিড় করে যাবে। যাত্রীরা আর ঘাঁটাবে না ওকে, পাগল বলেই এড়িয়ে যাবে। কাজ শেষ হতে সাধারণত আড়াইটে তিনটে, চারটেও বেজে যাবে কোনো কোনো দিন। পদা হাত পাতবে, আমার পাওনাটা?

টাকা নিয়ে ট্যাকে গুঁজবে, সিধেটা? চালটা আনাজটা, ঘিয়ের শিশিটা রেখে যান না মশাই, ওতে আর আছেটাই বা কী?

পাগল বলেই হয়েতো প্রায়শই বিমুখ হবে না যাত্রীরা। তবে কেউ কেউ যে আপত্তি করে না তা নয়— তোমার কীসের দাবি হে, এটা সরকারি বাড়ি।

পদার উত্তরও রেডি, আমি হচ্ছি মশাই এ বাড়ির কেয়ার টেকার। সরাকরি মাইনে পাইনে, আপনাদের মাথায় হাত বুলিয়ে চালাই। তারপর যাত্রীর ভুল ভাঙিয়ে দেবে, এটি হচ্ছে মরণঘর, সরকারি নয়, পদা অন্তর্জলি যাত্রার ইতিহাস শোনাবে।

যাত্রীরা চলে গেলে ওদেরই পরিত্যক্ত পিণ্ডি সেদ্ধ করার তিন ইঁটের অস্থায়ী উনুনের ওপর মালসায় করে নিজের জন্যে দুটি ভাত ফুটিয়ে নেবে। কখনো জেলেদের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে মাছ নিয়ে আসবে, ঝোল হবে।

শ্মশানে পরিত্যক্ত কাঠের জ্বালে তা ফুটবে, ধোঁয়ায় চোখ লাল হয়ে উঠবে। কখনো পাঁচি এসে দাঁড়ায়— ঠাকুর, আমি রেঁধে দেব?

পদা পাগল খিঁচিয়ে উঠবে, কেন রে মাগি, আজ আর পেটে জোটেনি বুঝি কিছু?

পাঁচি জবাব দেবে না, তখনই পদা ওকে ধমকে তাড়াবে, ভাগ্, শালি চরিত্রহীন মেয়েছেলে, ভাগ্ সামনে থেকে।

কিন্তু খেতে গিয়ে অনেকটাই পড়ে থাকবে মালসায়। উঠে গঙ্গার জলে হাত ধোবে। এদিক ওদিক খোঁজ করে দেখবে পাঁচিকে, দেখতে পেলেই অবার ধমকাবে, খাবার সময়ে ঠাকুরের কাছে। যা মাগি, খাবার বাসন মুক্ত করে দিয়ে আয়।

পাঁচি জানে ঠাকুরকে, গাল শুনে ঠোঁট টিপে হাসবে সামান্য, তারপর এগিয়ে যাবে।

একদিন পাঁচি এসে দাঁড়াল পদার সামনে। বলল,তুমি মানুষ নও ঠাকুর, দেবতা।

মোটা কাঠ নিয়ে তেড়ে গেছল পদা— তেল দিতে এসেছিল, খুব নোলা বেড়ে গেছে না?

পাঁচি নড়েনি সেদিন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল ওর সামনে, শেয়াল কুকুরে খায় আমারে, নিজেরে বাঁচাতে পারিনে, মরতেও পারিনে। পেটে এট্টা এয়েছে, তোমার মরণ ঘরে এট্টু জায়গা দেবে ঠাকুর?

পদা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। দলছুট মাদি কুকুরের মতো বেওয়ারিশ, খেতে না পেয়ে কুঁকড়ে যাওয়া নিস্তেজ যৌবন। হাত পা শুকনো। ঢাউস বেমানান পেট। কিন্তু চোখ দুটোয় মাতৃত্বের মমতা। যা দিয়ে ও সবকিছুকে আড়াল করতে চায়। কার জন্যে? একটা জারজ সন্তানের জন্যে?

নাড়া খেয়ে চমকে উঠেছিল পদাপাগলা। মাথায় খুন চড়ে গেছল। সেই কাঠটা নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল আবার— যা ভাগ্, সামনে দাঁড়াবি তো খুন করে ফেলব।

ভয় পেয়ে পাঁচি পেছিয়ে গেছল খানিক। লোকে বলে— ও মানুষ নয় রাতে নাকি ও প্রেতের সঙ্গে কথা বলে। মরণ ঘরের চারপাশে ঘুরে বেড়ানো তাবৎ প্রবীণ ভূতগুলোর ও পাহারাদার, এত রাগতে পাঁচি কখনো দেখেনি ওকে। পাঁচিকে সরতে দেখে পদাও বেরিয়ে গেছল। গুমধরা বুকের জ্বালাটা কিছুতেই থামে না। গঙ্গা পাড়ের বটের বাঁধানো চত্বরটায় বসে দূরের গঙ্গার দিকে তাকিয়েছিল।

এ পাড়ে কৃষ্ণনগর থেকে আসা বিশাল মালবাহী নৌকা থেকে খালাস হচ্ছিল মাটির হাঁড়ি কলসি, মালসা। ও পাশে এঁটেল মাটির নৌকা, কুলিদের ওঠানামা, পদা এইসব দেখছিল। দক্ষিণ থেকে ধেয়ে আসা দুরন্ত বাতাস ওর ঈষৎ পাক ধরা রুক্ষ চুল এলোমেলো করছিল। অনেকক্ষণ পরে শ্বাস নিয়েছিল ভালো করে।

রাতে ঘরে ফিরে আর একদফা চমকে গিয়েছিল পদাপাগল। নিজের অধিকারের ওপর আক্রমণ বলেই মনে হয়েছিল। পাঁচি শোনেনি, পদাকে অস্বীকার করেই ঢুকে পড়েছে ঘরে। কোণের দিকে আব্রু নিয়েছে ওর ছেঁড়া কাপড়খানা টাঙিয়ে। ওখান থেকেই পাঁচির গোঙানি শুনতে পেল পদা।

আবাব একটা জারজ জন্মাবে পৃথিবীতে কিছুক্ষণের মধ্যেই, তারই যন্ত্রণা এবং ওর ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করে পাঁচির অহংকার পদার মাথায় আর একদফা আগুন ধরিয়ে দিল। হয়তো কিছু করেই বসত, কিন্তু পাঁচির অমানুষিক কষ্ট এবং অসহায় চিৎকার ওকে হঠাৎই আচমকা অন্য কথা মনে করিয়ে দিল। বুকের কোথায় যেন ঘা খেয়ে থেমে গেল। পাঁচির মমতাময়ী মাতৃত্বের অহংকারী চোখ দুটো মনে পড়ল, যে কেবল মা।

তখনই মনে হল, জারজ কথাটা পাপী মানুষের প্রয়োজনে বানান। সতীত্ব কথাটায় পাপের পচা গন্ধ। পাঁচি কেবল একটি শিশুকে জন্ম দেবে, যে ওর নাড়ি ছিঁড়ে বাইরে আসার জন্যে অস্থির হয়েছে। কে জানে, ও হয়তো ভবিষ্যতে পুরোনো পচা সমাজের অনেক নাড়িকেই এভাবে ছিঁড়তে পারবে।

পদা ঘরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তখন রাত গভীর। শ্মশানের কোণের দিকের চিতায় শ্মশানযাত্রীরা জল ঢালছে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। এলাকাটা ঘুমে অচৈতন্য। পদা ডাকল মুখিয়াকে, ওর ঘুমন্ত বুড়ি বউটাকে টেনে তুলল। পাঠিয়ে দিল মরণঘরে পাঁচির কাছে।

ওরা মরণঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। অনেক পরে পুবের আকাশে পাতলা আলো ফুটল। গঙ্গাকে দেখা গেল সবুজ ঘাসে মোড়া একখণ্ড উর্বর জমির মতো ছড়িয়ে থাকতে। গাছে গাছে পাখি ডাকল।

তখনই পাঁচির গোঙানিকে ছাপিয়ে ওরা এক সদ্যোজাত শিশুর উপস্থিতি টের পেল। মুখিয়ার বুড়ি বউ নিয়ে এল কোলে করে, ছেলে বটেক।

পদা অবাক হয়ে দেখল ছেলে হাত পা ছুঁড়ছে এবং চেঁচিয়ে নিজের উপস্থিতি জানান দিতে শুরু করেছে।

অবিশ্বাস

সোমক দাস

(বাবা)

বাবার বয়স এখন চুয়ান্ন। মানুষ হিসেবে তিনি খুবই সরল ও বোকা। আবেগপ্রবণ ও অল্পবিস্তর পরিশ্রমী। ধর্মভীরু। দুশ্চিন্তাপ্রিয় ও অকর্মণ্য। দাদু যা যা তৈরী করেছিলেন— বাড়ি, জমিটমি ও ব্যবসা, সবই তিনি মানে আমার বাবা, সযত্নে নষ্ট করেছেন। কেউ অভিযোগ করলেই বলে ওঠেন— কর্মফল, গীতা, কপাল, সংসার বাঁচানোর জন্যে সব বেচে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না— ইত্যাদি। যৌবনে শোনা নেতাজীর বক্তৃতা, মহম্মদ আলীর বক্সিং, পেলের পায়ের কাজ, বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র, আর মায়ের বহুবিধ দোষত্রুটি— এই-ই হচ্ছে বাবার প্রিয় বিষয়। কারণে অকারণে হিসেবের খাতায় জমাখরচ লিখতে খুব ভালোবাসেন। অসুখের মধ্যে তাঁর আছে ব্রঙ্কাইটিস, বাত, আর অল্প হাঁফানি। ছোটবেলায়, একটু হাই তুললে দশজন ঝি-চাকর ছুটে আসতো। তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ আয় দিনে বাইশ হাজার টাকা। পুজোর বাজারে হাতিবাগানের শাড়ির দোকান থেকে। আঁটপুর বস্ত্রালয়। এখন সেখানে দুটো দোকান।

বাবা সন্ধেবেলা সেই বিশাল দোকান বেচোকাকার হাতে ছেড়ে দিয়ে নাইট শোয়ে মাকে নিয়ে সিনেমা চলে যেতো— দোকানটা বন্ধ করে দিস, বেচো। সেই বেচো এখন আঁটপুরে একটা চমৎকার বাড়ি করেছে, মেয়েকে শিশুমঙ্গল হাসপাতালে নার্সিং পড়ায়। বাবার কর্মচারী বলে সেই বেচোকে আমি বেচোকাকা বলতাম। তার ভালো নাম ছিল বিজয়কৃষ্ণ দে। আর একজন কর্মচারী ছিল দিলীপ সিংহ। সে বাড়ি করেনি, তবে দমদমে স্মল টুলসের ব্যবসা করছে। লেদ কিনেছে।

দোকানে তখন বছরে বিক্রি হত দু'লাখ টাকা। বার্ষিক নেট আয় বিশ হাজার। আঁটপুর আর কলকাতার মোট সংসার খরচ ছিল বছরে দশ হাজার। বাকি দশ হাজার টাকা ছিল দোকান খরচ। এর মধ্যেই বড় বোনের বিয়ে দিতে বাবা খরচ করেছিল বারো হাজার। উনিশশো পঁয়তাল্লিশের বারো হাজার। মেজ আর সেজ বোনের বিয়েতে খরচ বেশি হয়নি। ছোট বোনের বিয়েতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসার পাত্র পাওয়া গেল। অর্থাৎ পনেরো হাজার। দোকানের মহাজনের খাতায় ততদিনে দেনা বেড়েছে অনেক। এক লাখ দশ হাজার। বাষট্টি সালে দোকানের দাম উঠলো পঁচানব্বুই।

সোম থেকে বেস্পতিবার অব্দি বাবা থাকতো কলকাতায়। শনি রবি থাকতো দেশে। তখন ম্যানেজার নন্দকিশোর দে একা দোকান চালাতো আর আঁটপুরে জমি কিনতো। বাবার আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। জয়েন্ট ফ্যামিলি। বাবারা পাঁচ ভাই চার বোন।

এক লাখ দশ হাজারের দেনা কথাবার্তা বলে পঁচানব্বুই হাজারে মেটানো হল বাষট্টি সালে। সে বছরই বিধান রায় মারা গেলেন। বাবা তাতে দুঃখ পেয়েছিল বেশি। ফিউনারেলে গিয়েছিল।

ছোটবেলায় বাবা দেখেছে দাঙ্গা, দেখেছে কলকাতার রাস্তায় পাহাড় করা মৃতদেহ, দেখেছে কলকাতার ওপর দিয়ে পঙ্গপাল উড়ে গেল। দেখেছে স্বদেশী আন্দোলন— ডাঁই করে বিলিতি পোশাক পোড়ানো হচ্ছে কেন বুঝতে পারতো না ঠিক।

তারপর কলকাতায় এল সত্তর সাল। বাবা কাশীনাথ চাটুজ্জের সঙ্গে পাটের ব্যবসা করতো। ব্যবসাটা আসলে ছিল কাশীনাথ জেঠামশায়ের। বাবা শুধু হিসেব লিখতো। আমি তখন স্কুলে পড়ি। স্কুলের মাইনে দেবার নাম করে আসলে সিনেমা দেখার জন্যে যখন জেঠামশায়ের গদিতে গিয়ে বাবার কাছে টাকা চাইতুম, আঁটপুরে, বিশাল একটা দাঁড়িপাল্লায় তখন পাটের বস্তা ওজন করা হতো মহাসমারোহে— কাশীনাথ জেঠু সুর করে কাঁটা বাটখারা দেখতে দেখতে বলতো, আয়, বস্তা যায়, বিয়াল্লিশ। বাবা লিখতো— বিয়াল্লিশ, মানে বিয়াল্লিশ কেজি। এসবের মাঝখানে আমি গিয়ে টাকা চাইলে বাবা বলতো, ইয়ে—কাশীবাবু দশটা টাকা দিন তো। উদাসহীনভাবে দাঁড়িপাল্লার বস্তার দিকে চেয়ে জেঠামশাই বলতো— দিচ্ছি। কথা ছিল, ব্যবসা যেরকমই হোক, কাশী জেঠু মাসে বাবাকে পাঁচশো টাকা দেবে।

কাশী জেঠু খুব ভালো লোক ছিল। আমাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতো।

তারপর কলকাতায় সত্তর সাল এল। কলকাতার বাড়িতে আট বছরের মাড়োয়ারি ভাড়াটে। ভাড়াটে বসানোর খবর শুনেই ঠাকুমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। অথচ ঠাকুমা গোলা থেকে লুকিয়ে ধান বিক্রির পয়সা জমিয়ে একা একা গোমুখ ঘুরে এসেছে নির্বিঘ্নে। দাদুর নিজের হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তৈরী করা বাড়ি।

বাবা বলেছিলো— দুশো টাকা ভাড়া দেবে। বাড়িটা তো খালিই পড়ে আছে। দোকান যখন নেই তখন কলকাতার বাড়িতে কারো থাকার কোনো কারণ নেই। ভাড়াটে বসালে ক্ষতি কি। লাভের মধ্যে মাসে মাসে দুশো টাকার নিশ্চিন্তি। মাড়োয়ারিদের পেমেন্ট ভালো। সত্যিই ভালো। তারা এখনো এক তারিখে ঠিক ঠিক দুশো টাকা আমার পিসতুতো দাদার হাতে তুলে দেয়। বাড়িটা এখন তার। ভাড়াটে আছে বলে আর কোন খদ্দের না পেয়ে বাহাত্তর হাজারে বাবা সেটা আত্মীয়কেই বেচেছে। সেন্ট্রাল এভিনিউর ওপর তিনতলা দক্ষিণখোলা বাড়ি। বিকেলের বারান্দায় এখন মোটা ছোটগিন্নি শকুন্তলা আগরওয়াল বুক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ছোটবেলায় ওই বারান্দায় আমরা ভাইবোনেরা কত খেলেছি।

শরিক ছিল ছজন। পাঁচ ভাই আর ঠাকুমা। বারো হাজারে টেনে টুনে বছর দুয়েক চলেছিল। প্রতি সোমবার বাবা একশো টাকা তুলে আনতো ব্যাঙ্ক থেকে।

দেশের ধানজমি বাষট্টি সালের পর থেকে ততদিনে বেচতে বেচতে ফুরিয়ে গেছে। বাড়ি না বেচলে খাবো কি? কাশীনাথ চাটুজ্জের পাঁচশো টাকায় কিছু হয়! বাবা বলেছিল। ওঃ বলতে ভুলে গেছি— আমরা তখন পাঁচ ভাই আর দুই বোন। আমি মেজো।

আমি হায়ার সেকেণ্ডারি দিই একাত্তরে। ওই গোলমালের মধ্যে কি করে যেন ডিভিশন পেয়ে গেলাম। প্রেসিডেন্সিতে চান্সও পেলাম। অথচ আমার হাত ধরে বাবা এক জায়গায় নিয়ে গেল। সেখানে অনেক ভাঙাচোরা টাইপমেশিন ছিল। অনেক দুমড়ে যাওয়া চশমাপরা বৃদ্ধ ছিল। পরে জানলাম সেখানে উকিলের কাগজপত্র টাইপ হয়। পৃথিবীতে হাইকোর্ট নামে একটা জিনিস আছে। সেখানে অনেক টাইপ করা কাগজ লাগে।

আস্তে আস্তে টাইপ মেশিন আমার খুব বন্ধু হয়ে গেল। প্রায় একমাত্র বন্ধু। সারা দিনের টাইপ সেরে সন্ধেবেলা বিদ্যাসাগর কলেজ যাওয়াই হত না। গেলে দেখতুম— প্রফেসরের মাথাটা সারা ঘরে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। কানে ঢুকতো না কিছু।

বাবা তখন হনুমান হরলালকার কাপড়ের দোকানে খাতা লিখতো। মতি শীল স্ট্রিটে। এখনো লেখে।

সম্প্রতি, একটা পুরো সেদ্ধ ডিম বাবা পকেটে করে কিনে এনে সেদিন রাত্তিরে একা একা একটু একটু করে খেল। ছোট বোন খুব কাঁদছিল। তখন মা, পুরনো কোনো খারাপ রেকর্ড বাজানোর মত একটানা চিৎকার করছিল। আর বাবা, পরম যত্নে ডিমাহার সমাপ্ত করে বলল— পাক্কা দু'বছর পরে ডিম খেলুম কিনা। আসলে আত্মাকে কষ্ট দিতে নেই, তাই খেলুম। ঠিক দু'বছর পরে কিনা, তাই কাউকে দিলুমনি। ওরা তো সারা জীবনে অনেক ডিমই খাবে।

বাবার মাইনে এখন দেড়শো টাকা। সন্দেহজনক ম্যানেজারকে ওয়াচ করার কাজে তাঁকে লাগানো হয়েছে বলে ইদানীং পাঁচ টাকা মাইনে বেড়েছে।

কেউ কথা শোনে না বলে বাবার একটা দুঃখ আছে। ছুটির দিনে বাড়ি থাকলে তিনি এগারো বছরের মেয়েকে আদর করার নামে অনবরত পিঠে কিলচড় মারতে থাকেন। সুযোগ পেলেই। বোন রান্নাঘরে ঘর্মাক্ত মাকে গিয়ে নালিশ করে। রান্না ফেলে ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে এসে মা একটানা মিনিট পনেরো বড় অশ্লীল সুরে বাবাকে বকাবকি করেন। মাকে তখন মা বলে কিছুতেই চেনা যায় না। আর বাবার মুখে এক ধরনের অপমানিত সুখ দেখা যায়। বুঝতে পারি, মায়ের মনোযোগ আদায় করতে পেরে তিনি খুশি হয়েছেন।

কথা বলতে গেলে, একটা সেনটেন্স তিনবার না বললে বাবা বুঝতে পারেন না। মেজাজে থাকলে, বাবার এই অভ্যেসটা নিয়ে মা খুব মজা করে।

সেদিন পিসতুতো বোনের বিয়ে ছিল। খেয়ে-দেয়ে সবাই বাড়ি চলে গেছে। এই পিসতুতো বোনটি একদম আমার বয়সী। বৃদ্ধ আত্মীয়দের ধারণা ছিল, ঝর্নার সঙ্গে আমার একটা স্বতন্ত্র সম্পর্ক আছে। ধারণাটা মিথ্যে হলেও ঝর্নার সঙ্গে আমার অনেক কথা হত। মেয়েদের অনেক জটিল ও মসৃণ তথ্য আমি তার কাছেই শিখেছি। বিয়ের রাতে বারোটা নাগাদ ঝর্নাকে তার বরের সঙ্গে, অনেকদিন আগে থেকেই যাকে আমি চাঁদু-দা বলে চিনি— সেজেগুজে বসে থাকতে দেখে বলে ফেল্লুম— কিরে ঝুনু, তোর তাহলে বিয়ে হয়ে গেল? জায়গাটা ছিল আহিরিটোলা। আমরা বরানগরের ন-পাড়ায় থাকি। তাই ঝর্না আমাকে বাড়ি পাঠানোর জন্যে ব্যস্ত হল।

বাড়ি যাবার জন্য বাইরে এসে দেখি, ফুটপাথে পেতে রাখা অতিথিদের ফাঁকা চেয়ারগুলোর মধ্যে একা বাবা।

তোর জন্যে এক ঘণ্টা বসে আছি। সবাই বাড়ি চলে গেছে। তুই কি করছিলি এতক্ষণ। এখন যদি বাস না পাওয়া যায়।

অথচ আমার এখন খুব সিগারেট খাওয়া দরকার। আর বাবা, কোম্পানিবাগানের পাশ দিয়ে সেন্ট্রাল এভিনিউ-এর মোড়ে আসতে আসতে সেই মধ্যরাতে আমাকে বলেছিল, দইটা খুব ভালো ছিল, না? আমি অনেকবার চেয়ে চেয়ে খেয়েছি। তুই?

স্কুলে পড়ার সময় সন্ধেবেলা কাশী জেঠুর গদিতে গিয়ে পি কে দে সরকারের বই থেকে প্যাসেজ ট্রানশ্লেশন করে বাবাকে দেখাতুম। তারপর থেকে কতদিন যে বাবার সঙ্গে কথাই বলি না।

বিডন স্ট্রিট থেকে শেষ মিনিবাসটা পেয়ে গিয়ে বাবাকে সামনের সিটে বসতে বলে আমি একদম পেছনের সিটে বসে সিগারেট ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে বুঝতে পারলুম বাবাকে আমার এই প্রথম খুব বাবা বাবা লাগছে। আর বাবা আমার বন্ধু হতে চায়।

চাঁদুদাকে আর লুকিয়ে লুকিয়ে ঝর্নার বিছানায় যেতে হবে না। সামনের সিট থেকে বাবা গোপনে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

মধ্যরাতের মিনিবাস হু হু করে ডানলপ যাচ্ছে। এখনো পর্যন্ত আমি আর বাবা ছাড়া বাসে কোনো প্যাসেঞ্জার নেই। শ্যামবাজার থেকে কেউ উঠলেও উঠতে পারে।

ভবা পেটে শেষ সুখটান দিয়ে সিগারেটটা জানলা দিয়ে ফেলে দিতে গিয়ে, অনেকখানি ধোঁয়া গিলে, মনে হ'ল এই আরামের জন্যে আমার এই সামনের সিটের ভদ্রলোকটির প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আমার এই হাত-পা, চোখ, চুল, ক্ষুধা— সবই তো তিনিই দিয়েছেন।

আমার বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্তে আমি কি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবো আরো? আমিও একদিন বাবা হয়ে যাবো, স্রেফ সেকারণে আমি কি আমার এই চির-অকৃতকার্য বাবাকে ক্ষমা করে দেবো? বুঝতে পারি না।

রোজ রাতে সাড়ে দশটায় বাবা যখন সারাদিন খাতা লিখে পা টেনে টেনে দু'হাত পিছনে রেখে বাড়ি ফেরে— আমি তখন সুভাষ কিংবা হাবুর সঙ্গে বরানগর সাধারণ হাসপাতালের পুকুরপাড়ে বসে গাঁজা খাই। সুভাষ গাড়ি চালায়। হাবু কিছু করে না। বাড়ি ভাড়া পায়। আর একটা প্রাইভেট ভাড়া খাটায়। আর সারাদিন মেয়েদের পেছনে লাগে। একদিন বাবা ওরকম ক্লান্ত বেবুনের ভঙ্গিতে বাড়ি ফিরছে— সুভাষ বিড়ি খাচ্ছিল— আমি বললুম, এই সুভাষ, আমার বাবা। শুনে হাবু আর সুভাষের সে কি হাসি। এই লোকটা তোর বাবা? হতেই পারে না।

তারা নেশাগ্রস্ত ছিল বলে ক্ষমা করেছি। তবু আমি মাঝরাতে নপাড়ার এই ভাড়া বাড়িতে মশারির ভেতর মশা মারতে মারতে বুঝতে পারি না, আমি আমার কোন বাবাকে বিশ্বাস করবো। যে বাবা বাড়ি, ব্যবসা বেচে দিয়ে অনেক দিন পরে ছোট্ট মেয়েকে ভাগ না দিয়ে একা একা সেদ্ধ ডিম খায় তাকে; না যে বাবা পা টেনে টেনে পেছনে হাত রেখে রাত দশটায় এই চুয়ান্ন বছর বয়সে অক্ষয় মুখার্জি রোড দিয়ে একশো পঞ্চান্ন টাকার চাকরি করে বাড়ি ফিরে আসে, তাকে।

(মা)

মা এখন দক্ষিণেশ্বরে যায় রোজ। দক্ষিণেশ্বরের কাছে কোন মঠের এক প্রৌঢ় প্রসন্না সন্ন্যাসিনী মাকে এখন জীবনের সারমর্ম শেখাচ্ছেন রোজ। মা আজকাল বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ আর শ্রীশ্রীমায়ের ছোট ছোট বাঁধানো তিনটি ছবির সামনে জবাফুল ছড়িয়ে টানা চার পাঁচ ঘণ্টা ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকতে পারে। কি করে পারে আমি বুঝতে পারি না।

প্রিয়তমা রমণীটির সামনেও আমি এভাবে টানা চার পাঁচ ঘণ্টা বসে থাকতে পারবো না। অনেক কিছু করে ফেলবো। বকবক করবো এন্তার। সুখী হবো হয়তো কখনো, দুঃখীও হবো, বিষণ্ন বা ক্লান্তও হতে পারি মাঝে মাঝে। মা বোধহয় এসবের বাইরে চলে গেছে। রোজ বিকেলে সন্ধের মুখে বেরিয়ে যাবার সময় চার বছরের ছোট মেয়ের আকুল কান্না মাকে আজকাল একটুও আটকাতে পারে না।

অথচ মাসের শেষ দিকে সংসার খরচের টাকা ফুরোলে, একটু সর্দি-টর্দি যদি হয় কখনো, দেখেছি মায়ের মুখ কেমন পাহাড়ী মেষপালকের মত হয়ে যায়, যার অনেকগুলো পশু সারাদিনের চারণপর্বে হারিয়ে গিয়েছে। বিহ্বল ও বিরক্ত সেই মুখে কান্নার মেঘ ঝুঁকে আসে। সেই মাকে তখন আমার খুব মায়ের মতন লাগে।

বিয়ের সময় মায়ের বয়স ছিল চোদ্দ। বাবার একুশ। উনিশশো আটচল্লিশ সাল। সদ্য স্বাধীন কলকাতার ছিদাম মুদির লেন থেকে হুগলী জেলার দামোদরতীরের এক সম্পন্ন ব্যবসায়ী শুধু রূপ ও সারল্য দেখে মাকে বড় ছেলের বৌ করে এনে ফেললেন খোলা আকাশ, ধানখেত, আম-জাম আর তাঁতকলময় এক গ্রামে। সকালবেলার বেণী দুলিয়ে স্কুলে যাওয়া আর সন্ধেবেলায় হারমোনিয়ামে চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে... ভুলে গিয়ে মা দেখল আট চালায় পাহাড় হয়ে আছে সুতোর বাণ্ডিল বাঁধা গাঁট, এই সুতো দিয়েই তবে শাড়ি-টাড়ি তৈরি হয়। গোয়ালে বাচ্চা দিচ্ছে গাইগরু। দুধ জিনিসটা আসলে গরুর বাঁট থেকেই দুইতে হয়। খিড়কিপুকুরে স্নান করার সময় কলকাতার অন্ধকার কলঘরের শাসন ও জল ব্যবহারের কৃপণতাময় ঐতিহ্য কোনো কাজে লাগে না। সিনেমা দেখে পাশের গ্রাম থেকে ইস্কুলবাড়ির পাশ দিয়ে চোংদারদের আমবাগান বাঁয়ে ফেলে বাড়ি ফেরার সময় কখনো কখনো চাঁদের হাসি এত বাঁধভাঙা হয়ে ছড়িয়ে থাকে যে তা নিয়ে গান গাইতে গেলে হাসি পেয়ে যায়।

পুরুষেরা কলকাতার বাড়িতে দোকান দেখছে। এখানে সন্ধের কাঁধে হাত দিয়ে রাত আসে। সদর থেকে রান্নাবাড়ি ওব্দি হেঁটে যেতে গা ছমছম করে। বিকেলবেলায় কাঠঠোকরা আমড়াগাছে ঠোঁট ঠুকে ঠুকে বলে— অপেক্ষা করো, অপেক্ষা করো।

রাতদুপুরে কর্তা কিংবা শ্বশুরমশাই কলকাতা থেকে অতিথি নিয়ে হঠাৎ চলে আসে। সদরের সিংদরোজায় কর্তা হলে কড়া নাড়ার শব্দ হয়। শ্বশুর হলে বাজখাঁই ভরাট গলা পাওয়া যায়— বড় বৌমা। কাঁচা ঘুম থেকে উঠে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে মা দেখতো ঘরের লোকের হাতে হরিণের মাংস। রান্না করো।

বড় হয়ে মায়ের শাড়ির আলমারির তলা থেকে একটা বই পেলুম। একান্ত গোপন কথা। সেই আমার প্রথম অবিশ্বাস। মাও তাহলে মানুষ।

ন-পাড়ার এই ভাড়া বাড়িতে জায়গা কম বলে ব্যবহারিক ভাবে অদরকারী জিনিসগুলো খাটের নিচের শ্যাওলা ধরা একটা তোরঙ্গে ঢোকানো আছে। সেখানে মায়ের একটা কমবয়েসী নিষ্পাপ বাঁধানো ছবি আছে। বাস্তবে সেই ছবির মাকে আমি কখনো দেখিনি বা দেখতে পাবো না বলে আমার একটা দুঃখও আছে, একটা সুখও আছে। বড়লোকের ছেলেমেয়েদের গায়ে একটা ঘামতেল মাখানো থাকে। সেই ঘামতেলের নাম পয়সা। ছবির মায়ের গায়ে সেই ঘামতেলের ফিনিশিং আছে বলে খারাপ লাগে। আমার আসল মায়ের ছেচল্লিশ বছরের ভগ্নস্তূপ স্বাস্থ্য। সাতটি জীবিত ও একটি মৃত সন্তানের জন্মদান ও প্রতিপালনের পরে শুধুই মাতৃত্বের আবহাওয়া তার চারপাশে— উনুনের সামনে সত্যিকারের ঘামে ভেজা এই মা পোস্ত আর বিউলির ডাল দিয়ে ভাত বেড়ে দিলে মনে থাকে না— ছোটবেলায় কিংবা আমার জন্মের আগে মা ঠিক কি রকম ছিল। সেই অচেনা মাকে আমার কোনো দরকার নেই। বিশ্বাস নেই।

সেদিন ভোররাতে দর্জিপাড়ার মেজদাদু মরে গেলে সেজোকাকার স্কুটারে চেপে ঝর্না এসে বলল, বড়মাইমা, দাদু আর নেই। বাড়ির সবাই সেখানে চলে গেল। শিশুদের শ্মশানে বোধহয় মানায় না বলেই ছোট বোনকে অনেক কান্নাকাটি সত্ত্বেও নিয়ে গেল না। জুয়াড়ী ও স্বেচ্ছাচারী মেজদাদু যিনি যৌবনে অশ্বারোহণ ভালবাসতেন, তাঁকে আমি সন্দেশদাদু বলতাম কারণ জীবনে যে কয়েকবার তাঁর কাছে ঘটনাচক্রে গিয়ে পড়েছি ততবারই তিনি আমাদের সন্দেশ খাইয়েছেন। মৃত্যু ও অশৌচ আমি বিশ্বাস করতে পারি না বলে কোন দিন আমি শ্মশানবন্ধু হতে পারিনি। ফলত পাঁচ বছরের ছোট্ট বোনের সঙ্গে নানারকম গল্পগুজব ও খেলাধূলা করতে হল। মায়ের দিয়ে যাওয়া একটা টাকা

দিয়ে সে আমাকে লুকিয়ে পুরো একটা রাজভোগ একা খেয়েছে বলে আমার নকল কান্নায় সে বিস্তর মজা পেল যা দেখে আমারও এক ধরনের সার্থকতার সুখ হয়েছিল। তাড়াতাড়িতে রেঁধে রেখে যাওয়া শুধু ভাত খেতে গিয়ে দেখি ডালটা দুর্গন্ধময় হয়ে গেছে। তরকারি নেই। পাড়ার চায়ের দোকানে ডিম সেদ্ধ ছাড়া কিছু পাওয়া গেল না।

মড়া পুড়িয়ে ফিরে এসে মা বলল, সামাজিকতা না মানলে আমার কাছে থাকা চলবে না। আমার অপরাধ আমি অশৌচ না মেনে ডিম খেয়েছি। কোনো খাবারই যে ছিল না সেটা কোনো অপরাধ হতেই পারে না। ছোট মেয়েকে ফেলে যাওয়া সম্পর্কে অভিযোগ করলে মা বলল, আমার আর ভালো লাগে না। তোরা কি করতে আছিস।

আমি বিশ্বাস করি না একজন জীবিত শিশুর চেয়ে এক মৃত বৃদ্ধের প্রতি বেশী সম্মান দেখানো উচিত।

তবু আমি মাকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারিনি। দূরে চলে যাওয়া বা কাছে থাকা কোনোটাতেই আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি না।

আমার ছোটখাটো প্রয়োজনগুলো আমার মায়ের মত পৃথিবীর আর কোন নারী কোন দিন বুঝতে পারবে না আমি জানি। বোধহয় সে কারণেই ভালোবাসা ও দাম্পত্য আমার অর্থহীন মনে হয়। সেসব হল আসলে সাদা, নিরুপায় ও নানারকম মেনে নেওয়া।

(সেজোকাকা)

যৌবনে সেজোকাকা ছিলেন ঘোর নাস্তিক। ঈশ্বর সন্ধানে গোমুখ পেরিয়ে জনমানবহীন পার্বত্যপথে একবার তাঁর খুব আমাশা হয়েছিল।

বাবাকে চিঠি লিখেছিলেন— বড়দা টাকা পাঠাও, আমি মরে যাচ্ছি।

গ্র্যাজুয়েট হবার পর দোকানে বসবার ভয়ে তিনি বন্দুক হাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেয়েছিলেন। এখন তিনি পুলিশের ও সি।

ছোটবেলায় তীর-ধনুক দিয়ে তাঁব পাখি মারা দেখেছি আমরা। একটু বড় হয়ে কলকাতার বাড়ির ছাতে বুকে বালিশ দিয়ে কাক মারা দেখেছি। নিচেব রাস্তায় ঠিক বৃত্ত হয়ে ঝরে পড়তো মৃত কৃষ্ণপক্ষীকুল। আমরা ছুটোছুটি করে ডাস্টবিনে ফেলে আসতুম। যে যতগুলো ফেলবে সে ততগুলো রসগোল্লা। রসগোল্লাব লোভে তখন থেকেই বোধহয় মিথ্যে কথা বলতে শিখি।

সেজোকাকা শিকার ক'রে ক'রে বুনো খরগোশ, খরহাঁস, জলপিপি, ঘুঘুপাখি ইত্যাদি কত কি যে আনতো। মা মিথ্যে করে রাগ দেখাতো কিন্তু রেঁধে দিতো ঠিক আর আমরা খুব মজা করে খেতুম।

পুজোর সময় সেজোকাকা স্কুটার চাপিয়ে কুয়ো ভ্যাদিস জুতো কিনে দিতো। একবার আমার ভাই হাবলুর আর কিছুতেই জুতো পছন্দ হয় না। সারা কলকাতার সবকটা দোকান যখন ঘোবা শেষ, তখনই আমি বুঝতে পারলুম, হাবলু আসলে স্কুটার চাপার সুখের জন্যে জুতো পছন্দ হচ্ছে না বলে আসছে।

এখন যিনি আমার সেজোকাকিমা তিনি বাড়ির সামনে এসে খেলা থেকে ডেকে আমার হাতে ছোট ছোট চিঠি দিতেন। সেরকম একটা চিঠি দুপুরের ঘুম থেকে তুলে সেজোকাকার হাতে দিলে কাকা বলেছিল— এই ঘ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানির কি শেষ নেই? আমি পরে মাকে গোপনে জিগ্যেস করেছিলুম— ঘ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানি মানে কি গো মা?

বাড়ি থেকে চলে যাবার আগে সেজোকাকা তবলা বাজাতো। আর আমাকে ডেকে ডেকে বলতো— এই বেঁটে, বলতো তবলাটা কি বলছে। আমি যখন যা ইচ্ছে হতো বলে দিতুম। একবার বলেছিলুম— চান করবো না, ভাত খাবো না, বেড়াতে যাবো। সেজোকাকা খুব হেসেছিল।

এই সেজোকাকা এখন আর একদম হাসে না। আমাকে আই-এ-এস কিংবা ডবল্যু -বি-সি-এস-দিতে বলে। তবলা বাজায় না। কিছু জিগ্যেস না করলে নিজের থেকে কোনো কথা বলে না। দু বছর অন্তর কোয়ার্টার পাল্টায়। সেখানে টি-ভি ফ্রিজ বিলিতি কুকুর ইমার্সন হিটার এইসব।

বাড়ি-দোকান বিক্রির পর থেকে মা কিংবা দাদা কিংবা বাবা মাঝে মাঝেই এই সেজোকাকার কাছ থেকে টাকা চেয়ে আনতো। একদিন শেষতম ঠিকানায় খুঁজে খুঁজে গিয়ে দেখলুম দুনম্বর চৌরঙ্গী টেরেস আসলে চৌরঙ্গী থেকে অনেক দূরে, রবীন্দ্রসদনের কাছে। দরজা খুলে দিয়েই কাকীমা বললেন— ডেরার সন্ধান পেলি কোথায়?

ভেতরে তখন একজন কালোমতন লোক জাঙ্গিয়াপরা সেজোকাকাকে চাপড়ে চাপড়ে ম্যাসেজ করছিল।

গত বইমেলায় সেজোকাকার সঙ্গে শেষ দেখা। সঙ্গে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্র বুলা, কাকার ছেলে। তার হাতে ছিল অ্যাটম বোমা তৈরির ইতিহাস জাতীয় একটা মোটা ইংরেজি বই। আর কাকার হাতে দেখলাম— শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী।

(ন-কাকা)

ন-কাকার বিছানায় অনেক ছারপোকা অথচ তার কোনো অসুবিধা হয় না। ন-কাকার গোঁফ খুব মোটা। গলার স্বর নাকি-নাকি ও উচ্চতা চার ফুট চার ইঞ্চি। এর মধ্যে ন-কাকার পিঠে একটা চমৎকার কুঁজ আছে।

আমি যখন ক্লাশ সিক্সে পড়ি তখন ন-কাকা আমার কিংবা দাদার সঙ্গে দাবা খেলতে গিয়ে হেরে যেতো।

ছোটকাকা সব পরীক্ষায় তরতর করে এগিয়ে যেতো আর ন-কাকা এক ক্লাশে অনেক বছর ধরে থাকতে থাকতে স্কুলে যাওয়াই ছেড়ে দিল। তারপর দর্জির কাজ শিখতে শুরু করলো। কুঁজো হয়ে কাজ করতে করতে আর পিঠে বালিশ দিয়ে শোয়া অভ্যাস ছিল বলে আস্তে আস্তে একদিন পিঠে কুঁজ হয়ে গেল।

দেশের বাড়িতে ন-কাকা একা একা থাকে আর জমিটমি দেখাশোনা করে। দেশের বাড়িতে দুর্গাপুজো হয়। একবার পুজোর সময় কালী বলে একজন লোক যে যৌবনে কয়লা বয়ে দিতো অথচ এখন ভিখিরি হয়ে গেছে— আমার কাছে এসে অনেকক্ষণ ধরে ভাত খেতে চাইছিল।

আমি ন-কাকাকে বললুম, কালীকে কিছু খেতে দাও।

ন-কাকা বলেছিল, চাষ করতে কি পয়সা লাগে না?

অথচ দেশে সারদা ভবন নামে যখন প্রেমানন্দ মঠের গেস্ট হাউস তৈরী হয় তখন যাবতীয় কড়িবরগা ন-কাকা দিয়েছিল। সারদা ভবনের দাতাদের লিস্টে ন-কাকার নাম আছে। —দাতা শ্রীবিজয়বসন্ত দাস।

আমি এম-এ পরীক্ষা দিচ্ছি শুনে ন-কাকার বাল্যবন্ধু আমার ছোটবেলার মাস্টারমশাই সুদর্শন চক্রবর্তী আমাকে বললেন— পরীক্ষার পর নোটগুলো দিস। প্রাইভেটে বসবো। ন-কাকা শুনে বলল— কাউকে নোট দিবি না। পড়বার সময় ওরা পয়সা দিয়েছে?

(ভাই-বোন)

আমার বড় বোন আমাকে রোজ সকালে ঘুম থেকে তুলে দেয়। আমাকে প্রায়ই সংস্কৃত মানে বই কিনে দিতে বলে। সে এখন ক্লাশ সেভেনে পড়ে। আজকাল শরীর খারাপের অজুহাতে সে প্রায়ই স্কুল যায় না।

কাঁচের গ্লাস বা চায়ের কাপ ভেঙে ফেললে বা ছোট বোনের সঙ্গে অকারণে ঝগড়া মারামারি করলে তাকে যত বকুনি বা প্রহার করা হয় সে তত হাসতে থাকে। একদিন অসম্ভব রাগে তাকে অনেকক্ষণ মারধোর করার পর সে কেঁদে ফেলে। বকুনি দিলে সাধারণত সে হেসে থাকে, তাকে কাঁদাতে পেরে বড় খুশি লেগেছিল সেদিন, মনে আছে।

আমার পরের ভাই সারাদিন অঙ্ক করতো ঘরের এক কোণে বসে। কলেজ লাইফে। তার কোনো বন্ধু নেই।

এখন সে সেজোকাকার থ্রু দিয়ে একটা চাকরি পেয়েছে। সেটা এত দূর যে যাতায়াতেই আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। বেরিয়ে যায় সকাল ছ'টায় আর বাড়ি ফেরে সাতটা-আটটা, সন্ধেবেলা। এসেই ঘুমিয়ে পড়ে বলে তার সঙ্গে আমার ছুটির দিন ছাড়া দেখা হয় না।

সে ছ'মাস চাকরি ক'রে তিনশো টাকা মাইনে থেকে টাকা জমিয়ে কিভাবে যেন একটা ঘড়ি কিনে ফেললো। আমার দুশো টাকা শুধু হাতখরচ, তাও সবান্ধবে চা-সিগারেট মজলিসি নেশাতে সব দশ দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়।

একদিন মায়ের কাছে শুনলাম, ভাই আমার সম্পর্কে বলেছে— ও কিসের এত লাটের বাঁট যে একা এত খরচ করে?

তার পেট এত খারাপ যে কোনো খাবারই ঠিক ঠিক হজম হয় না, না বাড়ির না বাইরের। অনেকদিনই আফিস যাবার সময় বাস স্ট্যান্ডের অর্ধেক রাস্তা গিয়ে বাড়ি ফিরে আসে ও কোনো কথা না বলে গম্ভীরভাবে পায়খানায় ঢুকে যায়।

সে আমার চেয়ে এক বছরের ছোট বলে ছোটবেলায় তার সঙ্গে আমার সবচেয়ে বেশি মারামারি হতো।

তার পরের ভাই ভক্ত মানুষ। সে বি-কম-পার্ট-ওয়ান ফেল। আমার বন্ধুবান্ধব বাড়িতে এলে সে প্রশ্ন করে— জীবন কি? মুক্তি কি?

একদিন তার একটা চিঠি এল।

লালুভাই,

তোমার সহিত সাক্ষাতের আগে পর্যন্ত আমি সবিশেষ মনোকষ্টে ছিলাম। তোমার সহিত কথাবার্তা বলিয়া আমি মুক্তির সন্ধান পাইয়াছি। আমি দীক্ষা নিতে চাই। কবে কোথায় যোগাযোগ হইতে পারে জানাইয়া পত্র দিও।

ইতি

শ্রী বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

লালু বাড়ির বাজার করে। রেশন তোলে। দীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে আমি তাকে একবারও ভেবে দেখতে বলিনি।

কোনো একদিন সে কোনো মিশনের মহারাজ হয়ে গেলে আমার খারাপ লাগবে কিনা আমি বুঝতে পারি না। শুধু বুঝতে পারি, লালু যে মুক্তির কথা বলে, সেই মুক্তিও একধরনের বন্ধন। আর সেই বন্ধনের ভার অনেক, অনেক বেশি।

(দাদু)

একটা চিৎকার আমি আজও মাঝে মাঝে শুনতে পাই। বাম অঙ্গ প্যারালিসিসগ্রস্ত শীর্ণ-আত্মা দাদুকে একদিন খালি গা অনেক পাথুরে মালা পরা ওঝা মন্তর-টন্তর ঝাড়ফুকসহযোগে দেশের বাড়ির আটচালায় জোর করে হাঁটাচ্ছে। অপদেবতাকে উদ্দেশ্য করে দাদুর গায়ে মন্ত্রপূত ঝাঁটা পেটাচ্ছে। সঙ্গে চলছে বীভৎস খিস্তি আর গালিগালাজ। আটচালায় ভেঙে পড়েছে সারা গাঁয়ের মানুষ। দাদুর অমানুষিক চিৎকার আর গাঁয়ের মানুষজনের দিকে কোটরাগত করুণ চোখে তাকানো মনে পড়ে। আজও দেখতে পাই সেই চোখে কী তীব্র অবিশ্বাস ছিল।

আজ তোমরা যারা মজা দেখছো আপাত-অসহায় মুখ করে, তারা সবাই আমার শংকরী মাছের চাবুক আর দামী বেতের পরিচয় আজীবন পেয়েছে। তোমাদের দুর্বল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে প্রতিহিংসাতৃপ্ত এক একটি মুখ নিয়ে আজ তোমরা ঘরে ফিরবে।

দু'দিন চলেছিল ওঝার অত্যাচার। সকাল-সন্ধে দাদুর চিৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠত চরাচর। বিকেলে দাদুর এমনিতে বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে 'বাবলু' বলে ডাকলে আমরা বোদের পাড়ের খেলার মাঠ থেকে শুনতে পেতাম। সেই বাজখাঁই গলার প্রাণান্তকর চিৎকার আজও প্রায় মর্মে গেঁথে আছে।

ঠিক দুবছর দাদু প্যারালিসিসে ভুগেছিল। ঠাকুরমা আগেই মারা গেছে। সিঁড়ির মুখে দাদুর ঘর থেকে পালাক্রমে বাড়ির সবাইকে দাদু কাছে ডাকত। জল চাইত। কেউ আসত না।

শুধু বড় বৌমা, মানে আমার মাকে দেখেছি দাদুর মুখ ধুইয়ে দিতে; ভাত খাইয়ে দিতে; বেডপ্যান পাল্টে দিতে।

এভাবে অনেকদিন চলার পরে একদিন সকালে দাদুর ঘরে খুব ভিড় হল। দাদু মারা যাচ্ছে।

ন-কাকার হাতে ছিল সিন্দুকের চাবি। বাবার হাতে গীতা। আর সবাই গোল হয়ে দাদুকে ঘিরে। খুব সজ্ঞানে গীতা পাঠ শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে দাদু মারা গেলেন।

ছ'ফুট লম্বা চেহারার একটি উজ্জ্বল শাদা গোঁফ ছিল দাদুর। বিকেলবেলায় ছড়ি হাতে দাদুর প্রশ্ন ছিল, কে কটা লিচু চুরি করেছ? ঠিক ঠিক বললে কম মারব। আমি চুরি করতাম সবচে বেশি। স্বীকার করতাম সবচে আগে। বেত খেতাম সবচে কম।

সেজোকাকা খবর পেয়ে বিকেলবেলা গাড়ি এনে ব্যাকসিটে মৃতদাদুকে কোন রকমে শুইয়ে কলকাতা নিয়ে গেল। বিদ্যুৎ-চুল্লীতে পোড়ান হবে। সঙ্গে গেল বাবা।

সারা গাঁয়ের লোক বলল— আমরা কি আমাদের পূর্ণ দাসকে কাঁধে নিতে পারতুম নি? আমরা কি নেই?

অবরোহী

সনৎ বসু

আজও হল না।

বুকের গভীর থেকে উঠে আসা কয়েকটা শব্দ চাপা আর্তনাদ হয়ে অতীনকে অনেকবার নাড়িয়ে দিয়ে যায়।

দেওয়াল ঘড়িটা মিষ্টি শব্দে জানায় রাত দু'টো। বুকের তলা থেকে বালিশ সরিয়ে চিত হয়ে শোয় অতীন। শরীরটা সম্পূর্ণ ছেড়ে শবাসনে থাকার মতো চোখ বুঁজে পড়ে থাকে। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার দহন অনুভূতির তন্ত্রীগুলোকে কুরে কুরে খায়।

সুনির্মলের কাছে তবে সত্যি সত্যিই হার মানতে হবে?

আজ নিয়ে পর পর দশ দিন। একটা গল্পের প্লট দানা বেঁধে উঠল না। নিদেনপক্ষে একটা ঘটনা। বা একটা দুটো সংলাপ।

এই কদিন অফিস ছুটির পর সোজা ফ্ল্যাটে চলে এসেছে অতীন। সন্ধের পর কোনো কাজ রাখে নি। ঘরে ঢুকেই অন্যান্য দিনের মতো টিভি-র নব ঘুরিয়ে সোফায় বসে পর্ডেনি বা টেপ রেকর্ডারে অনুপ জালোটার ক্যাসেট জুড়ে ব্যালকনির অন্ধকারে গিয়ে বসে নি। মনে মনে নিজেকে তৈরি করেছে। রুম্পি আর নিলয় তার সঙ্গে গল্প করতে এলে ভুলিয়ে ভালিয়ে তাদের অদিতির কাছে পাঠিয়েছে।

বাথরুম থেকে স্নান সেরে সে সটান শুয়ে পড়েছে বিছানায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক নিঃসাড়ে পড়ে থেকেছে। অতীনের কথায় এটা নাকি তার মনের বিশ্রাম। যাতে রাত গভীরে লেখার সময় সজীব থাকে মনটা।

অদিতিও এই কদিন তাকে কোনোভাবে বিব্রত করে নি। যতটা সম্ভব লেখার সুযোগ করে দিয়েছে। হাতের কাছে টিফিন রেখে দরজা ভেজিয়ে পাশের ঘরে রুম্পি নিলয়কে পড়াতে বসিয়েছে। রাতে খাওয়ার সময় হলে ডাকতে বলেছে।

এরকম সুযোগ কজন লেখক পায়!

আজও যথারীতি টিফিন খাওয়ার পর বিছানায় আয়েস করে বসেছিল অতীন। বিছানার পাশেই হাফ-সেক্রেটারিয়েট টেবিল আর ফোমের গদিওয়ালা চেয়ার। কিন্তু আগেকার অভ্যাস মতো টেবিল চেয়ারের থেকে নরম বিছানাই তার লেখার প্রিয় জায়গা।

লিখতে বসে প্রথমেই একটা সুন্দর নাম মনে এসেছিল অতীনের। খুব রোম্যান্টিক নাম। স্বপ্নসমুদ্র। একটা দুঃখী মেয়ের সুখ, স্বপ্ন আর রূঢ় বাস্তবের সংঘাতকে গল্পে রূপ দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। পর পর ন'টা রাত নিষ্ফলা কেটেছে, মনের মধ্যে সৃষ্টির আকুলিবিকুলি। আভাস যখন একটা পাওয়া গেছে, গল্প নিশ্চয়ই লেখা হয়ে যাবে। পরম উৎসাহে খাতাটা সামনে টেনে ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল অতীন।

কিন্তু তারপর? সেই অনাদি অনন্ত প্রতীক্ষা। 'থিম'টা মাথায় থাকলেও কিছুতেই সাজানো যাচ্ছে না গল্পটা। কোথা থেকে কি ভাবে শুরু করবে ভাবতে ভাবতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল অতীন।

ঘুম যখন ভাঙল, দেখল টেবিলের ওপর ঢাকা রাতের খাবার। অতীন নিজের মনেই হাসল, নির্দেশগুলো কি নিখুঁত ভাবে মেনে চলেছে অদিতি।

গতকালও সে খাতা কলম পাশে রেখে চোখ বুঁজে শুয়েছিল। রাত দশটা নাগাদ খেতে বসবার জন্যে ডাকতে এসে তার মুখ ঝামটা খেয়েছিল অদিতি। আসলে অতীন তখন নতুন একটা গল্প সাজাবার চিন্তায় মগ্ন ছিল। অদিতির ডাকে ছকটা সেই যে গোলমাল হয়ে গেল, অনেক চেষ্টা করেও ঠিকঠাক গোছাতে পারল না অতীন।

তখনই নতুন নির্দেশ দিয়েছিল ঘুমিয়ে পড়লে তার খাবার যেন টেবিলের ওপর ঢেকে রাখা হয়। 'তথাস্তু' বলে গম্ভীর মুখে চলে গিয়েছিল অদিতি।

অতীনের আশ্চর্য লাগে আজ দশ দিন তারা এক বিছানায় শোয় নি। এমনকি হাসি ঠাট্টা পর্যন্ত করে নি। শুধু রুম্পি-নিলয়ের সঙ্গে টুকটাক দু-একটা কথা ছাড়া বাড়িতে অতীনের মাথা জুড়ে থেকেছে গল্পের চিন্তা। যতই দিন গেছে ততই সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। সুনির্মলকে সে কিছুতেই জয়ের শিরোপা কেড়ে নিতে দেবে না।

ছোট্ট সংসার বলে অনেক ক্ষেত্রেই সে আর অদিতি নিজেদের মধ্যে একটা অলিখিত কর্ম-বিভাজন করে নিয়েছিল। নিতান্ত অসুবিধা না হলে সেটা মেনে চলত দুজনেই।

রাতে শোওয়ার আগে অতীনের কাজ বেডকভার তুলে, বিছানার চাদর ঝেড়ে, মাথার বালিশ দুটো জায়গা মতো রেখে, খাটের স্ট্যাণ্ডের চার কোণে মশারির দড়ি লাগানো। তারপর নেমে গিয়ে বড় দরজার খিল ছিটকিনি লাগিয়ে ভেতর থেকে তালা আটকানো। এই তালা দেওয়ার ব্যাপারটা দু'মাস আগেও ছিল না। পাশের ফ্ল্যাটে একটা মস্ত চুরির ঘটনা ঘটায় অদিতির পীড়াপীড়িতে ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

সব শেষে বাইরের সুইচগুলো অফ্ করে, পা মুছে বিছানায় উঠে সটান শুয়ে পড়া।

অদিতি ততক্ষণে খাওয়ার বাসন কলঘরে ডাঁই করে, ডাইনিং টেবিল মুছে, কিচেনের জানলা বন্ধ করে, ফিল্টার থেকে জগে জল ভরে বাথরুমে ঢোকে।

ঘরে এসেই 'পলিক্রল'-এর কাপ আর জলের গ্লাস হাতে মশারির কাছে গিয়ে দাঁড়ায় অদিতি। শরীর কোমর পর্যন্ত তুলে কাত হয়ে 'অ্যান্টাসিড' খায় অতীন।

অদিতি এরপর আয়না চিরুনি নিয়ে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে। এক মনে চুলের জট ছাড়ায়। ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে এগারোটা হলে উঠে দাঁড়ায়। জগ থেকে ঢক ঢক করে বেশ খানিকটা জল খেয়ে আলো নিভিয়ে বিছানায় উঠে পড়ে।

এই দশটা দিন সংসারের অনেক নিয়মই পাল্টে গেছে। অদিতি এখন পাশের ঘরে ছেলেমেয়েদের সাথে শোয়।

শুধু মাত্র একটা গল্পের জন্য। দীর্ঘ সাত বছর পর এক সময়ের সাড়া জাগানো গল্পকার অতীন সেন আবার লেখায় হাত দিয়েছে।

এই লেখার মধ্য দিয়েই ঘটবে তার পুনর্জন্ম। সেদিনের সম্পাদক, সমালোচকদের উদাসীনতা, বিদ্রূপ আর বন্ধুবান্ধবদের 'অতীনটা গেঁজিয়ে গেছে, ওর দ্বারা আর কিস্সু হবে না'— জাতীয় পণ্ডিতিকে একটা গল্পের মধ্য দিয়ে উচিত জবাব দিতেই হবে। আর সুনির্মলকেও বুঝিয়ে দিতে হবে অতীন সেন এখনো মরে যায় নি।

বিছানা ছেড়ে পায়ে পায়ে খোলা জানলায় দাঁড়ায় অতীন। বাইরে উন্মুক্ত আকাশ, হালকা মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে চাঁদ। অতীনের মনে ভিড় করে অতীতের স্মৃতি।

তার গল্প তখন ছাপা হচ্ছে নানা পত্র-পত্রিকায়। সেবার পুজোয় সব মিলিয়ে দশটা গল্প ছাপা হল কলকাতা আর মফস্বলের কাগজে। তার মধ্যে সাতটা গল্প নিয়েই প্রচুর

লেখালিখি হল। আসতে লাগল চিঠি। এক সময়ে যে সব পত্রিকায় লেখা ছিল স্বপ্ন, আমন্ত্রণ জানালো তারাও। সে এক দারুণ অনুভূতি।

লিখতে বসলেই কলমের ডগায় ফুটে উঠত নতুন শব্দ, নতুন ভাষা, আর নতুন নতুন কাহিনী। মাটির গন্ধ নিয়ে চরিত্ররা হাজির হোত। বক্তব্যের বলিষ্ঠতায়, গদ্যের শানিত ঋজুতায়, ডিটেলিংয়ে, ট্রিটমেণ্টে, সর্বোপরি শিল্পের অপরূপ ব্যঞ্জনায় প্রতিটি গল্পেই চেনা যেত তার স্বতন্ত্রতা। অতি অল্প সময়েই তৈরি হয়ে গিয়েছিল নিজস্ব পাঠকগোষ্ঠী।

আসলে ছাত্র অবস্থা থেকে বিয়ের তিন বছর পরও সে সক্রিয়ভাবে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। ফলে সমাজ-জীবন ও মানুষের সঙ্গে তার ছিল নিবিড় ঘনিষ্ঠতা। অর্থনীতির সঙ্গে পরিবেশ পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত সম্পর্ক বিষয়ে সে ছিল যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সেই চেতনা ও অভিজ্ঞতার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছিল লেখায়।

অথচ ভীষণ বিপর্যয়ের মধ্যে চলছে সংসার। বরানগরের ভাড়া বাড়ি। একটাই মাত্র ঘর। পাশাপাশি আরো পাঁচ ঘর ভাড়াটে। এক কথায় অসুস্থ পরিবেশ।

তারই মধ্যে ঘরে দুটো রুগ্ণ শিশু। রুম্পি তিন বছরের, নিলয় মাত্র ন'মাসের। একটা না একটা লেগেই থাকে। ডাক্তার যেন ছাড়তেই চায় না। তার মধ্যেই বিভীষিকা হয়ে দেখা দিল অদিতির গলব্লাডারের সমস্যা।

মাঝে মধ্যেই ব্যথায় অস্থির হয়ে পড়ত অদিতি। বেহুঁশের মতো পড়ে থাকত বিছানায়।

সংসারের যাবতীয় কাজ এসে পড়ত অতীনের ঘাড়ে। অনভ্যস্ত অতীন চোখে মুখে অন্ধকার দেখত।

অফিস কামাই করে দিনের পর দিন পড়ে থাকত বাড়িতে। স্টোভ ধরিয়ে রান্না, বাচ্চাদের খাওয়ানো, ঘরদোর পরিষ্কার করা, বাইরের কল থেকে বালতি ভরে জল টেনে আনা, জামাকাপড় কাচা— দম ফেলার ফুরসৎ মিলত না।

তার মধ্যেই অদিতিকে ডাক্তার সোমের চেম্বারে দেখানো, এক্সরে-র ব্যবস্থা, প্রেসক্রিপশন মিলিয়ে ওষুধ কেনা এবং ফেরার পথে স্টেশনের কাছ থেকে দিনের কাঁচা বাজার করে আনা।

জানলা ছেড়ে চেয়ারে গা এলিয়ে বসে অতীন। পা দুটো তুলে দেয় টেবিলের ওপর। ড্রয়ার থেকে সিগারেট বের করে। সিগারেটের ধোঁয়ার সাথে চিন্তাগুলো হাওযায ভাসতে থাকে।

রাত দশটার মধ্যেই শুয়ে পড়ত তারা। সাত বাই পাঁচ খাটের সঙ্গে একটা চওড়া বেঞ্চ জুড়ে শোওয়ার জায়গা বাড়ানো হয়েছিল। মশারিটা ছিল অর্ডার দিয়ে বানানো। তাতেও চার জন হাত পা মেলে ঘুমোতে পারতো না।

খাটের মাথার দিকে দেওয়ালে একটা তাক ছিল। লেখার খাতা কলম ওখানেই থাকত। ঘণ্টা দুয়েক পর ঘুম ভেঙে যেত অতীনের। ততক্ষণে বাড়িঅলা ঘুমিয়ে পড়েছে। সমস্ত বাড়ি নিঝুম। খাট থেকে নেমে আলোটা জ্বালত। খাতা কলম নিয়ে আবার ঢুকে যেত মশারিব ভেতর। ষাট পাওয়ারের বাল্বটা উল্টো দিকের দেওয়ালে থাকায় ঠিকমতো আলো হত না। সাদা কাগজে ভেসে উঠতো মশারিব সুতোর আবছা ছায়া। অতীনের লিখতে খুব অসুবিধা হত।

অথচ ষাট পাওয়ারকে একশ পাওয়ার করার ক্ষমতা ছিল না। বাড়তি টাকার টোপ দিয়েও বাড়িঅলাকে রাজি করানো যায় নি। কারণ এক বছর আগেই ওদের ওপর উঠে যাওয়ার নোটিশ পড়েছে। এক নাগাড়ে তিন বছর পুরনো হলেই এ বাড়িতে ভাড়াটে উচ্ছেদের কলকাঠি নড়তে শুরু করে। উঠতে বসতে পেছনে লেগে ভাড়াটেকে অতিষ্ঠ করে তোলা হয়।

অতীন বাড়িঅলার এ হেন ফাঁদে ধরা দেয় নি। তাই তাকে তো খানিকটা বাড়তি দুর্ভোগ পোহাতেই হবে। তবে এ বাড়িঅলার একটাই গুণ, কাজে ভাড়াটের জীবন জেরবার করে দিলেও কথার মিষ্টতা হাবান না। গালমন্দ করা তো দূরের কথা।

সকাল সন্ধে দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে থাকেন তিনি। শ্যেন দৃষ্টিতে সব লক্ষ করেন। কোন ঘরের বাচ্চা লোহার গেটে ঝুলে দোল খেল বা টিউবকলের হাতল ধরে খট খটাং করল, কার ঘরে সন্ধের আগেই লাইট জ্বলল — বাড়িঅলার চোখ থেকে পাব পাবার জো নেই। ভাড়াটেবা তাই আড়ালে বাড়িওলা ভূপেনবাবুকে 'শকুনবুড়ো' বলে ডাকত।

বর্ষাকালে এই শকুনবুড়োর চোখকেও ফাঁকি দিত অতীন। কারণ রান্নাঘরটা ছিল উঠোনের উল্টো দিকে। বর্ষাব সময় উঠোনটা জলের নিচে ডুবে যেত। বৃষ্টি আর নর্দমার জল মিলেমিশে একাকার। রান্না করা খাবার নিয়ে জল পেরিয়ে বড ঘরে আসতে ঘেন্নায় পেটের ভাত উল্টে আসত অদিতির। বাধ্য হয়েই একটা ছোট স্টোভ কিনে রাতের অন্ধকারে শোওয়ার ঘরে ঢুকিয়েছিল অতীন। একটু রাত করে রান্না চাপাতো অদিতি। খাওয়া দাওযার পর অতীন এঁটো বাসনগুলো লুকিয়ে রেখে আসত রান্নাঘরে।

অদিতি মাঝে মাঝে ভেঙে পড়তো। 'এভাবে বাঁচা যায় না। প্লিজ, তুমি ঘর দেখ। অন্তত দুটো ঘর। রান্নাঘর যেন লাগোয়া থাকে। আর ভূপেনবাবুর মতো ছোটলোক বাড়িঅলা যেন না হয।'

অতীন স্ত্রীকে বোঝাতো। ব্যাঙ্কের একজন সাধারণ ক্লার্ক হয়ে এ বাজারে খুব ভালভাবে থাকা যায় না। তার ওপর মাথায় বহু টাকার 'প্রভিডেন্ট ফান্ড লোন'। ছোট বোনের বিয়ের সময নেওয়া। আরো এক বছর চলবে ডিডাকশান। লোন কাটা শেষ হলে ভাল বাড়ি দেখে উঠে যাওয়া যাবে।

অদিতি বুঝেও বুঝতে চাইত না। ফলে অহেতুক তর্কে জড়িয়ে পড়ত দু'জনে। চলত অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগেব পালা। কেউ হারতে চাইত না। তাই তর্কও থামত না।

অবস্থা চরমে উঠত ছেলেমেয়েরা কেউ অসুখে পড়লে। সব সময় অতীনের পক্ষে অফিস কামাই করা সম্ভব হত'না। ডাক্তার দেখানো, ওষুধ কেনা, বাচ্চার শুশ্রূষা, তার ওপর সংসারের প্রাত্যহিক কাজ। সব দিক সামলে অদিতি মাথা ঠিক রাখতে পাবত না। একটুতেই রেগে উঠত। আবোল তাবোল বকত।

আর অতীন? অফিস থেকে ফিরেই পোশাক পাল্টে লেগে যেত কাজে। অদিতিকে জোর করে বিশ্রাম নেওয়াতো। সারা রাত অসুস্থ সন্তানের পাশে জেগে সকালে যথারীতি অফিস চলে যেত।

এত করেও তার লেখা বন্ধ হয় নি। বরং গভীর জীবনবোধ নিয়ে আজও বেঁচে আছে সে সময়কার গল্পগুলো।

সেই একই অতীন সেনকে এখন একটা গল্প লেখার জন্য নিজেকে নিংড়ে দিয়েও কেন ব্যর্থতার গ্লানি বয়ে বেড়াতে হয়? কেন অসহ্য দহনে অহর্নিশ জ্বলে পুড়ে যেতে হয়?

চিন্তাটা মাথায় আসতে অতীন এই প্রথম তার অতীত ও বর্তমানের অবস্থানগত পার্থক্যের একটা তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাবার চেষ্টা করে।

অতীন কি কোনো দিন ভাবতে পেরেছিল বরানগরের নরকপুরী ছেড়ে এত দ্রুত সল্টলেকের এই মনোরম ফ্ল্যাটে উঠে আসবে? বলতে গেলে তার জীবনের এই উল্লম্ফনটা সেই আরব্যোপন্যাসের আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ পাওয়ার সঙ্গে তুলনীয়।

কাগজে সরকারি বিজ্ঞাপন দেখে পাশের টেবিলের সৌমিত্র বসুব হুজুগে পড়ে 'অ্যাপ্লিকেশনটা' পাঠিয়ে দিয়েছিল অতীন। সঙ্গে দু'হাজার টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট।

মাস ছয়েক পর চিঠি এল অফিসের ঠিকানায়। টাকা জমা দিয়ে ঘরের দখল নেওয়ার জন্য।

পরের ঘটনাগুলো ঘটল যেন অদৃশ্য কোনো যাদুকাঠির ছোঁয়ায়। ইউনিয়নের জগদীশদাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের কাছে। তারপর ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের বিশেষ সুপারিশ নিয়ে ছুটেছিল ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটের হেড অফিসে। সেখান থেকে আইন কানুনের গণ্ডি পেরিয়ে 'ফ্ল্যাট পারচেজ' লোনের টাকাটা মঞ্জুব হতে লাগল আরো চার মাস।

অতীনের নতুন ঠিকানা হল বি বি/ চৌত্রিশ/ছয়, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০ ০৬৪।

শুরু হল নতুন জীবন। সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ। পরিবর্তনের অনিবার্য প্রভাব সর্বপ্রথম পড়ল অদিতির ওপর। দ্বিগুণ উৎসাহে ঘর গোছানোর কাজে মেতে উঠল অদিতি। ফ্ল্যাটের অন্যান্য বাসিন্দাদের দেখাদেখি কেনা শুরু হল একটার পর একটা আসবাবপত্র। ধীরে ধীরে জানলার রং মিলিয়ে পর্দা, বিছানার চাদর, ব্যালকনিতে ঝুলন্ত ফুলের টব, ফ্যামিলি সাইজের ফ্রিজ, ফিলিপসের একটা টু-ইন-ওয়ান কেনা হল। রুম্পি নিলয়ের দাবিতে সুন্দর একটা অ্যাকুইরিয়াম বসল ডাইনিং স্পেসে।

কোথা থেকে কিভাবে যে এত টাকাব যোগাড় হল অতান অদিতির একান্ত আলোচনায় তাতে মিশে থাকে বিস্ময়ের ঘোর। অথচ সবই ধার।

বছর তিনেকের মধ্যেই সম্পূর্ণ ভোল পাল্টে গেল অতীনের সংসারের। প্রক্রিয়াটা যদিও অতীনের নিজের মধ্যে দ্রুত ঘটল না। সল্টলেকে উঠে আসার পরও সে সপ্তাহে অন্তত তিনটে দিন অফিস ছুটির পর রিক্রিয়েশন ক্লাবে আড্ডা মারত। সক্রিয় রাজনীতিব পাট চুকিয়ে দিয়েছিল নিলয় হওয়ার পর। যদিও বামপন্থার প্রতি তার সমর্থনের জোরটা আগের মতোই অটুট ছিল।

ফ্ল্যাটে জায়গার অভাব ছিল না। ছিল না শকুনবুড়োর উৎপাত। অদিতির অসুখটাও যেন হঠাৎ সেরে গেল। তবু অতীনের ভেতর খাতা কলম নিয়ে বসাব আগ্রহ দেখা গেল না। অদিতি বেশ কয়েক বার বলা সত্ত্বেও না। কেমন একটা আরামবোধ পেয়ে বসল তাকে। বরানগরে থাকতে যে লোক গড়ে দিনরাত মিলিয়ে ঘণ্টা পাঁচ ছয়ের বেশি ঘুমোত না, সল্টলেকে তার ঘুম বেড়ে হল দৈনিক সাড়ে আট থেকে ন ঘণ্টা।

অতীনের চেহারায় একটা জেল্লার ভাব এল। ভুঁড়িটা বেঢপ বেড়ে গেল। রিক্রিয়েশন ক্লাবে তার হাজিরা কমে গিয়ে দাঁড়ালো সপ্তাহে শুধু মঙ্গলবার। তাও আধ ঘণ্টাখানেক। এই সময়ে ইউনিয়ন সম্পর্কে তার মন্তব্যে বন্ধুরা অনেকেই অবাক হল।

সাড়ে তিন বছরের মাথায় সে অতি তুচ্ছ কারণে রিক্রিয়েশন ক্লাবের চাঁদা দিতে অস্বীকার করল।

চার বছরের মাথায় সে সাবা ভারত ব্যাঙ্ক কর্মী ইউনিয়নের ডাকা এসপ্ল্যানেড ইস্টের সমাবেশে না যাবার জন্য অফিস কামাই করে বাড়ি বসে রইল।

এর কিছুদিন পরই ঘরের পুরনো সাদা-কালো টিভিটা পাল্টে একটা বি.পি.এল কালার টিভি নিয়ে এল। ফলে অফিস ছুটির পরই বাড়িতে ফেরার তৎপরতা বেড়ে গেল তার।

সে হয়ে উঠল একজন নিয়মিত টেলিভিশন দর্শক। বাংলা হিন্দী সব কটা সিরিয়াল, সাড়ে সাতটা, সাড়ে ন'টার সংবাদ তার চাই-ই। এছাড়া শনি রবিবারের সিনেমা, বুধবারের চিত্রহার, শুক্রবারের 'ওয়ার্ল্ড দিস উইক' কোনোটাই তার বাদ যেত না।

পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বমোট দু'বার সে গল্প লেখার তাগিদ অনুভব করেছিল। প্রথমবার হঠাৎ-ই নিজের খেয়ালে, দ্বিতীয়বার পাঁচশ টাকার বিনিময়ে একটা বাজারী পত্রিকায় পূজা সংখ্যায় লেখার আমন্ত্রণ পেয়ে। দু'বারই গল্প দাঁড় করাতে না পেরে মাঝপথে ছেড়ে দিয়েছিল। অবশ্য তার জন্য কোনো দুঃখ-বোধ বা অনুশোচনা ছিল না।

কেননা তখন সে এক ভিন্ন মার্গের মানুষ। অফিস বাড়ি ছাড়া যার দ্বিতীয় কোনো জগৎ নেই। একদা রাজনৈতিক কর্মী অতীনের এখন রাজনৈতিক আলোচনার প্রতি তীব্র অনীহা। 'যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ' জাতীয় বাজার চলতি অশিক্ষিত মন্তব্য ইদানিং যেখানে সেখানে করে বসে সে। তার নতুন উপলব্ধি হল ভারতবর্ষে অধ্যাত্মবাদ ছাড়া আর সব মতবাদই অচল। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তার চোখে শ্রমিকদের ধান্দাবাজ বানাবার প্ল্যাটফরম।

তার এই নতুন আত্মোপলব্ধিই তাকে সহকর্মীদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিল। দু-একজন সুযোগ-সন্ধানী ছাড়া অফিসে তার প্রকৃত কোনো বন্ধু রইল না।

পারিবারিক জীবনের আয়েশী স্বাচ্ছন্দ্যে অতীন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিল তার সাহিত্যের উজ্জ্বল অতীত। ভুলে গিয়েছিল বরানগরের সেই কঠোর সংগ্রামময় দিনগুলি। ভুলে গিয়েছিল রতনবাবু রোডের বিখ্যাত রায় পরিবারের ছেলে সুনির্মলকে।

কিন্তু নেহাতই ঘটনাচক্রে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো তার জীবনে ঘটে গিয়েছিল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

অদিতি অনেক দিন ধরেই বলছিল অফিস লাইব্রেরি থেকে বই এনে দেবার জন্য। বরানগরের ওই দুঃস্বপ্নের দিনেও বই পড়ার অভ্যেসটা বজায় রেখেছিল অদিতি। ইদানিং ছেলেমেয়েরা স্কুলে চলে গেলে দুপুরের দিকটা খুব ফাঁকা লাগত। কিন্তু অতীন কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছিল বারবার। কারণ চাঁদা না দেওয়ার জন্য রিক্রিয়েশন ক্লাবের মেম্বারশিপ বাতিল হয়ে গিয়েছিল তার।

সেদিন এই বই নিয়ে অদিতির সঙ্গে বেশ এক চোট হয়ে যাওয়ার পর অফিসে গিয়ে সৌমিত্র বসুর ড্রয়ার থেকে লাইব্রেরির ক্যাটালগটা বের করেছিল অতীন। বই বাছার জন্য পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছিল।

লেখক তালিকায় 'দন্ত স' এর নিচে একেবারে শেষ জায়গায় সুনির্মল রায় নামটা দেখে বেশ অবাক হয়েছিল অতীন। লেখকের নামের নিচে ছ'টা উপন্যাসের তালিকা। টিফিন আওয়ারে সৌমিত্র বসুর কার্ডটা নিয়ে অতীন ছুটে গিয়েছিল লাইব্রেরিতে। লাইব্রেরিয়ান অলক ঘোষকে বিশেষ অনুরোধ করে পাওয়া গিয়েছিল তিনটে বই। বাকি তিনটে ইস্যু হয়ে গেছে। একটা বইয়ের পেছনের মলাটে লেখকের ছবিটা দেখেই চমকে উঠেছিল অতীন। অবিকল সেই মুখ, চশমার নিচে গাঢ় দুই চোখ। নাকটা বাঁ দিকে ঈষৎ বাঁকানো।

সুনির্মলের 'বিষাদসিন্ধু' উপন্যাসটা কার্ডে ইস্যু করিয়ে অদিতিকে পড়তে দিয়েছিল অতীন। অচেনা নাম দেখে অদিতি রেগে উঠেছিল। কোথাকার কোন উটকো লেখক। আসলে বরানগরে থাকলেও কোনো দিন তাদের বাড়ি আসেনি সুনির্মল। যা দেখা হোত সেই সাহিত্য আসরে। নতুবা শ্মশানের ধারে নরেশদার চায়ের দোকানে। অতীনের বাড়িঅলা ভূপেন রায় ছিল সুনির্মলদের আত্মীয়। কিন্তু লোকটার নীচতাকে সহ্য করতে পারত না সুনির্মল।

অতীন অনেক করে বলার পর বইটা পড়তে রাজি হয়েছিল অদিতি।

পরদিন বিকেলে অফিস থেকে ফেরার পর অতীনের জন্য অপেক্ষা করছিল অন্য চমক।

কলিং বেল বাজাতে দরজা খুলেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছিল অদিতি। 'জানো, বইটা হুবহু আমাদের জীবন নিয়ে লেখা। আমি হলফ করে বলতে পারি লেখক আমাদের পরিচিত। পড়ে মনে হচ্ছিল আবার যেন বরানগরে ফিরে গেছি। আমাদের দুঃখের দিনগুলির কি নিখুঁত বর্ণনা। আর উপন্যাসের নায়কের সঙ্গে অদ্ভুত মিল তোমার...'

তক্ষুণি বইটা নিয়ে বসেছিল অতীন। যখন শেষ হল রাত একটা। অতীনের ভেতর তখন অন্য অনুভূতি। বিস্ময়, শ্রদ্ধার পাশাপাশি কি একটা হারাবার যন্ত্রণা তাকে অস্থির করে তোলে।

এক উদীয়মান লেখকের পারিবারিক বিপর্যয় আর তার নিরলস সাহিত্য সাধনার মর্মস্পর্শী কাহিনী উপন্যাসের উপজীব্য।

উপন্যাসের লেখক-নায়ক সুদর্শন যেন তার দিকে ছুঁড়ে দেয় এক রাশ উপহাস। যেন বলে, একটু উন্নত জীবন পেয়েই নিজের শ্রেণীকে ভুলে গেলেন অতীনবাবু! কোথায় গেল আপনার আপসহীন কলম?

সমাজ ও মানুষের প্রতি আপনার আদর্শ... আপনার শপথ...?

অতীনের দৈনন্দিন জীবন ছন্দে চিড় ধরে। এক প্রলয়ঙ্কর ঝড় বয়ে যায় তার মনোজগতের ওপর দিয়ে। একটা পরাজিত মানসিকতা তাকে সর্বদা তাড়া করে বেড়ায়।

মনে পড়ে এই সুনির্মলের গল্প শুনেই বরানগরের সাহিত্য আসরে একদিন কঠোর মন্তব্য করেছিল অতীন। সভায় উপস্থিত অনেকেই ওই মন্তব্যের জন্য সমালোচনা করেছিল তার।

কিন্তু সবাইকে অবাক করে হাসিমুখে সব মেনে নিয়েছিল সুনির্মল। প্রকাশ্যে বলেছিল অগ্রজ গল্পকারের মন্তব্য তাকে হতোদ্যম তো করেই নি, বরং ভবিষ্যতে ভাল লেখার প্রেরণা যুগিয়েছে।

ছেলেটির বিনয় দেখে সেদিন নিজেই লজ্জিত হয়েছিল অতীন। তাদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গিয়েছিল তারপর থেকেই।

জমিদার পরিবারের সন্তান হয়েও অতি সাধারণ জীবন যাপন করত সুনির্মল। স্ত্রী আর একমাত্র মেয়েকে নিয়ে পৈত্রিক বাড়ি ছেড়ে ভাড়া থাকত গঙ্গার ধারে একটা ছোট্ট ঘরে। কর্পোরেশনে কাজ করত। ওর আলমারিতে বইয়ের সংগ্রহ দেখে অবাক হয়েছিল অতীন। যদিও সুনির্মলের লেখা তাকে সেভাবে টানত না। তখনো কি জানত যে সেই সুনির্মলই একদিন...

লাইব্রেরি থেকে সুনির্মলের বাকি উপন্যাসগুলিও বাড়ি এনে পড়ে ফেলল অতীন আর অদিতি। প্রত্যেকটিই সমীহ জাগানো লেখা। একজন লেখকের চোখ দিয়ে খুঁটিয়ে পড়েও তেমন দুর্বলতা ধরা পড়ল না অতীনের চোখে। বিষয়-বক্তব্য দুই-ই অসাধারণ। অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাতের পাশাপাশি মানবিকতার দরদী চালচিত্র।

অতীন আর থাকতে পারে নি। অফিস থেকে বেরিয়ে একদিন সোজা চলে গিয়েছিল বরানগর। সুনির্মলকে পেয়ে গিয়েছিল লেখার টেবিলে। একটুও পাল্টায় নি। শুধু বয়সের ছাপ পড়েছে দু-চোখের কোলে। মাথার চুল সামনের দিকটায় বেশ পাতলা হয়েছে। ঘরের দারিদ্র্য আরো প্রকটভাবে ধরা পড়েছিল অতীনের চোখে।

প্রকাশকের তাগিদে তার সাম্প্রতিক উপন্যাসের লেখায় খুব ব্যস্ত ছিল সুনির্মল। তার মধ্যেই অতীনকে পেয়ে খুব খুশি হয়েছিল। যৌবনের প্রারম্ভে অতীন সেনের গল্প পড়েই যে তার লেখার প্রেরণা লাভ, একথা স্বীকার করতে সে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নি।

দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে অতীন ভাঙতে শুরু করেছিল। ভাঙনের দ্রুত ও অনিবার্য প্রভাবে অতীন নতুন করে খাতা কলম নিয়ে বসেছিল।

সুনির্মলকে সে কিছুতেই বিজয়ী হতে দেবে না। এই মুহূর্তে তার চাই একটা গল্প। যে গল্পে নিজের জাত চিনিয়ে দেবে অতীন সেন। তারপর ধীরে সুস্থে উপন্যাসে হাত দেওয়া।

আজ দশ দিন ধরে কঠিন প্রতিজ্ঞার ব্রতে নিজেকে নিয়োজিত করেও একটা গল্পের কাঠামো দাঁড় করানো গেল না। তবুও অতীনের স্থির বিশ্বাস, প্রতিভা কখনো মরে না। নিরলস শ্রম আর একাগ্রতার সমন্বয়ে তার বিচ্ছুরণ ঘটাতে পারে একজন প্রকৃত শিল্পীই।

কিন্তু অতীন কি জানে চলমান জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে শিল্পীর প্রতিভাও এক সময় স্থবির, বিকলাঙ্গ হয়ে যায়।

বোধহয় জানে না।

বিবাহবার্ষিকীর চল্লিশতম দিনটি

কিন্নর রায়

কলকাতা ভালো করে জেগে ওঠার আগে রোজ বেরিয়ে পড়েন অবিনাশ। প্রথম শীত-কুয়াশার সেলোফেন মোড়া রাতশেষের এ শহরকে তাঁর মনে হয় একটা কালো বাজহাঁস, ডানা মুড়ে পাখার ভেতর মুখ গুঁজে বসে ভোরের প্রতীক্ষায়। সকাল এলেই উড়ে যাবে আকাশে, পাখা ঝাপটে।

এবার শীত এখনও তেমন করে পড়েনি। রাস্তার ওপারে কালীঘাট ট্রাম গুমটির ভেতর সারবন্দী ট্রাম। ডিপোর দেয়ালে আলো আর আলো। ফুটপাথে, গাড়ি বারান্দার নিচে কুণ্ডলি পাকানো মানুষ, গায়ের ছেঁড়া কানি, পাশে টায়ারের নিভে আসা আগুন। আগুনের কাছাকাছি ল্যাজ-মুখ এককরা শীতে পাওয়া নেড়িকুকুর। বাতাসে পোড়া টায়ারের গন্ধ।

ট্রাম ডিপোর ট্রামগুলো এখনও একশো, দুশো বা পাঁচশো মিটার দৌড়ের প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়িয়ে। স্টার্টারের হুইসিল পেলেই, ছুটবে, ছুটবে। তাদের ঘণ্টা বাজবে টংলিংটং... টিং টিং...। এই ক'দিন আগে এরকম বেড়াতে যাওয়ার পথে অবিনাশ দেখেছিলেন দিনের প্রথম ট্রাম কুয়াশা আর অন্ধকার ছিঁড়ে লাইনের ওপর দিয়ে শীত লাগা কোনো মানুষের মতোই কাঁপতে কাঁপতে ছুটছে। কালীঘাট আর রাসবিহারীব মাঝামাঝি দাঁড়ানো অবিনাশ ভারি কাঁচের চশমার ভেতর দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন সেই জনমানবহীন ট্রামের ভেতর ওভারকোট আর মাফলার জড়ানো দু'জন কণ্ডাক্টার। ট্রামের কপালে কুয়াশালাগা আলো দেখতে দেখতে মনে পড়ে যাচ্ছিল গত মাসে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গোবিন্দপুর বাস স্ট্যাণ্ডে আসার সময় একক মানুষকে হেঁটে যেতে দেখেছিলেন। আকাশে তখন মেঘে খাওয়া চাঁদ। ঘষা রুপো রঙেব পাতলা জ্যোৎস্না চারপাশে। মানুষটির বাঁ হাতে লণ্ঠন। কোনো গরিব-গুরবো কেউ। গায়ে ধুতির খুঁট জড়ানো। অবিনাশ পেছন ফিরে দেখেছিলেন। মনে হচ্ছিল সেই ফাঁকা রাস্তায় লণ্ঠন হেঁটে যাচ্ছে। ট্রামের হেডলাইট, মাফলার, ওভারকোট মোড়া দু'জন কণ্ডাক্টর অবিনাশকে সেই মানুবটির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল, যার মুখ তিনি দেখতে পার্নানি। অথচ সে পাশ কাটিয়ে যাওযার পরপরই তার রোগা রোগা পায়ের ডিম দেখতে পেয়েছিলেন। সেখানে রোদ না লাগা গাছের পাতা রঙের মরাটে আলো লেপ্টে ছিল।

একটু আগে যে জায়গা মাড়িয়ে এলেন সেখানে কয়েকমাস আগেও দিনরাত পাতাল রেলের ঘট্রা ঘটাং ঘটাং, ঘটাং ঘটাং...। ওয়েলডিং বার্নারের নীলচে আলো, ইলেকট্রিক আলো আর গতর খাটানো লোকজন। নরম কাপড়ের জুতো পায়ে লেকের দিকে পা চালিয়ে দিতে দিতে অবিনাশ দেখতে পেলেন টালিগঞ্জের দিক থেকে আসা কয়েকজন হরিবোল দিতে দিতে কেওড়াতলাব রাস্তায় চলে গেল।

বাইশ মাস আগে মাঝারি স্ট্রোকের পর অবিনাশ নিয়ম করে সকালে বেড়ান। বর্ষা শীত গ্রীষ্ম— সব ঋতুতেই তিনি পদযাত্রী। দেড় মাস আগে ই.সি.জি. করিয়েছেন। রেখাচিত্র তাঁর হৃদয়কে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলেনি। অ্যাটাকের পর সিগারেট একেবারেই ছেড়েছেন। দিনে বারো চোদ্দ কাপ চা নেমেছে দুইয়ে। চিনি ছাড়া, দুধ ছাড়া লিকার। শুধু পাতিলেবু দিয়ে।

সকাল হওয়ার আগে রোজ যখন বেরোন তখন মাধুরীই একমাত্র ওঠেন দরজা বন্ধ করার জন্যে। প্রথম প্রথম দিন পনের মাধুরীও এসেছিলেন বেড়াতে। ওঁর ব্লাডসুগার কোলেস্টেরল দুটোই আছে। বেড়ালে উপকার হয়। কিন্তু অত সকালে হাঁটা পোষায় না মাধুরীর। মুটিয়ে যাচ্ছেন। সামান্য পরিশ্রম, উত্তেজনায় হাঁফান। অথচ মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করেননি, ভাতও না। আলুও খাবেন। আর বারবার পান-জর্দা।

দোতলা থেকে নেমে সামনের চিলতে বারান্দাটুকু পেরিয়ে অবিনাশ একবার ওপরে তাকিয়েছিলেন, তাঁর কাঁধ থেকে উলের চাদর আলগা হয়ে নেমে যাচ্ছিল। চাদর ঠিক করতে করতে অবিনাশ দেখতে পেলেন মিলির ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। কাল রাত ঠিক ক'টায় মিলি বাড়ি ফিরেছে অবিনাশ টের পাননি। বোধহয় ওর অফিসের গাড়ি নামিয়ে দিয়ে গেছে। অবিনাশ কাল দশটার খবরে শুনেছিলেন নিউ মার্কেটে আগুন লেগেছে, ভীষণ আগুন, আগের দিন রাত থেকে। মিলির নতুন ইংরেজি উইকলি, তাই কি ডিটেলে কোনো কাজ সেরে ফিরতে মিলির রাত গভীর। না কি অন্য কোনো কারণ।

কি ভাবতে গিয়ে অবিনাশ থমকে গেছিলেন। খোঁচা খেয়ে ফিরে এলেন মাধুরীর কথায়— আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন! বেরোতে হয় তো বেরোও, আমি দোর বন্ধ করি। গায়ের চাদর আনিনি, শীত লাগছে।

বারান্দার কম পাওয়ারের ডুমের আলো অবিনাশ চৌধুরীকে তাঁর চল্লিশ বছরের বিয়ে করা বৌকে চিনতে দিচ্ছিল না। মাধুরী এলোমেলো করে জড়ানো কাপড়ে লেপ তোশকের বস্তা হয়ে দাঁড়িয়ে। এমনিতেই মোটা, এখন আরও লাগছে। কোত্থেকে আসা একটুকরো চোরা শীতের বাতাস অবিনাশের কান কেটে বেরিয়ে গেল। নড়ে উঠতে উঠতে অবিনাশ দেখতে পেলেন শিউরে উঠল মাধুরীও। নিউ মার্কেটের আগুন মিলির দেরিতে ফেরা আর আর তার ঘরে এখনও জ্বলে থাকা আলো, মাধুরীর কাপড় জড়ানো কাঁপা শরীর দেখতে দেখতে অবিনাশ চৌধুরীর মনে পড়ে গেল আজ তেরই ডিসেম্বর, তাঁর ও মাধুরীর চল্লিশতম বিবাহবার্ষিকীর তারিখ। জিভের তলায় সরবিট্রেড দিয়ে রাস্তায় পা রাখতে রাখতে অবিনাশ খিল বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলেন।

বাড়িতে ফিরে চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ খেতে খেতে অবিনাশ দেখতে পেলেন একটি ইংরেজি দৈনিকের পাতা জোড়া নিউ মার্কেটের ছবি। হঠাৎ দেখলে মনে হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমা-খাওয়া কোনো শহর, কিংবা ইদানীংকালের বেইরুট।

ঘড়িতে সাতটা বাজে, মিলি এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। ওর পোষা জাম্বু কিন্তু বেরিয়ে এসেছে। ভোর হলেই বাইরে আসার জন্যে দরজা আঁচড়ায়। মিলি ওকে বের করে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ে। মাস সাতেক বয়েস হবে জাম্বুর। খুবই চঞ্চল। হাতিবাগান বাজার থেকে ওকে পাঁচ মাস আগে কিনে এনেছে মিলি।

কাগজ থেকে মুখ তুলে অবিনাশ দেখলেন চ্যাটালো স্টিলের বাটির ভেতর প্রায় মাথা ডুবিয়ে সাত মাসের বাঁদরটি চা খাচ্ছে। তার লম্বা ল্যাজ, সবুজ লোমে দক্ষিণ কলকাতার স্যাঁতা পড়া রোদ্দুর।

কাগজে মন ডোবাতে ডোবাতে অবিনাশ টের পেলেন জাম্বু তাঁর কাঁধের ওপর। পাতলা চুলের গভীরে জাম্বুর আঙুলেরা দ্রুত হাঁটছে। আরামে দু চোখ বুজে আসছে অবিনাশের। মাধুরী কলতলা থেকে বেরিয়ে এলেন। ঘড়িতে ঠিক সাতটা কুড়ি। আজ তেরই ডিসেম্বর। মাধুরী কি একবার চল্লিশ বছর পেছিয়ে যেতে পারে না! অথচ গতবারও তুমিই তো মাধুরী মনে করালে আমাদের বিয়ের দিনের কথা। আমি তো ভুলেই যাই, এসব ভুলে থাকি। গেলবার সুরঞ্জনের সঙ্গে মিলিও এসেছিল। ইভিনিং ডিউটি ছিল সুরঞ্জনের। রাইটার্সের প্রেস কর্নার থেকে সোজা এখানে। খুব সুন্দর নরম আর দামী কম্বল এনেছিল ওরা, ডবল বেডের, কম্বলের গায়ে আকাশের রং।

খেতে বসে মিলি হাসতে হাসতে বলেছিল, জানো বাবা, রঞ্জন না বিশ্বাসই করে না তোমরা এখনও এক বিছানায় শোও...। বাকিটুকু বলার আগেই সুরঞ্জনের ফর্সা মুখ লাল, —না, মানে আমি সেভাবে বলিনি কাকু। আপনি আর কাকিমা ডবল বেড কম্বলের নিচে শোবেন এ নিয়ে মিলিই কত রসিকতা করল, যদিও জিনিসটা ওরই পছন্দ।

বিয়ের অনেক আগে থেকেই বাড়িতে আসার সূত্রে সুরঞ্জন অবিনাশকে কাকু বলে। মাধুরীকে কাকিমা। ওদের বিয়ের বয়েস চার হতে চললেও সে ডাক বদলায়নি। আর যা নিয়ে মিল হাসাহাসি করত, তা হলো সুরঞ্জন প্রায়ই ওকে তুই বলে। কথা অন্যদিকে ঘোরানোর জন্যে সুরঞ্জন তাড়াতাড়ি বলেছিল, টক মাংসটা দারুণ হয়েছে কাকিমা। আমাকে আর একটু...।

আজ ন'মাস হতে চলল মিলি সুরঞ্জন ছাড়াছাড়ি। ডিভোর্স মামলার ফাইল গোছানোর তোড়জোড় চালাচ্ছে সুরঞ্জন। পেয়েও যাবে। অবিনাশ বুঝতে পারেন না কেন এই ফাটল। জার্নালিজমে এম.এ পড়তে পড়তে সুরঞ্জনের সঙ্গে আলাপ মিলির। পাশ করেই বড় কাগজের রিপোর্টারের চাকরি। সুরঞ্জনের খুব ভালো লেখা বেরিয়েছিল ওই কাগজে আর অন্য কাগজেও। একই ইয়ারে পাশ করল দু'জনে। সুরঞ্জনের একটুও পছন্দ ছিল না মিলি খবরের কাগজে আসুক। অথচ বিয়ের পর সুরঞ্জনকে ক্রমশ কম পাওয়া মিলি ক্রমেই একাকী আর রোখা হয়ে উঠছিল। তৈরি করে নিচ্ছিল নিজের জগৎ। গোপনে ছুরি শানাচ্ছিল ভেতরে ভেতরে। চাকরির দরখাস্ত করছিল।

তারপর ন'মাস আগে এক ভোরে বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেমেছিল। মিলি নেমেছিল। হাতে একটা বড় সুটকেস, কাঁধ-ঝোলায় কিছু বই। চুল এলোমেলো। চোখের নিচে ময়লা মতো রং। এর আগেও বার তিন-চার ভোরেই চলে এসেছে মিলে সুরঞ্জনের ফ্ল্যাট থেকে। তারপর হয় সুরঞ্জন এসেছে, নয় তার ফোন। এরপরই ভাবসাব। স্বাভাবিক জীবনযাপন। পর পর কয়েকদিন এখানেই থেকে যাওয়া সুরঞ্জনের। সকাল সকাল বাড়ি ফেরা। আড্ডা, টি.ভি., সিনেমা। কি যে মাথায় ভূত চাপে ওদের!

মাধুরী অবশ্য বলে, বাচ্চা-কাচ্চা না থাকলে এমনই হয় বাপু। বিয়ের দেড় বছরও যা হয় নি, আমার শাশুড়ি সবাইকে বলে বেড়াতেন বউ না কুমড়ো, ছেলেপুলের নামও নেই। তারপর সেই যেবার কেদারবদ্রী গেলেন বাবা-মা, সেবারই তো পেটে এলো বাবলু। তার তিন বছরের মাথায় বড় মেয়ে শেলু, তারপর আবার ছেলে— কাবলু। দুজনে এক বছরের পিঠোপিঠি। শেষে মিলি, কাবলুর থেকে সাত বছরের ছোট।

সেই যে মিলি সোজা ওপরে উঠে এলো, অবিনাশ তারপরই ক্রমে জানতে পারলেন মিলি আর সুরঞ্জনের কাছে ফিরে যাবে না। এ ব্যাপারে তিনি ও মাধুরী দু-একবার মুখোমুখি হয়েছেন মিলির। সেখানে প্রতিজ্ঞার পাঁচিল অনড়। সুরঞ্জনের দিক থেকেও কোনো শব্দ নেই।

কাগজ দেখে দেখে বিজ্ঞাপন ঘেঁটে একটার পর একটা দরখাস্ত দিয়ে গেছে মিলি। ওর পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ করেছে চাকরির জন্যে। অবশেষে এই দু বছর বয়েসী ইংরেজি সাপ্তাহিকটিতে করেসপনডেন্ট। এমন কিছু আহামরি মাইনে নয়, তবে চলে যায় ভালো মতন। চার মাস হয়ে গেল ওর এখানে। প্রবিশনারি পিরিয়ড চলছে। আরও দুমাস পর কনফারমেশন। তাই খাটনিও এখন প্রচুর, প্রায়ই রাত করে বাড়ি ফেরা। এর মধ্যেই বাইরে একটা ছোট ট্যুর করে এসেছে। অথচ এই রাতে ফেরা, হঠাৎ হঠাৎ ট্যুরে চলে যাওয়া, অন্য কোনো যোগাযোগ না রাখা— এসব নিয়েই সুরঞ্জনের কাছ থেকে সরে আসার সূত্রপাত মিলির। মিলি কি এভাবেই ফিরিয়ে দিতে চাইছে তার যাবতীয় অপমান সকলকে? সবাই কি শত্রু হয়ে উঠল তার?

ঘর থেকে চায়ের কাপ হাতে মিলি বেরিয়ে এলো। প্রায় আটটা। রোজকার থেকে একটু আগেই যেন মিলির উঠে আসা। জাম্বু ক্রমাগত ঘুরপাক খেয়ে রেলিংয়ে উঠে, নেমে, শব্দ করে, অবিনাশের পিঠে কাঁধে উঠে, মাথায় আঙুল নেড়ে কোথা দিয়ে যে সময় পার করে দিল!

চায়ের কাপ হাতে মিলিকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেই জাম্বু লক্ষ্মী ছেলে হয়ে অবিনাশের কাঁধ থেকে নিচে নেমে এলো। চোখ পিটপিট করে দেখতে লাগল মিলিকে। জাম্বু জানে মিলি একদম গায়ে ওঠা পছন্দ করে না।

অবিনাশ তাঁর পঁচিশ পেরনো মেয়ে মিলিকে দেখলেন। হাল্কা সাদা পাঞ্জাবি, তার ওপর পাতলা সুতির চাদর। রঙিন পায়জামা পরা, বয়েজ কাট চুল। চোখের কোলে ক্লান্তির রং। ঘর থেকে একটা প্লাস্টিকের লাঠি নিয়ে এসেছে মিলি। লাঠিটা জাম্বুর ঘাড়ের ওপর ফেলে ওপরের দুটো হাত তার ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে নিচের দু হাতে হাঁটা অভ্যাস করাবে। জাম্বু এতে রাজী হয় না। মার খায়। মার খেয়ে শব্দ করে। গা বেয়ে উঠতে চায় মিলির। মিলি ওকে ধমক দেয়। জাম্বু ঘাড়ে লাঠি ফেলে তার দু পাশ দিয়ে দুটো হাত ঝুলিয়ে অন্য দু হাতে হাঁটে। তারপর হঠাৎ লাঠিটা সোজা দাঁড় করিয়ে তাতে ভর দিয়ে ডিগবাজি খায়। একটু দূরে ছিটকে যায় লাঠি। জাম্বু পেছনের হাত দিয়ে ওটাকে টেনে আনে। মিলি বাটিতে ভেজানো ছোলা আনল। জাম্বু যত না খায়, ছড়ায় বেশি। গলার কাছে জমিয়ে রাখে খাবার। গলার ওপরে, চামড়ার নিচে সুপুরি যেন একটা।

মিলি চায়ের কাপ রেখে জাম্বুর হাত ধরে। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় নিউ মার্কেটে আগুনের খবর দেখতে দেখতে বলে— কাল যা হরিবল সিচুয়েশন। আর্মি নেমেছিল। কলকাতার ওয়াটার সাপ্লাই এত খারাপ, কোনো হাইড্রেনে জল নেই। কি আগুন, কি আগুন বাপরে! নিউ মার্কেটকে তো চেনাই যায় না, খালি পোড়া, ভাঙাচোরা স্ট্রাকচার, আর মাথার ওপর স্কাই। চারদিন বাদে আমাদের কাগজে ডিটেল বেরবে খবর। ইণ্ডিয়ায় আমাদের পিরিয়ডিকালেই ফার্স্ট—।

যদিও যাবতীয় কথা তাঁকে উদ্দেশ্য করেই, তবুও কোনো সম্বোধন না থাকায় অবিনাশ সামান্য দ্বিধায় ছিলেন জবাব দেয়ার ব্যাপারে। ইদানীং মিলির মেজাজ সর্বদাই উর্ধ্বমুখী। নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরেই যেন অবিনাশ হাওয়ায় কথা ছুঁড়লেন, তুই গেছিলি নাকি রিপোর্ট করতে?

হ্যাঁ, আমি আর অঞ্জু শর্মা। আমরা দুজনে স্টোরি-বিল্ড করলাম। ফটোগ্রাফার অভীক ছিল। দারুণ ঝুঁকি নিয়ে তুলেছে। অনেকগুলো কালার স্ন্যাপ নিয়েছে, ট্রান্সপারেন্সি। মলাটে যাবে, ভেতরেও। তাছাড়া প্রচুর ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট ছবিও থাকছে।

এই কথা বলার ফাঁকে জাম্বু মিলির গা বেয়ে মাথা ছুঁয়ে ফেলেছে। চুল এলোমেলো হচ্ছে তার আঙুলে। মিলি বিরক্ত হয়, জাম্বু দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে। গলা তুলে মাধুরীর কাছ থেকে দেশলাই চায় মিলি। অবিনাশ জেনে গেছেন মিলি সিগারেট নিয়ে বাথরুমে যায়।

দুই

এখন দুপুর। একটু আগে দিল্লি থেকে ট্রাঙ্কল এসেছিল। বড় ছেলে বাবলুর বৌ চিত্রলেখা ফোন করেছিল ওদের, একমাত্র মেয়ে সাত বছরের গুড্ডির সঙ্গেও কথা বললেন অবিনাশ। বাবলু এখন এদেশে নেই। অফিসের কাজে পশ্চিম জার্মানি। চিত্রলেখা তাঁর ও মাধুরীর চল্লিশতম বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানাল। গুড্ডি বলল, ওর মাম নাকি দারুণ একটা সোয়েটার বুনছে অবিনাশের জন্যে, ওরা যখন যাবে, নিয়ে যাবে।

অবিনাশ জানেন বিকেলে অফিস ফেরত আসবে নন্দিনী, কাবলুর বউ। শেলু ক'দিন আগে বেড়াতে গেছে বাইরে, না হলে সেও আসত। আজকাল কর্তব্য করে সকলেই, কিন্তু তার পেছনে কতটা হৃদয় আছে অবিনাশ জানেন না।

খবরের কাগজ হাতে বারান্দায় বসে রোদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অবিনাশের মনে পড়ে গেল বিয়ের পর পরই তারা দেওঘর গেছিলেন। ওঁর বাবার বন্ধু দুর্যোধনবাবুর বাড়ি ছিল সেখানে। মা-বাবা, কাকা-কাকিমা, অন্য ভাইবোনেরা সঙ্গে ছিল। পৌষ সংক্রান্তির দিন পিঠে। কলকাতা থেকে চারটে নারকেল নিয়ে গেছিলেন বাবা, আর খেজুর গুড়। দেওঘরের ক্ষীর আর নারকেলে যা পাটিসাপটা হয়েছিল অবিনাশ এখনও জিভে তার স্বাদ পান। কি বড় বড় বেগুন তখন দেওঘরে। রামদয়াল বলে একটা লোক বাড়ির উল্টোদিকে বেগুন ফলাত, টমাটোও। রামদয়াল ডাকাতি কেসে সাত বছর জেলে ছিল। দুর্যোধনবাবুর বাড়িতে তখন মিস্ত্রিরি খাটছে। একদিন হঠাৎ চুরি হয়ে গেল অবিনাশের বিয়েতে পাওয়া ওয়েস্ট এণ্ড ওয়াচ কোম্পানির ঘড়ি। খোঁজ খোঁজ। পাওয়া আর গেল না। শেষে সাত মাইল দূর থেকে আনা হলো এক তান্ত্রিক, নাম খর্পরিয়াবাবা। মোটাসোটা ফর্সা চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, হাতে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে সিঁদুর টিপ।

খর্পরিয়াবাবা এসেই খড়ি দিয়ে ঘর কেটে তাতে সিঁদুর ফোঁটা দিয়ে, জবা ফুল আর কড়ি রেখে বলল, ঘড়ি এখানেই আছে। আমি বন্ধন করে দিয়ে গেলাম। বাইরে যেতে পারবে না। আর তিন রাত্তিরের ভেতর যদি তুমি ঘড়ি ফেরত না পাও, তাহলে চোরের মুখ দিয়ে যাতে রক্ত ওঠে সেই ব্যবস্থা করব।

পাঁচটা ধূপ, পাঁচটা কড়ি আর পাঁচটা জবাফুল নিয়েছিল খর্পরিয়াবাবা। বাংলা-হিন্দি মেশানো আশ্চর্য কথা শুনতে শুনতে অবিনাশরা মুগ্ধ হয়েছিল। ও চলে যাওয়ার বার ঘণ্টার ভেতর বালির গাদা থেকে ঘড়ি বেরিয়েছিল। মজুরদের একটা ছোট ছেলে পেয়েছিল ঘড়ি। ঘড়ির ডায়ালে জল ঢুকে ছিল।

এসব এখন শুধুই স্মৃতি। মাধুরী আর তিনি বিয়ের ছ'মাস পর শুধু দু'জনে মিলে বেড়াতে গেছিলেন কাশী। তখন কেলনার আর বল্লভ দাসের ক্যাটারিং। কেলনারের খাবারের স্বাদ কি ভোলা যায়!

তখন এই বাড়ি থেকে কান পাতলে শীতের গভীর রাতে চিড়িয়াখানা থেকে ভেসে আসা বাঘের ডাক শোনা যেত। ইদানীং কি বাঘেরা আর ডাকে না! মনে পড়ল তিনি আর মাধুরী 'মুক্তি' দেখতে গিয়ে দুজনেই কেঁদেছিলেন। পঙ্কজ মল্লিকের গলায় 'দিনের

শেষে ঘুমের দেশে', আর বড়ুয়া-কাননের অভিনয়, এসব তো ভোলা যায় না। রবিন মজুমদারের গলায় 'এই কি গো শেষ গান বিরহ দিয়ে গেলে' শুনলে এখনও মন খারাপ হয় অবিনাশের।

এসব ভাবতে ভাবতেই ঘুমের গভীরে অবিনাশ। এবং তারপর বিকেল।

বিকেলে এক পাক বেড়িয়ে এসে বাড়ি ঢোকার মুখে নন্দিনীর গলা। টের পেলেন স্টোভ জ্বেলে চা করছে নন্দিনী। সেই চা খেলেন মাধুরী, অবিনাশ, নন্দিনী। সঙ্গে নন্দিনীর আনা নলেন গুড়ের সন্দেশ। তাঁদের এই চা-চক্রে হাজির ছিল জাম্বুও।

অফিস থেকে সোজা এসেছে নন্দিনী, বলল, কাবলুর ফিরতে রাত হবে, কি ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং আছে। ওদেব একমাত্র ছেলে সুরম্যকে বাড়ি যাওয়ার পথে ক্রেস থেকে নিয়ে যাবে নন্দিনী। রোজ অফিস যাওয়ার সময় দিয়ে যায়। দেশপ্রিয় পার্কের কাছে কাবলুর সুন্দর ফ্ল্যাট, সারাদিন সেখানে কেউ থাকে না।

একদিন সুরম্যকে নিয়ে এসো বৌমা। অনেকদিন ওকে দেখি না। বলতে গিয়েও আটকে গেল। অবিনাশ পারলেন না। তিনি জানেন এমন কথা মাধুরী বা নন্দিনী, কোনো একজনেরই অপছন্দ হতে পারে। নিজের অধিকার বোধটুকু ক্রমেই খুইয়ে ফেলছেন অবিনাশ।

রাতে গরম দুধ দিয়ে খই খেলেন অবিনাশ। সঙ্গে দুটো মর্তমান কলা। এই সাতষট্টিতে এসে মাঝে মধ্যেই রাতে এমন খান। অন্য দিনের তুলনায় সকাল সকালই ফিরেছে মিলি। সাড়ে আটটায় রাতের খাবাব খাচ্ছে তারা তিনজন— মাধুরী, অবিনাশ, মিলি। জাম্বু ঘুমিয়ে পড়েছে। সন্ধে হলেই কলা রুটি আর দুধ খেয়ে মিলির খাটের ছত্রীতে ঝুলে ঘুমোবে। কিছুতেই ওকে বিছানায় শোয়াতে পারে না মিলি। একটু আদর-টাদর খেয়ে নিয়ে ঠিক আবার ছত্রীতে উঠে পড়বে!

শোয়ার আগে শীত টের পেলেন অবিনাশ। আঁচিয়ে আসার পর মাধুরী তাঁর হাতে পান দিলেন। শুধু চুন, ছোট এলাচ আর সুপুরি। খয়ের নেই।

সুরঞ্জনের দেয়া আকাশ-রং কম্বলের নিচে শুলেন অবিনাশ। তাঁর পাশে মাধুরী। বেড সুইচ টিপে আলো নেভালেন। ঘরে এখন শুধুই টাইমপিসের শব্দ।

এক সময় মাধুরীও ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর বিশ্রি নাক ডাকার শব্দ শুনতে লাগলেন অবিনাশ।

বাইরের বারান্দায় টেবিলের ওপর একলা মিলি। তার সামনে রাজ্যের কাগজপত্র। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। গেলাসে জল ঢালার শব্দ পেলেন অবিনাশ। তারপর দেশলাই জ্বালার। মিলি বামে জল মেশাল, তারপর সিগারেট ধরিয়েছে।

এই শীত কামড়ানো রাতে মিলি কি একলা ঘরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে? এ ভয় কি শুধু কোনো নারীর, না একক মানুষের? মানুষ কি একা থাকলেই ভয় পায়?

অনেকটা সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর অবিনাশের ইচ্ছে হল উঠে গিয়ে মিলিকে বলেন, যা শুয়ে পড়, অনেক রাত হলো।

এর মধ্যে আরও দু'বার জল ঢালার শব্দ পেয়েছেন অবিনাশ। এসেছে দেশলাই জ্বালার আওয়াজ।

অবিনাশ উঠতে গিয়েও পারলেন না। হেরে যাওয়া ভিতু মানুষ যেমন কুঁকড়ে শুয়ে থাকে, তেমনই থাকলেন। ঘুমন্ত মাধুরীর একখানা হাত নিজের বুকের মধ্যিখানে নামিয়ে রাখতে রাখতে অবিনাশ ঘুমের প্রার্থনা করতে লাগলেন। দীর্ঘ ঘুমের।

সহজপাঠ

সুদেব সুন্দর মুখোপাধ্যায়

হাওড়া থেকে ডিহিভুরশুট্ হু হু বাস ছুটছে। শহর ছাড়িয়ে ক্রমশ গ্রামের চৌহদ্দিতে। দু-পাশের ধানক্ষেতের বুক চিরে পাকা সড়ক। সড়ক নয়, যেন ধর্ষিতা গ্রাম্য-বালিকা— বুক চিতিয়ে পড়ে রয়েছে। যাবতীয় গ্রাম্য-সম্পদের ইজ্জতের মতো এই পথেই দুহাতে লুঠছে। পাশে বসে অতনুকে গ্রাম সম্বন্ধে দীক্ষা দিচ্ছে উদয়। বললে—

— গ্রামের মানুষ সহজ সরল, বুঝলেন। আপনাদের শহরের মতো শয়তান নয়। অতনু বলে— সে আগে ছিল, এখন সবই সমান। এখন আর ও-কথা বলা যায় না।

— ইস্! মাইরি আর কী! এই তো দেখুন না—

স্বপক্ষে কী একটা অব্যর্থ প্রমাণ দাখিল করতে যাচ্ছিল উদয়, কণ্ডাক্টরের জন্য ছেদ পড়ল। কাছে এসে হাত বাড়িয়ে টিকিট চাইছে। উদয়কে দেখেই ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে সরে এল। এগিয়ে এসে অতনুর কাছে টিকিট চাইতেই উদয় অমনি নিজের বুকে হাত ঠেকিয়ে বললে— 'আমাব লোক'। কণ্ডাক্টর সরে গেল বটে, তবে ব্যাজার মুখ। অতনু তাড়াতাড়ি পকেটে হাত চালাতেই উদয় হাতটা চেপে ধরে বলল— ধ্যুস্, টিকিট কীসের! আমাদের টিকিট লাগে না।

— কেন!

— কেন কী আবার! নিক না পয়সা, বুঝবে ঠ্যালা। রুট পারমিট থেকে হ্যানাত্যানা সব কিছুর জন্যেই ওদের আমাদের কাছে আসতে হয়— তা জানেন!

উদয়ের বাবা অনাদি সরকারি কন্ট্রাক্টর! এছাড়াও জমি কেনা-বেচার ব্যবসা। দুটো বাস, লাইনে খাটছে। আগের বিডিও অর্চিতা মিত্র-র সঙ্গে অনাদির ঝামেলা হয়েছিল। অর্চিতা মিত্র-র দাপট খুব। মেয়েমানুষ এত দাপট কোথা থেকে পায় কে জানে! লঘু গুরু মানামানি নেই, মুড়ি-মিছরি একদর করে দিয়েছিল। কিছুতেই টোপ গিলত না। শালী যেন শোল মাছের পারা, মুখের মধ্যে টোপ সেঁধিয়ে দিলেও লেজ ঘুরিয়ে পালাত। তো এমন লোক নিয়ে কাজকর্ম চলে? ব্যবসা তো লাটে উঠবেই। তবুও মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল অনাদি। পেছন থেকে নিখিল সর্দার উস্কানি দিল, কান ভাঙাল। নিখিল সর্দারও পার্টির লোক, সম্প্রতি বিক্ষুব্ধ। একে রাম রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর! নিখিল সর্দারের উস্কানিতেই অর্চিতা মিত্র অনাদির তিন লাখ টাকার বিল চেপে দেওয়ার হুমকি দিল। তাতেই রক্ত চড়ে গেল—

বাড়ি এসে চুপিচুপি উদয়কে বলল— এই বিডিও-টা তেমন সুবিধের নয়, বুঝলি। একটু ত্যাঁদড় আছে। যত তাড়াতাড়ি পারিস এর গোড়া কেটে ফেলতে হবে। বান-মারা তালগাছ দেকিচিস? ভুঁয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—অথচ ভেতরটা ফাঁপা—সেইরকম আর কী! উদয় বলে— কেন, কী হল আবার!

— কী হয়নি তাই বল! এ থাকলে কন্ট্রাক্টরি ব্যবসা তো লাটে উঠবেই, চাই কি না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে। একে তাড়াতে হবে, কাজটা সেরে ফেল দিকিনি—দেখি কত বড় নেতা হয়েছিস তুই। দরকার হলে বলাইবাবুকে আমার কথা বলবি। বলাইবাবু ডিস্ট্রিক্ট কমিটির নেতা। অনাদির সঙ্গে খাতিরও খুব। উদয় বলাইবাবুকে গিয়ে ধরল। বলাইবাবু উদয়কে স্নেহের চোখে দেখেন। নিজের হাতে পার্টিতে এনেছেন। মনে মনে আলাদা ইচ্ছেও আছে। মা-মরা মেয়েটাকে ওই উদয়ের সঙ্গেই...। বলাইবাবুর সঙ্গেও অর্চিতা মিত্র-র ঝামেলা হয়েছিল। রাগটা ছিলই, শুধু সময়ের অপেক্ষা। বলাইবাবু সব শুনে বললেন— তোমার বাবাকে আমার প্রণাম জানিয়ে বোলো বলাইবাবু চিন্তা করতে না করেছেন। উনি বুড়ো মানুষ কেন শুধু শুধু—। কাল আমি কলকাতা যাব, রাইটার্স বিল্ডিং। তুমিও থেকো আমার সঙ্গে, পরিচয় করিয়ে দেব সবার সঙ্গে। রাজনীতিতে এটুকু ভীষণ জরুরি।

বিডিও অফিসের গায়ে বাঁশের খুঁটিতে এখনো পোস্টার ঝুলছে— 'অর্চিতা মিত্র গো-ব্যাক্। অত্যাচারী আমলাশাহী নিপাত যাক্। ডাউন ডাউন অ্যান্টিপিপল্ পলিসি— ডাউন ডাউন।'

যা করবার সবই বলাইবাবু করেছেন। মাসখানেক ধরে রাইটার্সে ধর্না দেওয়া, তদ্বির তদারকি করা— সব। উদয় শুধু সঙ্গে থেকেছে মাত্র। তা রাইটার্সে বলাইবাবুর খাতিরও দেখেছে উদয়। সেই বাচ্চারা যেমন করে ছড়া কাটে— এলাটিং বেলাটিং সই লো, কীসের খবর আইল? বলাইবাবুও রাইটার্সে গিয়ে অনেকটা সেইরকম ভাবেই বলেছে— রাজা একটি বিডিও চাইল। কোন্ বিডিও চাইল? অতনু-বিডিও চাইল।

— তথাস্তু।

অতনু বলাইবাবুর ভাগ্নে। চোদ্দ বছর বয়সে যখন বাবা মারা যায় তখন থেকে ঐ মামার গার্জেনশিপেই পড়াশুনা। ট্রান্সফার শুনেই বিদিশা হাজার রাগারাগি করলেও মামার মুখের ওপর অতনু তাই একটা কথাও বলতে পারেনি। ছ-বছর উত্তরবঙ্গে পোস্টিং ছিল, সবে বছরখানেক হল কলকাতার কাছাকাছি বদলি হয়ে ফিরেছিল। আজ আবার...।

সেই অতনু বিডিওকে সঙ্গে নিয়ে উদয় গ্রামে ফিরছে। উদয় যেন ভগীরথ— সঙ্গে করে গঙ্গা আনছে।

বলাইবাবু বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, এই অতনুর সঙ্গে যে আমাদের পূর্ব সম্পর্ক আছে এ-কথা চাউর করার দরকার নেই। যে জানে, সে জানে। অতনুর তাই আলাদা থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। বাসস্ট্যাণ্ড বাজারে অনাদির আর একটা দোতলা বাড়ি আছে। একতলায় সব দোকান ভাড়া। দোতলায় অতনু থাকবে। শুধু জল তোলা, বাসন মাজা আর ঝাঁট দেওয়ার জন্য একটা কাজের লোক দরকার— সেইসঙ্গে রান্নাটাও। উদয় সে ভরসাও দিয়ে রেখেছে অতনুকে। এখন শুধু থিতু হওয়ার পালা।

অতনুর দৃষ্টি বাসের জানলা গলে সুদূরে বিলীন। মনটাও খিঁচিয়ে রয়েছে বিদিশার কারণে। বিদিশা রইল তার চাকরি আর সংসার নিয়ে কলকাতায়। অতনুকে চলে আসতে হয়েছে। ফের ট্রান্সফার শুনেই বিদিশা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছে— একবছরে দু-বার ট্রান্সফার! কী ভাবে কী তোমাদের! কেনা গোলাম! একে তো সরকারি চাকরিতে সুখ কত। বি সি এস অফিসার হয়ে পঞ্চায়েতের অশিক্ষিত অল্পশিক্ষিত নেতাদের হুকুম তালিম করা। তার ওপর আজ এখানে, কাল সেখানে— দরকার নেই অমন গোলামির। আর সত্যি কথাটা বিদিশার কাছেও গোপন করে গেছে অতনু। না করে উপায়ও ছিল না। এই ট্রান্সফারের পেছনে যে ওর মামার হাত ষোলআনা সেকথা বিদিশা জানে না। জানলে আরও বেশি রি-অ্যাক্ট করত।

উল্টোদিক থেকে আলু-বোঝাই লরি হুস্ হুস্ বেরিয়ে যাচ্ছে শহরের কোল্ড-স্টোরেজে। আবার এই পথেই গ্রামের বাজারে ফিরবে। অতনুর মন থেকে শহর মুছে দিয়ে তাকে গ্রামে ফেরাচ্ছে উদয়। বলল— ওই দেখুন আখ। এ জেলায় আখ চাষটাও বেশি। চলুন না আপনাকে চাষীর বাড়ি আখ খাওয়াব— কত খেতে পারেন দেখব। অতনু ভাবল, সেই আখ খাওয়াটাও কি কণ্ডাক্টরকে ক্ষমতার বুড়ো-আঙুল দেখানোর মতো হবে নাকি! কে জানে! গ্রাম্য সরলতার সে কতটুকুই বা বোঝে। ঠিক তখনই ভিড় একটু পাতলা হলে কণ্ডাক্টব ফিরে এসে বলল— ও উদয়দা, খপর শুনিচ? গেরামে পুলিশ ঘুরছে, যাকে পাচ্ছে তাকেই তুলে নিয়ে যাচ্ছে— খুব হুজ্জোতি গো! উদয় মাত্র তিনদিন গ্রামে ছিল না। তাই অবাক হয়ে বলল— কেন পুলিস কেন?

ধান কাটার মারামারি হয়েছে। সেই যে গো ধনা-মোনার কেস্। একজমি দু-বার বেচার ঝ্যামিলি—

ধনা মোনার কেস শুনেই গুটিয়ে গেল উদয়। কেননা মোনাকে জমিটা বেচেছিল তার বাবা অনাদি। কাকাদের কিছু না জানিয়ে বেচে দিয়েছিল। খবর পেয়ে কাকারাও তাদের অংশ ফের ধনাকে বেচে দিল। ফেঁসে গিয়ে ধনা মোনা পঞ্চায়েত করল। সেই নিয়ে আজ দু-বছর পঞ্চায়েত চলছে। পঞ্চায়েতের শ্যাম রাখি না কুল রাখি আবস্থা। ধনাকেও না, মোনাকেও না— কাউকে চটাতে চায়নি। আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাব না— গোছের ভাব। মাঝের থেকে বিডিও-কে রিসিভার করে ঝুলিয়ে রেখেছিল। একজমি দু-বার বেচার ঝামেলাটা তার বাবার তৈরি, উদয় তাই শুনেই চুপ করে যায়। ওপর থেকে থুথু ছুঁড়লে নিজের মুখেই পড়বে। কিন্তু কণ্ডাক্টরের সে বালাই নেই। বরং সত্যি ঘটনা বর্ণনার মধ্যে কেমন একটা বাড়তি উৎসাহ টের পাওয়া যাচ্ছে। হাতি কাদায় পড়লে ব্যাঙের যে খুশি— সেই খুশি খেলে বেড়াচ্ছে চোখে মুখে। বলল— গেলবার ধনা রুয়েছিল, মোনা ধান কেটে নিয়েছিল। এবছর ধনা তাই দিনদুপুরে পঞ্চাশজন মজুর লাগিয়ে সব ধান কেটে সাফ করে দিয়েছে। পার্টি কিংবা পঞ্চায়েতের তোয়াক্কা করেনি। খবর পেয়ে বলাইবাবুও দলবল নিয়ে চড়াও হয়েছিল। বলল— চালাও লাঠি! তা ধনা তার আগেই মজুরদের মদ আর টাকা খাইয়ে রেডি রেখেছিল। তারাও সব লঙ্কা-গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে লাঠির ওপর লাঠি চালাল। সেই লাঠি খেয়ে নিমাই পাগলা হাসপাতালে। এখন তখন অবস্থা চলছিল— আজ সকালে মারা গেছে। গ্রামে তাই পুলিশ ঘুরছে, যাকে পাচ্ছে তাকেই তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

— নিমাই কি করতে গেসল ওদের মধ্যে? ও-তো পাগল ছাগল মানুষ! ও কেন—

— নিমাই পাগলা আশুদতলায় বসে 'এই পথ যদি না শেষ হয়'করছিল, 'তুমি আর আমি শুধু জীবনের খেলাঘর' করছিল। লাঠালাঠি দেখে সেইদিকেই ছুটল। ও নাকি থামাতে চেষ্টা করছিল— সবাই দেখেছে, তবুও মরল।

ধনাকে মার্ডার কেসে জব্দ করতে ইচ্ছে করেই নিমাই পাগলাকে মেরে দিয়েছে। নইলে ওর মরার কথা নয়। নিমাই পাগলার মা সেই থেকে কেঁদে কেঁদে গেরাম তোলপাড় করছে। সে দিশ্য তুমি সইতে পারবে নি গো উদয়দা— মাইরি বলতেছি।

. নিমাই পাগলার মায়ের কথা শুনে আর একজনের কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে উদয়ের। সে নিমাইয়ের বোন ঝাঁপি। ঝাঁপির বিয়ে হয়েছিল, বাঁজা বলে স্বামী বসিয়ে দিয়ে গিয়ে আবার বিয়ে করেছে। মা-মেয়ে দুজনেই উদয়দের বাড়ি কাজ করে। গরু বাছুর দেখে, ধান সেদ্ধ করে, ঘুঁটে গোবর দেয়। ওই ঝাঁপিকেই উদয় অতনুর বাসায় ফিট্ করে দেবে মনে মনে ঠিক করে রেখেছে। নিমাই পাগল হোক, ছাঁগল হোক— তবু তো একটা

পুরুষ ছিল সংসারে। এখন তাও রইল না। ধনার ওপরেই রাগ জমছে। বলল— তা ধনাই বা ধান কাটতে গেল কেন? ও জমিতে তো বিডিও রিসিভার ছিল।

— বিডিও নাকি ধনাকে ধান কাটতে বলে গেছে। ধনা তো সেই কথাই বলে বেড়াচ্ছে সব্বাইকে।

মুহূর্তে উদয় বুঝে নিল একটা আসলে অর্চিতা মিত্র-র চালাকি। যাওয়ার আগে মরণ কামড় দিয়ে গেছে। এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছে— বলাইবাবুকে, সেইসঙ্গে তার বাবা অনাদিকেও। এর পেছনে নিশ্চয়ই নিখিল সর্দারের সর্দারি। ওই উস্কানি দিয়েছে। নইলে মজুরদের এত সাহস! পার্টির মাথায় লাঠি!

পাশে বসে অতনু এতক্ষণ সমস্ত ঘটনার মধ্যে দিয়ে গ্রাম্য-সরলতাটুকু খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। শুনতে শুনতে মনে হল, অভিমন্যুর মতো সেও আর এক চক্রব্যূহে পা বাড়াচ্ছে। আর সেই চক্রব্যূহে টেনে আনছে তাকে তার মামা— বলাইবাবু। যেমন করে অভিমন্যুকে ঠেলে দিয়েছিল তার পিতৃব্যরা। এর থেকে বের হওয়ার রাস্তাটা অন্তত জেনে রাখা দরকার।

(২)

উদয় বাড়ি এসে দেখল তাদের সদরে পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে, জিপের চারপাশে লোকে লোকারণ্য। পুলিশ এসেছে, তাই সব মজা দেখতে ভিড় জমিয়েছে। এখানেও সেই হাতি কাদায় পড়ার আনন্দ। উদয়কে আসতে দেখেই অনাদি কোথা ছেকে ছুটে এসে বলল— এসে গেছিস! ভালো হয়েছে। চট্ করে একবার বলাইবাবুকে ধরে নিয়ে আয় দিকি। বলবি, পুলিশ এসেছে, বাবা আপনাকে ডাকছে। ধরে আনতেই হবে, নইলে পুলিশ আবার কী ফ্যাসাদে জড়ায় কে জানে! উদয় বিরক্ত হয়ে বলল— তোমার জন্যেই তো। তুমিই তো ফ্যাচাংটা বাধালে। কী দরকার ছিল তোমার কাকাদের অংশ বেচে দেওয়ার? এখন নাও ঠ্যালা সামলাও।

আরে ছুঁচো! আমি যখন প্যান্টুলুন্ বানিয়েছি তখন কী পেচ্ছাপের জায়গা না রেখেছি? তুই অত ঘাবড়াচ্ছিস্ কেন? বলাইবাবুকে ধরে পুলিসকে তো আগে ঠেকাই— তারপর দেখা যাবে। যা চট্ করে চলে যা। বলবি, জলদি জলদি। উদয়কে যেতেই হল, অনাদি ফিরে এসে পুলিশকে বলল— 'সদরে কেন স্যার! অন্দরে চলুন, পাখার তলায় বসে না হয়—।

এই ঝাঁপি দৌড়ে যা, স্যারদের জন্য চার প্লেট—।'

মিষ্টি জল এল, ঝাঁপিই বয়ে নিয়ে এল। ঝাঁপিকে দেখিয়ে অনাদি বলল— এই যে স্যার ঝাঁপি— নিমাই পাগলার বোন। স্বামী নেই, কেউ নেই, কেবল ঐ পাগলা দাদা ছিল। তা সেও গেল, এখন তবে ওরা যায় কোথায়। আমি বলেছি— থাক তুই, তোকে আর তোর মা-কে আমি দেখব। কোথাও যেতে হবে না তোদের। তবে দেখবেন স্যার গরিবমানুষ, ঠিকমতো যেন বিচারটা পায় অন্তত। পুলিশ অফিসার বলল— একজমি দুবার বেচার জন্যেই যত গণ্ডগোল। কেন বেচতে গেলেন আপনি?

— না স্যার, দুবার কেন বেচব! একবারই বেচেছি মোনাকে, ধনাকে জমি আমি বেচিনি। ওই তো ধনা দাঁড়িয়ে রয়েছে, জিগ্যেস করুন ওকে—।

— আপনি বেচলেন মোনাকে, আপনার ভাইরা বেচল ধনাকে। তাতেই তো—

— তাহলে স্যার তার দায় আমার ঘাড়ে কেন? আমি তো আগে বেচেছি। পরে ধনা যখন কিনল, তারই তো খোঁজ করা উচিত ছিল— চুকে যেত ল্যাঠা। তা ধনা একবার লেজ তুলেও দেখল না, এঁড়ে কী বকনা।

— আপনি ভাইদের জমিই বা বেচতে গেলেন কেন?

— না স্যার, ওটা ভাইদের নয়, আমারই। ভাইদের কোনো অংশ নেই ওর মধ্যে। ভাইরা অমনি প্রতিবাদ করে বলল— পৈতৃক জমি। আমাদের অংশ নেই মানে? বললেই হল। অনাদি অনুগতের ভঙ্গিতে আরও বিনয়ী হল। হাত জড়ো করে বলল— ধর্মসাক্ষী স্যার, মিথ্যে বলব না। শেষ বয়সে মা আমার অনেক দুঃখ নিয়ে মরেছে। অন্য ছেলেরা কেউ ফিরেও চেয়ে দেখত না, খোঁজ খবরও নিত না। মা তাই নিয়ে বার্তদিন আমাব কাছে অনেক কান্নাকাটি করেছে। ও জমিটা মা তাই আমার নামে দানপত্তর করে দলিল করে দিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে বলাইবাবু এসে বললেন— কী ব্যাপার! দাঙ্গা হল মাঠে, পুলিশ গেল ঘাটে— এও যে দেখছি তাই! পুলিশ অফিসার বলল— আজ্ঞে, পুলিশের কাজই তো ওই, সেইজন্যেই তদন্ত। তা উনি যখন বলছেন ওনার নামে দলিল, তখন তার ফয়সালা করবে কোর্ট— আমরা না। আমরা শুধু রিপোর্ট লিখে ছেড়ে দেব।

— কি রিপোর্ট লিখবেনটা শুনি? ঘটনার আসল বহস্যটা জানেন? কিছুই তো জানেন না। জানতে হলে আরও গভীরে ঢুকতে হবে। আসল আসামী খুঁজে বাব করতে হবে— আসুন আমার সঙ্গে।

বলাইবাবু পুলিশকে নিয়ে বাড়িব ভেতর চলে গেলেন। খানিক পরে ফিরে গেল পুলিশ। যাবার আগে নিখিল মাস্টারের ভাই বনমালি সর্দাবেব রাঙ্ঝালের দোকানে দাঁড়িয়ে ভাঙচুর করল। বলল-- পালিয়ে বাঁচবে কোথায়! কান টানলেই মাথা আসবে— আসতে বাধ্য।

নিখিল মাস্টার তখন 'রসিদপুব বিদ্যামন্দির'-এর ক্লাস ইলেভেনে 'দাস ক্যাপিটাল' বোঝাচ্ছিল। সিলেবাস-বহির্ভূত। পূর্ব ইউরোপ ভেঙে তছনছ্ হয়ে গেলেও মাস্টারের বিশ্বাসে কোনো ফাঁকি ছিল না। বলে, প্রয়োগ পদ্ধতিতে ভুল থার্কতে পারে, সমাজতান্ত্রিকতায় কোনো ভুল নাই— এটুকু জানবি। তিরিশ বছর পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী ছিল। পার্টির জন্যেই কোনোদিন বিয়ে করে ঘরসংসার করা হল না! শুধু স্বপ্ন দেখত, দেখাতও। সাতাত্তরে সেই স্বপ্ন চারিয়ে দিয়েছিল মানুষের বুকেব মধ্যে। তারপর সব কেমন পাল্টে গেল। চোখের সামনে বেনামি জমি ভেস্ট্ হতে দেখল। আবার সেই ভেস্টেড্ জমি বিক্রি হয়ে যেতেও দেখল। প্রতিবাদ করতেই কোণঠাসা। ক্ষুব্ধ হয়ে তাই পার্টি ছেড়ে দিয়েছে, তবু স্বপ্ন দেখা ছাড়তে পারেনি। তরুণতর ছাত্রদের মনে আজও স্বপ্নের ফুল ফোটাচ্ছে। খবর পেয়েই ছেঁড়া চটি ফাটা পাঞ্জাবির নিখিল মাস্টার দৌড়ে এল। বলল— 'কী ব্যাপার?' 'না, আপনার বিরুদ্ধে মার্ডার কেসের এফ আই আর আছে— ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট্।' নিখিল মাস্টার মুচকি হেসে বলল— 'কেউটে ধরাব মুরোদ নেই, হেলে ধরতে চায়। নিমাই পাগলাকে সরিয়েছে, এবার আমাকেও..।'

পাবলিক আর ছাত্ররা মিলে হুজ্জোতি করল। কিছুতেই অ্যারেস্ট করতে দিল না মাস্টারকে। বাধ্য হয়েই ফিরে গেল পুলিশ।

পরের দিন থানায় ত্রিপাক্ষিক মিটিং-এর নাম করে এসে জিপে করে তুলে নিয়ে গিয়ে কার্যত অ্যারেস্ট করল। কোর্টে হাজির করে মার্ডার কেসের চার্জে ফেলে হাজতে পুবল। মহকুমা জেলের জেলার নিখিল মাস্টারকে ফাটকে ভরে দিতে দিতে শেষবারের

মতো পেছন ফিরে বলল— 'ভালো চাস তো এখনো পাঁচশো টাকা ছাড়— জামাই আদরে রাখব। নইলে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেব।'

নিখিল সর্দার হাত জোড় করে বলল— 'স্যার! আমি একজন শিক্ষক— আসামী নই। একজন শিক্ষকের সম্মান—'

— ওরে শুয়োরের বাচ্চা! আবার মাস্টারি মারাচ্ছে। তোর মাস্টারির ইয়ে করি আমি, তা জানিস? দাঁড়া দেখাচ্ছি। নগেন! এই নগেন, এদিকে আয়—।

নগেন ক্রিমিনালদের সর্দার। তিনটে মার্ডার, চারটে ডাকাতি ও দুটো রেপ্‌কেসের আসামী হয়ে যাবজ্জীবন সাব্যস্ত। তাগড়াই চেহারাব নগেন এসে বলল— ডাকছেন হুজুর?

— হ্যাঁ শোন, এটাকে আচ্ছা করে ধোলাই দে। যতক্ষণ না টাকা ছাড়তে রাজি হচ্ছে, চালিয়ে যাবি। আমি আধঘণ্টা পরে ঘুরে আসছি।

নগেনের কাছে জেলারের যা হুকুম— তাই তামিল। নগেন কলার ধরে নিখিল সর্দারের মুখে মারল এক ঘুষি। নিখিল সর্দার ছিটকে গিয়ে পড়ল মাটিতে। নাক মুখ দিয়ে রক্ত গড়াতে লাগল— চোখে অন্ধকার। তার ওপর নগেনের ঘুষির বৃষ্টি। আধঘণ্টার আগেই জেলার ফিরে এল— কীরে! বাজি হয়েছে?

— না স্যার, ঘুঘু মাল আছে— কিছুতেই হ্যাঁ বলছে না। শালা আমার চেয়েও দাগী।

— ছাড়বি না. চালিয়ে যা। দরকার হলে তোদের ক্রিমিনালদের থার্ড ডিগ্রি চালাবি। শালার মাস্টারি ঘুচিয়ে দিবি জন্মের মতো— আমি ফের আসব। নগেন এগিয়ে এসে নিখিল সর্দারকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে দিতেই শুরু হল ক্রিমিনালদের থার্ড ডিগ্রি। নিখিল মাস্টার শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করল। নিখিল মাস্টার যদি দ্রৌপদি হত, তাহলে এই মুহূর্তে চিৎকার করে বলত— হে নারায়ণ! হে মধুসূদন! কোথা তুমি দর্পহারী— বিপন্নকে রক্ষা করো। কিন্তু নিখিল মাস্টার কোনোদিন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেনি। তার বদলে মানুষকে বিশ্বাস করত। মানুষ মানে দলীয় সহকর্মী বলাইবাবু— মানে জেলার— মানে যাবজ্জীবন আসামী নগেন। লজ্জা ঢাকতে তাই প্রাণপণে প্রার্থনা করল— চেতনা আচ্ছন্ন হোক, গাঢ় অন্ধকার নেমে আসুক পৃথিবীর বুকে— আর যেন সূর্যোদয় না হয়।

এই ক-দিন অতনু অনেক কিছুই জেনেছে। জেনেছে ফাইলে চোখ বুলিয়ে। নিখিল সর্দাবের হাজার লোকের সই করা প্রতিবাদপত্রও পড়ে দেখেছে— ফাইলে নথিবদ্ধ আছে। সবথেকে বেশি জেনেছে ঝাঁপির কাছ থেকে। ঝাঁপিকে পরের দিনই অতনুর বাসায় ফিট করে দিয়েছে উদয়। ঝাঁপি এখন দু-বাড়ি সামলায়। প্রথম প্রথম ঝাঁপি কিছুতেই মুখ খুলতে সাহস করত না অতনুর কাছে। কেমন ভয়ে ভয়ে গুটিয়ে থাকত। আস্তে আস্তে সাহস পাচ্ছে, মুখ খুলছে। তবে সর্বদাই তটস্থ। আর কিছু কিছু জেনেছে মামাতো বোন মুনমুনের কাছ থেকে— তবে সে তেমন কিছু নয়। প্রথমদিন মুনমুন দুঃখ করে বলেছিল— মামার বাড়ি থাকতে বাসাবাড়ি! তুমি কী গো অন্তুদা। আমরা কি মরে গেছি? না হয় মামিমা নেই, মা থাকলে কি তোমায়...। চোখটা ছলছলিয়ে উঠল। মাঝে মাঝেই তাই মুনমুনের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হয়। কখনও কখনও মুনমুনও আসে তার বাসায়। এসে খোঁজখবর করে, এটা ওটা রান্না করে খাওয়ায়। বিদিশাকে চিঠিতে সে কথা জানিয়েছে অতনু। বিদিশা তার কোনো উত্তর দেয়নি। এখনো কি রেগে আছে বিদিশা? কে জানে!

অনাদি একদিন অফিসে দেখা করতে এল। অতনু খাতির করে বসিয়ে বলল— 'কংক্রিট্ প্রোডাক্টসের' মালিক কে, আপনি? অনাদি বলল— হ্যাঁ স্যার, নমস্কার। আপনি বলাইবাবুর ভাগ্নে, সেই সুবাদে স্যার আমাদেরও ভাগ্নে জানবেন। বলুন, নতুন জায়গা কেমন লাগছে! অতনু 'ভালো তো' বলে কাজের কথায় ফিরল, বলল— গাজিপুরের ব্রিজ কে করেছে, আপনি?

— আজ্ঞে হ্যাঁ— এনি ফল্ট্ স্যার?

— নতুনপল্লীর প্রাইমারি?

— আজ্ঞে আমি।

— আমতা-ডিহিভুরশুট্ বাস রুট?

— আজ্ঞে আমি— ফি বছর আমিই করে থাকি ওটা।

— আর জাঙ্গীপাড়া মিনি মার্কেট?

— সেও আমি স্যার, কেন?

— সবই তো আপনি দেখছি, আর কোনো কন্ট্রাক্টর নেই?

— ওই দেখুন, থাকবে না কেন! তবে পুঁজিতে কুলিয়ে উঠতে পারে না। আপনার বাপ মায়ের আশীর্বাদ স্যার—

— উদয়বাবু কে হয় আপনার?

অনাদি থমকাল। ঢোঁক গিলে বলল— আজ্ঞে স্যার, ছেলে। তবে বাপ-বেটা হলে কী হবে, বিজনেস আলাদা। আমার যদি কন্ট্রাক্টরি তো তেনার হল পলিটিক্স। কেউ কারও বিজনেসে নাক গলাই না।

— আলাদা থাকেন, নাকি একই বাড়ি?

— নাহ্ স্যার, একই বাড়িতে। গরিবের বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে স্যার, তা বলে রাখছি কিন্তু। এটা আব্দার জানবেন— না বললে শুনছি না।

— কী করে আপনার ছেলে?

— কী করবে আর! চাকরি বাকরি তো কিছুই হল না। বাধ্য হয়ে তাই রাজনীতিতে নামল। অতনু চমকাল! রাজনীতি তাহলে কিছু না হওয়ার বিকল্প! এবং সে কথা উচ্চারণেও কোনো সংকোচ নেই। এই কি তবে গ্রাম্য-সরলতা— বাসের মধ্যে উদয় যা তাকে ভেঙে ভেঙে বোঝাতে চাইছিল? হঠাৎ তারই মাঝে অনাদি টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল— রসিদপুরের খাল-কাটার বিলটা স্যার আটকে আছে— দু মাস হতে চলল। একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। অতনু বলল— ওটা হবে না, গণ্ডগোল আছে। আমি নোট দিয়ে ফাইল ক্লোজ্ করে দেব— আমার কিছু করার নেই। অনাদি অমনি হুমড়ি খেয়ে অতনুর হাত দুটো ধরে বলল— মরে যাব স্যার। ধনে প্রাণে মরে যাব— তিন লাখ টাকার বিল! কথা দিচ্ছি স্যার, আমিও আপনার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করব—

অতনু রেগেমেগে আঙুল তুলে বলল— বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান বলছি। সেদিনই বলাইবাবু অতনুকে বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে বললেন— তুমি অনাদিবাবুকে কী বলেছ? রসিদপুরের খাল-কাটার বিল আটকে দিয়ে ফাইল ক্লোজ করে দেবে?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। ওতে অনেক গণ্ডগোল আছে। আমি দেখেছি মামা—

— কী গণ্ডগোল?

— আজ্ঞে ইউটিলাইজেশন্ সার্টিফিকেট প্রডিউস্ করেনি। আগের বিডিও' নোট দিয়ে গেছে।

— ওটা অর্চিতা মিত্র-র চালাকি। সার্টিফিকেটটা সরিয়ে ফেলেছে— ইচ্ছে করে হ্যারাস করছে। বেশ, ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট পেয়ে যাবে।

— কিন্তু মামা—

— কোনো কিন্তু নেই। তোমাকে একটা কথা জানিয়ে রাখি অতনু। এই আষাঢ়ে মুনুর সঙ্গে উদয়ের বিয়ের পাকা কথা হয়ে রয়েছে। তোমার কারণে বিলটা আটকে গেলে মুনুর বিয়েটাও আটকে যাবে। তুমি নিশ্চই চাইবে না মা-মরা মামাতো বোনটার ক্ষতি হোক! বিলটা ছেড়ে দিও।

আজও অতনু মামার মুখের ওপর মুখ তুলে তেমন কোনো কথাই বলতে পারল না। কেবল বাসায় ফিরে ঝাঁপিকে ডেকে বলল— নিতাই পাগলা কেন মরল বলতে পারিস ঝাঁপি? তোর তো দাদা হয়! ঝাঁপি বলল— মরণের ডানা গজিয়েছিল পাগলার, সেই তরেই মরল, খালি গান আর গান। রেডিওর গান, কলের গান— আরও কত কী! ওই গানেই মরণ ডেকে আনল তারই।

— কেন!

— সে অনেক বিত্তান্ত। পাগলার গানের খাতা আছে একটা,আপনাকে দুবো, তালেই বুঝে যাবেন সঅব।

সেই খাতা এনে ঝাঁপি অতনুর হাতে তুলে দিতেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে অতনু। 'এই পথ যদি না শেষ হয়' আছে, 'জীবনের খেলাঘর' আছে, 'ও কোকিলা' আছে, তবে কোনোটাই আস্ত নয়। বলল— কতদূর পড়েছিল তোর দাদা? ঝাঁপি বলল— আট কেলাস। তাপ্পরে মাথাটা কেমুন পাগলের মতো হয়ে যেতে আর পড়তে পারেনি। শেষপাতা উল্টে অতনুর চোখ আটকে গেল। 'রসিদপুরের খাল-কাটা' শিরোনামে একটা আস্ত গান, নাকি কবিতা! অতনু এক নিঃশ্বাসে ডুবে গেল। লিখেছে—

'শুনো শুনো বারোজনা শুনো দিয়া মন,
রসিদপুরের খাল-কাটা করিব বর্ণন।
আর্থিক বছরের টাকা খরচ না করিলে,
ফিরা যাইব সেই টাকা সরকারের ঘরে।
মার্চের সাতাশে অনাদি খবর করিল,
সেই শুনে বলাইবাবুও হাল-হকিকৎ নিল।
বিডিও অর্চিতা মিত্র যত আপত্তি ধরে,
পঞ্চায়েত সমিতি তার সব যুক্তি হরে।
চারদিনে খালকাটা! কভু না সম্ভবে,
কে বলেছে অসম্ভব, সবই সম্ভব ভবে।
টেণ্ডার ডাকিতে হবে— সে সময় কই?
কত টেণ্ডার চাই বলো না, আজই দিবই।
টেণ্ডার পেয়ে সমিতি যে সম্মতি দিল,
বিডিও-র আপত্তি আর ধোপে না টিকিল।
পঞ্চাশ হাজার টাকা পার্টি ফাণ্ডে গেল,
ব্যাক্ ডেটে অনাদিও কাজটা পাইল।
পাবলিকের টাকা কেন পার্টি-ফাণ্ডে গেল?
এই প্রশ্ন তুলে মাস্টার গোল বাধাইল।

মাস্টারের মুখ-বন্ধে তখন টাকা ছড়াইল,
ওই টাকার মুখে আমি... বলে মাস্টার প্রত্যাখ্যান করিল।
যার পেচ্ছাপ সে করেছে, তাতে মোদের কী?
এসো আমরা খাল কেটে জল ভরে দি।
আঠাশেতে কাজ শুরু একত্রিশে শেষ,
সেই খালে জল না এলেও টাকা এল বেশ।'

অতনু চমকে উঠে বলল— এই গান কে বেঁধেছে, নিতাই পাগলা? ঝাঁপি বলে কে জানে। ওই পাগলাই বলতে পারত সে-কথা। যখন তখন ছেলে ছোকরারা এসে ডেকে নিয়ে যেত। বলত— চ নিমাই, গান গাইবি চ। বাসট্যান্ বাজারে গাইবি, চড়কতলার মাঠে গাইবি, ইস্টিশানে গাইবি— সভ্যব জাগায় গেয়ে ফাটিয়ে দিবি পাগলা, চ। পাগলাও চলে যেত। মা ভয় পেয়ে কত মানা করেছে— ও গান গাসনি নিমাই। বাবুরা রাগ করে। কে শুনত কার কথা। ওই গানেই মরণ ডেকে আনল।

অতনু যত্ন করে খাতাটা নিজের ভি আই পি স্যুটকেসে তুলে রাখল। ডক্যুমেন্ট হিসাবে কাজে লাগাবে। তার আগে ঐ নিখিল সর্দারের সঙ্গে দেখা করে নেবে একবার হাজতে।

ক-দিন পরে সন্ধেবেলা একদিন অতনু বাসায় ফিরে দেখল মুনমুন দাঁড়িয়ে রয়েছে। অবাক হয়ে বলল— কী রে! তুই? এমন অসময়ে!

— বাবা পাঠাল, এই নাও— বলেই একটা চিঠি তুলে দিল মুনমুন অতনুর হাতে। অতনু দেখল মামার চিঠি—

কল্যাণীয়েষু অতনু,

আজ রাতে অবশ্যই একবার বাড়িতে এসে দেখা করবে। বিশেষ প্রয়োজন। অন্যথা না হয় যেন। তোমার অপেক্ষায় থাকব।

ইতি— আশীর্বাদক মামা।

কী ব্যাপার! মামা কি তবে তার সবকিছুই জেনে ফেলেছে? নইলে এই সন্ধেবেলা জরুরি চিঠি লিখে মুনমুনকে পাঠিয়েছে! এমন কী দরকার পড়ল যে...! মুনমুন চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ সেই নিয়ে আকাশ পাতাল ভাবল অতনু। মামার মুখোমুখি দাঁড়াতে তার ভয় করছে। তবুও রাত আটটার পর তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বাড়িতে যেতেই মুনমুন বলল— বাবা তো নেই, এই মাত্তর কী জরুরি কাজে বেরিয়ে গেল। ফিরতে রাত হবে, তুমি ঘরে এসো অন্তুদা।

অতনু ঘরে ঢুকে পাখা চালিয়ে দিল। এখন অনেকটা হাল্কা লাগছে নিজেকে। খানিক পরে মুনমুন এল। এসেই টেবিলে একটা প্যাকেট নামিয়ে দিয়ে বলল— তুমি এলে এটা দিতে বলে গেছে। বলেছে, এতে তিরিশ আছে।

মানে তিরিশ হাজার! অঙ্ক শুনে অতনু চমকাল। এবং যা বোঝার বুঝে নিল। জরুরি কাজে নয়, নলচে আড়াল করে হুঁকো টানার মতো এটুকু আব্রু রাখতেই মামাকে বেরিয়ে যেতে হয়েছে। হাজার হোক...।

টেবিলে শোয়ানো তিরিশ হাজার টাকার বাণ্ডিল। অতনু একদৃষ্টে সেইদিকেই তাকিয়ে রয়েছে। কী দেখছ অর্জুন? একটা চোখ— আর কিছু না গুরুদেব। অতনুও আর কিছু দেখছে না— কিচ্ছু না। এ পর্যন্ত অতনুর সমস্ত আচরণকে নিজেরই কেমন ছেলেমানুষি

বলে মনে হচ্ছে। যত্তো সব—। ঠিক তখনই একটা টিক্‌টিকি ডাকল— টিক্ টিক্ টিক্ টিক্। অতনু তিনবার আঙুলে টুসকি মারল। এ তার ছেলেবেলার অভ্যেস।

মুনমুন কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। ঘরে কেউ নেই, অতনু একা। টেবিলে তিরিশ হাজার টাকার বাণ্ডিল— দেওয়ালে টিক্‌টিকি। সেই দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অতনুর মনে হল— নিখিল সর্দাররা ডাইনোসরের মতোই অবলুপ্ত প্রজাতি। কোনোদিনই ফিরে জন্মাবে না আর। তার জায়গায় চারিদিকে এখন শুধু টিক্‌টিকি— ক্ষুদে টিক্‌টিকি!

হাত বাড়িয়ে টাকার বাণ্ডিলটা অ্যাটাচিতে ভরে উঠে দাঁড়াল অতনু। এগিয়ে যাবার জন্যে সামনে পা পাড়াল।

সামনে না পেছনে?

সুখের মরা

অশোককুমার কুণ্ডু

বগাজলের বাস স্টপে নেমেই প্রতিমা ডাক-ফুঁকরে কেঁদে উঠল, 'ওগো ঠাক্‌মা গো, তোমাকে আর কি দেখতে পাবুনি গো?' পিছনে নবকুমারের প্লাসটিকের বালতি ব্যাগ থেকে শাড়ির লাল পাড় সমেত আঁচলটা উত্তরের হাওয়া খাচ্ছে। এগিয়ে চলেছে বড় ছেলে বুধন— সজনে ডাঁটার মতো পা ফেলে। বেশ ক'মাস পরে মামার বাড়ির উদ্দেশে এই ভ্রমণটা বুধনের ভাল লাগছে। সে বুঝেছে বড় মা এবার মরে যাবে। নবকুমারের কাঁধে মাঝেরটি— মেয়ে ফেতি; পিছনে ছোট মেয়ে লতি গাঙারী পেটাচ্ছে। কান্না তার অহেতুক নয়। বাবা তাকে কেন কোলে নিচ্ছে না। বড় জমির মাথার আলে সে হঠাৎ কোনো এক অদৃশ্য ট্রাফিকের লাল আলোতে থমকে দাঁড়িয়ে আছে— নট নড়ন চড়ন। প্রতিমার কোনো দিকে তাকাবার সময় নেই।

নবকুমার পুরনো জামাই। অনেক সঙ্কোচ কেটে গেছে। বাস থেকে নেমে সে আর রিক্সা করেনি। আড়াই টাকা বাঁচানোর জন্যে সে এখন অনেকটা সুখী। পিছনে দাঁড়িয়ে পড়া মেয়েকে ডাকে, 'লতি' আয় মা লক্ষ্মীটি, এই চলে এনু মামা ঘর। হুই হোতা তোর বড় মামা দাঁড়িয়ে। গেলে পরে দুধ, মুড়ি, বাতাসা কত কী।' দূরে তখন প্রতিমা তালপুকুরের পাড়ে উঠে গেছে। বুধনের পরিচিত রাস্তা। সে এতক্ষণ মামার বাড়ির ঝিটচাল দেখতে পেয়ে গেছে।

গরু বাঁধছিলো সিমেন্দার বৌ। 'কে বাবা নবকুমার? যাও বাবা শীগ্‌গীর। বুড়ির হেঁচকী উঠছে।' নবকুমার দু মেয়েকে কাঁধে নেয়, হাঁটতে শুরু করে। তালপুকুর পাড়ে ওঠার আগে সে সিমেন্দার বৌ-এর দিকে তাকিয়ে বলে, 'সিমেন্দর পিসি, তুমি কখন দেখে এয়েচ?' সিমেন্দার বৌ ঠাট্টা করে, 'কি লো ফেতি, লতি? যা যা, বড় মা ত গেল গেল শব্দি। নুচি পেকেছে এবার।' নবকুমার অনেকটা পথ হেঁটেছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দূর থেকে আসা কান্নার শব্দে সে দ্রুত পা চালায়। সিমেন্দার বৌ বাতাসের সঙ্গে কথা বলে, 'সে ত বটেই বাবা। চোখের দেখা বলে কথা গো বাবা। শেষ সময়ের দেখা। কত করেচে লাতি পুতির লেগে। কুসুম পিসি কি আজকের মানুষ! গাঁয়ে কেউ নাই যে কুসুমবালার পেন্নাম পায়।' সিমেন্দার বৌ কুসুমবালার বয়সের দীর্ঘতা জানিয়ে কপালে মাথা ঠেকায়।

বাসস্টপে উল্টোদিক থেকে একটা বাস এসে দাঁড়ালো। নতুন জামাই মায়াকে নিয়ে রিক্সায় ওঠে। রাস্তায় রিক্সার ধুলো ওড়ে। পক্ পক্ আওয়াজ করে রিক্সা। গেল বোশেখে মায়ার বিয়ে হয়েছে, এখনো এক বছর হয়নি। বিশ্বনাথ আর মায়া। রিক্সার চারদিকে তাকিয়ে দেখে। ধান কাটা মাঠের দিকে আঙুল বাড়িয়ে মায়া দেখায় কোনটা তার ছোট্‌কার জমি।

'ঐ যে যেখানটায় আউজ গাছটা, ওখানে আমাদের পাঁচবিঘের কাঁদিটা।' স্বাভাবিক ভাবেই মেয়েরা যেমন বাপের বাড়ীর কুকুরটির প্রতি বিশেষত্ব খোঁজে, তাই খুঁজে খুঁজে

মায়া দেখাচ্ছিলো ওর বর বিশ্বনাথকে। পক্ পক্ রিক্সা ছুটছে। কুসুমবালার মর মর খবরটা চতুর্দিকে গন্ধ ছড়িয়ে ডেকে আনছে আত্মীয়স্বজনকে। রিক্সা ছুটছে।

'আচ্ছা ঐ তালপুকুর পার হয়ে গেল কে, দাদাবাবু না?' মায়া আঙুল বাড়ায়। বিশ্বনাথ ব্যাপারটা ভালো করে দেখে, 'হ্যাঁ তাইতো, নবদা। হেঁটেই যাচ্ছে। বলিহারি যাই। শালা হাড় কিপ্পোন।'

মায়া কথা বাড়ায় না। অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। বলে, 'ঠাকুমার খারাপই দেখি আর ভালোই দেখি আমি দু-চারদিন থাকব। তোমার তো মোকামে এখন চালের গাড়ি। তুমি চলে যেয়ো।'

মনে মনে বিশ্বনাথ ভাবে, মেয়েরা এই বাপের ঘরের আঁদাড়ে পাঁদাড়ে এলেই মাথায় উঠে নাচ শুরু করে দেয়। সুরে তখন বায়না নয়, জেদ। আর শ্বশুর ঘরে গিয়ে ঘাঁটানোও অসম্ভব। তবে বিশ্বনাথের থাকার সাবগাস নেই। কারণ ওর চালের আড়তে এখন শীতের নতুন চালের আসা-যাওয়া। একবেলা কামাই মানে অনেক লোকসান। রিক্সা পৌঁছে যায়।

পাতুলপাড়া গ্রাম থেকে কুলকী বেশি দূরে নয়। 'কাগের মুখে খবর' দিলে চলে যায়। মাঠে মাঠে পথ ভেঙে চলে এসেছে মাঝ বয়সী পার্বতী আর তার বর। বড়কর্তার মেয়ে ও জামাই। এমন খারাপ সময়, ঝিউড়িদের লজ্জার কিছু নাই। অন্য সময় হলে ওরা ঘুরপথে বাসে আসতো। এখন ওরা দুজনেই প্রায় ছুটছে। পার্বতী বাঁজা। ঝাড়া হাত পা। পার্বতীর মন দো বাড়ির মাটির মতন সরল— স্বামীরও তাই। ঠাকুমার বেশী বয়সে একমাত্র পার্বতীই অনেকদিন কাছে রেখে সেবা করেছিলো। অন্য কেউ যেটা করেনি। ঝামেলা এড়িয়ে গেছে। ওরা এসে পৌঁছায়। ঘর ভরে গেছে নাতি পুতি, নাতজামাই ও হরেক রকম কুটুমে।

কুসুমবালা এই মৃত্যু নিয়ে গেল বছরের আগের বছর থেকে অনেকবার রসিকতা করেছে। কুসুমবালার মৃত্যুটা ঠিক কতকটা 'রাখালের পালে বাঘ' পড়ার মতো। তবে এ বছর রাতে বার-বেরুতে গিয়ে লাছ দুয়ারে পড়ে গিয়ে পা ভাঙে। পাকা হাড় জোড়া লাগেনি আর। তাই হাঁটা চলার পর্ব শেষ। বসে বসেই খাওয়া-হাগা-পেচ্ছাপ সব। এ সময়টা মানুষের বড় দুর্দিন।

'ভাগে' ছিলো কুসুমবালা। চার মাস করে তিন ছেলের ঘরে; বছর ঘুরে যায়। এবার বোধহয় বছর ঘুরবে না। তবেগ এই চলত-শক্তি-রহিত হবার পর কুসুমবালার প্রতি স্বাভাবিক কারণে বৌদের অবহেলা বাড়ে। কে আর করতে পারে সব। বিছানা থেকে গু-মুত ধোয়া। শেষে ছোট ছেলে শশাঙ্ক দাদাদের সামনে বললে, 'এখন থেকে মা আমার ঘরেই থাকবে।' এ নিয়ে অবশ্য ছুট্‌কীর সাথে অনেক বচসাও হয়েছে। অবশ্য সেই সব দিনগুলির কথা মনে করেই এ সিদ্ধান্তে এসেছে। কত কষ্ট করে মা তাকে বেঙ্গাইয়ের মাইনর স্কুলে পড়িয়েছিল।

এখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। কুসুমবালার অবস্থা অনেকটা ভালো. মানে এ যাত্রা টিকে গেল। তবে বলা যায় না, মৃত্যু বড় সেয়ানা। ব্যস্ত জামাইরা চলে যাবে রাত কাবার হলে। অবশ্য একটু পর্যবেক্ষণ করে যেতে হচ্ছে এবং পুরো ব্যাপারটাই নির্ভর করছে এই 'কাল রাতের' উপর।

'কাল রাত' কেটে গেল। সকাল হলো।

শীতের সকালে লাতা বালতি ফেলে রেখে ছুট্‌কী একাই ডাক-ফুঁক্‌রে কেঁদে উঠলো। কান্না শুনে পাশের দেওয়াল সরিয়ে মেজকী এলো। আর বড়কীর আসার উপায় নেই। সে যেখানে গেছে সেখান থেকে মানুষ ফেরে না। কুসুমবালাও হয়তো সেখানে চলে

যাবে। 'টান' হচ্ছে কুসুমবালার। ধড়মড় করে কুটুমজন পড়শীরা এসে গেল। তবে কি কুসুমবালা গেল? না, তবে প্রায় যাওয়ারই সামিল। মানে অনেকেই আজ বাড়ী ফিরতে পারবে না। কুসুমবালা সবাইকে বেঁধে রেখেছে। আত্মীয়স্বজন নাতি পুতিতে গেরস্তের ঘরে বান ডেকেছে।

গোপালপুরের বীণা, কাঁটালির প্রতিমা, কানপুরের মায়া, রতনপুরের ছায়া— সব ঝিউড়ীরা এসেছে। বড় কর্তা বলাইবাবুর তিন মেয়ে ও জামাই এবং তাদের ছেলে মেয়ে। মেজ সুবলবাবুর দু-মেয়ে আর বাইরে থাকে এক ছেলে। ছোট শশাঙ্কর এক ছেলে ও তার বৌ কলকাতা থেকে এবং দু-মেয়ে ও জামাই সবাই খবর পেয়েই চলে এসেছে। ছেলে দেবু অবশ্য শুধু ঠাকুমাকে দেখতে আসেনি। এই শীতে একটু গ্রামে আসা, তার সাথে ঠাকুমার অন্তিমকাল এবং সেই যোগে ছুটি মিলেছে। দেবু অবশ্য দিন তিনেক হ'ল কলকাতা থেকে এখানে। আহা যা করেছো করেছো, মানুষটার কাছে শেষ সময় থাকা দরকার। চোখের দেখা, শেষ দেখা বলে কথা।

'ভাগের মা আগুন পায়নে'— কিন্তু এত যে ক্যাণ্ডিডেট সবাই এক আঁটি করে খড় মারলে বুড়ির অস্থি মজ্জা সব ছাই হয়ে হাওয়ায় উড়বে। মৃত্যু এত লোককে জড়ো করতেও পারে! পাড়া প্রতিবেশী আর ঘরের লোক বাদ দিলে শুধু বাইরের আত্মীয়-স্বজনই বত্রিশ জন।

শীতের সকাল বেশ কুঁড়েমীতে ভরা। শীত শেষ-ট্রেনের টিকিট হাতে নিয়ে এসময় আসে বুড়ো-বুড়িদের কাছে। আর এক বিয়ানী বৌ তো গায়েব কাঁথা। বুড়িটা বড় বেরসিকের মতো কান্না তুলে দিলো এই সাত সকালে। দরজায় ধাক্কা পড়লো নাতি দেবুর— ছুটকির বড় ছেলে। মা ডাকছে, 'ওঠ বাবা দেবু, ঠাকুমার মুখে জল দিবি।' দুম দুম করে ঘা পড়লো দরজায়। ঘুম জড়ানো গলায় দেবু বিরক্ত হয়েই বলে, 'যাচ্ছি।' মুখ দিয়ে ছোট করে 'শালা' বের হয়।

দেবু উঠতে দেরী করছে। নীচে, বাইরে তখন রথযাত্রা শুরু হয়েছে। পাড়া প্রতিবেশী সবাই হাজির। বুড়ির জীবনের সম্পূর্ণ রামায়ণে রঙ চড়াচ্ছে সবাই। তা রঙীন চিত্র হয়ে শীতের ন্যাড়া গোলঞ্চের মাথায় আটকে যাচ্ছে। সুস্মিতা দুটো ঠেলা মারলো দেবুকে— 'ওঠ ওঠ। ঠাকুমার অবস্থা খারাপ আর তুমি ঘুম মারছো।'

ঘড়ি দেখল দেবু, ছটা। এক কাপ চা হলে জমে। সিগারেট ধরালো। এতক্ষণে কলকাতার বাসায় বউয়ের সঙ্গে খুনসুটী পর্বের আসরে যন্ত্র পড়তো। আহা এই শীতে বৌ যেন ভুটিয়া সোয়েটার।

আবার দরজায় ধাক্কা পড়ল, 'কইরে দেবু, ও দেবু, বৌমা...।'

দেবু লুঙ্গি ঠিক করে দরজা খুলতে গেল। লেপের ভিতর থেকে সুস্মিতা সুখী বিড়ালের মতো চোখ খুলে উত্তর দেয়, 'যাই মা।'

দেবু সিঁড়ি ভেঙে চোখ মুছতে মুছতে নীচে নামলো। বড় জ্যাঠার ছেলেরা বাইরে থাকে। গতকাল এসেছে। এই সকালে উঠোন ভর্তি লোক দেখে দেবু অবাক হলো। পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন কুসুমবালার চারিদিকে 'চীনের প্রাচীর' গেড়েছে। মৃত্যু তবু ঐ ফাঁকেই ঢুকবে।

বুড়ির এখন রোদ দরকার। যদি শীত কাটিয়ে ঘণ্টা কয়েক বেঁচে থাকে, তবে যারা এখনও পৌঁছায়নি দূর থেকে, এসে যাবে।

— 'এই সরে দাঁড়া না লা মাগী। বুড়ো মানুষ রোদের দরকার।' বল্লে পুব পাড়ার ফুলী, সরস্বতীকে। অথচ সে নিজে বুড়ির মুখে অপ্রয়োজনীয় ছায়া করে দাঁড়িয়ে আছে।

সবাই দুহাতে লোকজন সরাচ্ছে। আর নিজেরা সরছে না। মৃত্যু বড় রহস্যজনক। দেখা দরকার কেমন করে ধিকি ধিকি চোখের সামনে একটা মানুষ দিনের আলোতে মরে। এমন দেখার সুযোগ থাকে না। রোদ দরকার। আহ্! অনেক রোদ জল ভেঙে বুড়ি এই সংসার গড়েছে। এবার না হয় একটু ছায়াতেই যাক। ঠেলাঠেলির ফলে বড় বৌমার দুধের মতো সাদা মেয়েটা যেন কলার খোসায় পা দিয়ে চিৎপাত। শুরু হলো করুণ রাগিণী। বাঁ পায়ের হাঁটু থেকে নুনছাল উঠে গেল। বেশ কিছুটা বিরক্ত হয়ে বৌমা কোলে তুলে নিলেন মেয়েকে। রোদ পড়ছে বুড়ির মুখে। আহ্! চামড়ার রঙ দেখেছো! যেথাকার রোদ সেথায় যেন গড়িয়ে যাচ্ছে।

'আগেকার মানুষ বলে কথা। সইমার শরীল যেন দুগ্‌গার মেড়'— বল্লে সুবন পাইকেরের বৌ। অথচ শিব কেটে পড়েছে সইমার যৌবনের শেষ দিকে। সংসারে যে যত আগে কেটে পড়তে পারে তার ততই ভালো।

পায়ের তলায় হট-ওয়াটার ব্যাগ। অসংখ্য হাত শেষ সময়ে ছুঁয়ে আছে পায়ে। যেন তোমার করুণায় আমরা বেঁচে আছি। 'জল-জল' — কে বললো। কুসুমবালার একটা চাপা শব্দ হয় মুখের ভিতর থেকে। অমনি 'থারটি সিক্স বেঙ্গল ব্যাটেলিয়ান' ছুটে এল সব। জল এলো। ডাঁটি ভাঙ্গা কাপে জল এলো। ঘটিতে এলো। কাঁসার বাটিতে এলো। পিতলের সানকীতে এলো। এলো হরেক রকম চামচ। আদ্যিকালের পিতলের গোঁদল থেকে শুরু করে সুস্মিতার স্টেনলেস স্টীলের চামচ। বড় বৌমার ল্যাকটোজেনের কৌটো থেকে প্লাস্টিকের চামচ। পাড়ার পাবলিক সবাই মুখে জল দেবার প্রশস্ত পথ করে দিচ্ছে। জল ঢালা হচ্ছে মুখে। গরম জল, ঠাণ্ডা জল, কুসুম গরম, দুটো বাটিতে দুধও এসে গেল। নানারকম প্রোটিন মেশানো। হরলিক্স থেকে শুরু করে সাত সকালের দোয়া গরুর 'বলক তোলা' দুধ। সবই প্রায় মুখের কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ত্রিনয়নী জলের ধারার মতো। জিভটা কচি বাঁশপাতার মতো 'রোল' করে বেরিয়ে আসছে। সেই সাথে পুরনো বেড়ফোর্ড গাড়ির এ্যাকসিলেটারের টানের মতো। এর মধ্যে সুস্মিতার গ্লুকোজ সামান্য ভেতরে গেল।

জিতে গেল সুস্মিতা। পাবলিকের ভিতর থেকে গুঞ্জন উঠলো— 'সুস্মিতা ভাগ্যবতী'। আহা! ছোট নাতি দেবু ছিল ঠাকুমার কল্‌জে। তা বাবা দেবু ঠিক মরার সময় এই চার বছর পর, তো বিয়ে করে পাত্তা দাওনি। এতদিন পরে পোয়াতী মেয়ের মতো শীতের রোদ খেতে কলকাতার ছুটি কাটাতে গাঁয়ে এসেছ!

সুস্মিতা রাজ্য জয় করার মতো উপরে উঠতে গেল।

কুসুমবালাব সইয়ের মেয়ে বললে— 'কোথায় যাও বাছা? কাছে একটু বসো।'

সুস্মিতা উত্তর দেয়, 'আর একটু গ্লুকোজ গুলে আনি।'

— 'যাও মা তবু তোমার হাতের গুলুকুচের জলটা খেল।'

আর যাদের জল মুখে গেল না তারা যেন মহাপাপী। অপরাধীর মতো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, সুযোগ পেলেই জল ঢালবে।

সুস্মিতা উপরে এসেছে, পিছু পিছু দেবুও।

— 'একটু কফি হলে আমার ভালো হয়।'

সুস্মিতা মেজাজে বলে, 'বায়নার আর সময় পেলে না!'

দেবু বৌকে জড়িয়ে ধরে, 'মাইরী তুমিও জিতে গেলে।'

— 'ঠাকুমা তোমাকে খুব ভালবাসতেন না।'

— 'হ্যাঁ কিন্তু আমার জল তো খেলো না।'

দেবু দুনম্বর সিগারেট ধরিয়ে লেদার সুটকেশ থেকে কফির কৌটো বের করে। স্টোভ থেকে গরম জলে চামচ নাড়তে নাড়তে শৈশবের দিনে ফিরে যায়। ঠাকুমার সঙ্গে আলুবাড়ি, বেগুন ক্ষেত, পালংয়ের দানা ছড়ানো। আহ! সে সব দিন যেন সোনার দিন, এখন সব স্মৃতি।

ওদিকে সবাই ফোকাস করছে সুস্মিতাকে। আরো এক চামচ গ্লুকোজের জল খেল ঠাকুমা। ছুট্‌কী তার বৌমার ভাগ্যের জন্যে কিছুটা গর্ব অনুভব করছে! সবার দৃষ্টি বাহ্‌বা দিচ্ছে। জনগণের দিকে তাকিয়ে সুস্মিতা বললে, 'একটু কড়া পাকের সন্দেশ ভেঙে দেব?' সবাই বলে উঠলো, 'দাও দাও।'

সুস্মিতা ডাকলো, 'ঠাকুমা ও ঠাকুমা।'

শ্যামনাম কানের ভিতরে গেল কি গেল না, কিছু শব্দ হলো হেঁচকীর মতো— মানে আমি আছি।

সামান্য সন্দেশ ভেঙে দিলো সুস্মিতা। বিষ্ণুপুরের ঝামা পাথরের মতো, কড়া পাকেব সন্দেশ মুখে আটকে রইল। কিছুটা জল দিলো সুস্মিতা। সন্দেশ জলে মিশে একটু তরল গড়িয়ে পড়ল। সামান্য ভিতরে গেল কি গেল না। তবুও সবাই ধরে নিল বুড়ি কিছুটা খেয়েছে।

এদিকে মনতোষের ছোট ব্যাটা পায়ের ফাঁকে হাত গলিয়ে মেরে দিয়েছে কড়া পাকের সন্দেশ দুটো। ছেলেতো নয় যেন বাংলার ডাকাত। চুপিসারে বসে আছে। আবহাওয়া একটু ক্লিয়ার হওয়ার আগেই সে কেটে পডলো।

সুস্মিতা সুধাংশুর বৌকে ডাকল, 'দিদি আপনি একটু দিন না।'

সুধাংশুর বৌ এগিয়ে এল আহত পক্ষীশাবককে স্বামীর কোলে দিয়ে। সুধাংশুর বৌ এগিয়ে এসে সুস্মিতার বাটি সরিয়ে রাখল, 'পারসোনাল এক্সজিস্ট্যান্স।' লেখাপড়া জানা ভদ্র ফ্যামিলির বৌ। নিজের প্লাসটিকের গ্লাস থেকে হরলিক্স দিল। বুড়ি সামান্য খেলো। জিভটা একটু ভাঁজ খুললো। কেন খুললি বাপ? এবার একে একে রাবণের বংশ সবাই নানাবিধ জল চার্জ করবে। বড় কর্তার মেজো ছেলে সুনীত, পারুলের জামাই, তসো ছেলে মেয়ে সবাই জল চার্জে ব্যস্ত। মেজকী পুরনো মানুষ। গোঁদলে করে জল ঢাললেন। পুরোটাই চলে গেল সাহারায়।

এ যাত্রা বুড়ি বেঁচে গেল বোধ হয়।

বুড়ি ডাকলো-- 'শ-শা-ন কো।'

সবাই একটু নিশ্চিন্ত হলো।

শশাঙ্ক বুড়ির অষ্টম গর্ভের সন্তান। মায়ের খুব আদরের। বড় কর্তার ছেলেরা সভ্য হয়েছে। বাপকে লেঙ্গি মেরে শহরে সেটেল্ করেছে। শেষ সময়ের চিঠি পেয়ে সবাই এসেছে। বাপের সাথে তোলা কাপড়ের সম্পর্ক। মাস গেলে হাত খরচা পাঠায়। বাপ মরে গেলে পটাপট জমিগুলো বেচে দেবে, ভাগ বাঁটোয়া হবে দুভাইয়ে। বাবা এই দুঃখে কিছুটা বৈরাগী।

মেজো কর্তা পাশের ভিটের প্রাচীর তুলে পুরনো ঘরের দাম বাবদ হাজার তিন পেয়েছে। হাঁড়ি আলাদার সময় তিন ভাই লোকজন বিশেষ ডাকেনি। সবার মুখে তখন এক কথা, বাইরের লোক দরকার নেই। মানে, নিজেরাই নিজেদের কাদা ঘাঁটবো। তবে ভাগাভাগির সময় যে শান্তিতে কেটেছে তা নয়। মেজো তো হাঁড়ি ভাগের সময় বলেছিল, 'মায়ের দুধ ভাগ করে খেয়েছি আর আলাদা তো হতেই হবে।' ছোট কর্তা ভাবলো

মন্দকি। এক সংসারে দুধের কড়া থেকে শুরু করে খারে কাপড় কাচা অব্দি এই সব নিয়ে টুকটাক খিটমিটি চলছিল, তা বেশ ভালোই হল। কুসুমবালা সাচ্চা মানুষ, বলেছিলো 'তোরাই আমার সব, তিরিশ বছরে ঢ্যাঁড় হয়েচি আর এখন আমার নামে আলাদা জমি। লোকে কী বলবে?' তা ঠিক।

এই কুসুমবালা করেনি কী? দিন রাতে মাত্র চার পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়ে ভোরের শুক ওঠার সময় ধান সেদ্ধ করে সকাল থেকে দুপুর অব্দি সেই ধান শুকিয়ে চাল করেছে। সন্ধের আলো জ্বালার আগে বস্তা বেঁধে স্বামীর গাড়ি জুড়ে মোকামে পাঠিয়েছে চাল বেচতে।

ভানা-কুটোর ব্যবসা করেছে দু মানুষে অনেকদিন। ছেলে পুলে বড় করেছে। নিজে মুখ্যু কিন্তু সব ছেলেকেই গোঘাটে গুড়-ট্রেনিং স্কুল অব্দি পাঠিয়েছে। ছোট শশাঙ্ক তো এ অঞ্চলের প্রথম আই.এ.। কুসুমবালার সে সব দিন কাজে-কাজেই কেটেছে। লোকের ধান ভেনেছে। এক বস্তা ধানে আধশলি চাল। সে সব দিনে বুড়ি স্বপ্ন দেখেছে সুখের। সারাদিন ধান ভেনে ঢেঁকিতে পাত দিয়ে পায়ের চেটো ফুলেছে। তবুও স্বামীকে বলেনি। সারারাত গাড়ি করে কুসুমবালার স্বামী রামজীবনপুরের মোকামে চাল বেচে ফিরছে ঘরে, নাগাদ সন্ধেতে। কুসুমবালা তখন দে বাড়ির আলুর মাটি ধরাচ্ছে। সে মনসা পুজোতে মুড়ি ভেজে রোজগার করেছে দে পাড়ার নেদো তেলীর ঘরে।

কুসুমবালা এ গাঁয়ের প্রাণ। মানুষের আঁতের কথা জেনে নেয় সবার আগে। সকাল বিকেল কাজের ফাঁকে কুয়োতলার মেয়েলী মজলিসে জল তোলার সময় খবর জোগাড় করে। ছোটখাটো ঝগড়ার সমাধান দেয়। বিপাকে পড়লে 'ভাষ' দেয়।

গাঁয়ের নতুন বৌ-এর পেটে ক'মাসের বাচ্চা আছে, কুসুমবালাকে শুধিয়ে দেখ, ঠিক পেয়ে যাবে। কে কালী পুজোর রাতে কার হাত ধরে টেনেছিলো কুসুমবালা ঠিক জেনে নেয়। কুসুমবালা যায় পাতায় পাতায়।

এছাড়া কার পিছনে আড়াই হাত দিতে হবে কুসুমবালা জানে। মড়োলের বউ ওর 'সই'। ঠিক কলকাঠি নেড়ে দেবে। তাই কুসুমবালাকে কেউ ঘাঁটায় না। গাঁয়ের কোন পোয়াতী রাত বিরেতে খালাস হলে কুসুমবালা তার ঘরে জেগে কাটায়। তাই কুসুমবালাকে সবাই ভালোবাসে।

কোনো ঘরে মানুষ মরলে কুসুম আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গাঁয়ের পাল-পরবে কুসুম ডাকে মেয়েদের। মজলিস বসায়। তাই কুসুমবালাকে সবাই ভক্তি করে।

কুসুমবালার মাথায় নেইটা কী? রঙ্গরসে ভরা কুসুমবালার মাথা। আশুবাবুর লোক সাহিত্যের মোটা বই অমন দু দশটা খুঁজলে পাওয়া যাবে। কুসুম এমন গল্প বলে, বোশেখের দুপুরে আইবুড়ো মেয়েদের মিছিল জমে ওর কাছে। গায়ের রঙ এমন, না জানি বয়েস কালে কত লোক কুসুমবালাকে গল্প শোনাতে চাইত।

কুসুমবালার জীবনে কত কী ঘটেছে। বারোটা ছেলে মেয়ের মধ্যে হেজে মরে বেঁচে রইল এক মেয়ে আর তিন ছেলে। মেয়ে আজ বেঁচে নেই। অপঘাতে গেছে— সাপকাটি। সেই শোকেই কুসুমবালা বেশ কাহিল হয়েছে এই শেষ কটি বছর। না হলে আরও কটা শীত-বর্ষা বেড়ি দিতো কে জানে।

সকাল বেলা যখন গড়িয়ে জল-খাবার বেলার দিকে গেল— সবাই গুটি গুটি চলে যাচ্ছে। তার মানে এ বেলার ফাঁড়াটা গেল। শীতের রোদের তাতে কুসুমবালা চোখ খুললো, নাড়াচাড়া খেল।

সবার পেটে তখন চিতার কাঠ জ্বলছে। জামাইরা পুবদিকের কোঠা ঘরে এক ঝাল তাস মেলেছে। মুড়ির টিন সাবাড় হচ্ছে। নতুন আলুর খোসা উঠছে। ভাজা হবে। ছুটকীর খোসা উঠছে। বাস্তবিক এই দুদিনে তার বারো টিন মুড়ি আধ বস্তা চাল হাওয়া। দুধ ঘি, কুমড়োর হিসেব বাদ দিয়েও খরচাটা বলার মতো।

নাতনীরা চন্দন বাটা শুরু করেছিল সেটা এখন শুকিয়ে গেছে। তার উপর একটা মাছি উড়ছে। মাথার কাছে বড় কর্তা যে গীতা খুলে পাঠ করছিলেন সেটার পাতায় হাওয়া খেল ধরেছে। মেজকী চলে গেল ও বাকুলে। কে ট্রানজিসটার খুলে দিলো। গোয়ালে জাবনা দেওয়া হয়নি। গরুগুলো অনেকক্ষণ থেকে হাম্বা হাম্বা করে ডাকছে।

দু বাড়িতে রান্না চড়েছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়া কীর্তি। আকাশে যেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাজনা। গেরস্তের হরেক রকম রান্না। জামাইদের জন্য তেল ভাসানি রান্না। যে সব ছেলে-বৌ বিদেশে থাকে তাদের রান্না। দুবেলার রান্না চলবে না। মড়া-হাঁড়ির-ভাত খাবে কে?

এদিকে বাচ্চাদের বাটি হাতে মুড়ির মিছিল। পাখপাখালীর কলরবে বাড়ি মুখরিত। উপরে টুয়েনটি নাইনের ডাক উঠছে, বিশ, বাইশ, পাশ। পেয়ার, মারো টেক্কা। দক্ষিণের বারান্দায় বিদেশী শালাদের সাথে অন্য জামাইদের হার্ট, স্পেডের ডাক। প্রবাসী বৌরা গাঁয়ের বৌদের শহরের গল্প শুনিয়ে তাক লাগাচ্ছে। কুসুমবালার মাথা-সিতেনে কিছু নিষ্ঠাবতী ঠায় দাঁড়িয়ে। ছুটকী অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললো,'সইমা, পারু পিসি, তোমরা তবে চান-ভাত এখেনেই করে নাও না।'

সূর্য মাথার উপরে এলো। গাছের ছায়া গাছের সাথে মিশলো। এখন জামাইরা চলেছে দলবদ্ধভাবে খাঁটি ঘানির সরষের তেল ঘষতে ঘষতে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে। ধুলো উড়িয়ে, পাকা ধানের গাড়ি আসছে খামারে।

সবার কর্মব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ যেন কম্যান্ডার বলে উঠবে,'সাবধান।' অমনি সবাই স্থিরচিত্র হয়ে যাবে।

বেশী নাড়াচাড়া করতে বারণ করলো মেজো কর্তা সুবলবাবু। শুধু কড়া রোদ আটকানোর জন্যে দুয়ারের পাশে চাদর টাঙানো হলো। চান-ভাতের পর্ব শুরু। গোপালপুরের জামাই একবার আড়চোখে দেখে নিলো ঠাকুমাকে, চান-ভাত করার স্পীড কেমন হবে। আসলে খেতে খেতে যদি হঠাৎ হেঁচকী ওঠে তবে খাওয়া বন্ধ হবে। দুপুরে খাওয়া দাওয়া মিটে গেল। কুসুমবালার মুতো চাদরটা বদলে দিলো শশাঙ্ক। বুড়ির কাছে এখন কেউ নেই। মাথা ধুইয়ে দিলো সে। সবার খাওয়া শেষ। এখন দুপুরের পড়ন্ত রোদে দাঁতে কাঠি দিচ্ছে কেউ কেউ। অন্য দু-একজন বারান্দার রোদ কাড়াকাড়িতে ব্যস্ত। নবাসনের মোটা জামাইয়ের নাক ডাকছে। সবাই সকালের যুদ্ধের পর এখন সাদা পতাকার নীচে, শান্ত।

এমন সময় একটা হেঁচকী উঠলো। বুড়ি একদম চুপচাপ। শুধু শশাঙ্ক ছাড়া কেউ শুনতে পেল না। ছুটে এলো ঘর থেকে দুয়ারে। ডাকলো, 'ছোট বৌ, বড়দা, মেজদা এসো গো।' কুসুমবালা একদম নিথর। মহাপ্রাণ বেরিয়ে গেছে। সবাই কি আর দেখতে পায়? পুণ্যবান না হলে কেউ দেখতে পায়ে না। শেষ সময়ে কাছে থাকতে পারল না! এবার আবার শুরু হলো কান্না। সত্যি সত্যি মৃত্যুর জন্যে কান্না।

শীতের বিকেল যেন হাতের মুঠোর জল। চারিদিক থেকে সবাই সবার কাজ ফেলে ছুটে এলো। পড়শীদের কেউ কেউ এলো না, হাতের কাজ শেষ করে আসবে এমন ভাবছিলো। কারণ এরকম অসংখ্য বারই তো হয়েছে। তাই একদম শেষ খবর পেলে

আসবে। জামাইরা কেউ কেউ কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে হাই তুললো। সবাই যখন কাছে এলো, তখন পরাণ-পাখী খাঁচা ভেঙ্গে উড়ে গেছে। সমস্বরে কান্না শুরু হলো। ধরা গলা, মিনমিনে গলা, বসা গলা, সুরেলা গলার কান্নার কম্বাইন্ড সুরে বানভাসির মতো সবাইকে জড়ো করেছে। মেজকীর সুর,'মা আমি আট বছরে এয়েছিনু গো; তুমি আমাকে বৌ ভাবুনি, মেয়ে ভাবতে গো।' নাতনীরা সমস্বরে,'ওগো ঠাক্‌মা গো, কোথায় গেলে গো।' শশাঙ্ক শিক্ষিত লোক। মার হাতের বিটটা পরীক্ষা করছিলো। নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। সন্দেহ রয়ে গেল। অনেক সময় 'হার্ট' কিছু পরে চালু হয়। ছুটকী চুপচাপ মানুষ—'আমি কাকে মা বলে ডাকবো গো-ও-ও।' বড় কর্তা সব হারিয়ে ভোলানাথ। দুয়ারে তিনি গড়াগড়ি দিচ্ছেন বিশাল শরীরে। 'ওগো মা, মা আমার, তুমি কোথায় সব ফেলে চলে গেলে গো?' মেজ কর্তার সাথে মার লাঠি ঠেঙাও হয়েছে ক'বার। এসময় তিনিও মার মাথার কাছে নোনা জলের প্রস্রবণ ঢালছেন।

সুস্মিতা উপরে উঠে এলো। মুখ টিপে ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। যথারীতি দেবু পিছনে পিছনে। তার সেন্টিমেন্টে লেগেছে,'সবাই কাঁদছে আর তুমি...।'

—'হাসি পাবে না। তুমি দেখে এস, এক ফোঁটাও জল পড়ছে না। দেবু কিছু না বলে ক্যামেরা বাগিয়ে নীচে এলো।

প্রথম দফায় তিন ছেলে ও মার ছবি। মাদার অ্যান্ড চিলড্রেন। তারপর বৌদের সাথে শাশুড়ীর। বৌ শাশুড়ীর সম্পর্ক ছিলো সাপে নেউলে। তবু শেষ সময় বলে কথা।

'আর কি, মানুষ তো মাটির সনে মিশে যাবে।' ফিলজফারের মতো বললে ফুলি মামী।

এবার নাত জামাইদের ছবি তোলা হলো ঠাকুমার সাথে! সেই সুযোগে লক্ষ্মীপুরের জামাই ভিড়ের মধ্যে সুস্মিতার বুকে একটু কনুইয়ের টাচ মারলো। সুস্মিতা বুঝেও বুঝতে পারলো না। শুধু তাকালো একবার।

শালা টাকার কুমীর। আলুর আড়তদার, গোলদারী ব্যবসা। দু-ছেলে তবু রস দেখেছ! সোনার ফ্রেমের চশমা। ঘড়িতে সোনার চেন। বৌ সীতাকে নিয়ে এসেছে সোনায় মুড়ে, যেন সিনেমা দেখতে এসেছে।

কুসুমবালা হাঁ করে মরেছে। হাঁ করে মরলে সোনা দিতে হয়। কে এক পাকা মাথার মানুষ 'ভাস্যি' দিল। সবাই মুখ চাওয়া-চায়ি করলো। সুস্মিতা স্মার্টলি নাক ছাবি খুললো। ফুলি মামী বললো,'শুধু ডাঁটিটা একটু ভেঙ্গে দিলেই হবে।' সুস্মিতা হঠাৎ এ কাজটা করলো মুড়ে। পরে সামান্য কষ্ট হলো।

শ্মশানে ঘি চাই। মেজকী অ্যাডভান্স বললো, 'আমার ঘরের ঘি তো ভাদুরে বিয়োনো গাই, ছোট তোর তো ভালো ঘি আছে, তুই দিয়ে দে।' ছুটকীর অনেক যাচ্ছে। এবারে তার বুক কর কর করে উঠলো। ওদিকে মেজো কর্তার ঝাড়ে বাঁশ কাটা হচ্ছে। কত আশা করে ভালো বাঁশ রেখেছিলো গাড়ির ফোঁড় হবে। দুদিন পরে মরলে ভালো হতো। বড় কর্তার ছেলে মৃত্যুর টাইম 'নোট' করলো। নিম গাছ একটা। সেটা ছোটর ভাগে। মড়মড় করে পড়ে গেল। আধটা মাল খেয়ে দেহিপদ একাই কাটলো, মালের গুণ। কোরা কাপড় আগেই কেনা ছিল। কবে মরে কবে মরে এই ভেবে।

অনেকেই শশাঙ্ককে প্রশংসা করলো। মা তবু তার দুয়ারেই মরেছে। মেজো মনে মনে প্যাঁচ কষে। ছোটকেই বলবে শ্রাদ্ধের লায়নস শেয়ারটা বহন করতে। বড়কর্তা উঠে দাঁড়িয়েছে। 'মুড়ি' বাঁধা হয়ে গেছে। সূর্য ডোবার আগেই মড়া তুলে যেতে হবে শ্মশানে। না হলে আত্মা অনেকটা দোষ পাবে। নাতনী অঞ্জনা চন্দনে ডোবানো তুলসী পাতা দু-চোখে দিল।

সূর্য পাটে বসেছে। মেজকী মাটির দেওয়াল থেকে পেরেক খুললো। 'ভস' করে পেরেক উপড়ে এল। মনতোষ মাজ দুয়ারে পেরেক পুঁতল।

খিকড়ীর পাড়ে অজিত একাই একটা বোতল শেষ করে অন্যগুলো থেকে কিছুটা ঢেলে, পানা পুকুরের জল পাইল করে দিলো। চারখানা বোতল শ্মশানে যাবে।

'বল হরি, হরিবোল।' পুরোনো যে গাছটা এতদিন বেঁচে ছিলো সেটা আজ হাড়ে মজ্জায় শুকিয়ে গেল। এই শীতের হাড় কাঁপানো বাতাস সইতে পারলো না। ফল ফুল অনেক হয়েছিল গাছটায়। হাটের মাঝে হাট সাজিয়ে কেটে পড়ল কুসুমবালা। অনেক দিনের পুরনো দলিল নাড়াচাড়ায় গুঁড়ো হয়ে গেল, পড়ে রইল ভাঙ্গা সুটকেশ।

কুসুমবালার মৃতদেহ এখন অস্থির। মাথা দুদিক থেকে নড়ে উঠল। এপাশে ওপাশে। মুখের ভিতর স্থির জিভ দেখা যাচ্ছে। চোখ দুটি বন্ধ। চন্দনে ভেজান তুলসীপাতা দুটি চোখের পাতার ওপর আটকে আছে। দীর্ঘদিন রোগে ভোগার ফলে কিছু মাছি নিকট প্রতিবেশী হয়ে গিয়েছিল। তারা এখন সঙ্গ ছাড়তে চাইছে না। মড়া বাঁধার প্রস্তুতির ফলে, জীবিত হাতের কসরতে, তারা উড়ে পালাচ্ছে। আবার বসছে। কুসুমবালার নাকে, মুখে ও পায়ের পাতায়। জলচৌকিতে যে পিতলের জল-ঘটি ও গ্লাস ছিল তা সরিয়ে নিল ছুট্‌কী। শুধু কাঠের চৌকী, সেটি কুসুমবালার সঙ্গে যাবে। যে চাটাইয়ের ওপর শুয়েছিল সে এতদিন, সেটার ভিতর 'রোল' করে বাঁধা হল মৃতদেহ। আর যা মলিন, গায়ের কাঁথা ও বালিশ তা আলাদা করে বাঁধা হল।

কোমরের ঘুনসীর সঙ্গে একটা রুপোর মাদুলি, সেটা দেখা গেল একবার। আলো ঠিক্‌রে পড়ল। গোয়াল থেকে একটি গরু এত লোকের সমাগম দেখে 'হাম্বা হাম্বা' করে একটা দীর্ঘ ডাক দিল। ভয়ে নাকি, বিয়োগ ব্যথায় তা বোঝা গেল না। অনেক দিনের পোষা সাদাব ওপর কালোর ছোপ লাগা বিড়ালটি এই ফাঁকে ঢুকে গেল রান্নাঘরে। শোকে ব্যস্ত অনেকেই। এই পরম সুযোগ। বিড়ালটি রান্নাঘরে ঢোকার আগে জিভ দিয়ে চেটে নিল ঠোঁট।

সবাই ঘরের বাইরে। দরজা হাঁ-হাঁ করে আছে। কুসুমবালার ঘরের মেঝেতে এই মুখ আঁধারীতে একটা ইঁদুর মাটি তুলেছে।

মড়া বইবার মাচার সামনে পিছনে হাত দশেক করে বাঁশ বাঁধা। সবাই কাঁধ দেবে।

'বল হরি, হরিবোল।' ক্যান্ডিডেট অনেক, কাঁধ ফিরিয়ে কাঁধ স্পর্শ করছে, মড়ার বোঝা, কুসুমবালার ভার। এতদিন তোমাকে দেখেনি।

'বল হরি, হরিবোল।'

মড়া উঠলো। 'বল হরি, হরিবোল।' সূর্য ডুবে গেল। পাতলা অন্ধকার। কান্না— এবার দ্রুত পর্যায়ে। পুব পাড়ার নন্দীর বৌ বললো,'এতো সুখের মরা, কান্নার কি? লাতিপুতি বাগান সাজিয়ে কুসুম পিসি গেল। আমরা যেতে পারলে বাঁচি।' বলে, আঁচলের খুঁট দিয়ে নাকের ও চোখের প্রথম দফার জল মুছলো।

সুস্মিতা খই ছড়াচ্ছে। খইয়ের সাথে খুচরো পয়সা। পাড়ার বাগ্দীদের ছেলেমেয়েরা সব দেখে রাখছে পয়সাগুলো কোথায় গড়িয়ে পড়ছে। ফুলি মামী প্রশংসা করলো, 'দেখেচো শিক্ষিত মেয়ের গুণই আলাদা।' সুধাংশুর বৌ-এর প্রেসটিজ লিক হলো। বলে উঠল,'গাঁগুই (যারা পোড়াতে যায়)-দের লুচি মিষ্টির খরচা আমার।'

লক্ষ্মীপুরের জামাই বাবাজী দেহিপদিকে বললো,'এই নাও কারণের খরচা পঞ্চাশ।' দেহিপদর মনে হলো শালা দেশ শুদ্ধ সব লোক মরে যাক। পঞ্চাশ টাকায় গাঁয়ের সব মাল আজ শ্মশানে যাবে। 'বল হরি, হরিবোল।' মড়া চলেছে। কুসুমবালা চলেছে, গাঁয়ের একশো চার বছরের ইতিহাস চলেছে।

অন্ধকারের ধোঁয়া বিস্তৃত হচ্ছে। বড়কী নেই, তাই মেজকী গোবর ছড়া দেবার পোষ্টটা পেয়েছে। শোনা যাচ্ছে হরিবোল। পাড়ার ভিতর দিয়ে এখন মড়া যাচ্ছে। এবার মিনিট দশেকের মাঠ পার হতে হবে। তারপর শ্মশান।

হরিবোল দূরে যাচ্ছে। কাঙাল মানুষ আঁধারে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর রহস্যে ডুবে যাচ্ছে. মড়ার সামনে বড়কর্তা। পিছনে অনেকেই। কে বললো, 'ছোট কর্তা, মেজো কর্তা কোথায় গেল?' 'আসছে আসছে, খরো পায়ে চলো। 'বল হরি হরিবোল' দেহিপদ বলল।

অন্ধকারে কুসুমবালার ঘর খোলা। সবাই বাইরে এখন উদাস দৃষ্টিতে জীবন মরণের রহস্যে আবৃত। কুসুমবালার ঘরে হুড়কোর গর্তে হাত ঢোকাল শশাঙ্ক। কোথায় আছে মার পোর্টমানের চাবিকাঠি।

ওটাতে আছে মার চার ভরির বিছে হার। এসময় ওটা পাচার করা দরকার। কথা ছিলো মার শেষ কাজের সময় পোর্টমান খোলানো হবে। এই আঁধারকে এখন শশাঙ্কর প্রচণ্ড ভয় লাগছে। নিজের উঠোনকেই লাগছে অচেনা। তবু যা হোক ঘরের ভিতরে কেউ নেই, সবাই বাইরে কাঁদছে।

এই আঁধারে খিড়কীর লাছ দিয়ে কে কুসুমবালার ঘরের দিকে আসছে। পায়ের শব্দে ইঁদুরটা মাটিতোলার কাজ বন্ধ রেখেছে। জন্তুর ভয় শব্দে, মানুষের ভয় এই আঁধারকে। চুপি-চুপি, পা-টিপে এগিয়ে এলো।

অনেক ব্যবহারে হুড়কোর গর্তটা বাইরে দেওয়াল ফুটো করেছে। বহু পুরনো দেওয়াল তো।

হাত ঢুকিয়েই 'বাপরে' বলে চিৎকার করলো। সাপ মনে হলো। এই সব ক্ষেত্রে নাকি সাপ বসে পাহারা দেয়। শব্দ শুনে শশাঙ্ক ভয় পেলো। দুটো হাত স্পর্শ করেছিলো বিপরীত দিক থেকে, হুড়কো গর্তের ভিতরে মুখ আঁধারী আলোতে। ঘর থেকে সট্ করে বেরিয়ে দেখলো মেজদা— সুবল। হরিবোল তখন দূর থেকে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে।

■ ডাক-ফুঁকুরে কেদে ওঠা > সুর করে, চিৎকার করে কান্না। ঝিটচাল > ঘরের বাইবের দিকের দেওযালের সব থেকে নীচের আচ্ছাদন। হেঁচকী ওঠা > মৃত্যুর আগে যে টান ওঠে, দমকা মেরে। নুচি পাকা > লুচি পাকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মৃত্যু বোঝাতে বলা হয়। কারণ শ্রাদ্ধবাড়িতে নিমন্ত্রিতদেব লুচি খাওয়ানো হয়।
কাঁদি > কলার কাঁদি। গুচ্ছ। আবাদী জমির ক্ষেত্রে, বড় মাপের জমিকে বলা হয়। দাদাবাবু > জামাইবাবু। মোকাম > গ্রাম গঞ্জ ঘিরে যে ব্যবসাস্থল। আঁদাড়-পাঁদাড় > ঘরের খুব নিকটে। সাবগাস > অপসোর, অবসর। আড়ত > গুদাম, যে ঘরে ব্যবসার জন্য কৃষিজ জিনিসপত্র মজুত রাখা হয়। 'কাগের মুখে খবর' > খুব কম দূরত্বের মধ্যে যে খবর চলাচল করে। ঝিউড়ী > বিবাহিতা মহিলাদের বোঝাতে, 'ঝি' শব্দ বোঝাতে কন্যা। ঝাড়া হাত পা > নিঃসন্তান অর্থে যে দম্পতি, ঝামেলাহীন। দো বাড়ি > দুফসলী মাঠ। কুটুম > আত্মীয়। লাছ দুয়ার > ঘরের বাইরে যে পাঁচিল, সেখানে দরজার নীচে যে সিঁড়ি। ভাগে থাকা > সংসারে ছেলেরা আলাদা (পৃথগন্ন) হলে বৃদ্ধ মা-বাবাদের বছরের নির্দিষ্ট সময় ভাগ করে দিয়ে এক এক জনের কাছে থাকা। কাবার > শেষ। লাতা > নাতা, ঘর মোছার যে বস্ত্রখণ্ড। টান > মৃত্যুর সময় যে দীর্ঘায়িত শ্বাস-প্রশ্বাস। আসরে যন্ত্র পড়া > যাত্রা শুরুর আগে স্টেজে যে সব বাদ্যযন্ত্র আসে। কোনো কিছুর সূচনা বোঝাতেও বলা হয়। নুন ছাল > চামড়ার বাইরের স্তর, বা চামড়ার প্রথম স্তর।

সইমা > (স্ত্রী লিঙ্গে) বন্ধুর মা, স্যাঙাত মা। পাইকের > যে বিক্রি করে। গরু বিক্রেতা ও ক্রেতার ক্ষেত্রেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মেড় > দেবদেবীর প্রতিমার খড়ের তৈরি ধাতব বড় বাটি বিশেষ। গোঁদল > বাচ্চাদের তরল খাবার খাওয়ানোর বিশেষ পিতলের কঙ্কাল-কাঠামো। যার ওপর কাদা-মাটি দিয়ে প্রতিমা সম্পূর্ণ হয়। সানকী > পিতলের তৈরি জিনিস। বলক তোলা > খাঁটি দুধ, তাপে প্রথমবার ফুটে ওঠার পর। 'তোলা কাপড়ের সম্পর্ক > মাঝে মধ্যে, খুব কম দেখা করা হয় এরকম সম্পর্ক। টাঁড় > বিধবা, টাঁড়ি অর্থে মহিলা। গালাগাল দেওয়ার সময় 'টাঁড়ি' শব্দটিও ব্যবহার করা হয়। শুক ওঠা > ভোরের শুকতারা ওঠা। ভানা কুটো > ধান সিদ্ধ করে চাল তৈরি করা এবং তা বিক্রি করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দ। দু মানুষ > শুধু মাত্র স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বোঝাতে। আধ শলি > ধানের মাপ, আয়তনে। আলুর মাটি ধরানো > আলুর গাছ বের হলে দু পাশের মাটি দিয়ে গাছের গোড়ার চার পাশে দেওয়ার পদ্ধতি। আঁতের কথা > হৃদয়ের গোপন কথা। ভাষ > ভায্য, উপদেশ অর্থে। খালাস > গর্ভবতী প্রাণীর বাচ্চা হওয়া, মুক্ত হওয়া। বকুল > প্রাচীর ঘেরা ঘরসমেত যে স্থান। জাবনা > গরুর জন্য তৈরি করা খাবার। মড়া-হাঁড়ির ভাত > কেউ মারা যাবার পর রান্না ঘরে যে সমস্ত রান্না খাবার থাকে, ঐ খাবার ফেলে দিতে হয়। মৃত্যুর খবর এলে তা কেউ খায় না। মাথা-সিতেন > মাথার খুব কাছে। চান-ভাত > স্নানের পর যে ভাত খাওয়া হয়। ভাস্যি > ভাষ্য, ভাষ, সদ উপদেশ। ভাদুরে বিয়ানো গাই > ভাদ্র মাসে বাচ্চা প্রসব করা গাভী। এ গাভীর দুধ, দুধ থেকে তৈরি ঘি বা মিষ্টি কোন শুদ্ধ কাজে ব্যবহার করা হয় না। গাড়ির ফোঁড় > গোরুর গাড়িতে ব্যবহৃত সব থেকে লম্বা বাঁশ দুটি। মুড়ি বাঁধা > মৃত দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার আগে বাঁধা। পাটে বসা > সূর্যাস্ত। গাঁগুই > যারা মৃতদেহ সৎকার করতে যায়। এদের বিশেষ সম্মান দেওয়া হয় শ্রাদ্ধের দিন। কারণ > মদ্য। খরো পায়ে > দ্রুত হাঁটা। হুড়কো > ঘরের ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে রাখার জন্য যে বাঁশ। দরজার দু পাশের দেওয়ালে দুটি গর্ত করে লম্বা বাঁশ যা দরজাকে কষে বন্ধ রাখে।

তারামাস্টারের মা

ঋতুপর্ণ বিশ্বাস

গোপালপুর হাটে বসেই সাংবাদটা পেলেন তারামাস্টার, অবনীর ছেলেরা করাতী এনেছে।

খেত থেকে আজ পটল উঠেছে তিরিশ কিলো। ছেলেটাই গুছিয়ে দিয়েছিল। মেপেজুখে বস্তা ভরে তুলে দিয়েছিল ভ্যান-রিকশায়। একটু আগে পাইকারের কাছে সব পটল বেচে দিয়ে মৌজ করে চা খাবেন বলে মাস্টার বসেছিলেন অমল চা-কুঞ্জে। কাচের গ্লাসে চায়ের বাদামী জলে দুধ পড়ে আমলের হাতের চামচের সশব্দ হুটোপুটিতে চায়ের রঙ হয়ে যাচ্ছিল বৈরাগ্যের। অন্তরীণ নিবিষ্টতায় সেটিই লক্ষ্য করছিলেন মাস্টার। ঠিক তখনি কালু গাজী বলল কথাটা, 'তেঁতুলগাছটা বেচে দেলেন মাস্টার? করাতী নে এল যে অবনীর ছেলেরা!'

ফুঃ করে তাকে উড়িয়ে দিলেন মাস্টার। 'তুমি কি গাছ কাটতি দেকেছো ওদেব?'

কালু গাজী তাঁদের গ্রামের গাজীপাড়ার। তার ছেলেমেয়েরা মাস্টারের পড়ুয়া। কালু তুতলিয়ে বলল, 'না তা—তা ঠিক দেখেনি। তবে সব জোট পাকিয়ে বসেছেলো তেঁতুলগাছের নীচে।'

চা ঠোঁটে তুলতে গিয়ে থামলেন মাস্টার। হেসে উঠে বললেন, 'ও, সব বসেছেলো তেঁতুলগাছেব নিচে! বোস গাজীর পো। চা খাও। তেঁতুলগাছ আমি বেচিনি। বেচপোও না কোনকালে। তা হাটে কি এনেলে গাজীব পো?'

কালু লোকটা অন্য রকম। সোজার সোজা, বাঁকার বাঁকা। মুসলমান, কিন্তু মুরগি ছোঁয় না। দাড়ি রাখে—অথচ মসজিদে যায় না। তাকে পেয়ে হাসি-মজায় চা-টা জমেই গেল মাস্টারের। ওখান থেকে উঠে কালু গেল মেছোহাটায়। মাস্টার কিছু মশলাপাতি কিনে ঘাট পেরোবেন বলে এসে দাঁড়ালেন নদীর ঘাটে, ঘাটের উপরের দোকানের ছায়ায়। নৌকো যাত্রী নিয়ে আসছে ওপার থেকে। এখন সে মাঝনদীতে। গোপালপুরের হাট আজকাল সকাল থেকেই বসে। তরকারিপত্রের কেনাবেচা চলে সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত। এতে ক্রেতা বিক্রেতা দুপক্ষেরই সুবিধে। যত দূরের পথই হোক তারা ফিরে যেতে পারে দিনে দিনে। বেশ মনে আছে, পাকা কাঁঠাল বেচতে গোপালপুরের এই হাটে এসেই একবার বাড়ি ফিরে যেতে পারেননি মাস্টার। থেকে যেতে হয়েছিল গোবিন্দপুরে বন্ধু অজিত ঘোষের বাড়ি। এমন কিছু রাত হয়নি! আটটা। কিন্তু আজকালকার আটটা তো নয়! গ্রামে আজকাল সন্ধেই হয় আটটায়। তখন এমন পাকা রাস্তা হয়নি! বিদ্যুৎ আসেনি। ভাবা যায়, পোলতায় কানাই ডাক্তারের বৈঠকখানায় টিভি চলছে এখন! উপরের ঘরে পাখা চলছে হনহন করে।

দিন প্রতিদিন আরো ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে ইছামতী। মাঝ নদী থেকে নৌকো পারে ভিড়তে এত সময় লাগার কথা নয়। মাছধরা জালে জড়িয়ে গিয়েছিল হাল। ছাড়িয়ে নিয়ে আসছে। জলের কিনারায় নেমে এলেন মাস্টার। তখনি নৌকো-আরোহীদের ভিড়ে টের পেলেন

ছেলে সঞ্জয়কে। সে তাঁর দিকেই তাকিয়ে ছিল। চোখাচোখি হতে হাত তুলল। কি ব্যাপার! এ সময়ে এদিকে তো সঞ্জয়ের আসার কথা নয়! হাতই বা তুলল কেন! নিশ্চয়ই বোঝাতে চাইছে জরুরি কিছু। তবে কি অবনীর ছেলেরা সত্যিই কোন অঘটন ঘটাচ্ছে!

নৌকো ভাল করে থামার আগেই মাটিতে লাফিয়ে পড়ল সঞ্জয়। 'বাবা, গজুরা করাতী এনেছে। তেঁতুলগাছ কাটছে। তাড়াতাড়ি চল।'

মাঝ নদীতে হালে জাল জড়িয়ে গেলে এই আরোহীদেরই ব্যস্ততার কথা তুলে হৈচৈ করতে দেখেছিলেন মাস্টার। এখন তারাই নিবিড় কৌতূহলে তাঁদের ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল দেখে নির্লিপ্ত মুখে ছেলেকে বললেন, 'আচ্ছা, চল।'

উত্তেজনায় বড় বড় শ্বাস পড়ছিল সঞ্জয়ের। হাত ইশারায় তাকে শান্ত হতে বলে নৌকোয় উঠলেন মাস্টার। নিরাশমুখে ছত্রখান হয়ে গেল ভিড়। মাস্টারদের সঙ্গে কিছু যাত্রীও উঠেছিল নৌকোয়। কিন্তু আরো কিছু না হলে তো ছাড়বে না। ইদানীং বাঘের সঙ্গে ফেউ-এর মতন নৌকোর পাশে সর্বক্ষণ লেগে থাকে ব্যক্তিমালিকানার কিছু ছোট নৌকো। ঘাটমালিককে যা পয়সা দেবার তা তো দিতেই হয়। এরা আলাদা পয়সা নেয়। একটু বেশিই নেয়। কিন্তু দ্রুত পৌঁছে দেয়। নৌকোর একবার যাবার সময়ের মধ্যেই এরা তিনবার যাতায়াত করে। ঘাট-নৌকো ঢিলে তো চলেই, পুরো না ভরলেও ছাড়ে না। আশপাশে কোন ফেউ, স্থানীয় ভাষার টাবুরে নেই দেখে নৌকোয় উঠেছিলেন মাস্টার। তাঁদের সঙ্গে আরো যারা উঠেছিল— তাদের নিয়ে যাত্রী হয়েছে আধ নৌকো। পুরো না হলে ছাড়ার সম্ভাবনা নেই। হাত তুলে ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা টাবুরেকে ডাকতে চাইলেন মাস্টার। একজন আসছে। হয়তো তার সময়েই। কারণ যাত্রী বোঝাই ছিল নৌকোয়। সে ঘাটে এসে লাগার আগেই নেমে তৈরি হয়ে দাঁড়ালেন মাস্টাররা। নৌকো খালি হতেই উঠে বললেন, 'চল, যা নোবার নিও।'

বাপ-বেটায় বসলেন মুখোমুখি। গাজীপাড়ার প্রাইমারি স্কুলে চাকরির বয়স ফুরোতে আর তিন বছর বাকি মাস্টারের। সাড়ে এগারোর রোদ তাঁর শরীরে ঘাম তুলে ভিজিয়ে দিচ্ছিল পাঞ্জাবি। সঞ্জয় বনগাঁর দীনবন্ধু কলেজের দ্বিতীয় বর্ষ কলাবিভাগের ছাত্র। ফর্সা মুখে ব্রণ, ব্রণর দাগ। মাঝারি লম্বা চুল ঘন এবং অবিন্যস্ত। উত্তেজনা, কথার তোড়, রোদ এবং সাইকেল চালিয়ে আসায় সে ঘামছিল দরদরিয়ে। বলল, 'এখুনি বাস আছে। তুমি বাসে চল। আমি আসছি তোমার পিছনে।'

মাস্টার বললেন, 'পিছনে আসতে হবে না। আমার সঙ্গেই চল। সাইকেল কোন দোকানে রেখে দেও, না হলি নে চল। এখুনি ছাড়লি বাসের মাথায় তুলে দিতি বলব।'

তেমনি করেই এলেন দুজন। নামলেন বালকি-র মোড়ে। হাতের প্যাকেট হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে সঞ্জয় সিটে উঠে বসতেই মাস্টার উঠে বসলেন ক্যারিয়ারে।

সংবাদটা এখনো বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না তারামাস্টার। মশলাপাতি কিনতে কিনতে ভাবছিলেন অবনীর ছন্নছাড়া স্বভাব আর অভাবের কথা। জমিজিরেত শেষ করে এবার সে হাত দিয়েছে ভিটেবাড়ির গাছে। সবগুলিই ফলন্ত। আজ কোনটি শেষ করছে কে জানে। তেঁতুলগাছের নিচে করাতী বসে থাকার কথা শুনেও তাদের যে তেঁতুলগাছ কাটতে আনা হয়েছে ভাবনায়-ই আসেনি মাস্টারের। অবনীদের বিঘেটাকের ভিটেবাড়ি। তেঁতুলগাছের পাশের জমিতে তারা তরকারির চাষ করে। লাঙ্গল দেবার সময় প্রতিবারই একটু করে ঠেলে আনে আল। প্রথমদিকে দু'একবার অবনীকে বলেছিলেন মাস্টার। সে আঁৎকে উঠে বলেছিল, 'তাই। এ গজুর কাজ দাদা। নতুন নাঙলে। ছেড়ে দেও, আমি

বলে দোবো।' গজু অবনীর বড় ছেলে। তাকে সে কিছু বলেছিল কিনা সে-ই জানে। গজুর আল ঠেলা বন্ধ হয়নি।

অবনী আর তারকেশ্বর ওরফে তারামাস্টার খুড়তুতো জেঠতুতো ভাই। বাবাদের আমলেই হাঁড়ি ভিন্ন হয়ে যায়। একই জমি—মাঝখানে আল পড়ে হয় দু'টুকরো। ও প্রান্তে তারকেশ্বরের কাকা, এ প্রান্তে বাবা। ও প্রান্তেই ছিল ঘরদোর। বাবা এ প্রান্তে নতুন করে বাঁধেন। অপেক্ষাকৃত খারাপ ছিল এদিকের জমি। কিন্তু বাবা গ্রহণ করেন স্বেচ্ছায়। কারণ তেঁতুলের চারাটা ছিল এপাশেই। সংসারে অনটন ছিল। আর একটু না গুছিয়ে বাবা বিয়ে করতে চাননি। কিন্তু মায়ের রূপ দেখে নাকি মাথা ঘুরে গিয়েছিল ঠাকুরদার। কোন কিছুর কারণে রূপসী কন্যার বিবাহ তো কোনকালেই আটকে থাকেনি, পাছে হাতছাড়া হয়ে যায় সুপাত্রী— তাই বাবার অমতেই তাঁকে বিয়ে দিয়ে এনেছিলেন ঠাকুরদা। তাঁকে তারামাস্টার মনে করতে পারেন না। নাকি ভীষণ মেজাজী ছিলেন। তাঁর মুখের উপর তো অনেক বড় কথা, আড়ালও তাঁর সম্পর্কে কটু আলোচনা করতে পারতেন না বাবা। তাঁর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়েছিল মায়ের উপর। বহুদিন তাঁকে চোখ তুলে দেখেননি। কিন্তু নিজস্ব চলনে সে কথা কখনোই প্রকাশ হতে দেননি মা। তাহলে যে তেড়ে আসবেন শ্বশুরমশাই। জানাজানি হবে। পাঁচজনের চোখে ছোট হয়ে যাবেন স্বামী। মা বরং চেষ্টা করতে থাকলেন তিনি যেমন করে কাজ করা পছন্দ করেন, ভালবাসেন যেমন খাবার খেতে কিংবা পোশাক পরতে, যথাসময়ে তেমনি সব তাঁর হাতের কাছে যুগিয়ে দিয়ে প্রিয় হয়ে উঠতে এবং উঠলেনও তাই। ভরা শ্রাবণের যে রাতে প্রথম তাঁকে চোখ তুলে দেখেছিলেন বাবা— তার পরদিন সকালে প্রবল খুশিতে যখন ছটফট করছিলেন মা— সে সময় হঠাৎ হাতের কাছে তেঁতুলবীজ পেয়ে বসিয়ে দিয়েছিলেন বাগানের জমিতে। সেটুকুনিই জানতেন বাবা। অন্য গাছপালার মধ্যে কবে সেই বীজ থেকে চারা হয়েছে জানতেন না। হয়তো মাও ভুলে গিয়েছিলেন। তারামাস্টারকে পৃথিবী দেখাতে গিয়ে মৃত্যুর মুখ দেখলেন মা। তারপরই একদিন গাছটা আবিষ্কার করেন বাবা। জড়িয়ে ধরেন। চারপাশের গাছপালা কেটে তাকে আলো দেখার সুযোগ করে দেন। কাকার সঙ্গে মতান্তরে অন্ন পৃথক হয়ে গেলে তেঁতুলগাছের পাশে এসে বাড়ি করেন বাবা। কত সুখ কিংবা দুঃখের দিনে এই গাছের গায়ে হাত রেখে তাঁকে বিড়বিড় করতে দেখেছেন তারামাস্টার। কত জরুরি বৈষয়িক সিদ্ধান্ত নিতে দেখেছেন তেঁতুলতলায় বসে। আর যখন ঝড় হত— কিছুতেই ঘরে আটকে রাখা যেত না বাবাকে। গাছের গোড়ায় ছুটে গিয়ে তার গায়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকতেন। হয়তো বলতেন, 'ভয় কি! এই তো আমি আছি।'

সজ্ঞানে এই গাছকে কখনো অযত্ন করেন নি মাস্টার। চৈত্রের প্রথমে গোড়া কুপিয়ে ব্যবস্থা করতেন নিয়মিত জল ঢালার। পাতা কিংবা গায়ে পোকা হলে স্প্রে করতেন কীটনাশক। সদাই চোখে চোখে রেখেছিলেন। রাখতেনও আমৃত্যু। চোখের আড়াল হবে বলে ভিটাবাড়িও বদলাতে চাননি। কিন্তু এমন বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল গজু। মদ-জুয়ায় সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল অবনী। ছেলেদের মানুষ করতে পারেনি। সংসারের হালে পানি আনতে ব্ল্যাকমার্কেটিয়ারদের দলে যোগ দিয়েছিল গজু। গুণরাজপুর হয়ে লবঙ্গ, এলাচ, মোটরগাড়ির পার্টস, দামী ঘড়ি আনত বাংলাদেশ থেকে। আজও আনে। টাকা অন্যের। মাঝখান থেকে সে পায় দালালী আর ঝুঁকিযুক্ত মাল বওয়ার পারিশ্রমিক। অষ্টপ্রহর বাড়িতে লেগে থাকত অসামাজিক লোকের ভিড়। সাইকেল নিয়ে অনেকেই দাঁড়িয়ে থাকত তেঁতুলগাছতলায়। উঁকিঝুঁকি মারত। জিজ্ঞেস করলে বলত, 'গজু দাঁড়াতে বলেছে।' কিংবা

'গজুরে খুঁজছি।' বড় মেয়ে মায়া তখন বিয়ের যুগ্যি। সাবধান হয়েছিলেন মাস্টার। জমি ছিল রাস্তার ধারে। উঠে এসেছিলেন অনন্যোপায় হয়ে।

প্রথমদিকে প্রতিদিন যেতেন পুরনো ভিটেয়। সময় করে দিনের কোন না কোন সময়। ঘরদরজার সঙ্গে গাছটাও দেখা হয়ে যেত। ঘর ভেঙে চালচুলো-দরজা-জানালা খুলে আনার পর স্বাভাবিক ভাবেই পুরনো মায়া কমে যায়। সেই সুযোগটাই ব্যবহার করে অবনী কিংবা গজু। কিংবা দুজনেই। খেতে লাঙ্গল দেবার সময় প্রতিবার একটু একটু করে আল ঠেলে দখল নিতে থাকে এদিককার জমির। প্রথমবারের পর আরো দু'একবার অবনীকে বলেছেন মাস্টার। অবনী শুনেছে আর কান থেকে বের করে দিয়েছে। সঞ্জয়ের মা বলেছে, 'পাড়ার লোকদেরও জানাও। বিচার করুক তারা।' দশ পা পিছিয়ে এসেছেন মাস্টার। চিরকাল তিনি প্রতিবেশীদের ঝগড়াবিবাদ মিটিয়ে এসেছেন, এখন তাদের কাছেই চাইবেন নিজের বিচার। তাও আবার ভাই-ভাইয়ের ঝগড়ার। তা তিনি পারবেন না। এমনিতেই অনুর্বর ওখানকার জমি। ঠেলুক না, কত জমি বের করে নেবে অবনীর ছেলেরা। কিন্তু জমির লোভ বড় মারাত্মক। আর ঠেলা যার অভ্যেস সে কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারে না। আলছাড়া পাঁচ হাত ভিতরে ছিল তেঁতুলগাছ। সরে আসতে আসতে গত বর্ষায় সেই গাছকে সীমানায় এনে দাঁড় করিয়েছিল গজুরা। জমির জন্যে নয়, গাছটির স্বার্থে সরব হবেন ভেবেছিলেন মাস্টার। কিন্তু ঠিক তখনি, চাকরি জীবনের এই সায়ংকালে জড়িয়ে গেলেন এক অভিনব মামলায়। ছাত্রছাত্রীরা অবাধ্য হলে, পড়া না করলে মারধর করতেই হয়। গাজীপাড়ার মালেক গাজীর ক্লাস থ্রি-র মেয়ে ইমতিআরার হাতে ছড়ি চালাতে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। তার জ্ঞান ফেবাতে সহকারী শিক্ষকদের নিয়ে চেষ্টা করেও সফল হতে না পেরে ডাক্তার ডেকেছিলেন তারামাস্টার। ততক্ষণে হৈ-চৈ হয়ে গেছে চারদিকে। মাঠের কাজ ফেলে দৌড়ে এসে মালেকরা ক'ভাই প্রথমেই চড়াও হল মাস্টারের উপর। বিনিময়ে বসিরহাট কোর্টে গিয়ে মামলা ঠুকে দিলেন মাস্টার। যেতেই হল। মরমে মরে গিয়েছিলেন তিনি। লজ্জায় পথে বেরোতেন না। সহকারী শিক্ষকরা আর মহকুমা শিক্ষকসমিতিই তাঁকে বাধ্য করেছিল মামলা করতে। বুঝিয়েছিল, বিষয়টি তাঁর একলার নয়। প্রশ্ন এখন তাঁদের সকলের নিরাপত্তার। অবাধ্য হলে ছাত্রছাত্রীদের মারতেই হয়। হাতে ছড়ি পড়লেই কেউ যদি অজ্ঞান হয়ে যায়—ইস্কুলে উঠে তার বাপ-চাচারা মারবে মাস্টারমশাইকে। এমনও তো নয়, অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মেয়ে—তাঁরা তার তদ্বির করেননি। ন'মাস চলে সেই মামলা শেষ হল গত মাসে। কোর্টের নির্দেশে মালেক গাজীরা এসে এক সভায় ক্ষমা চেয়ে নিল দশজন গণ্যমান্যের সামনে। এর আগেই ছেলের মুখে একদিন মাস্টার শুনলেন, এবারের বর্ষাকালীন চাষের সময় আরো সরে এসে গাছ আলের বাইরে বের করে নিয়েছে গজু। এ নিয়ে নাড়াচাড়া করলেই এখুনি নতুন ঝামেলা ঘাড়ে এসে পড়বে, জানতেন মাস্টার। তাই তিনি চুপ করেই ছিলেন। ভেঙেও পড়েছিলেন ভিতরে ভিতরে। কি হল মানুষের। ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায়, অধিকার-বোধ, আইন মেনে চলা উঠে গেল সবার থেকে। ছুটে গিয়েছিলেন গাছের গোড়ায়। অবস্থা দেখে চমকে উঠেছিলেন। ডেকে পাঠিয়েছিলেন অবনীকে। অবনী আসেনি। বলে পাঠিয়েছিল, 'ছেলে আমার কথা শোনে না। তবে দাদা ভয় পাচ্ছে কেন। গাছ আমার ছেলের দিকি বেরুয়ে আসলিও— ফল খাবে দাদার ছেলেই।'

এটি কোন ভাল কথা নয়। মাস্টার শুধু অপেক্ষায় ছিলেন চলতি মামলাটি ঘাড় থেকে নেমে যাবার। তা যেতেই লোকজন ডাকার কথা ভাবছিলেন তিনি। আমিন এনে মাপজোখ করার কথা ভাবছিলেন। এর মধ্যেই এই—

উঃ করে উঠেই চেপে গেলেন মাস্টার। সঞ্জয়ের কিছু করার নেই। তার জোরে চালাবারই কথা। রাস্তার বেহাল হালেই সাইকেল লাফাচ্ছে। ভাল করতেই চেয়েছিল খগেন মণ্ডল। কাদা হয় বলে লোকজন ধরে নিজের টালির কারখানার ঘেঁষ এনে ফেলেছিল রাস্তায়। কাদা হয়নি ঠিকই কিন্তু বর্ষায় গুঁড়ো ঘেঁষ ধুয়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ইটের টুকরো, টালির ভাঙা অংশ। প্রায় গোট রাস্তাটাই এখন কাঁঠালের গা। ফলে ধাক্কাধাক্কি তো অনিবার্যই। আর একটু। সামনের মোড়টা ঘুরলেই নতুন বাড়ি। সেখান থেকে পুরনো ভিটে মিনিট তিনের রাস্তা।

রাস্তার উপরেই দাঁড়িয়ে ছিল চারুবালা। স্বামীপুত্রকে দেখেই পথ আগলে দাঁড়াল। তাকে পাশ কাটিয়ে ছেলেকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন তারামাস্টার। সঞ্জয় তাই-ই করল। চারুবালা পিছু পিছু দৌড়ে এল খানিক। স্বামীপুত্রকে না যেতে অনুরোধ করল। বলল, 'ওরা কোমর বেঁধে লেগেছে। তোমরা পারবো না। যেও না ওখানে। কোন দরকার নেই যাওয়ার।'

'বলছ কি! ক্যারিয়ার থেকে গভীর বিরক্তিতে চেঁচিয়ে উঠলেন মাস্টার। 'ওরা গাছ কেটে ফ্যালবে আর আমরা বাড়ি বসে থাকপ!'

'কি করবা! পারবা তোমরা ওদের সঙ্গে? লোকজন আছে?

'চিনুদের ডেকে নে যাচ্ছি।'

'ওরা তোমার পক্ষে কতা বলবে! বুনির বে-র সেই অপমানের কতা ওরা ভুলিনি, মনে নেই! চারুবালা থেমে গেল। হাঁপাচ্ছিল।

তিনি আবার কবে অপমান করেছিলেন ওদের! ওরাই তো অপমান করেছিল তাঁকে। রাধার বিয়ের রাতে উঠোনভরা নতুন কুটুম্ব, পাড়া-প্রতিবেশীদের সামনে জ্ঞাতি বড়ভাই হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল অবনীকে। কারণ তার ক'দিন আগেই পুকুরে মাছধরা নিয়ে চিনুর ঝগড়া হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। শরিকী পুকুর। মাছ ছাড়া হয় ভাগে। ধরার সময় জিজ্ঞেস করতে হবে না! বলতে গিয়েই দোষী হয়েছিলেন তিনি। পাস্তাপাড়ার বর। হাটেঘাটে কতজনের সঙ্গেই চেনা পরিচয়। বরকর্তা উঠে তারামাস্টারকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ও মশাই, আপনি তালি এদের কে? ম্লানমুখে মাস্টার বলেছিলেন, 'মহাশয়, অপরাধ নেবেন না। চিনু ছেলেমানুষ— তাই কদিন আগের ঝগড়ার কথাডা মনে রেকেছে। আসলে এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমিই এদের বড় ভাই।'

গ্রামীণ বরযাত্রীদের কৌতূহল একটু বেশিই হয়। পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন বরকর্তা, 'ও, তা মহাশয় ঝগড়াডা কি নে জানানো হোক।'

'মহাশয়, সে নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার।'

'সেজন্যিই তো শোনবার প্রেয়োজন। দেখতি চাচ্ছি কোন ঝগড়াটে গুষ্টিতি আমি আমার ভাইপোর বে দিতি আসিনি তো!'

অগত্যা বলতেই হয়েছিল সবিস্তারে। তাতে মান গিয়েছিল চিনুর।

হুড়মুড়-ঝপাত করে ডাল পড়ার শব্দ হল। ককিয়ে উঠলেন মাস্টার। সঞ্জয়কে নেমে পড়তে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কি হল তোর, নাবলি কেন!' ছেলে চেন ঠিক করছে দেখে বাকি পথটা তিনি দৌড়েই পৌঁছে গেলেন।

এইমাত্র শেষ ডালটি কেটে নামিয়েছে করাতীরা। গোড়ায় করাত চালাবার আগে সবাই বিড়ি ধরিয়েছে। চারদিক একেবারে ফাঁকা। মাথার উপর থেকে হঠাৎ ছাদ উড়ে গেলে যেমনটা হয়। হা-হা, শূন্য। তীরবেগে গিয়ে গাছ জড়িয়ে ধরে ডুকরে উঠলেন মাস্টার। করাতীরা ভেবাচেকা। তাকাল দূরে বসা গজুর দিকে। গজু চেঁচিয়ে বলল, 'আমার জেঠা। মাথার গোলমাল আছে। বিড়ি খাওয়া হলি কাজে লাগো তাড়াতাড়ি।'

মাথায় খুন চেপে গেল মাস্টারের। দৌড়ে গিয়ে টুঁটি চেপে ধরলেন গজুর। কিন্তু তিনি তার সঙ্গে পারবেন কেন! গজুর সঙ্গে তার ভাই হাবু, ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার বন্ধুরাও রয়েছে। বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে সঞ্জয়ও মার খেল। ছুটে এসে ফের গাছের গোড়া জড়িয়ে ধরলেন মাস্টার। 'গজু— তোর বাবাকে ডাক। কোতায় সে গা-ঢাকা দেছে! ডাক তারে। সেই বলুক কার এই গাছ! সঞ্জয়, পাড়ার মাতব্বরদের ডেকে আন্। ছুটে যা। সোগুলিই তো জানে এই গাছ কাদের! করাতী ভাইরা এসো, আগে আমারে কাটো, তারপর আমার মা-রে।'

রক্তবর্ণ হয়ে এগিয়ে লাফিয়ে এল গজু আর তার শাগরেদরা। মাস্টারকে টেনেহিঁচড়ে সরিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু হাজার হুঙ্কার আর অর্থের প্রলোভনেও গাছ কাটতে রাজি হল না করাতীদের বৃদ্ধ দলপতি। সে বার বার বলতে থাকল,'গাছ কাটতিই তো আমরা আইচি বাবুরা। কিন্তু আপনারা আগে তোমাদের বিবাদ মিটুয়ে ফেল। এ গাছ কার? কার গাছ কাটতি আইচি আমরা, সেইডা ঠিক কর আগে!'

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর বিশ্রামে ছিল মাতব্বরেরা। কিন্তু মাস্টার ডাকছে, সঞ্জয় ডাকতে গেছে বলে কেউ-ই না এসে পারল না। বিনি আহ্বানে সবার আগে এল গাজীপাড়ার মুসলমান আর পাড়ুইপাড়ার পাড়ুইরা। বিকেলের কাজে যাওয়া ফেলে এল আরো কত লোক । গ্রামগঞ্জে মজা দেখতে যেমন করে হাজির হয় সব।

মাতব্বররা হাজির হতেই তাদের সামনে হাতজোড় করে কেঁদে পড়ল গজু। 'আমার মাল ধরা হয়েছে হাকিমপুরে বডারে। তিনদিনির মদ্দি মালিকরে টাকা ভজিয়ে না দিতি পাল্লি মালিক আমারে জানে মেরে দেবে। তাই আমি গাছ কাটছিলাম। এই দেখেন আল। আপনরাই বলেন, এ গাছ কার?

মাতব্বরদের সবাইকে বোঝাতে চাইলেন মাস্টার, 'আপনারা তো জানেন, এ পাশের জমি আমার, এ গাছ আমার মা-র হাতের লাগানে, আল ঠেলে গজু গাছ বের করে নেছে বলে গাছ তার হয়ে যাবে! ওরে গাছ কাটতি আপনারা নিষেধ করেন।' কিন্তু এত কথার পরেও মুখ খোলে না মাতব্বরেরা। তারা কথা বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে নিজেদের চোখ আর সাক্ষিসাবুদ। জ্বলজ্বলে আল পরিষ্কার সাক্ষি দিচ্ছে তেঁতুলগাছ গজুদের। কি তারা জানে সেটি বড় কথা নয়। কি তারা দেখছে সেটিই বড় কথা।

চিনুর হাত জড়িয়ে ধরলেন মাস্টার। 'ভাই, তুই অন্তত বল এ-গাছ আমার!'

মুখ ঘুরিয়ে নিল চিনু। সাধারণের চেয়ে বেশি বুদ্ধির কারণে কিংবা সমাজবিরোধীদের ভয়ে মাতব্বররাও নিশ্চুপ, দ্বিধাগ্রস্ত। গজুর আহ্বানে এবার উঠে দাঁড়াল করাতী বুড়ো। সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গীরাও। করাত তুলে নিল হাতে। এতক্ষণে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল যুবকদের। আগে লাফিয়ে এল কালু গাজীর ছেলে। তারপর ঘোষবাড়ির কানাই, তিনকড়ি মণ্ডলের নাতি হলধর। তারপর একে একে অনেকে। মুহূর্তে গাজী-মণ্ডল-বোস-চৌধুরি মিলেমিশে একাকার। লাফিয়ে এসে তারা ঘিরে ফেলল তেঁতুলগাছ। আওয়াজ ছাড়ল, 'খবদ্দার, এই গাছে কেউ হাত দেছে কি খুনোখুনি হয়ে যাবে। এ গাছ আমাদের মাস্টারমশার। কতদিন তেঁতুল পাড়িছি আমরা।' হলধর বলল, 'ঢিল মেরে তেঁতুল পাড়ছিলাম একদিন। দেখতি পেয়ে মাস্টারমশার সেকি তাড়া! পরাণদের ডেরেন গে উল্টে পড়েলাম। তা দেখ মাস্টারমশাই আমারে কোলে তুলে নেয়। পাড়া তেঁতুল তো আমারে দেয়ই। গাছ থেকে নিজেও পেড়ে দেয় আরো।' আব্দার গাজী বলে, 'এই গাছের তলায়পড়া পাকা তেঁতুল দে পান্তা খেয়ে আমরা ভাইবুন মানুষ। আজ শুনতিছি এ গাছ গজুদের!' আরো অনেক যুবক বলতে থাকে আরো সব স্মৃতিকথা।

এবার বোধহয় সাহস হয়, বুদ্ধি খোলে মাতব্বরদের। সমবেতভাবে পরামর্শ করে গজুদের বলে, 'ঠিক আচে বাপু, তোমরা আজগের দিনডে গাছ কাটা বন্দ কর। কাল আমিন আনবে মাস্টার। আমরা সোগুলি থাকপ। মেপে যদি গাছ পাওনা হয় তোমাদের— কেটো, মাস্টার আর বাধা দেবে না।'

এ প্রস্তাবে গজুদের রাজি হবার কথা নয়। তারা চড়ে ওঠে। আর ছেলেরা বুঝি এর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। হাতের কাছে যে যা পায় তাই নিয়ে তাড়া করে গজুদের। বেগতিক দেখে কেটে পড়ে করাতীরাও। মুহূর্তে সাফ হয়ে যায় তেঁতুলতলা। মাস্টারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে, আল ঠেলছে দেখেও তিনি কেন তাদের জানাননি— তার জন্যে ভর্ৎসনা করে, গাছকে মেলা মা-মা করার দরকার নেই—লোকে পাগল বলবে, বলেটলে এবং কোন ভয় নেই— তারা পিছনে আছে জানিয়ে, একে একে চলে গেল সবাই। ছেলেদের দলে যার যার ছেলে ছিল— যাবার সময় নানা ছুতোয় ডেকে নিয়ে গেল তাদেরও।

বাকি ছেলেদের কারো হাত জড়িয়ে ধরে, কারো পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে, পরম স্নেহে কারো মুখ বুকে টেনে নিয়ে কৃতজ্ঞতা জানালেন মাস্টার। সকলকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। কেউ নড়তে চাইছিল না। মাস্টার বোঝালেন, 'তোমরা যে তাড়া করেছ— ওরা আর ফিরে আসবে না। হাজার হলুও ওরা অপরাধী। ভীতু ওরা। তোমরা যাও। প্রয়োজন হলি আমিই তোমাদের ডেকে পাঠাব।'

সবাই চলে গেলে বাবাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চেষ্টা করল সঞ্জয়। কিন্তু মাস্টার গোঁজ হয়ে বসে রইলেন গাছের গোড়ায়। অগত্যা বাড়ি গিয়ে সে মাকে নিয়ে এল।

কি উদ্বেগে যে ঘরবার করছিল চারুবালা— সে-ই জানে। তেমনি একটা লোক পাওয়া যায় নি— যাকে বাড়ি দেখতে বলে এখানে এসে দাঁড়াবে। যাকে পাচ্ছিল— তার কাছেই সংবাদ নিচ্ছিল। ছেলেরা ফিরছে দেখে তাদের দুজনকে দাঁড় করিয়ে কেবল বেবোবার উদ্যোগ করছিল, সেসময়ই সঞ্জয় গেল তাকে আনতে। তাকে দেখেই শিশুর মতন ফুঁপিয়ে উঠলেন মাস্টার, 'দেখ, দেখ চারু, এরা আমার মা-র কি দশা করেছে দেখ। আর কি বাঁচপে আমার মা! কত ফল দেছে আমারে! যেবার টর্ণেডো এল— নিজির ডালপালা ভেঙে রক্ষে করেছে আমরে। একফোঁটা ঝড় ঘরে লাগদি দেয়নি। অথচ আমি আমার মা-র হাত পা রক্ষে কত্তি পাল্লাম না! আর কি বাঁচপে আমার মা!'

কান্নায় গলা বুজে এসেছিল চারুবালার। কোন রকমে বলল, 'বাঁচপে। আমার মন বলচে আমাদের জন্যি ঠিক বেঁচে ওঠপে মা। দেখো।'

তিনজনে ঘিরে বসল গাছকে। তারামাস্টার গাছে মাথা ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'তোমার অনেক অযত্ন হয়েছে মা। আর হবে না। কথা দিচ্ছি, এই ভিটেতেই ঘর বাঁধব আবার। তোমারে চোখে চোখে রাখপ। শুধু এইবারডা, এইবারডা তুমি আমারে ক্ষমা করে দেও। বেঁচে ওঠো তুমি।'

তারামাস্টারের মনে হল সাড়া দিচ্ছে মা। তিনি মাথা তুললেন। দেখলেন, ডালপালায় ভরে যাচ্ছে মায়ের মাথা, শরীর। হাওয়া এল। এল পাখিরা। ঝমঝম করে বৃষ্টি আসতেই চোখ নামালেন মাস্টার। রোদ উঠল। আবার বৃষ্টি। দেখলেন একটা গাছ, দুটো গাছ। চারপাশে পরপর জন্মে উঠল আরো কত গাছ! কত মা। তারামাস্টারের চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল। বড় বড় করে চোখ মেলে দেখছিলেন, সব গাছের তলাতেই হাত-ধরাধরি করে খেলছে ফুরফুরে ছেলেমেয়ে।

জাঁতাকল

নজরুল ইসলাম

নরেন এসে বলল, 'রাধাদা তুমি নাকি বিয়ে করছ?' এমনভাবে বলল যে এর থেকে মজার খবর আর হয় না। নরেনের মজা গায়ে না মেখে রাধা সোজা হয়ে দাঁড়াল। বিষচোখ নাচিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করল, 'কেন, আমি কি বিয়ে করতে পারি নে?'

'পারবে না কেন? এতদিন করনি তো, তাই বলছি। তার ওপর তুমি আবার রাধা!' নরেন দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

রাধার হাড়-পিত্তি জ্বলে গেল। ভগবান তো তাকে মেরেই রেখেছে, বাবা-মাও ছাড়েনি। এমন নাম রেখেছে যে মেয়ে মেয়ে মনে হয়। ছেলেবেলায় একবার অনুরোধ করেছিল। বাবা ব্যাখ্যা করে বলল, 'তোর নাম তো রাধা নয়—রাধানাথ।' সেটা তো সেও জানে। কিন্তু বন্ধুরা কি মানে? তারা বলে, 'তুই তো রাধা রে। কৃষ্ণের প্রেমিকা। তোর আবার বিয়ে কি?' সব সময় হাসাহাসি করে। যেন সে একটা জলজ্যান্ত অসঙ্গতি!

অসঙ্গতি তো বটেই! তার বয়স এখন আটত্রিশ। তার পূর্বপুরুষেরা এই বয়সে সংসার ত্যাগ করার কথা ভাবত। তার এখনও বিয়েই হল না।

না হোক, সে কারও হাসির খোরাক হবে না। নরেনের হাসিকে সে পাত্তা দিল না। ঝাঁপে ঠেকা লাগিয়ে টুলের ওপর বসল। প্লাসটিকের প্যাকেট থেকে সীলগুলি বের করে টেবিলের ড্রয়ারে রাখতে লাগল।

নরেন বুঝল সুবিধা হবে না। সে চলে গেল। টুলের ওপর বসে রাধার অনেক কথা মনে পড়তে লাগল।

পড়াশোনায় সে কোনদিনই ভাল ছিল না। পরপর তিনবার পরীক্ষা দিয়েও স্কুল ফাইনাল পাস করতে পারেনি। দাদা ততদিনে বি এ পাস করে ফেলেছে। বাবা কলকাতার রায় অ্যান্ড রায় কোম্পানিতে কাজ করতেন। রিটায়ারমেন্টের সময় বলে কয়ে দাদাকে ওখানে ঢুকিয়ে দিলেন। দাদার বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগল।

মা বলল, 'রাধারও দিয়ে দাও, সংসারী হোক।'

বাবা ফুঁসে উঠল, 'বললেই হল! নিজে তো বাবার হোটেলে খাচ্ছে। বৌকে খাওয়াবে কে?

'কে আবার খাওয়াবে? ও-ই খাওয়াবে।'

'কী করে?'

'কাজ করে।'

'ও কী কাজ করবে?'

মা বড় মুখ করে বলেছিল, 'ব্যবসা করবে।'

ব্যবসাই সে করছে। কিন্তু মাও কি ভাবতে পেরেছিল, এরকম ছ্যাঁচড়া ব্যবসা করতে সে বাধ্য হবে? অবশ্য বাবা রিটায়ারমেন্টের সময় পাওয়া টাকা দিয়ে মোড়ের মাথায়

তাকে একটা মণিহারি দোকান করে দিয়েছিল। সে দোকান রাধা বেশিদিন চালাতে পারল না। বছর খানেকের মধ্যে ফেল মেরে দিল।

মা মনের দুঃখ মনে নিয়েই ইহলোক ত্যাগ করল।

তখন বাড়িতে রাধার একমাত্র ভরসা বৌদি। বৌদি তার সমবয়সীই। কিন্তু তাকে মায়ের মতই স্নেহ করত।

ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সে চাকরি পেল। বাড়িতে ঘন ঘন সম্বন্ধ আসছে। বৌদি বলল, 'মেজরও হোক।' বাবা পাত্রী খুঁজতে লাগল। কিন্তু তার মত ছন্নছাড়া, বেকার ছেলের সঙ্গে কেউ মেয়ের বিয়ে দিতে চাইবে কেন? পছন্দ মত মেয়ে পাওয়া গেল না। বিয়েও হল না।

একদিন ঘটনাক্রমে রাধা বন্ধুদের সঙ্গে ছোট ভাইয়ের কথাবার্তা শুনে ফেলল। এক বন্ধু ভাইকে বলছে. 'মেজদার বিয়ে হবে তারপর? তা হলেই হয়েছে! ভেবেছিস, তোর ঐ দামড়া দাদার মেয়ে জুটবে? ততদিনে মেয়েটা হা-পিত্যেশ করে বসে থাকবে?'

ভাই কী বলল সে শুনতে পেল না। তবে কদিন পরেই জানতে পারল, ভাই রেজিষ্ট্রি ম্যারেজ করেছে।

রাধার মনে ধিক্কার লাগল। সেদিনই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। এসে উঠল মহাদেবদার কাছে। মহাদেবদা তখন এই চালা ঘরে ক্লিয়ারিং এজেন্ট।

মহানগরের সীমানায় এই জাঁতাকল চেক পোস্ট। তালিকাভুক্ত কোনও মাল নিয়ে মহানগরে ঢুকতে হলেই চুঙ্গি কব দিতে হয়। ক্লিয়ারিং এজেন্টরা সেই কর জমা দিতে সাহায্য করে। এক পারসেন্ট কমিশন পায়। রাধা মহাদেবদার চালা ঘরে বসে থাকে। বোঝাই লরি এলেই ছুটে যায। ড্রাইভারকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মহাদেবদার কাছে নিয়ে আসতে পারলেই পাঁচটা টাকা পায়।

ড্রাইভারের সঙ্গে কথা হয়ে গেলে মহাদেবদা বিল-চালানগুলো এগিযে দেয়। বাধা ফর্ম ফোর পূরণ করে শিফট ইন্সপেক্টারের কাছে জমা দেয। অ্যালোটমেন্ট হলে অ্যাসেসমেন্টের জন্য নির্দিষ্ট কাউন্টারে দাঁড়ায়। অ্যাসেসমেন্ট হয়ে গেলে মহাদেবদাব কাছ থেকে টাকা নিয়ে ক্যাশকাউন্টারে জমা দেয়। ফর্ম ফাইভে রসিদ নিয়ে আসে। ফর্ম ফাইভের নম্বর দিয়ে ড্রাইভারকে রসিদ লিখে দেয়। মালের মালিকের কাছে টাকা আনতে যায়। টাকা আদায় হলেও মহাদেবদা পাঁচ-দশ টাকা দেয়। রাধার কোনওরকমে চলে যায়।

দশ বছব এভাবেই চলছিল। গত বছর মহাদেবদা চেক পোস্টের পাশে একটা জমি কিনে দোতলা বাড়ি করেছে। ওপরের তলায় ফ্যামিলি নিয়ে থাকে। নিচে বিরাট অফিস। চালা ঘরটা রাধাকে ছেড়ে দিয়েছে। রাধা এখন নিজেই ক্লিয়ারিং এজেন্ট। গণেশ তার অ্যাসিস্টেন্ট। দশ বছরে চেক পোস্টের ঘাট-ঘোট সে ভালই রপ্ত করেছে। কারবার খারাপ চলে না। গণেশকে দিয়ে-থুয়েও মাসে দু-আড়াই হাজার টাকা থাকে।

রোজগার বাড়তেই সে বাড়িতে ফিরে গেছে। বৌদি কয়েকবারই লোক পাঠিয়েছিল। সে যাযনি। গত মাসে দাদা এসে ধরে নিয়ে গেছে। দাদাই পাশের গ্রামের দত্তদের বড় মেয়ে, রমার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ করেছে। রবিবার সে বৌদির সঙ্গে দেখতে গিয়েছিল। রমার মুখখানা বেশ মিষ্টি। রাধা মুখখানা মনে করার চেষ্টা করছিল।

একটা বোঝাই লরি এসে থামল। গণেশ এখনও এসে পৌছায়নি। রাধা টুল থেকে উঠে এগিয়ে গেল। ততক্ষণে আরও অনেকে এসে গেছে। সক্কলেরই লক্ষ্য লরির ড্রাইভার।

ফুটবল মাঠে একটা বল নিয়ে বাইশ জন প্লেয়াব কাড়াকাড়ি করে। আর এন্ট্রিট্যাক্স চেক পোস্টে এক ড্রাইভারকে ধরে বত্রিশ জন ক্লিয়ারিং এজেন্ট টানাটানি করে। ফলে ড্রাইভারদের পোয়া বারো।

হাতের বিল-চালানগুলো রাধাকে দিয়ে ড্রাইভার বলল 'বাবু বলিয়েছেন, এক হাজার রূপেয়ার বেশি দিতে পারবেন না।'

'এক লরি কাপড় আছে। এক হাজারে কী করে হবে? তা হলে তো ভাগাতে হবে।'

'ভাগাতে হয়, হাঁকাতে হয়, সেটা আপনার বেপার। এখন বলুন, আপনি পারবেন, না আওর কারও কাছে যেতে হবে?'

'আর কারও কাছে গিয়ে লাভ হবে? দেখলেন তো, এক হাজার শুনেই সব কেটে পড়ল!'

ড্রাইভার কোনও উত্তর দিল না।

বিল-চালানগুলো নিয়ে রাধা টুলের ওপর বসল। ওপাশ থেকে বলাই এসে হাতের ইশারা করে ডাকল।

'এক মিনিট বসুন', বলে রাধা টুলের ওপর থেকে উঠে বলাইয়ের কাছে এগিয়ে গেল।

বলাই বলল, 'একুশ তারিখ আশীর্বাদ করতে যাওয়ার দিন ঠিক হয়েছে। তা কী দিয়ে আশীর্বাদ করবি?'

'দাদার সঙ্গে কথা বল।'

'দাদা তো তোকে জিজ্ঞেস করতে বলল।'

রাধা মুশকিলে পড়ল। তার কাছে যা টাকা-পয়সা ছিল বিয়ের খরচের জন্য দাদার হাতে তুলে দিয়েছে। তারপরেও দাদা তাকে জিজ্ঞেস করতে বলছে!

'ঠিক আছে, আমি কাল তোকে বলব!'

বলাই চলে গেল। রাধা ভাবল, আজ যা পাবে তাই দিয়ে একটা সোনার আংটি গড়াবে।

একটুক্ষণ ভেবে সে মনস্থির করে ফেলল। গণেশকে চালায় বসতে বলে সে কাগজপত্রগুলো নিয়ে বাড়িতে গেল। টিনের বাক্সটা খুলে চেক পোস্টের জাল সীল বের করল। বিছানার তলা থেকে একটা ফর্ম ফাইভও। ট্যাক্স জমা দেওয়ার প্রমাণস্বরূপ জাল রসিদ তৈরি করল। জাল রসিদ নিয়ে চালা-ঘরে এল। ড্রাইভার তখনও বসে ছিল। তাকে রসিদের একটা কপি দিয়ে বলল, 'এখন নয়, সন্ধ্যাবেলায়, শিফট চেঞ্জের সময় ভাগবেন।'

প্যাট্রলম্যানের হাতে কিছু দিয়ে রাখতে হবে। মান্থলিটাও মিটিয়ে দিতে হবে। বাঁ পকেটে একটা দশ টাকার নোট এবং ডান পকেটে একটা খামে করে একটা এক শ টাকার নোট দিয়ে সে এক পা দুপা করে হাঁটতে লাগল।

শিফট চেঞ্জ হতে এখনও অনেক দেরি। তবে পরের শিফটের ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ, সলিল সেন, চলে এসেছে। ইশারা করতেই সে পিছনের দিকে এগিয়ে গেল। টাকার খামটা হাতে দিতেই তার মুখে সন্তোষের হাসি ফুটে উঠল।

রাধা সে হাসিতে যোগ দিতে পারল না। অতগুলো টাকা দিতে হওয়ার জন্য মনটা খচখচ করছিল। প্রতিমাসেই দিতে হয়। যতগুলো ক্লিয়ারিং এজেন্ট আছে সকলকেই এক শো-দু শো থেকে আরম্ভ করে পাঁচ হাজার সাত হাজার পর্যন্ত মান্থলি দিতে হয়। কারও কারও আবার লরির ওপর বন্দোবস্ত। লরি পিছু পাঁচ-দশ থেকে আড়াই শো-তিন শো পর্যন্ত দিতে হয়। তারপর পুজো স্পেশাল। তাকে এবার পাঁচ শো টাকা দিতে হয়েছে। প্রথমে সে দিতে চায়নি। বলেছিল, 'অত দিতে পারব না। একশো টাকা দেব।' সঙ্গে সঙ্গে একটা লরির ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশানের অর্ডার। লেবার ডাক, আনলোড কর। একশো টাকা কমিশনের জন্য দু শো টাকা লেবার চার্জ দাও। লরিটা একদিন আটকে থাকল। পাঁচশো টাকা ড্যামারেজ দাও। ঢাকের দায়ে মনসা বিকানোর থেকেও খারাপ

অবস্থা। তাতেও যদি রেহাই হত। সে এতদিনে যত লরি ক্লিয়ার করেছে, সব মালিককে নোটিশ দিয়ে ডাকা হতে লাগল। পরের দিন পড়ি-মরি করে সে পাঁচ শো টাকা দিয়ে দিল। প্রথমে না দিতে চাওয়ার জন্য হাত জোড় করে ক্ষমাও চাইতে হল।

এরপরেও আছে খুচরো আব্দার। আজ এ বাবুর বিয়ের নিমন্ত্রণ, একটা শাড়ি কিনে দাও। কাল সে বাবুর ছেলের উপনয়ন, একটা ঘড়ি কিনে দাও। পরশু ওবাবু মিষ্টি খেয়েছেন, দোকানের বিলটা মেটাও। তরশু কে বাবু স্টেশনে যাবেন, একটা লিফট দিয়ে দাও।

মহাদেবদার একটা গাড়ি তো সব সময় বাবুদের সেবায় নিয়োজিত। পরিবর্তে তার ঢালাও কারবার। দিল্লি-বোম্বাই-সুরাট-আমেদাবাদ-সব জায়গায় বিল-চালান এখানে জাল হচ্ছে। তা জমা দিলে লরি পার হয়ে যাচ্ছে। কেউ লেজ তুলে দেখছে না। রাধা সামনের দিকে তাকাল। মহাদেবদার গাড়িটা দেখতে পেল না। হয়ত রাস্তা ক্লিয়ার আছে কি না দেখতে গেছে। প্যাট্রলম্যানের হাতে দশটা টাকা ধরিয়ে দিয়ে সে চালায় ফিরে এল।

টুলের ওপর বসতেই তার ভাবী বধূর কথা মনে পড়ে গেল। আচ্ছা, রমা তার এসব কাজ পছন্দ করবে তো? প্রথম সুযোগেই তার সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে। আপাতত আশীর্বাদের আংটিটার অর্ডার দিয়ে দিতে হয়।

রাধা উঠতে যাচ্ছিল। ড্রাইভার এসে খবর দিল, 'গেট মে গাড়ি পাকাড় লিযা।'

রাধা ড্রাইভারের মুখের দিকে তাকাল। ড্রাইভার বলল, 'ম্যায় নে বোলা, লাইসিন ভি হ্যায়, পারমিট ভি হ্যায়, চুঙ্গিকা বিলটিভি হ্যায়। ফির ভি পাকাড় লিয়া।' রাধা বুঝতে পারল না। সে মান্থলি মিটিয়ে দিয়েছে। প্যাট্রলম্যানের পাওনাও চুকিয়ে দিয়েছে। তারপরেও গাড়ি ধরল কেন? ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, 'কৌন?'

'ও তো নেহি মালুম। বোলতা হ্যায়, এজেন্টকো বুলাও।'

রাধা গণেশকে পাঠাল। গণেশ ফিরে এসে জানাল, 'ই টি ও, স্বপন ব্যানার্জি ধরেছে।'

রাধার মেজাজটা খিচড়ে গেল। এই ই টি ওটা এক নম্বরের ছোটলোক। চামার। ঢেমনার একশেষ। লজ্জা তো দূরের কথা, মান-সম্মান বোধও নেই। তখন রাধা সবে মহাদেবদার কাছে ঢুকেছে। ট্যাক্স জমা দেওয়ার জন্য কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। স্বপন ব্যানার্জি এক শালওয়ালার কাছে শাল দেখছিল। প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে বলল, 'শালটা পছন্দ। কিন্তু বাড়ি থেকে টাকা আনতে ভুলে গেছি। আপনাদের কারও কাছে আছে। কাল দিয়ে দেব।'

'আমার কাছে আছে, নিন।'

শালের দাম তিনশো পঁচিশ টাকা রাধা গুনে দিয়েছিল।

চালায় ফিরতেই মহাদেবদা ঠাস করে চড় কষিয়েছিল।

'ওকে তুই টাকা দিতে গেলি কেন?'

'কাল দিয়ে দেবে তো...!'

'কাল দিয়ে দেবে! ওই বেটা টাকা ফেরত দেবে? কক্ষনও দেবে না। বরং চাইতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। লরির ফিজিক্যাল হবে।'

মহাদেবদার আশঙ্কাই সত্য হয়েছে। স্বপন ব্যানার্জি আজও সে টাকা ফেরত দেয়নি। মাঝে ট্রান্সফার হয়েছিল। আবার ফিরে এসেছে। স্বপন ব্যানার্জি যখন ধরেছে তখন টাকা না নিয়ে ছাড়বে না।

রাধা সলিল সেনের কাছে গেল। সলিল সেন তাকে স্বপন ব্যানার্জির কাছে নিয়ে গেল। স্বপন ব্যানার্জি বলল, 'আপনার একশ টাকা একজেমশান গাড়ি পাস করার রেট।

ও রেটে ট্যাক্সেবল গাড়ি পাস হয় না। ফুল ট্রাক টেরিকটন আছে। দশ টনের কম নয়। এম বি রেট লাগালেই বিশ হাজার টাকা ট্যাক্স হবে। আসল বিল ধরলে ত্রিশ হাজারের কম নয়। এমনি এমনি পাস হয়ে যাবে?'

'কি করতে হবে বলুন স্যার।'

'অন্তত দু'হাজার টাকা লাগবে।'

'অত টাকা কোথায় পাব স্যার?'

'পাবেন না, দিতে হবে না। লেবার ডাকুন, মাল আনলোড করুন। কম করে ত্রিশ হাজার টাকা ট্যাক্স হবে। টেন টাইমস্ পেনালটি তিন লাখ ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে মাল নিয়ে যাবেন। আর ফর্ম ফাইভের ফোর্জারি তো আছেই। তার জন্য যা করার পুলিশই করবে।'

স্বপন ব্যানার্জি ডাঁটের মাথায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাধার মনে হল, অজগর যেমন হরিণ শিশুকে আস্টেপিস্টে জড়িয়ে পিষতে থাকে এরা তেমনি তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলেছে। না মরা পর্যন্ত এদের হাত থেকে মুক্তি নেই। বিয়ের মধ্যে থানা-পুলিস হলে আরও কেলেঙ্কারি। সে সলিল সেনের কাছে হাত জোড় করল, 'আপনি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করুন, লরিটা পাস করানোর জন্য আমি মাত্র হাজার টাকা পাব। টাকা আনতে যাওয়ার রাহা খরচ আছে, গণশার খরচ আছে, আমিও পেটের জন্যেই ধান্দা করছি। দু হাজার টাকা কোথা থেকে দেব বলুন?'

সলিল সেনের মনটা একটু নরম হল। সে রাধাকে নিজের ঘরে বসিয়ে স্বপন ব্যানার্জির কাছে গেল। ফিরে এসে বলল, 'সাহেব তো হাজারের নীচে কিছুতেই নামবেন না।' অনেক বলে কয়ে পাঁচ শ-তে রাজি করিয়েছি। আর কথা বাড়াবেন না কিন্তু!

রাধা চলে আসছিল। সলিল যেন পিছন থেকে ডাকল। রাধা ঘুরে দাঁড়াতে বলল, 'এখনই ছাড়বেন না কিন্তু। রাস্তা ক্লিয়ার আছে জেনে, তবে যাবে।'

রাধা সম্মতি জানিয়ে চলে এল। গণেশের হাত দিয়ে টাকাটা পাঠিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেল। সকাল বেলায় গণেশ এসে খবর দিল, নরেনরা স্বপন ব্যানার্জিকে ঘেরাও করেছে। জাল কাগজ-পত্র থাকা সত্ত্বেও সে কেন লরিটা ছেড়ে দিল, তারা জানতে চাইছে।

আবার কী অশান্তি হয়, কে জানে? হোক। তারপরেও যদি দুনম্বর কাজ বন্ধ হয়, সে খুশিই হবে। শান্তিতে কাজ করবে। তারা কয়েকজন মিলে কয়েকবারই চেষ্টা করছিল, দু নম্বরি করবে না, কাউকে করতে দেবে না। যে মালের যত ট্যাক্স হবে, তাই জমা দেবে। আর কমিশন নেবে।

কিন্তু মাত্র দু-চার দিন। তারপর আবার যে কার সেই। এজেন্টদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এত বেশি যে তলে তলে সবাই ট্রান্সপোর্টারদের সন্তুষ্ট করে চলতে চায়। ট্রান্সপোর্টাররা যে সব থেকে কম পয়সায় গাড়ি পার করতে পারে তার কাছে যায়। এজেন্টরা স্টাফদের সঙ্গে আলাদা আলাদা আঁতাত করে নেয়। যে দু-নম্বরি করে না তার রুটি-রুজি বন্ধ হওয়ার জোগাড় হয়। সেই জন্য এসব ব্যাপারে রাধার আর আগ্রহ নেই। তবে এবারকার ঝামেলাটা হচ্ছে তার পাস করা লরি নিয়েই। কাজেই কী হয়, তাকে খবর রাখতেই হচ্ছে।

যা হল তা মোটেই সুখকর নয়। স্বপন ব্যানার্জি লগ বুকে এন্ট্রি করল, ড্রাইভারের কাছে জাল রসিদ ছিল। সে লরিটা আটক করেছিল। ড্রাইভার লরি নিয়ে পালিয়ে গেছে।

ই টি ও-ইন চার্জ তপন সরকার মালিককে নোটিস করল। এন্ট্রির একটা কপি থানার বড়বাবুর কাছে পাঠিয়ে দিল।

বিয়ের মধ্যে আবার সেই থানা-পুলিস। রাধা ছুটল পঞ্চাননদার কাছে। পঞ্চাননদা পঞ্চায়েতের মেম্বার, রুলিং পার্টির লিডার। সব শুনে বলল, 'ও বড়বাবুটার খাই খুব

বেশি রে। হাজারের নিচে কথা বলে না। তবে ল্যাঙড়া আমে খুব আসক্তি। আমি আভাস দিয়ে রাখব। যদি এক ঝুড়ি নিয়ে যেতে পারিস, তাহলে হয়েও যেতে পারে।'

স্থানীয় বাজারে ভাল আম পাওয়া যায় না। রাধা ফ্রুট মার্কেটে গেল। গণেশের মাথায় ঝুড়িটা চাপিয়ে বড়বাবুর বাসায় হাজির হল। প্রথম সুযোগেই পঞ্চাননদার নামটাও শুনিয়ে দিল।

আমের ঝুড়িটা একবার দেখে নিয়ে বড়বাবু বলল, 'হ্যাঁ উনি হাজার খানেকের মধ্যে মিটিয়ে দিতে বলছিলেন। কিন্তু ফোর্জারি কেস, বোঝেনই তো, অনেকের মুখ বন্ধ করতে হবে। ওতে হবে না। তবে আপনি পঞ্চাননবাবুর লোক! দেড় হাজার দেবেন!'

বড়বাবু এমনভাবে কথাগুলো বলল যে সেটাই চূড়ান্ত। রাধা কিছু বলতেই পারল না।

চেক পোস্টে ফিরে দেখল, ট্রান্সপোর্টের মালিক তার চালায় বসে আছে। টুলের ওপর বসতেই সে নোটিশটা এগিয়ে ধরল, 'এখন কি হবে?'

রাধার বলতে ইচ্ছে করছিল, এক হাজার টাকায় গাড়ি পাস করালে যা হয় তাই হবে। কিন্তু বলতে পারল না। বলল, 'ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

রাধা সলিল সেনকে নিয়ে তপন সরকারের কাছে গেল। তপন সরকার বলল, লিখিত দিলে আমি আর কি বলব বলুন? আমাকে তো অ্যাকশন নিতেই হবে।'

'তা তো বুঝছি স্যার। কিন্তু একটা ব্যবস্থা না করলে...।'

'একটা উত্তর দিয়ে দিতে বলুন। আমি ফাইল করে দেব। কিভাবে লিখতে হবে সলিলবাবুর কাছে বুঝে নিন।'

একটু আড়ালে এসে সলিলবাবু বুঝিয়ে দিল, 'উত্তরটা জমা দেওয়াব আগে সাহেবের হাতে শ খানেক টাকা দিয়ে দেবেন।'

রাধা হ্যাঁ-না, কিছুই বলতে পারল না। মনে হল, সে যেন ভাগাড়ে পড়ে থাকা একটা মরা মোষ। আর এরা সব এক-একটা শকুন। এক খাবলা মাংস থাকা পর্যন্ত ছাড়বে না। হাড়ের মধ্যে থেকে মজ্জাও টেনে ছিঁড়ে খাবে।

সে চালায় ফিরে এল। ব্যাক ডেটে একটা রসিদ লিখে মালিকের হাতে দিল 'এটা জমা দিয়ে দিন। তারপর যা হয় আমি বুঝব।'

মালিক চলে গেল।

রাধা আশীর্বাদের আংটির অর্ডার দিতে গেল।

আশীর্বাদের আর মাত্র তিন দিন বাকি। আংটিটা বুক পকেটে পুরে রাধা বাড়ির বারান্দায় বসে ছিল। বারবার হাত দিয়ে দেখছিল। ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনের অনেক ছবি তার মানসপটে ভেসে উঠেছিল।

গোপাল এসে বলল, 'রাধাদা, পালাও! ওপরে কারা পিটিশান করেছিল. কলকাতা থেকে পুলিস এসে গণশাকে ধরেছে। তোমাকেও খুঁজছে।''

রাধা মুহূর্ত বিলম্ব না করে সরে পড়ল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়িতে পুলিস এল। তাকে না পেয়ে তার দুটো খাতা নিয়ে চলে গেল। ভাগ্যিস জাল সীলগুলো সে সরিয়ে রেখেছিল!

রাধা আবার গিয়ে ধরল পঞ্চাননদাকে। পঞ্চাননদা কয়েকবার ফোন করে বলল, 'নারে। কেসটা নাকি মন্ত্রীর কান পর্যন্ত উঠেছে। ওরা কেউ কিছু করতে পারছে না।'

'তা হলে?'

'কদিন গা ঢাকা দিয়ে থাক। ঠিক হয়ে যাবে।'

কিন্তু পরশু দিনই যে আশীর্বাদ। আর মাসখানেকের মধ্যেই বিয়ে। সেকথা পঞ্চাননদাকে বলতে পারল না। রাস্তার হোটেলে ভাত খেয়ে ভাবতে লাগল, কী করা

যায়! বাড়িতে থাকা ঠিক হবে না। বলাইয়ের বাড়িতে যাওয়া যেত। কিন্তু বলাই টের পেলে পাত্রীপক্ষ জেনে যেতে পারে! সে মালিকের বাড়িতে গেল। গল্প-গুজবের পর তার সঙ্গেই শুয়ে পড়ল।

সকাল বেলায় বাড়িতে আসতে দাদা মুখ ফিরিয়ে নিল। ছোট ভাইও কথা বলল না। রাধা ভয়ে ভয়ে বৌদির কাছে গিয়ে বসল!

বৌদি বলল, 'রাতে পুলিস এসেছিল। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজল। ঘরের সব জিনিস তছনছ করে দিল। আর বাড়িসুদ্ধ লোককে কি জেরা, 'বাড়িতে নাই কেন? কোথায় গেছে? কোন আত্মীয় বাড়ি? তাদের ঠিকানা কি? কবে আসবে? অফিসে পাঠিয়ে দেবেন। আরও কত কী! বুড়ো মানুষটাকেও রেহাই দিল না।'

এবার দাদা ফেটে পড়ল, 'তোমার জন্য বাড়ির বেইজ্জতি হল। বংশের মুখে কালি পড়ল। তুমি কোথায় কী করে বেড়াবে, আর রাত দুপুরে পুলিস এসে বাড়িসুদ্ধ লোককে হয়রান করবে, তা চলবে না। তুমি ভিনো হয়ে যাও।'

রাধা মাথা নিচু করল।

ভাই ইঞ্জিনিয়ার। দাদাও কোম্পানীতে কাজ করে। আর সে এন্ট্রি ট্যাক্স চেক পোস্টে একটা ক্লিয়ারিং এজেন্ট। এমনিতেই বাড়িতে তার সমাদর নেই। তার ওপর রাত দুপুরে পুলিস এলে তো ভিন্ন হতে বলবেই। সে ভিন্নই হয়ে যাবে। শুধু বিয়েটা পর্যন্ত অপেক্ষা।

মাথা নিচু করে দাদার বকুনিটা হজম করে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

মোড়ের মাথায় বলাইয়ের সঙ্গে দেখা। সে বলল, 'মেয়েপক্ষ আশীর্বাদের জন্য আরও কয়েকটা দিন সময় চাচ্ছে।'

রাধা বুঝতে পারল, ওরা আর তার সঙ্গে রমার বিয়ে দিতে চাইছে না। এতক্ষণ যার জন্য সে সবকিছু সহ্য করতে পারছিল, সে মুহূর্তে তার সামনে থেকে সরে গেল। তার মনে হল, এ জীবনে কোন নারীর কোমল স্পর্শ আর কোনওদিনও পড়বে না।

পুলিস তাকে ধরে নিয়ে যাবে। প্রথমে হাজতে। তারপর জেল। জেল থেকে ছাড়া গেলেও তাকে বেঁচে থাকতে হবে দাগী অপরাধী হিসেবে। আত্মীয়-স্বজনরা এড়িয়ে চলবে। প্রতিবেশীরা ঘৃণা করবে। বন্ধু-বান্ধবরা করবে করুণা। সে নিজেও কি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে? কী লাভ এভাবে বেঁচে থেকে? সে মনস্থির করে ফেলল।

সারাদিন পথে পথে ঘুরে বেড়াল। সন্ধ্যাবেলায় একবার প্রাইমারি স্কুলটার কাছে গেল। সেই ছেলেবেলায় বই হাতে পড়তে আসত। জীবনটা তখন কত সুন্দর ছিল। সে জীবন আর কোনদিন ফিরে পাবে না!

সে বাড়ি ফিরতে লাগল। ফেরার পথে হাই স্কুলটা চোখে পড়ল। এই স্কুলটাও যদি সে পাস করতে পারত! মোড়ের মাথায় এসে থমকে থামল। মণিহারি দোকানটা চালাতে পারলেও আজ তার এ অবস্থা হত না।

রাত হয়ে গিয়েছিল। সে এসে নিজের বিছানাটায় শেষবারের মত শুয়ে পড়ল। বিছানাটা পরম আদরে তাকে গ্রহণ করল।

ক্ষেতে দেওয়ার জন্য এক শিশি ফলিডল বিষ আনা হয়েছিল। বিষের শিশিটা পাশের তাকে ছিল। সে তাক থেকে বিষের শিশিটা পেড়ে নিল। ছিপি খুলে খানিকটা গলায় ঢেলে দিল। বুকের মধ্যেটা জ্বালা করে উঠল। একবার রমার মুখটা মনে পড়ল। তারপর দম বন্ধ হয়ে এল। বিছানার ওপর ছটফট করতে করতে সব অন্ধকার হয়ে গেল। একটা বিরাট পাথর যেন সব কিছু চাপা দিয়ে দিল।

জ্ঞান ফিরতে দেখল, সে হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। কপালে হাত দিয়ে শিয়রে গণেশ বসে আছে।

গণেশ তাকে অনেক খবর দিল। পুলিস তাকে জামিনে ছেড়ে দিয়েছে। রাতে দেখা করতে এসে দেখে, রাধা গোঙাচ্ছে। তার মুখ দিয়ে ফেপড়া উঠছে। গণেশ আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠে। লোকজন জড় হয়ে যায়। মহাদেবদার গাড়ি করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ডাক্তাররা আশা দিতে পারেনি। তিনদিন পরে আজ জ্ঞান ফিরেছে।

খবর পেয়ে পুলিস গার্ড পোস্ট করে দিয়েছে।

তারা নাকি ইতিমধ্যেই ট্রান্সপোর্টের মালিকের কাছ থেকে দুটো রসিদই সিজ করেছে। খাতার লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছে, রসিদ দুটোর হাতের লেখা তারই। অর্থাৎ জালিয়াতি সে ই করছে। সুস্থ হয়ে উঠলেই তাকে আদালতে হাজির করা হবে। হবেই তো। সে যে সত্যি অপরাধী।

কিন্তু স্বপন ব্যানার্জি, সলিল সেন, তপন সরকার— ওরা? আর থানার বড়বাবু চন্ডী ঘোষ?

ওরাও তো অপরাধী। তার থেকে অনেক বেশি করে অপরাধী। পুলিস কি ওদের কাউকে ধরেছে? ধরেনি। ধরবেও না।

যারা মাসে মাসে মোটা টাকা মাইনে নেওয়ার পরেও ঘুষ খায়, পুলিস তাদের স্পর্শ করবে না। আর তার মত যারা পেটেব দায়ে তাদেরকে ঘুষ দিতে বাধ্য হয় তাদেবকে ধরে হাজতে পুরবে।

নিশ্চয় ওরাও ভাগ পায়! না হলে এরকম করে কেন? এব কী কোন প্রতিকাব নাই?

ক্ষোভে রাধা পাশ ফিরে শোয়। অল্পক্ষণের মধ্যে সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

বৌদি এসে বলে, 'রাধা দেখ্ তো কে এসেছে!'

রাধা চোখ মেলে চায়। দেখে, বৌদির পাশে একটা লালপাড় সাদা শাড়ি পবে রমা দাঁড়িয়ে আছে! সে তাকাতে রমা মুখ নিচু করে নেয়।

গণেশ ডাকে, 'রাধাদা, ঘুমিয়ে পড়লে?' আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যায়। রাধা চোখ টেনে খোলে। দেখে, বৌদি বা রমা কেউ নেই। সে ফ্যালফ্যাল করে গণেশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মুখের ওপাশে চেক পোস্টের চালাটা ফুটে ওঠে।

দলছুট

মঞ্জু সরকার

দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতা তার গোড়া থেকেই ছিল। সত্যি বলতে কি, মুক্তি-বাহিনীতে যোগ দেয়ার মূলে দেশপ্রেম কিংবা কোনো রাজনৈতিক অঙ্গীকার, অন্তত তার ক্ষেত্রে প্রধান প্রণোদনা ছিল না। হুজুগেই মেতেছিল অনেকটা। আর পলায়নী স্বভাবটা বোধ করি তার জন্মগত।

৭১-এ দেশজুড়ে যখন পালাও পালাও রব, পালিয়ে বাঁচাটাই ছিল তখন স্বাভাবিক পথ। প্রথমে শহর ছেড়ে গ্রামে পালিয়ে এসেছিল সে। কিন্তু ওই গ্রামেও তখন মিলিটারি এলো-আসবে আতঙ্ক। আর কে না জানে, পাকিস্তানি মিলিটারি মানে বাঙালির সাক্ষাৎ যম। স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে, ওরা চায় কেবল বাংলার মাটি, আর পদানত মুসলমান। এমন অবস্থায় বদ্ধ গ্রামে থাকতে হানিফের ভালো লাগছিল না। করারও কিছু ছিল না। গ্রামের কিছু যুবকদের সঙ্গে ইন্ডিয়া পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে। পালানোর সময় মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার বাসনা, একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য পিপাসা, নাকি ইন্ডিয়া বেড়ানোর শখ— কোন সত্য মনের মধ্যে কতোটা সক্রিয় ছিল, বলা মুশকিল। তবে নিছক মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে সে কি আর মায়ের গোপন সঞ্চয় ১০০ টাকার নোটটা চুরি করেছিল?

বর্ডারে জিন্নাহর ছবিযুক্ত পাকিস্থানি নোটটা বদলে ভারতীয় ১৩৫ রূপি পেয়েছিল হানিফ। টাকাটা হাতে পেয়ে, নিজের দেশকে স্বাধীন করার জন্য দায়িত্ব পালনের চেয়ে ভারতীয় স্বাধীনতা উপভোগের ইচ্ছেটা মনে জোরালো হয়ে উঠেছিল। সীমান্তবর্তী ছোট শহরে সঙ্গীদের নিয়ে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানো, হোটেলে বসে বড় প্লেটে ভারতীয় চালের ভাত ও জল খাওয়া, কেজি মাপে মুড়ি কেনা, টেন্ডু পাতার বিড়ি, চার্মিনার সিগারেট সব কিছু মনে হয়েছিল অপূর্ব। গাঁয়ের ছেলে প্রথম শহরে গেলে যেমন হয়, বিদেশ-বিভুঁই সেরকম অনুভূতি জাগিয়েছিল তার। সিনেমা হলেও ঢুকেছিল। হিন্দি সিনেমা, হাতী মেরে সাথী। আত্মীয়-স্বজন না থাক, পকেট ভরা ইন্ডিয়ান টাকা থাকলে, যুদ্ধের সময়টা হানিফ ইন্ডিয়া ভ্রমণ করে কাটাতো সন্দেহ নেই। কিন্তু পকেটের দারিদ্র্যের চেয়ে গাঁয়ের দরিদ্রতর সঙ্গীরা ছিল বড় বাধা। অনেকে ঝাড়া হাত-পা-নিয়ে, আশ্রয় শিবিরের ওপর ভরসা করে বাড়ি ছেড়েছিল। দেশমুক্ত হোক বা না হোক, আত্মরক্ষার জন্য মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখানো ছাড়া উপায় ছিল না তাদের। সঙ্গীদের টানে বাংলাদেশী যুবকদের জন্য তৈরি যুব শিবিরে ভর্তি হয়েছিল হানিফ। তারপর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ভালোমন্দ লাগার কানাকড়ি মূল্য ছিল না আর।

আশ্রয় কেন্দ্র ও ট্রেনিং ক্যাম্পে ভেড়ার পালের মতো দলবদ্ধ শৃঙ্খলিত জীবন অসহ্য লাগতো। তখনও পালাবার কথা ভেবেছিল সে। কিন্তু কোনো উপায় ছিল না। যুব শিবির থেকে ট্রাকে তুলে চোখ বেঁধে সামরিক ট্রেনিং ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের।

পাহাড়ের ওপর জায়গাটা ভারী সুন্দর। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের মতো বিন্দুমাত্র ফুরসত ছিল না ট্রেনিং ক্যাম্পের ধরাবাঁধা জীবনে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৬ ঘণ্টা হাড়-মাস একাকার করে দেয়ার মতো দৈহিক শ্রমে ঘাম ঝরানো, ভারতীয় ওস্তাদ সেনাদের কাছে অস্ত্র চালানো ও গেরিলা যুদ্ধের কৌশল শেখার সময়টা ছিল একটানা দুঃস্বপ্নের মতো। ৬ সপ্তাহে অন্তত ৬ পাউন্ড ওজন কমে গিয়েছিল তার।

ট্রেনিং শেষে, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দেশের ভেতরে ঢোকার প্রথমে দিনই যুদ্ধ থেকে পালাবার কথা ভাবতে শুরু করেছিল হানিফ। সেটা ছিল তাদের প্রথম অপারেশন। ভারতীয় সীমান্তে অবস্থিত ক্যাম্প ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পাকবাহিনীর ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছতে হবে। বারোজন গেরিলা যোদ্ধার একটি গ্রুপ। সার বেঁধে যাত্রা শুরু করেছিল সন্ধ্যায়। দীর্ঘ পদযাত্রা। পথঘাট অচেনা। কমান্ডার বাদশা ভাই ও পথ প্রদর্শক সামসু সামনে। দলের মাঝামাঝি অবস্থান হানিফের। হাতে রাইফেল। অনন্তপুর ব্রীজ রেকি করে, নিকটস্থ পাকবাহিনীর ক্যাম্পে মুক্তিবাহিনীর অস্তিত্ব জানান দিতে হবে শুধু। নিরাপদ দূরত্বে পজিশন নিয়ে কয়েকটা বুলেট খরচ করতে হবে মাত্র। শত্রুদের পাল্টা প্রতিক্রিয়া, গতিবিধি জেনে দিনের আলো ফোটার আগেই ক্যাম্পে ফিরে আসতে হবে। কমান্ডার বাদশা ভাইকে বি এস এফ-এর মেজর ভাট নক্সা এঁকে অপারেশনের দায় দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছে। হানিফের আলাদাভাবে করার কিছু নেই। শুধু দলের সঙ্গে পথ চলা আর কমান্ডারের নির্দেশ মতো কাজ করা। তবু দলের মধ্যে ভয়ে উত্তেজনায় তার বুকের ধুকফুক প্রতিক্রিয়া ছিল সবচেয়ে বেশি।

হাঁটু-পানির একটা খাল পেরিয়ে গাইড সামসু ঘোষণা করে, ইন্ডিয়ার সীমানা শেষ হয়েছে। আমরা দেশে ঢুকেছি।

পায়ের নিচে ভেজা নরম মাটির স্পর্শ গা ছমছম করা অনুভূতি জাগায়। কমবেশি মাস তিনেক আগে দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে এসেছিল সবাই। কিন্তু মনে হয় তিন যুগ কেটে গেছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়ে অস্ত্র হাতে আবার দেশ ফেরা। কমান্ডার বাদশার সঙ্গে সঙ্গে দলটি প্রান্তরে দাঁড়িয়ে পড়ে। আদিগন্ত অন্ধকারে ঢাকা স্বদেশ। অসংখ্য জোনাকি জ্বলে জ্বলে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাগত জানায়। ঝিঁঝি পোকার ঐকতান বাজে। পালানোর সময় পাকবাহিনী মূলত শহর এলাকায় সীমিত ছিল। এখন তারা ছড়িয়ে পড়েছে দেশময়। যুদ্ধরত বাংলাদেশ এখনও তাদের কাছে পূর্ব পাকিস্তান। পাকিস্তানের অংশ হিসেবে দেশটাকে আঁকড়ে রাখার জন্য প্রতিদিন বাঙালির রক্ত আর লাশে উর্বর করে তুলছে বাংলার মাটি। বাড়িতে ছেড়ে আসা আপনজনেরা এখনো জীবিত আছে কিনা কে জানে। পায়ের তলায় ভেজা ঘাস-মাটির সঙ্গে যেন মিশে আছে বাঙালির রক্ত, ডোবা থেকে ভেসে আসা সোদা গন্ধের সঙ্গেও যেন মিশে আছে বাঙালির লাশ। মুক্তিযোদ্ধার দলটি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হয়তো এসব কথাই ভাবে। গা ছমছম করে তাদের। কথা বলে প্রথম কমান্ডার বাদশা।

ভাইয়েরা, এসো, দেশের মাটিকে চুমু খেয়ে আমরা আবার শপথ নি। হানাদার বাহিনীর কবল থেকে, দেশকে মুক্ত না করে আমরা ঘরে ফিরবো না। আজ প্রথম অপারেশনে বেরিয়েছি, দেহে শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। তবু দেশমাতাকে স্বাধীন করবোই ইনশাল্লাহ।

বাদশা শুধু নিজগুণে কমান্ডার হয়নি, কলেজেও ছাত্রনেতা ছিল। বক্তৃতা করতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, তার কণ্ঠটি বেশ গম্ভীর। ভাইয়েরা—ডাকলে শেখ মুজিবের ভাষণ

মনে পড়ে। তার এ গুণটিকে স্বীকৃতি দিয়ে ক্যাম্পে একদিন আয়নুদ্দি ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিল, 'মুজিব নাই তো কি হইছে রে। কমান্ডার বাদশা ভাই এখন হামার শেখ মুজিব।' আয়নুদ্দি চাষার ছেলে, নিজেও চাষা। বকলম, কিন্তু খুব হাসি-খুশি রসিক যুবক। সে কথা বললে দলের সবাই হাসার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। সেদিনও হেসেছিল সবাই। শুধু বাদশা ছাড়া। সেই আয়নুদ্দিও আজ অপারেশনে বেরিয়ে কমান্ডারের উদ্দীপনা জাগানো ভাষণ শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

অচেনা জায়গার মাটি। গু-গোবর কি বা আছে। মাটিকে চুমা দিয়া কি লাভ বাদশা ভাই? যাকে চুমা খাওয়ার কথা, তাকে জিন্দেগীতে দেখিবার পামো কি না আল্লা জানে।

অপারেশনে বেরিয়ে ফালতু কথা বলিস না তো।

এখনো ৫/৬ ঘণ্টার পথ হাঁটতে হবে, চলেন।

বিড়ি জ্বালিয়ে ওরা আবার সার বেঁধে হাঁটতে থাকে। গাঁয়ের মেঠো পথ। দুপাশে ধান-পাটের ক্ষেত। চরাচর স্তব্ধ, নির্জন। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ নিয়ে কৃষ্ণপক্ষের রাত সন্ধ্যাতেই জমে উঠেছে। যে কোনো মুহূর্তে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটবে বলেই চিচি করে মাটি কাঁদছে যেন।

এরকম রাতে গাঁয়ের পথে একা বেরুলে হানিফ এখনও ভূতের ভয় পায়। তাদের গ্রামে নামকরা কিছু ভূতের আখড়া আছেও। এ তল্লাটেও আছে নিশ্চয়। পথে খানাখন্দে সাপ-ব্যাঙ-জোঁক ও গু-গোবর থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলার নিজস্ব সম্পদ নিয়ে রাতের প্রকৃতি মুক্তিবাহিনীর চলার পথে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াল না। বরং এসবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তারা এগিয়ে যায়। হানিফের ভয়টা আসলে আসন্ন যুদ্ধকে ঘিরে।

শত্রুবাহিনীর সঙ্গে হঠাৎ মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে তারা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বড় রাস্তায় ওঠেনি। সেই রাস্তার দুটি ব্রীজ এখনো উড়িয়ে দেয়া হয়নি বলে ক্রমশ ভেতর দিকে এগিয়ে এসে তারা ক্যাম্প করেছে। যাদের হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হওয়ার ভয়ে দেশ ছেড়েছিল, আজ তাদেরকেই ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে শত্রুঘাঁটির খুব কাছাকাছি যেতে হবে। কিন্তু হানিফের বুকে শত্রু নিধনের সাহস ও প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে ওঠে না কেন? বরং তার মনে হতে থাকে, তাদের কয়েকটা রাইফেল ও একটি মাত্র স্টেনগানের বিপরীতে শত্রুদের হাজারটা স্টেন-মেশিনগান, মাইন, রকেট লাঞ্চার-কামান-ট্যাংক। সম্মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুকে পিছু হঠানো দূরের কথা, অনেক দূরে পজিশন নিয়েও শত্রুবাহিনীর গোলাগুলির বৃষ্টি শুরু হলে আত্মরক্ষা হবে কিনা আল্লা জানে।

কমান্ডারের দেশাত্মবোধক সাহস হানিফের ভেতর তেমন সংক্রমিত হতে পারে না। দেশমাতার মুক্তির জন্য রক্তদানের আহ্বান রক্তে উন্মাদনা জাগায় না। ঘুরেফিরে আয়নুদ্দির দীর্ঘশ্বাসযুক্ত হাহাকার কানে বাজে। বাড়ির কথা ভেবে, বাবা-মা-ভাই-বোনের স্মৃতির ভারে বুক ভার হয়ে ওঠে হানিফের। গোপন প্রেমিকার কথা মনে পড়ে। সে আজ মন থেকে সহজে নেমে যায় না। ট্রেনিং ক্যাম্পে তার কথা ভেবে উদাস হওয়ার অবকাশ ছিল না। কিন্তু দেশের নির্জন স্তব্ধ অন্ধকারে সেই হয়ে ওঠে একমাত্র আলো। তার স্মৃতি এতো বাস্তব হয়ে ওঠে যে, মনে হয় এই যুদ্ধযাত্রা স্বপ্নের ভেতরে ঘটছে।

ভাঙা রাস্তায় পানি জমেছে। পেরুবার সময় খলাৎখল শব্দ ওঠে। আয়নুদ্দি কথা বলে আবার।

মোর মনে হয়, গাড়া বড়শি ঘাড়ে নিয়া বোয়াল মাছ ধরিবার বাদে যাইতেছি হামরা।

হ্যাঁ, বোয়ালের মতো ২/১ টি খানসেনার লাশ কাঁধে ঝুলিয়ে ক্যাম্পে ফিরবো কাল। মেজর দেখবে, বাঙালি ছেলেরা শুধু মাছ শিকার নয় শত্রু শিকারেও ওস্তাদ।

সামনে ভবানীপুর গ্রাম বাদশা ভাই, হুঁশিয়ার হয়ে হাঁটেন।

গ্রামের ঘনবসতির ভেতর দিয়ে রাস্তা। কিন্তু বাড়িঘরগুলোতে জনপ্রাণীর সাড়া নেই। গাঁয়ের মানুষ অবশ্য সন্ধ্যা হতে না হতেই খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু এই নিস্তব্ধতা শান্তিপূর্ণ ঘুমের কারণে, নাকি খানসেনাদের ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কারণে — বোঝা মুশকিল। সতর্ক পদক্ষেপে চুপচাপ হেঁটে চলে মুক্তিবাহিনীর জোয়ানরা। বাঁশঝাড় তলায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার পার হওয়ার পর এক বাড়ির উঠানে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। চুলার আগুন। রাত-জাগা সমবেত মানুষের কথাবার্তা কানে আসে।

হঠাৎ কোত্থেকে একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ চিৎকার নিয়ে ছুটে আসে। মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে এসে ডাকাত থাকে। কুকুরের ডাকে আশপাশ বাড়ির ঘুমন্ত অনেকেই জেগে ওঠে।

ও বাহে আজিরুদ্দি, কুত্তা শালা ভোকে ক্যানে? মিলিটারি আইসে নাকি?

লাঠি বল্লম নিয়া বাড়ান সবাই।

নেপথ্য থেকে এসব কথাবার্তা শুনেও নীরব মুক্তিবাহিনী উঠানে আগুনঅলা বাড়ির কাছে এসে থামতে বাধ্য হয়। সামনে লাঠি হাতে এক পুরুষ ভয় পাওয়া কণ্ঠে চেঁচায়।

কে বাহে? কে যায়?

ভয় নাই। আমরা মুক্তি।

আপনারা মুক্তিফৌজ! খাড়ান একটু, মুক্তিবাহিনীকে স্বচক্ষে দেখার জন্যে হামার বুড়া পাগল হয়া গেইছে। তাকে এক নজর দেখা দিয়া যাও।

মুক্তিবাহিনীর উপস্থিতি ঘোষণা ঘুমন্ত গ্রামটিতে যেন প্রাণের সাড়া জাগায়। মিলিটারি-আতঙ্ক মুছে গিয়ে আনন্দ কোলাহল জাগে। বাড়ি-ঘর থেকে ছুটে আসে মানুষজন। লম্ফ-হ্যারিকেন হাতে বউ-ঝিরাও বেরিয়ে আসে মুক্তিফৌজকে এক নজর দেখার জন্য। গ্রামবাসীগণ ইমামগঞ্জ হাটে পাকবাহিনীর সাম্প্রতিক আগমন ও নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ঘটনার বিবরণ দেয়। পাকবাহিনীর ঘাঁটিতে পৌঁছানোর শর্টকাট রাস্তাও চিনিয়ে দেয়। একজন বৃদ্ধ হানিফের মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ ছড়ায়, যাও বাবারা যুদ্ধে যাও। জানোয়ারগুলানকে ক্ষতম করি সহিসালামতে ফিরে আইসেন।

গ্রামবাসীদের সমর্থন ও ভালোবাসার আবেগে সিক্ত হয়ে কামান্ডার বাদশা তার পুরনো শপথ নতুন করে শোনায়।

দোয়া করবেন আপনারা, দেশকে আমরা স্বাধীন করবোই।

যাত্রা শুরুর পথে লম্ফ হাতে এক মহিলার আমন্ত্রণ আবার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর ইচ্ছায় যুদ্ধের সময়ে মেয়ের বিয়ে হয়েছে তার। বাড়িতে মেহমান এসেছে। রান্নাবাড়ি হচ্ছে। ক্ষীরের হাঁড়ি নামিয়ে রেখেই শুনলো মুক্তিফৌজের কথা। এখন মুক্তিফৌজরা একটু খানি গরম ক্ষীর চেখে গেলে সে কৃতার্থ হয়।

মুক্তিবাহিনী মোর হাতের ক্ষীর চাকি গেইলে কথাটা সারা জেবন ফমে থাকপে মোর। আইসেন বাবারা।

মহিলাটির আন্তরিক আমন্ত্রণের সমর্থনে গ্রামবাসীগণ সায় যোগায়। আলো-জ্বলা বাড়ির উঠানে ডেকে নিয়ে মাদুর পিঁড়ি পেতে দেয়া হয়। মুক্তিবাহিনীর হাতে সময় কম। তাদের আদর আপ্যায়নে তৎপর হয়ে ওঠেন সবাই। একটি কিশোর মুক্তিবাহিনীর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধে যাওয়ার বায়না ধরে। কিন্তু তার মা খালি হাতে ছেলেকে যুদ্ধে পাঠাতে রাজি নয়। নিরস্ত্র কিশোরকে নিরাশ করে গ্রামবাসীদের কাছে বিদায় নিয়ে মুক্তিবাহিনী নতুন উদ্যমে হাঁটতে থাকে।

তিন ঘণ্টা একটানা হাঁটার পর অনন্তপুর ব্রীজের কাছাকাছি এসে একটা অচিন বৃক্ষের তলায় ঘন হয়ে দাঁড়ায় মুক্তিযোদ্ধারা। গাইড সামসু অনেকক্ষণ ধরে একই কথা বলছিল,

এই তো সামনে। এসে গেছি প্রায়। এখন বলছে, ওই তো দেখা যাচ্ছে ব্রীজ। আধা মাইল দূরও নয়।

উত্তেজনায় একজন বিড়ি ধরাতে গেলে কমান্ডার বাদশা ধমক দেয়, নো বিড়ি টানা। ব্রীজে পাক সেনাদের পেট্রল ডিউটি থাকতে পারে। রিমেমবার, আমরা এখন এনিমির অস্ত্রের রেঞ্জের মধ্যে। হুঁশিয়ার সবাই!

কমান্ডার এবার দলের সবাইকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়। এখান থেকে চারজন করে তিনভাগ হয়ে ব্রীজের দিকে এগোতে হবে। মেইন রাস্তা ক্রলিং করে পার হবে একটি গ্রুপ। তারপর ক্ষেতের ভেতর দিয়ে নদীর ধার ঘেঁষে, কোনোরকম সাড়াশব্দ না করে, অন্ধকারে মিশে প্রয়োজনে ক্রলিং করে এগোবে সবাই। ব্রীজের দুই দিকে ১০০ গজের মধ্যে পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করবে দুটি গ্রুপ। আর কমান্ডার তিনজনকে নিয়ে ব্রীজের একদম গোড়ায় চলে যাবে। শত্রুদের পেট্রল ডিউটি নেই বুঝলে ফায়ারিং ছাড়াই ব্রীজ রেকি সম্পন্ন করবে। আর ব্রীজে শত্রুসেনার উপস্থিতি টের পেলে কমান্ডারের সিগনাল পাওয়া মাত্র তিন দিক থেকে ফায়ার ওপেন করবে সবাই। তারপর কাজ সম্পন্ন হলে, এই গাছতলায় কিংবা আরো পেছনে ছেড়ে আসা মসজিদে একত্রিত হবে তারা।

শলাপরামর্শ শেষে তিনভাগ হয়ে তারা ব্রীজের দিতে এগোতে থাকে। হানিফ দলের মধ্যে নিজেকে সবচেয়ে ভিতু এবং প্রকৃত যোদ্ধার অনুপযোগী ভাবছিল। কিন্তু পাটক্ষেতের আল ধরে হাঁটতে গিয়ে মনে হলো গ্রুপের তিনজন তার চেয়েও বেশি ভয় পেয়েছে। আয়নুদ্দি পেছন থেকে তার জামা টেনে ধরলে, চমকে ঘুরে দাঁড়ায় হানিফ। সকলে দাঁড়িয়ে পড়ে। আয়নুদ্দি ফিসফাস করে কথা বলে।

ঐ গ্রামে তখন ক্ষীর খায়া জামাই আদর ভোগ করিলাম। এলায় কপালে না জানি কী দুর্ভোগ আছে। বইসো সবায়। শেষ বিড়িটা টানি, আর আয়তাল কুরসি দোয়াটা পড়ি একবার।

তার চেয়ে এখানেই আমরা পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করি।

পাটক্ষেতের আড়ালে, আলের ওপর বসে আয়নুদ্দি বিড়ি ধরানোর জন্যে ম্যাচ জ্বালাতে গেলে হানিফ এবার বাধা দেয়। শত্রুবাহিনীর গোলাগুলির রেঞ্জের ভেতর ঢুকে পড়েছে তারা। অন্য গ্রুপ দুটি হয়তো এতক্ষণে তাদের নির্ধারিত পজিশনে পৌঁছে গেছে। আর হানিফের গ্রুপ ব্রীজের আভাস দেখতে পায়নি এখনো। এমন অবস্থায় সহযোদ্ধাদের ভীত আচরণ হানিফকে আরো অস্থির করে তোলে। কম্পিত কণ্ঠে সঙ্গীদের এবং নিজেকেও সাহস যোগায় সে, ভিতুরা আগে মরে। জলদি ব্রীজের কাছে চলো।

প্রায় মাথা সমান উঁচু পাটক্ষেতে হানিফ প্রথমে ঢুকে পড়ে। এক হাতে রাইফেল আগলে, অন্য হাতে পাট গাছ সরিয়ে সতর্ক পা ফেলে এগোতে থাকে। অন্য তিনজনও অনুসরণ করে তাকে।

দীর্ঘায়তন পাট ক্ষেত ফুঁড়ে বেরুনোর পর ব্রীজ কিংবা ছোট নদীটি চোখে পড়ার আগে হঠাৎ আলোর ঝলক দেখে ক্ষেতের কাদা-পানিতে দ্রুত শুয়ে পড়ে হানিফ। ধানক্ষেতে মাথা গুঁজে দিয়ে গুলির শব্দ শুনতে পায়। শত্রুরা কি তাদের দেখতে পেয়েছে? মেশিনগানের ঠাঠা গুলি-বৃষ্টি অন্ধকার ছিন্নভিন্ন করে তাদের দিকেই ধেয়ে আসছে যেন। পাল্টা গুলিবর্ষণের জন্য রাইফেল তাক করে পজিশন নিতে পারে না হানিফ। মনে হয়, পালাতে মুহূর্ত বিলম্ব হলে মৃত্যু অনিবার্য। ক্রলিং করে আবার পাটক্ষেতে ঢুকে হানিফ পাটবনের গহীনে লুকাতে চায়। মাথার ওপর যে ঘনমেঘ ও বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে হাঁটছিল, সেই মেঘ যেন এতক্ষণে তুমুল বর্ষণ শুরু করেছে। গোলাগুলির শব্দে কিংবা

গুলিবিদ্ধ হয়েই যেন বা, পাটগাছগুলি সরসর শব্দে কেঁপে উঠছে। কাছেপিঠে শেল বর্ষণের বিকট আওয়াজ কানে বাজে। সঙ্গীরা কি হানিফকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেলো? পাটক্ষেত ভেঙে, কাদা পানিতে পা ফেলে ফেলে শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার সময় কোনো শব্দ করেনি হানিফ। কিন্তু এখন পালানোর শব্দ অগ্রাহ্য করে, শরীরের ধাক্কায় পাটগাছ সরিয়ে দ্রুত ছুটতে থাকে।

পাটক্ষেত থেকে মুক্ত হানিফ আলের ওপর মুহূর্ত কয়েক দাঁড়ায়। কোথায় তার সাথীবা, কোনদিকে শত্রু, ঠাহর করতে পারে না কিছুই। আলের ওপর একা পজিশন নিয়ে কোনদিবে কাকে লক্ষ্য করে রাইফেলটির ঘুম ভাঙাবে, তাও বুঝতে পারে না। ওদিকে তাকে লক্ষ্য করে শত্রুবাহিনীর গোলাবর্ষণ ক্রমে বেড়েই চলেছে। অন্ধকার চরাচরের স্তব্ধতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে থেকে থেকে। গোলাগুলির শব্দকে পেছনে রেখে হানিফ ছুটতে থাকে। দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই, ক্ষেত-আল-প্রান্তর-খাল পেরিয়ে হানিফ তবু ছুটতে থাকে।

গুলির আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে এলে এক সময় হানিফ বুঝতে পারে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সে পালিয়ে আসতে পেরেছে ঠিকই, কিন্তু দল থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এখন এই দিকচিহ্নহীন অন্ধকারে কাউকে খুঁজে পাবে না। যে পথে এসেছে, সে পথটাকেও সে আর খুঁজে পায় না। এমন অবস্থায় স্থানীয় লোকজনের সাহায্য না নিয়ে আর কোনো উপায় নেই।

ছোট পুকুর এবং সুপুরি গাছের বাগান ঘেরা একটি বাড়িতে হানিফ চোরের মতো ঢুকে পড়ে। টিনের ঘরটির ভেতরে আলো জ্বলছে। তার মানে বাড়ি জনশূন্য নয়। মধ্যরাতে গোলাগুলির আওয়াজ শুনেই হয়তো জেগে উঠেছে বাড়ির লোকজন। পাকবাহিনীর ভয়ে এ গ্রামের লোকজন হয়তো সারারাত্রি জেগেই থাকে।

বাড়িতে কে আছেন? দরজাটা একটু খোলেন। ভয় নেই কোনো। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধ করতে এসে সাথীদের হারিয়ে ফেলেছি। রাতের জন্য একটু আশ্রয় দেন।

নিজের পরিচয় ও বিপদের স্বরূপ বর্ণনা করার পরও ঘবের ভেতরে থেকে কোনো সাড়া আসে না। বরং ভেতরের আলোটি নিভে যায়। পথে অচেনা গাঁয়ের লোকজনের কাছে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আদর-আপ্যায়ন পাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে হানিফ জানতো, মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় দিলে এ বাড়িতেও সমাদর পাবে। কিন্তু বাড়ির লোকজন কি তার পরিচয় বিশ্বাস করতে পারছে না? ভূত কিংবা চোর-ডাকাত সন্দেহ করছে?

আপনি কে? কাকে চান?

ঘরের ভেতর থেকে মেয়েলি কণ্ঠে আতঙ্কজড়িত প্রশ্নে হানিফ আশ্বস্ত হয়। তার মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়টি বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য বিপদের বিস্তারিত বিবরণ দিতে থাকে। তারপর বাতি জ্বলে ওঠে ঘরের ভেতর। দরজা খুলে যায়।

হারিকেন হাতে মধ্য-বয়সী বউটি চোখেমুখে জ্বলজ্বলে বিস্ময় ও আতঙ্ক নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাকে দেখে। হানিফের লুঙ্গির কোচা ও গায়ের জামা ভিজে গেছে। কাদা লেগে আছে শরীরের অনেক স্থানে। মাথায় পাট-পাতা। হাতে রাইফেলটি না থাকলে তাকে ভূত ভাবা বিচিত্র নয়।

আপনার সাথে আর কেউ নাই?

বললাম যে, যুদ্ধ করতে এসে দলের সবাইকে হারিয়ে ফেলেছি। বাকি রাতটার জন্য একটু আশ্রয় দেন। ভোরবেলা বর্ডারে যাওয়ার রাস্তা চিনিয়ে দিলে ক্যাম্পে চলে যাবো।

মুক্তিযোদ্ধা আমার বাড়িতে! আল্লাহর কী রহমত! বইস বাবা। আর কোনো ভয় নাই। গোলাগুলির আওয়াজ শুনিয়া বড় চিন্তায় আছিলাম।

ভয়মুক্ত হওয়ার আনন্দ উচ্ছ্বাস নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ঘরের পুরুষটি। বউটিকে আড়াল করে সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখে হাসি। লণ্ঠনের আলো থাকা সত্ত্বেও, হাতের টর্চলাইট জ্বেলে হানিফকে দেখে।

আহারে, যুদ্ধ করিতে আসি পাকবাহিনীর দাবাড়ি খাইয়া বাবার কী হাল হইছে। আর কোনো ভয় নাই তোমার। কই, এনাকে বসতে দাও। কিছু খাইতে দাও।

না, না ব্যস্ত হবেন না। আমি কিছু খাবো না।

আপনি ঘরে আরাম করেন বাবা। আমি দেখি, আপনার দলের লোকজনকে খুঁজিয়া পাই কিনা। সকাল বেলা আমি নিজে আপনাকে ইন্ডিয়ায় থুইয়া আসবো। বাবাকে ঘরে নিয়া বসাও। আমি আসি।

শীতে কাঁপা মানুষের কাছে আগুনের উত্তাপ যেমন প্রিয়, দলবিচ্ছিন্ন দিশেহারা হানিফ তেমনি মানুষের উষ্ণ ভালোবাসার বড় কাঙাল হয়ে পড়েছিল। তার একাকিত্ব ও অসহায় দশা মুহূর্তেই কেটে যায়। লোকটি বাইরে চলে যাওয়ার পর কাঙাল হৃদয় পরিপূর্ণ করে তোলার জন্য সে বউটির দিকে তাকায়।

প্রথমে খুব ভয় পেয়ে গেছিলেন, না? স্বাভাবিক।

বউটির বিস্ময় যেন তবু কাটে না। ফ্যালফ্যাল করে হানিফের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘরেও ডাকে না।

এতো রাতে আপনাকে কষ্ট দিলাম। উনি কোথায় গেলেন?

উনি পাক বাহিনীর দালাল। রাজাকার। আপনি জানেন না?

হঠাৎ শত্রুবাহিনীর গোলবর্ষণের মুখে পড়ে যেমন হয়েছিল, হানিফের প্রতিক্রিয়া তার চেয়েও নাজুক। অদ্ভুত চোখে বউটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

উনি পাকবাহিনী আর রাজাকারদের ডাকতে গেছে। আপনারে ধরায় দেবে। পলায় যান। বাঁচতে চাইলে এ গেরাম ছাড়ি এই দণ্ডে পলায় যান।

হানিফ রাজাকারের স্ত্রীটিকে গুলি করবে, নাকি ধন্যবাদ জানাবে? তার হতচকিত বিহ্বল দশা কাটে না। বউটি তার গায়ে হাত রাখে।

আল্লাহ তোমায় বাঁচায় রাখুক ভাই। পালাও জলদি।

রাজাকারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হানিফ আবার ছুটতে থাকে। তাকে ধরার জন্য রাজাকার ও পাকবাহিনী হয়তো গ্রামটা ঘিরে ফেলতে শুরু করেছে। যতো দ্রুত সম্ভব এই মৃত্যুফাঁদ থেকে পালাতে হবে। কিন্তু কোন দিকে পালাবে? কোথায় যাবে? জানে না হানিফ। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েও সে দলের সঙ্গে সেঁটে থাকতে পারেনি। আত্মরক্ষার গরজে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শত্রুর মুখোমুখি হয়েও হানিফ শত্রু বিনাশের জন্য অস্ত্র ব্যবহার করতে পারেনি। হাতের অস্ত্রটি এখন ভারি বোঝা হয়ে উঠেছে। অস্ত্র রেখে মানুষের উষ্ণ ভালবাসার আশ্রয়ে ভয়ঙ্কর রাতটা কাটাতে চেয়েছিল হানিফ। কিন্তু অচেনা মানুষজনের প্রতি বিশ্বাস তার উঠে গেছে। হানিফ তবু বাঁচার জন্য একা ছুটতে থাকে। কোন দিকে কোন পথে গেলে মুক্তি— জানে না সে। ভয়ঙ্কর আঁধারে ডোবা স্বদেশের কাদা-জল-মাটি-দুপায়ে খচে, হানিফ কেবলি ছুটে চলে।

গল্পটি আমি এভাবে, এখানেই শেষ করতে চাইনি। কিন্তু দলছুট মুক্তিযোদ্ধা হানিফ, মুক্তিযুদ্ধে তার স্মরণীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে এখানেই থেমে যায়। আমি তীব্র কৌতূহল নিয়ে বলি, তারপর?

হানিফ বিষণ্ন হাসে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জবাব দেয়, তার আর পর নেই। কোন পথে গেলে মুক্তি পাবো জানি না। শত্রু কে মিত্র কে চিনি না। বাঁচার আশায় সেই যে ছুটতে শুরু করেছি, মনে হয় অন্ধকারে আজো তেমনি একা একা ছুটে চলেছি।

স্বদেশকথা

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূগোলের ক্লাসে নতুন ছেলেটি আজ মার খেল।

ঘটনাটা ঘটল এরকম ঃ মাস্টারমশাই ক্লাসে ঢুকে বললেন, ওহে— এদিকে শোনো একবার—তোমার নামটা যেন কী?

ছেলেটি কাছে এসে দাঁড়াল, কিন্তু নাম বলল না।

মাস্টারমশাই বললেন, নিজের নামটাও বলতে শেখোনি! কোন্ দেশের ছেলে তুমি? আর এটা কী করেছ? কী এঁকেছ এটা?

টেবিলে রাখা খাতার গাদা থেকে মাস্টারমশাই টেনে বের করলেন একটি পাতলা খাতা। মলিন, কিন্তু মলাটটি চকচকে। খুব সম্ভব কোন দামী কাগজের ঠোঙা কেটে বানানো। ঠোঙার ভাঁজের দাগগুলো স্পষ্ট চেনা যায়।

খাতাটি খুলে মাস্টারমশাই সবাইকে শুনিয়ে বললেন, দ্যাখো—তোমাদের এই বন্ধু কেমন ভারতের মানচিত্র এঁকেছে— চিনতে পারছ? কী মনে হচ্ছে? মানচিত্র না একটা জানোয়ারের ছবি?

ছেলেটি চেয়ে রইল। যে-সব ছেলেরা ভালো মানচিত্র আঁকতে পারে না, তারা হি হি করে হাসল। ভালো ছেলেরাও হাসল, তবে ঠোঁট চেপে, শব্দ না করে। ক্লাসের প্রথম হওয়া ছেলেটি আদিম কোনো জন্তুর কথাই ভাবল। দ্বিতীয় ছেলেটির মনে হল, বর্ষার দিনে দেয়ালের ভিজে দাগ, আর তৃতীয় ছেলেটি খুঁজে পেল মেঘের তুলনা—বিকেলের আকাশ ছাড়া ছাড়া মেঘ। মাস্টারমশাই খাতাটি টেবিলের ওপর আছড়ে বললেন, নিজের দেশের মানচিত্র আঁকতে পারো না তুমি? কী পারো তাহলে?

ছেলেটি চেয়েই রইল। নতুন ভর্তি হয়েছে। ক্লাসের সব ছেলেরা এখনও নাম জানে না। মাস্টারমশায়ের মনে পড়ল না, ছেলেটিকে তিনি এর আগে কোন দিন ক্লাসে কথা বলতে শুনেছেন কিনা। একটু বেশি যেন চুপচাপ ছেলেটি, যদিও একেবারেই যে নিরীহ, মুখ দেখে মনে হয় না। যতদূর মনে পড়ছে, দেয়ালে দাগ কাটার জন্য এরি মধ্যে একদিন শাস্তি পাওয়া হয়ে গেছে।

ছেলেটির এই চুপ করে থাকাটা অসহ্য বোধ হচ্ছিল। মাস্টারমশাই চীৎকার করে বললেন, জবাব দাও— চুপ করে থেকো না। টেবিলের ওপর থেকে তিনি এবার সরু ছড়িটা তুলে নিলেন। ছিপের মতো দেখাতে লাগল ছড়িটা তার হাতে। ছেলেটি বলল, পারি না স্যার?

— কী পারো না?

ছেলেটি আবার চেয়ে রইল। ছড়িটি ছিপের মতো উঁচিয়ে আছে। ছেলেটি ছিপের দিকে চেয়ে আছে। ক্লাসে একটিও শব্দ নেই। ছেলেটির মনে হল, ছিপটা যেন নড়ে উঠল একবার।

— নিজের দেশের মানচিত্র আঁকতে পারো না, বলতে লজ্জা করে না তোমার?

মাস্টারমশাই মারতে গিয়েও মারলেন না। ছড়িটা শব্দ করে শুইয়ে রাখলেন টেবিলের ওপর। তারপর ক্লাসের একটি ভালো ছেলেকে বললেন, ভূগোলের ঘর থেকে খুব সাবধানে গ্লোবটি নিয়ে আসতে।

তিনখানা ঘর পরেই ভূগোলের ল্যাবরেটরি। সেখানে মানচিত্র, গ্লোব, মডেল আর নানা ধরনের ছবি রাখা আছে। ভালো ছেলেটি মিনিটের মধ্যে গ্লোব নিয়ে এল। এমনভাবে সে গ্লোবটি ধরে রেখেছে, যেন ওটা তার পুরস্কার। কোন প্রতিযোগিতায় ভূ-গোলকটি যেন সে পুরস্কার হিসাবে জয় করেছে।

টেবিলের ওপর গ্লোবটি রাখা হল। কুড়ি সেমি ব্যাসের বেশ বড় একটি গোলক। তবে পুরোন, রঙ সামান্য মলিন হয়ে গেছে। মাস্টারমশাই গ্লোবটির ওপর ফু দিয়ে ধুলো উড়িয়ে দিলেন। তারপর নতুন ছেলেটিকে দাঁড় করালেন সামনে।

— এই পৃথিবী। বিশাল পৃথিবী! বল তো, এর মধ্যে কোথায় তোমার দেশ। খুঁজে বের করো। দাঁড়িয়ে থেকো না— দেখিয়ে দাও—

মাস্টারমশাই বলে যেতে লাগলেন। ধাপে ধাপে তার গলা উঠে যাচ্ছে। গমগম করে উঠছে ঘর। অথচ ছেলেটি তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। গ্লোবটির দিকে নয়, সে চেয়ে আছে মাস্টারমশায়ের মুখের দিকে। ঠাস করে একটি চড় মেরে মাস্টারমশাই বললেন, নিজের দেশকে চেনো না তুমি? তারপর টান মেরে ছেলেটির ডান হাতটা তুলে নিয়ে গ্লোবের একটি বিশেষ জায়গায় চেপে ধরে বললেন, দ্যাখো— কী দেখছ? কী লেখা আছে?

ছেলেটি বলল, ভারত।

— ভারত কী?

— একটা দেশ।

বাঁ হাতে ছেলেটির ঘাড়ের ওপর একটা থাপ্পড় মেরে মাস্টারমশাই বললেন, বলো— আমার দেশ— আমাদের দেশ।

— আমার দেশ। আমাদের বেশ।

— আবার বলো।

ছেলেটি আবার বলল, আমার দেশ। আমাদের দেশ।

মাস্টারমশাই দেখলেন, ভারতের ঠিক মাঝখানে ছেলেটির ডান হাতের নোংরা আঙুল, দাঁত দিয়ে কাটা নখসুদ্ধ বসে আছে। আর আঙুলের চাপে গোলকটা ঘুরে যাচ্ছে একটু একটু করে।

মাস্টারমশাই রুমাল দিয়ে ঘাম মুছলেন, ঘাড়, গলা। তারপর টেবিলের ওপর রাখা ভারতের মানচিত্রটি ভাঁজ খুলে দেওয়ালে টাঙিয়ে দিলেন লম্বা করে।

ছেলেটি তখনও তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। মাস্টারমশাই ঘাড়টা ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, কী দেখছ?

— ভারত।

— ভারত কী?

— আমার দেশ। আমাদের দেশ।

— গুড! মাস্টারমশাই ছেলেটির পিঠে বেশ চওড়া করে হাত রাখলেন। তারপর মানচিত্রে দিকে ছড়িটি উঁচিয়ে বললেন, ভারতের উত্তরে কী আছে?

ছেলেটি আবার তার দিকে চেয়ে আছে। মাস্টারমশাই বললেন আমার দিকে নয়, মানচিত্রের দিকে তাকাও। বলো, ভারতের উত্তরে কী আছে, দক্ষিণে কী আছে, — বলো— চুপ করে থেকো না—

ছেলেটি বলল, পারছি না,স্যার।

— কী পারছ না?

— চিনতে পারছি না।

— নিজের দেশকে চিনতে পারছ না তুমি! মাস্টারমশাই ছড়ি দিয়ে একটা খোঁচা দিলেন ছেলেটির পেটে।

— নিজের দেশকে চেনো না তুমি?

ছেলেটি একটু কুঁজো হয়ে বলল, এটাই কি আমার দেশ?

— জানো না তুমি?

— এর সবটাই কি আমার দেশ?

— জানো না তুমি?

— এত বড়ো আমার দেশ!

ছপাৎ করে একটা ঘা মেরে মাস্টারমশাই বললেন, জানো না তুমি? কী জানো তাহলে? কী শিখেছ এতদিন? হাত পাতো। দাঁড়িয়ে থেকো না, হাত পাতো—

ছেলেটি হাত পাতল। চৌকো হিজিবিজি পাতা। সরু সরু আঙুল। ছড়ি এসে পড়তে লাগল আঙুলের ডগে, গাঁটে। ছেলেটি একবারও হাত সরাল না।

— বলো, কেন একথা বললে?

— আমি জানতাম না, স্যার।

— কী জানতে না? কোন্‌টে তোমার দেশ, তুমি জানতে না?

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে বলল, না।

— কী জানতে তাহলে?

ছড়ি পড়তে লাগল। ছেলেটির আঙুলের ডগ ফেটে গেল। গাঁট ফুলে লাল হয়ে উঠল। তালুতে উঁচু হয়ে কালসিটে পড়ে গেল। মাস্টারমশাই নাকটা বন্দুকের নলের মতো দেখাচ্ছে এখন। — বলো, কী জানতে, বলো!

— আমার বাবা বলে, বাবার একটা দেশ ছিল।

— আর?

— আমার মা বলে, মা-র একটা দেশ ছিল।

— আর?

— আমার ঠাকুমা বলত, ঠাকুমার একটা দেশ ছিল।

মাস্টারমশাই ছড়িটা আছাড় মেরে ফেলে দিয়ে বললেন, আর কী জানতে তুমি? বলে যাও— চুপ করে থেকো না।

ছেলেটি বলল, এখন আমাদের কোন দেশ নেই, স্যার।

— আর?

— আমরা দেশ ছেড়ে চলে এসেছি।

— আর?

মাস্টারমশাই ছেলেটির কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলেন, আর ছেলেটি হঠাৎ নিচু হয়ে মাস্টারমশায়ের দুটো পা জড়িয়ে ধরে বলল, আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, স্যার। আর আমায় কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আপনার পায়ে ধরছি, স্যার—

ছেলেটি হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেল। মাস্টারমশাই শুনতে পেলেন, ছেলেটি হু-হু করে কাঁদছে। আরও কয়েকটি ছেলেও ফোঁপাচ্ছে ক্লাসে। তিনি চশমাটা খুলে ফেললেন। তার চোখদুটো ভেতরে ঢুকে গেল। গালের চামড়া ঝুলে পড়ল। ঠোঁটদুটো নড়ে উঠল কয়েকবার। দু-হাতে ছেলেটিকে টেনে তুলে তিনি বললেন, এই তোর দেশ — তোকে চিনতে হবে, বাবা! আমি চেনাব তোকে।

মাস্টারমশাই ছেলেটিকে নিয়ে গেলেন মানচিত্রের কাছে। তারপর নিজের হাতে ছেলেটির হাতটি ধরে স্থাপন করলেন ভারতের ঠিক বক্ষস্থলের ওপর। ফিসফিস করে বললেন, ছুঁয়ে দ্যাখ— এই তোর দেশ— জননী জন্মভূমি।

ছেলেটির ডান হাতের পাঁচটি আঙুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগল ভারতের সীমারেখা, পাহাড়-সমুদ্র-অরণ্য, গ্রাম-নগর-নদীনালা, আর মাস্টারমশাই দেখলেন, মানচিত্রটি লাল হয়ে যাচ্ছে। ছেলেটির আঙুলের ডগ ফেটে রক্ত বেরিয়ে এসে ভারতের সারা অঙ্গে লাল ছোপ দিয়ে যাচ্ছে। বিন্ধ্যহিমাচলের চুড়োয় রক্ত লেগে যাচ্ছে। গঙ্গোত্রীর মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। গভীর সবুজ অরণ্যানী লাল হয়ে যাচ্ছে।

মাস্টারমশাই চীৎকার করে উঠলেন। আর দেখতে চাই না আর দেখতে চাই না আমি! তিনি চোখ বুজে ফেললেন। তার সারা দেহ কাঁপতে লাগল। একি ভয়ানক দৃশ্য তাকে দেখাল এই বালক!

মাস্টারমশাই ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ছেলেটি চেয়ে রইল।

টেবিলে পড়ে থাকল মলিন ভূগোলক। দেয়ালে রক্তাক্ত স্বদেশ।

বিমলবাবুর পরিবেশ সমস্যা

মোহিত রায়

সত্যি সত্যি কাগজ কলম নিয়ে বসলেন বিমলবাবু। আজকে লিখেই ফেলবেন, বৌকে ডেকে বললেন মশার ধূপটা একটু টেবিলের তলায় দিয়ে দিতে। বাংলায় না ইংরেজিতে? না বাংলা কাগজেই তো পাঠাবেন। কিন্তু বাংলায় চিঠি লেখাটা, মানে এরকম সম্পাদক সমীপেষু গোছের চিঠি তো উনি কোনদিন লেখেননি। তবে হ্যাঁ, অনেককে চিঠি লিখতে সাজেশন দিয়েছেন— একটা কাগজে চিঠি ঝাড় তো, এ ব্যাপারটার একটা প্রতিবাদ হওয়া উচিত। কিন্তু নিজের লেখা হয়ে ওঠেনি, বলতেন— দুর কাগজে! চিঠি লেখে রিটায়ার্ড লোকে, রিটায়ার করি, তারপর বাড়ির বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে দূরে মাঠ-ঘাট দেখতে দেখতে চিঠি লিখবো। আমার বাড়ি বাপু ঐ গ্রামে জঙ্গলেই প্রায়। বেশ মাঠ-ঘাট দেখা যায়। বিমলবাবুকে এখন সেই বাড়ি আর মাঠ-ঘাট নিয়েই চিঠি লিখতে হবে। না, রিটায়ার করেননি, বিমলবাবু একটু নিজেকে সান্ত্বনা দেন, ঐ প্রায় রিটায়ারই, আর তো বছর দুয়েক।

বরং একটা কোটেশন দিয়ে শুরু করলে মন্দ হবে না, বিমলবাবু বইয়ের তাকের দিকে চোখ রাখেন। দশ বাই বারো ঘর, এটাকেই বসার ঘর আজকাল বলা হয়। একদিকের দেয়ালে কাঠের তাকে কাঁচে ঢাকা বইপত্তর। দেয়ালে আবার চুনকাম করাতে হবে, ওদিকে পাশের বাড়ির পুঁচকেটা দেয়ালে পেন্সিল দিয়ে বার কয়েক দাদু লিখে গেছে। তাহলে দাদুই হয়ে গেলাম, কিন্তু তা বলে বুড়িয়ে যাইনি, এ সব ভাবতে ভাবতে চেয়ারে বসেই বইগুলোকে নজরে আনেন। মাঝের তাকের কয়েকটা বই নতুন, 'পরিবেশ চেতনা', 'মানুষ ও পরিবেশ', 'এনভায়রনমেন্টাল ক্রাইসিস'— এইসব। এগুলো নতুন যোগাড় করেছেন বিমলবাবু, বেকার ছোট ছেলে তার এক বন্ধুর কাছ থেকে এনে দিয়েছে। এগুলোর একটা সামনে রেখে শুরু করবেন কি, বেশ একটা গম্ভীর গোছের— "পরিবেশ ও মানুষের সম্পর্কটি পারস্পরিক সহযোগিতার, বিদ্বেষের নয়", বা পরিবেশ বাদ দিয়ে ইকোলজিও ব্যবহার করা যেতে পারে। একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটালো। লরি ঢুকছে, এই পাশ দিয়েই যাবে, একরাশ পোড়া ডিজেলের গন্ধের আতঙ্কে বিমলবাবু টেবিল ছেড়ে বইয়ের তাকের সামনে এলেন।

বিশেষ বই-টই পড়ার বাতিক না থাকলেও কাঁচে ঢাকা দেওয়াল আলমারির একটা তাক জুড়ে রবীন্দ্রনাথ আছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে মনে হলো একটা রবীন্দ্রনাথ থেকে কোটেশন ঝাড়া যায় না, বাংলা কাগজ তো লোক খাবে। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় এই পরিবেশ-টরিবেশ নিয়েও কিছু বলেছেন। কাঁচ ঠেলে লটারির টিকিট কাটার মতন একটা খণ্ড নামান। কাঁচ বন্ধ করে টেবিলের দিকে ফিরতেই সব অন্ধকার, আলো গেল, লোডশেডিং।

রবীন্দ্রনাথ, বিমলবাবু, অন্ধকার। একটু উঁচু গলায় বললেন— হ্যাঁ গো, হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে? — কেরোসিন কোথায় যে হ্যারিকেন জ্বলবে? নিভা ভেতর থেকে

ঝাঁঝিয়ে ওঠেন— কি রাজত্ব পড়েছে বাপু, কারেন্ট নেই, কোরোসিনও নেই।— ঠিক আছে। ঠিক আছে। বিমলবাবু উত্তাপ কমানোর চেষ্টা করেন। — কি ঠিক আছে বলোতো? নিজের পার্টির সরকার, তাই ঠিক আছে বললেই সবাই মানবে?

বিমলবাবু কথা বাড়ান না, আজকাল লোকে পার্টির নামে কিছু বললে তেমন রেগে ওঠেন না। তাঁর এই নিজের ব্যাপারটা দিয়েই তো বুঝছেন। তাঁর এ চিঠি কি আর পার্টির দৈনিকে ছাপবে? চিঠি লেখাটাও কি ঠিক হচ্ছে? রিটায়ারের সময় এগিয়ে আসছে। একটা দুম করে ট্রান্সফার যদি করে দেয়, ছোট ছেলেটার চাকরিও হয়নি। এই লোডশেডিং তবু মাথা খারাপ করে দেয়, এই সন্ধেবেলা কি করা যায়। এইসব এনভায়রনমেন্টের বইগুলো আজকাল তিনি পড়ছেন তাতে অনেকেই বলছেন যে আমাদের শক্তির ব্যবহার কমাতে হবে. এনার্জি কনজারভেশন, তাহলে ভালোই তো এই লোডশেডিং, রবীন্দ্রনাথ বুকে চেপে জানালার পাশে এসে দাঁড়ান বিমলবাবু।

বাঃ— বিমলবাবু বলে ফেললেন। এই লোডশেডিংয়ের সন্ধেয় কি সুন্দর ফুটফুট করছে চাঁদের আলো। দিন দুয়েক পরেই বোধহয় পূর্ণিমা। কার্তিক শেষ হলো, একটা হাল্কা কুয়াশার চাদর জড়াচ্ছে গাছপালা, মাঠ, চিকচিক করছে জলকণা। পাশাপাশি পাঁচটা লেবুর গাছ যে এত সুন্দর তা আরেকবার আবিষ্কার করলেন বিমলবাবু। জানালার পাশে রাস্তা পেরোলে একটা মাঠ এখনও আছে। বোঁচাদের তিনটে ছাগল এখনও মাঠে। মাঠের এককোণে অচিন্ত্য বসুর বাড়ি, বিমলবাবুই এ জমির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এখন আবছা অন্ধকারে কেমন আশ্চর্য লাগছে। একটু কষ্ট করে ঘাড় বাঁকালে সেই পুকুরটাও দেখা যায়। একটু আগে চই চই ডাকে হাঁসেরা ঘরে ফিরে গেছে। পুকুরের আগে কিছুটা নিচু জমিতে অল্প জল জমে আছে, তাতে কচুরীপানা। রাত পাখির একটা গুব্ গুব্ ডাক শুনতে পেলেন। দূরের বাঁশঝাড়টায় আদিম অন্ধকার। আর মাঠের শেষে কালো একটা জন্তুর মতন দাঁড়িয়ে আছে ট্যারা খোকার লরী। এই পুকুর ভর্তি করার জঞ্জাল নিয়ে এসেছে। ট্যারা খোকার দাদা এখানের পার্টির লোকাল কমিটির মাতব্বর।

।। ২ ।।

বিমল দত্ত যে একটা জমি কিনেছে তা অফিসের লোক অনেকদিনই জানত না। এমন জানাজানি করানোর মতো জমিও নয়। পাশের টেবিলের জলধর যখন বললেন— মাইরি বিমল, শালা আমাদেরও বললি না, দুবছর হয়ে গেল।

বিমল বলেছিল— এ যা জমি, কেনা না-কেনা সমান। সে এক ধ্যাধেবড়ে গোবিন্দপুর।

— তা তুই কি নিউ আলিপুরে জমি কিনবি ভেবেছিস?

— তাহলেও একটু কাছাকাছি হলে পদের হতো। বাসরাস্তা শেষ হয়ে গেলে তারপর ভ্যানরিক্সা করে যেতে হয়, এমনকি রিক্সাও পাবি না।

— তাহলে কিনলি কেন?

— সস্তায় পেয়ে গেলাম, বৌ ঝুলে বসল, একটু জমি কিনে রাখা ভালো। বললাম, ও জমি কোথায়, ওতো ধানক্ষেত। জায়গার নাম কি জানিস, ভেবাগ্রাম। আর ঐ জয়েন করবার সময় একসঙ্গে টাকাটা পেলাম তো।

এখন বিমলবাবু ভাবেন, নিভার দূরদৃষ্টি আছে। কট্টর বামপন্থী ইউনিয়ন কর্মী ছিলেন, বছরখানেক চাকরি গেল, আবার উনসত্তরে যুক্তফ্রন্ট ফিরে এলে একগাদা গাঁদার মালা পরে ফিরে এলেন। ইউনিয়নের জোর ছিল, একবছরের মাইনেও ফেরত পেলেন। তখনই নিভা বলেছিল, এ-টাকা তো পাবো ভাবিনি, জমিটা কিনে ফেল্লে।

— তোমার গয়নাগুলো যে গেল।

— সে আবার আসবে, জমি তো সোনা-ই গো।

সেই জমি কেনা, আটশো টাকা কাঠায় সাড়ে তিন কাঠা। এখন আশি হাজার টাকা কাঠা। ভেবাগ্রাম নাম পাল্টে এখন পূর্বপল্লী, পিনকোডে কলিকাতা সাতলক্ষ কিছু একটা। এখন অফিসের লোকে বলে আপনার কি চিন্তা বিমলবাবু, ওরকম জায়গায় বাড়ি করে ফেলেছেন।

কিন্তু এসব একদম এখনকার কথা। বছর বারো আগে যখন বিমলবাবু ভেবাগ্রামে বাড়ি শুরু করলেন, তখন অফিসে আর একবার তার জমি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। সরকারী অফিস, কাজকর্ম বিশেষ হবার কথা নয়। এক একটা নতুন বিষয় পেলে সময়টা কাটে ভালো। কেন্দ্রীয় সরকারের টালমাটাল অবস্থা, চরণ সিংয়ের ভবিষ্যৎ থেকে হঠাৎ আলোচনা নেমে এলো ভেবাগ্রামে, ইউনিয়নের তরুণ জঙ্গী নেতা নির্মাল্য নিয়ম ভেঙ্গে দুটোর পরও অফিসে রয়ে গেল। ভেবাগ্রামে তাহলে ডেভেলপমেন্ট শুরু হয়ে গেল। পঞ্চায়েত থেকে ওটা এখন মিউনিসিপ্যালিটি এলাকা হয়ে গেছে। না এখনও বিশেষ বাড়ি-ঘর ওঠেনি, ভেবাগ্রামের পুরোনো কিছু ঘর তো আছেই। তবে নতুন চওড়া রাস্তা হচ্ছে, এক্সপ্রেসওয়ে, ভেবাগ্রাম কিছু মর্যাদা পেতে থাকল। নিত্যবাবু বললেন— বিমলদা দেখবেন তো এখন জমি-টমি কেমন পাওয়া যাচ্ছে।

।। ৩ ।।

বিমলবাবু বললেন— একটু বেরোচ্ছি আমি।

— এই লোডশেডিংয়ের মধ্যে, টর্চটা নিও, চাদরটাও।

— ঠিক আছে।

— কিন্তু যাচ্ছ কোথায়? নিভা এবার রান্নাঘর থেকে উঁচু গলায় জিজ্ঞাসা করে।

— এই একটু। চাঁদের আলোটা একবার দেখে যাও। এত জোরে কথাটা বলে বিমলবাবু একটু লজ্জা পেলেন।

অবশ্য চাঁদের আলো দেখতে বেরোচ্ছেন না তিনি, ট্যারা খোকার লরিটার হালচাল দেখতে যাচ্ছেন। গেট থেকে বেরোতেই·দেখলেন লরির হেডলাইট দুটো জ্বলে উঠল, তাহলে ছাই ঢালা সারা। এবার আর ঘোরা রাস্তা দিয়ে নয়, মাঠ দিয়ে দুদ্দাড় করে লরিটা সোজা রাস্তায় উঠল। চাঁদের ফুটফুটে আলোয় পোড়া ডিজেলের গন্ধ সব বেমানান করে দিল।

বিমলবাবু আকাশ দেখলেন। অঘ্রানের ঝকঝকে নীল আকাশ, লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে। দশবছর আগে লোডশেডিং না হলেও এরকম আকাশ দেখা যেতো। তখন রাস্তায় আলো ছিল না, এত বাড়িও নয়। শুধু কি আকাশ, এখন যেখানে ডানদিকের বাড়িগুলো সেখানের জলায় পুরো আকাশটা ধরা পড়ত। দমদম, পাইকপাড়ার ঘুপচী বাড়িতে থেকে থেকে প্রকৃতি-টকৃতি ভুলে গিয়েছিলেন, এখানে এসে আবার শৈশবের গ্রাম মনে পড়ত। ছোট ছেলে তখনও লায়েক হয়নি, তাকে দেখাতেন। ঐ দ্যাখ আকন্দ গাছ, আমাদের গ্রামে খুব ছিলো, দেখ এই গাছটায় চৈতে কেমন তুলো উড়বে, শাপলা ফুল দেখেছিস, ওর ডাটা দিয়ে শাক মন্দ হয় না কিন্তু।

তারপর ঐ জলাটা একদিন বিক্রি হয়ে গেল। সে ভেবাগ্রাম এখন আর নেই। যাদের জমিজমা তারা সব দারুণ দাম পেয়ে নাকি আরো ভেতরে চলে যাচ্ছে। মাঠে এখন ছাগলগুলো নেই, দুটো গোরু অন্ধকারেও কচুরীপানা খাচ্ছে। এইসব মাঠে বাড়ি হয়ে যাওয়ায় এখন পশু চরাবার জায়গা বড় কম, এর-ওর বাড়ির ফুলগাছই খাদ্য। বিমলবাবু মাঠে নামলেন, পুকুরটার দিকে চললেন। এই পুকুরটাই শেষ ছিল, তাও বোধহয় রক্ষা করা গেল না। ঘাসের হিমে পা

ভিজে উঠেছে। অন্ধকারে কিম্ভূত বাড়িগুলোতে টিমটিম মোম বা হ্যারিকেনের আলো, ওদিকের দুটো বাড়ি পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে। তাদের ইট-বালির পাহারাদার ছোকরা ট্রানজিস্টার চালিয়েছে জোরে। পুকুরটার পাড়ে এসে দাঁড়ালেন, বেশ বড় পুকুর, টুপটাপ দুটো ব্যাঙ লাফ দিয়ে পড়ল, ঢেউয়ে ভেঙে ভেঙে গেল চাঁদ। বিমলবাবুর নতুন আনা বইয়ের একটার কথা মনে পড়ল— 'প্রকৃতির মধ্যে মানুষের পূর্ণ বিকাশ ঘটে'। এই চাঁদের আলো, হিমে ভেজা মাঠ, স্তব্ধ পুকুর— সব কেমন বিমলবাবুকে একটা অন্য উপলব্ধির কাছে নিয়ে যাচ্ছে। কোথাও কুকুর ডাকলো, তখন মনে হলো ট্যারা খোকা তাহলে পুকুরটাকেও ছাড়বে না। বরং একবার মজুমদারবাবুর বাড়ি যাওয়া যাক। সেখানে অনেকে আসে।

রাস্তা ধরে এগুলেন। এদিকের পরপর দুটো বাড়ি এক প্যাটার্নের। শ্যালকের অফিসের লোকেরা কোঅপারেটিভ করে বানিয়েছে। উনিই যোগাযোগ করিয়েছিলেন। বাঁদিকে পার্ক। ছোট্ট মাঠটায় ভাগ্যিস বুদ্ধি করে দুটো দোলনা লাগিয়ে দিয়েছিলেন, নইলে ওটাও বোধহয় ট্যারা খোকা ছাড়ত না। কিন্তু পুকুরটা বোজানো নিয়ে তো কাউন্সিলর এখনো কিছু ফাইনাল বলেনি, তবু ট্যারা খোকা ছাই ঢালতে শুরু করলো! দেখি মজুমদাররা কি বলে। এভাবে পরিবেশ ধ্বংসের কোনো প্রতিবাদ হবে না! মজুমদারের বাড়ির গেটেই দেখলেন ট্যারা খোকা ছ-ব্যাটারির টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে।

।। ৪ ।।

তখনও লোকে ভেবাগ্রাম বলত। বিমলবাবু নিজেও বলতেন। নতুন বাড়ির কিছু গল্প তো থাকেই। অফিসে বসে সেসব গল্প হতো। একে সরকারী অফিস, তায় ইউনিয়নের পাণ্ডা, বিমলবাবু এগারোটার আগে অফিসে ঢোকেন না, এখন সেটা সাড়ে এগারোটা হলো। এতো আর দমদম থেকে সাট্ করে মিনি চড়ে আসা না। দশ মিনিট হেঁটে রিক্সাস্ট্যাণ্ড, সেখান থেকে রিক্সায় বাসস্ট্যাণ্ড। একটা প্রাইভেট বাস শুধু অদ্দুর পর্যন্ত যায়। এক্সপ্রেসওয়ে-টয়ে তখন কথার কথা।

ভেবাগ্রাম অবশ্য আর গ্রাম পঞ্চায়েত নেই। মিউনিসিপ্যালিটিতে ঢুকে গেছে। কাউন্সিলর অজিতবাবু তাঁর পার্টিরই লোক। এদিকে ওদিকে চেনাশোনা বেরিয়ে পড়ল। অজিতবাবুই তখন দেখা হলে ভরসা দিতেন, এ জায়গা কদিনে পাল্টে যাবে, রাজ্যে নতুন জনপ্রিয় সরকার, আমরা সবাই মিলে হাত লাগালে কি হবে না।

তা সময়টা তখন নতুনই। অফিসে এখন বিমলবাবুদেরই রমরমা। পার্টি সরকারে আসার পর মিছিল-টিছিলের শক্তিক্ষয় একটু কমেছে। এখন সমাবেশে যেতে বাস-টাস পাওয়া যায়। সম্মেলনে খাওয়া-দাওয়া ভালো হয়, অনেক সুবিধে। মিউনিসিপ্যালিটিতে বাড়ির প্ল্যান পাস হয়ে গেলো সাতদিনে। অজিতবাবুই জগবন্ধুকে লাগিয়ে দিলেন বাড়ি তৈরির কাজে। পার্টির কর্মী, এখন একটু কানট্রাক্টরির কাজ করছে। আপনার ইট, সিমেন্ট, বালি সব করে দেবে। তা সত্যিই ভালো করেছিল জগবন্ধু, ঠকায়নি। পার্টির লোক। তবে এখন জগবন্ধু শুধু পার্টিই করে, লোকাল কমিটি বলতে সেই। তার ভাই ট্যারা খোকা ঐ কনট্রাক্টরি দেখে।

বিমলবাবু তখন ভেবাগ্রামের উন্নতিতে ব্যস্ত। নামটা পাল্টে হয়ে গেল পূর্বপল্লী। ভেবাগ্রাম ঠিক চলে না। এটা তো এখন প্রায় কোলকাতাই। পূর্বপল্লীর অন্তত ২৫টি জমির খোঁজ তিনিই দিয়েছেন। প্রথম দু-তিন বছরে সাকুল্যে ছিল তিনটে বাড়ি। একবছর তো ইলেকট্রিসিটি ছাড়াই। বিমলবাবু ব্যাগে আনন্দবাজার, টিফিন বাক্সর সঙ্গে যুক্ত হলো ভারী টর্চ। রিক্সা স্ট্যাণ্ড থেকে পায়ে হাঁটা অন্ধকার রাস্তায় দশ মিনিট। ধানক্ষেতের সাপগুলো তখনো ভেবাগ্রাম ছাড়েনি। বর্ষাকালে এঁটেল মাটির কাদা। ইউনিয়নের কাজে আজকাল বিমলবাবুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

উনি ব্যস্ত পূর্বপল্লীর উন্নয়নে। মাঝে মাঝেই অফিসে ডুব মারেন। কাউন্সিলর অজিতবাবু, জগবন্ধুদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে চেষ্টা করেন মিউনিসিপ্যালিটি যদি রাস্তাটা পাকা করে, এবার তো রাস্তাতে লাইটও লাগাতে হয়। বেশ কিছু নতুন নতুন জমি বিক্রি হচ্ছে, বাড়িও উঠতে শুরু করেছে। জগবন্ধুর ভাই খোকাও এখন কাজে নেমেছে। কনট্রাক্টরের কাজ আসছে মন্দ না। অফিসে পূর্বপল্লীর ম্যাপ খুলে বসেন বিমলবাবু, আড্ডার লোক জুটে যায়। তাদের বলেন—

না এতদিনে দাঁড়াচ্ছে জায়গাটা। এখনও বাস সার্ভিসটা ঠিক হয়নি, জলের লাইন আসেনি, তবু যাই বলো সকালবেলাটা সত্যি সুন্দর। আর ছুটির দিনে বিকেলে বারান্দায় বসে সূর্যাস্ত দেখি। যাই বলো ভাই, একটু কষ্ট আছেই তবে বাড়ি ফিরলে একটা বেশ শান্তি লাগে, কোলকাতায় আছি বলে মনে হয় না।

এলাকায় একটা নাগরিক সমিতি গড়ে ফেলা হয়েছে। একটা দুর্গাপুজোও শুরু হয়েছে। নেতাজী সংঘও গড়ে উঠল। আর ডেভেলপমেন্টটা আরও জোরদার হল দুটো কারণে। এক্সপ্রেসওয়েটা তৈরি হয়ে এল প্রায়। পূর্বপল্লীর সামনের রাস্তাটা ওর সঙ্গে মিশে গেলে এয়ারপোর্ট মাত্র আধঘণ্টা। চচ্চর করে জমির দাম বাড়তে থাকল। দ্বিতীয় কারণটা অজিতবাবুর মুখে আগেই শুনেছিলেন, কর্পোরেশনে পার্টিকে জিততে হলে নতুন নতুন জায়গাকে কর্পোরেশনে ঢোকাতে হবে। এখন বিমলবাবু পূর্বপল্লীর নাম বেশ গর্ব করেই বলেন।

।। ৫ ।।

এখন আর জায়গাটাকে শূন্যপুরী লাগে না। দেখতে দেখতে বেশ কটা বাড়ি হয়েছে, একটা পার্ক। সেদিন রোববার সকালে বারান্দায় চেয়ারে হেলান দিয়ে পত্রিকা পড়ছিলেন। পার্টিকে যতই গালাগাল করুক এখনও আনন্দবাজারই পড়েন বিমলবাবু। আজকাল বিমলবাবুও বোঝেন সব অভিযোগকে মিথ্যে বলবার মতো জোর আর নেই। এই পূর্বপল্লীর ব্যাপারটাই দেখা যাক না। কর্পোরেশনে আসার পর ঘুষ ছাড়া কিছু হয় না। হঠাৎ চোখ গেল একটু দূরে, বেশ কিছু লোকজন। কি ব্যাপার? ওই আমবাগানটা বিক্রী হয়ে গেল বুঝি। কাগজ রেখে পাঞ্জাবিটা গায়ে চাপিয়ে বেরোলেন। ওটা তো মণ্ডলদের বিক্রী করার কথা নয়। গিয়ে দেখেন বেশ দামী দামী লোকজন, তাঁর মর্তন সরকারী অফিসের কেরানি নয়। ট্যারা খোকাও আছে। মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল, বেশ ঘন একটা বাগান ছিল, বাচ্চাগুলো খেলা করত। মনে আছে গতবারের কালবৈশাখীতে ছেলেকে বলেছিলেন, যা দেখে আয় কটা আম পড়লো। মণ্ডলরা বেচে দিল শেষ পর্যন্ত। বড় ছেলে সবে ব্যাংকের চাকরি পেয়ে মালদায় পোস্টেড। ছুটিতে এসেছিল। সে বলল—সেকি, চারিদিকে এত বৃক্ষরোপণ চলছে, তখন একটা আমবাগান কেটে ফেলবে কি করে? তাছাড়া বাগান কাটলেই তো ওটা জমির সিলিংয়ের আওতায়। এসব অনেক ঝামেলা আছে।

কাউন্সিলর অজিতবাবুর সঙ্গে দেখা করা আজকাল অত সহজ নয়। কর্পোরেশন হবার পর থেকে অজিতবাবু আরও কেউকেটা হয়ে গেছেন। জগবন্ধু দেখা হলে একটু দাদা কেমন আছেন গোছের বলেই মুখ ঘোরায়। না, তাঁর সঙ্গে কোনো ঝুট ঝামেলা নেই, আসলে ওরা সবাই খুব ব্যস্ত। অজিতবাবু এখন রিক্সা ছেড়ে গাড়িতেই ঘোরেন। ইণ্ডিয়া কিংস সিগারেট খান। তবু দেখা করলেন বিমলবাবু। এভাবে গাছ-টাছ কেটে ফেললে তো চলবে না। তাছাড়া প্ল্যানিং বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। টাউন অ্যাণ্ড কান্ট্রিপ্ল্যানিং বলে একটা দপ্তর তো এসব দেখাশোনা করে, তাদের কি জানানো যায়? অজিতবাবু কিছুক্ষণ চুপচাপ, বললেন—

এ বাগানটা ঠিক বিক্রীর জন্য ছিল না, কিন্তু কি করা যায় বলুন, গৃহসমস্যার কথাও তো সরকারকে ভাবতে হবে। জানেন তো এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে বড় রাস্তাটা কানেক্ট হয়ে যাবে,

ফলে এদিকে তো অনেকেই আসতে চাইছে। ওখানে একটা চারতলা হাউসিং-এর প্ল্যান আছে, আমাদের খোকা দেখছে কাজটা. ওটা নিয়ে আর হইচই করবেন না।

কিন্তু এভাবে শুরু হলে তো পূর্বপল্লীর পরিবেশ— এনভায়রনমেন্ট আজকাল একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, জানেন তো... মানে, আমাদের সরকার, পাব্লিক তো ব্যাপারটা—

অজিতবাবু থামিয়ে দেন— না, না কিছু হবে না। কেউ চেঁচামেচি করছে দেখলে একটু নামধামগুলো নোট করে নেবেন তো। ওসব পরিবেশ-টরিবেশ শুনতেই ভালো লাগে, ছিল তো ধানক্ষেত আর ডোবা। এই যে ডেভেলপমেন্ট হলো, তাতে কম গাছ কাটা হলো, আর সবার এনভায়রনমেন্ট নিয়ে ভাবনা কোথায় ছিলো? দেখছেন না ক্যাবিনেটে এনভায়রনমেন্ট মিনিস্টারকে কেউ পাত্তা দেয়? না, এটা বোধহয় খোকার বিরুদ্ধে কেউ চক্রান্ত করছে।

চক্রান্ত কথাটা শুনে বিমলবাবু একটু ঘাবড়ান। এসব পার্টির পেটেন্ট কথাবার্তা. তিনিও ইউনিয়নে কম ব্যবহার করেন না। খোকার বিরুদ্ধে চক্রান্ত মানে জগবন্ধুর বিরুদ্ধে. মানে অজিতবাবুর বিরুদ্ধে, মানে জনদরদী সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত! আজকাল ইউনিয়নে কম যান, কি জানি কেউ যদি এসব নিয়ে আবার অফিসে লাগায়।

বাড়ির ডানদিক দিয়ে বাঁশবাগানটা দেখা যায়। একদিন সকালে অফিস যাবার আগে দেখলেন ওখানে মাটি খোঁড়া হচ্ছে। বাড়ি হবে। বাঁশবাগানের মাথায় ঝেঁপে বৃষ্টি আসছে আর দেখা হবে না। আগে পূর্বপল্লীতে কোনো বাড়ি তৈরি শুরু হলে নিজে থেকে গিয়ে খোঁজ নিতেন, বলতেন— ভালোই হলো, আপনারা সবাই এলে তো জায়গাটা গড়ে ওঠে! আজকাল কোনো মাটিতে কোদালের ঘা পড়লে তিনি শিউরে ওঠেন; বড় লোক বেড়ে যাচ্ছে, এবার থামা উচিত।

অফিসে গিয়ে শুনলেন এটা অরণ্য সপ্তাহ— মন্ত্রী আসবেন কাল। একটা গাছও পোঁতা হবে। পুরোনো ইউনিয়ন কর্মী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব আছে বৈকি. তবু বিমলবাবু একটু যেন বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অফিসে সবাইকে বলতে থাকলেন, মন্ত্রী আসবেন, সেকেণ্ড হাফে থাকবেন কিন্তু। অনেকদিন পর মন্ত্রীর ভাষণ মন দিয়ে শুনলেন তিনি। মন্ত্রী বললেন পরিবেশের গুরুত্ব, সমস্যা, গ্রীনহাউস এফেক্ট, এ্যাসিড রেইন. নিউক্লিয়ার পাওয়ার কত কি। বাড়ি ফিরে ছোট ছেলেকে বললেন— তোদের কলেজে এনভায়রনমেন্ট পড়ায় না? ছেলে বলল— ওসব বোধহয় সায়েন্সে আছে, কমার্সে নেই।

— দেখিস তো. চেনা কারো কাছে একটা দুটো বই পেলে আনিস তো! ব্যাপারটা আজকাল খুব ইমপরট্যান্ট।

তারপর বিমলবাবু পাড়াতেও একটা অরণ্য সপ্তাহ করে ফেললেন। নাগরিক সমিতিতে তিনিও একজন পাণ্ডা। সবাই বলল ভালোই তো। নেতাজী সংঘ একটা অনুষ্ঠান করে ফেললো. চাঁদা তুলে পূর্বপল্লীর প্রধান রাস্তার দু'পাশে বাঁশের ঘেরা দিয়ে গোটা বিশেক গাছ লাগানো হলো। বিমলবাবু ভাষণও দিলেন, তাতে ওসব গ্রীনহাউস-টাউসও বললেন, পূর্বপল্লীর পরিবেশ যে ধ্বংস হতে যাচ্ছে, নতুন নতুন বাড়ি যে বেড়েই চলেছে এসব কথাও ছিল। পরদিন বাজারে জগবন্ধু ডেকে বললো দাদা. একটা প্রোগ্রাম করলেন আব লোকাল কমিটিকে একটু জানালেন না! একটু দূরে ট্যারা খোকাও ছিল।

সেদিন অনেকদিন পরে অফিস থেকে ফেরার মুখে ডালহৌসিতে রজত সেনের সঙ্গে দেখা। এক সময় তাঁদের অফিসেই ছিলো, ইউনিয়ন করার জন্য একসঙ্গে সাসপেণ্ডও হয়েছিল। তারপর সে কি সব পড়ে-ফড়ে প্রাইভেটে এম-এ, এম.ফিল করে কলেজে ঢুকে গেল. রাষ্ট্রবিজ্ঞান না কি পড়ায়। এখন নাকি বেশ নামডাক হয়েছে, পার্টির কাগজে মাঝেমাঝে নাম-টাম বেরোয়। একটা চায়ের দোকানে ঢুকে দুজনে গপ্পোমুপ্পো হলো। রজতবাবু এসেছিলেন একটা কোঅপারেটিভ সোসাইটির ফাংশনে ভাষণ দিতে। কথায় কথায় বিমলবাবু বলেই

ফেললেন— পূর্বপল্লী আর পরিবেশ দূষণের কথা। রজত বেশ সিরিয়াস হলেন, আজকাল যে-কোনো কথাতেই একটু বক্তৃতার ছাপ আছে, বললেন এন্‌ভায়রনমেন্টাল ক্রাইসিস, এটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফল, হবেই। সমাজতন্ত্রে এসব নেই। ক্রাইসিসটার কারণ সিস্টেম আর মার্কেট-ফোর্স। সে মুনাফার জন্য পরিবেশের তোয়াক্কা করে না।

বিমলবাবু নিজও ইউনিয়ন করেন, জানেন গণ-আন্দোলন আর সমাজ বদল ওসব কথার কথা। আসল হচ্ছে সিস্টেম আর মার্কেট-ফোর্স। তা পূর্বপল্লীতে সিস্টেম মানে অজিতবাবু আর জগবন্ধু। মার্কেট-ফোর্স মানে ট্যারা খোকা। বিমলবাবু চায়ের তলানিটুকু ভুল করে চুমুক মারেন। রজত সেনও ইণ্ডিয়া কিংস ধরান।

।। ৬ ।।

পাড়ায় এখন ব্যাপারটা সবাই জানে। বিমল দত্ত, ননী সাহা এরকম কয়েকজন পূর্বপল্লীর পরিবেশ নিয়ে খুব চিন্তিত, চিন্তিত অবশ্য অজিতবাবুও। পাড়ায় নেতাজী সংঘকে বিমলবাবুরা কিছুটা হাত করছেন। দু'বছর ধরে অরণ্য সপ্তাহ পালন হচ্ছে, ওরা খেলার মাঠের চারপাশটায় বেশ গাছ লাগিয়েছে। বছর দেড়েকে বেশ বড়সড় হয়েছে গাছগুলো।

তবে ভেবাগ্রামের মণ্ডলরাও খুব রেগে আছেন। এই ক্লাবের মাঠের জমিটা নাকি তাঁদের বেদখল হয়ে যাচ্ছে ক্লাবের মাঠ বলে। অবশ্য মণ্ডলদের অনেক জমিই বেনামী সেটাও সবাই জানে। কিন্তু গাছ-পালা মাঠ-ঘাট নিয়ে বিমলবাবুর এসব আদিখ্যেতা তাদের ভালো লাগছে না। কেন বাপু, এসবই তো ধানী জমি ছিলো। জঙ্গল ছিলো, জলা ছিলো। কত রকমের পাখি আসতো সারা শীত জুড়ে। এদিক থেকে একটু নেমে গেলে একসময় বিদ্যেধরী নদীও ছিল, সেটা মণ্ডল শুনেছেন তার বাপের কাছে। চাষীদের ঘরও ছিল গোটা বিশেক। ভেবাগ্রামের দুধ ছিলো বিখ্যাত, এ গ্রামের গোরুর সুখ্যাতি ক্যানিং পর্যন্ত লোক জানত। তা সব তো গেল। কোলকাতা বাড়তে বাড়তে সব খেয়ে নিচ্ছে। ভেবাগ্রামই নেই। আর ঐ বিমলবাবুই তো প্রথম এলেন। ওনারাই তো নাম রাখলেন পূর্বপল্লী। বিমলবাবুই তো কতজনকে নিয়ে এলেন মণ্ডলদের কাছে। লোকবসতি না বাড়ালে নাকি ডেভেলপমেন্ট হবে না। এখন বিমলবাবুই লোক খেপাচ্ছেন, মণ্ডলরা যেন আর জমি বিক্রী না করে। এ কেমন বিচার!

অজিতবাবুরাও আর ছেড়ে কথা কইবেন না। ট্যারা খোকা সাফ জানিয়েছে, কোঅর্ডিনেশনের লোক বলে এদ্দিন কিছু বলিনি। দাদারও কাজের হাতে খড়ি ওনার বাড়ির কাজে। কিন্তু এই পুকুরটার ব্যাপার নিয়ে বিমল দত্ত বাড়াবাড়ি করছে। দশবছর আগে এদিকে ডোবাখানা বোজাতে কম মিউনিসিপ্যালিটি দৌড়াদৌড়ি করেছে। কিনা মশার উপদ্রব। এখন ঐ এঁদো পুকুরটার জন্য এত মায়া। আর ঐ পুকুরটা থাকলে বস্তীটাও উঠবে না। বস্তীটার জন্যে ওদিকের জমির দাম মার খাচ্ছে। বিমল দত্ত নাকি পলিউশন কন্ট্রোলেও গিয়েছিল, আজকাল নাকি পুকুর বোজাতেও পারমিশন লাগে।

বিমলবাবুর ফিরতে একটু রাত হলো। সুপ্রকাশের ছোট ভাই আনন্দবাজারে আছে, ওকে বলতে গিয়েছিল চিঠিটা হাতে হাতে দেবে কিনা, যাতে তাড়াতাড়ি ছাপা হয়। লিখে ফেলেছেন একটা, কোটেশনও দিয়েছেন, সেইটাই, "দাও ফিরে সে অরণ্য"...। জামাকাপড় ছেড়ে বসতে বসতে ছোট ছেলেকে বললেন টি.ভি-টা চালাতে— এনভায়রনমেন্ট নিয়ে প্রোগ্রাম আছে। তারপর নিবিষ্ট টি.ভি-র পর্দায়। নিভা চা দিয়ে গেলেন। চায়ে চুমুক দিতে দিতে দেখলেন পর্দায় আমাজনের জঙ্গল। জঙ্গল কেটে ফেলা হচ্ছে। জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে পৃথিবী দূষিত হচ্ছে। গ্রীনহাউস এফেক্ট। কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেড়ে যাচ্ছে, পৃথিবী গরম হয়ে উঠছে। ছোট ছেলেকে আর একবার ডাকলেন— প্রোগ্রামটা দেখলে পারতিস। গ্রীনহাউস

এফেক্ট, এ্যাসিড রেইন সব বুঝিয়ে দিচ্ছে। আর আজকাল ইন্টারভিউয়ে এসব খুব জিজ্ঞেস করে, এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন নিয়ে তো জিজ্ঞেস করবেই।

এমন সময় নিভা এসে দাঁড়ায়— চা-টাতো ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

— টি.ভি-র প্রোগ্রামটা দেখছি তো, দারুণ, পরিবেশ নিয়ে. ..

— ও তুমি পুকুর-টুকুর নিয়ে মাতামাতি ছাড়ো তো, বড় খোকা চিঠি দিয়েছে, একটু দেখো ওটা।

—- কি লিখেছে।

— একটু পড়ে দেখো না, জমির ব্যাপার স্যাপার কি আছে।

টি.ভি-তে প্রোগ্রামটা শেষ হলে বিমলবাবু চিঠিটা পড়তে থাকেন। বড় খোকাদের ব্যাংকের লোকেরা কোঅপারেটিভ করে জমি কিনছে। ব্যাংক প্রচুর লোন দিচ্ছে। এইবেলা একটা জমি কিনে রাখা ভালো। এই এক্সপ্রেসওয়ে পেরিয়ে আধঘণ্টা হাঁটাপথে ভিতরে গ্রামের দিকে একটা জমির খবর আছে। গ্রামের নাম হোসেনপুর। কোঅপারেটিভ জমিটা কিনবে ঠিক করছে। বিমলবাবু যদি একটু খবর নেন, আর বাড়িটা হলে তাদের নিজেদের বাড়ির কাছেও হলো, সেটাও কম বড় কথা নয়। কোঅপারেটিভ কেনার আগে ওখানের জমিটমি সম্পর্কে আরো কিছু খবর থাকলে জানতে চাইছে।

— ভালোই তো, বিমলবাবু বলেন— জমি তো সোনাই।

— তা আবার কোথায় এই গ্রামের মধ্যে— নিভার পছন্দ নয়।

—তা ভেবাগ্রামই কোন শহর ছিল বলো। তোমার বুদ্ধি না হলে কি এবাড়ি হতো। কিনে ফেলুক বড় খোকা। ও ডেভেলপমেন্ট হয়ে যাবে। ঐ এক্সপ্রেসওয়েটা পুরো চালু হলেই দেখো না জমির দাম কি বাড়বে। রাস্তার কাছাকাছি আর কোনো জমি কেনা যাবে না।

নিভা তবু কিন্তু কিন্তু করেন, আর একটু খোঁজ-টোজ নিয়ে কেনা উচিত।

— সে আমি খোঁজ নেবখন।

পরদিন সকালে বাজারের মোড়ে ইট-বালির সবচেয়ে বড় দোকানে বিমলবাবুকে দেখা যায়। ট্যারা খোকার সঙ্গে কথা বলছেন বিমলবাবু। ট্যাবা খোকা বিমলবাবুকে আশ্বস্ত করে— না বড়দা, কোন চিন্তা নেই। জমি কিনতে বলুন। ওখানের পঞ্চায়েত আমাদের, ওখানেও ডেভেলপমেন্ট করে দেবো। আপনারা একটু সাপোর্ট দিন। এখনো গাঁ আছে, জমি সস্তায় পেয়ে যাচ্ছেন। ব্যাংক কিছু ঠিক করলে জানাবেন কিন্তু।

নিশ্চিত হয়ে বিমলবাবু বাড়ির দিকে ফেরেন। আজও অফিসে ডুব মারতে পারেন। রাস্তার পাশে বাঁশের বেড়া ভেঙ্গে বনমহোৎসবের গাছ খাচ্ছিল বোঁচাদের ছাগল। বিমলবাবু আজ সেগুলোকে তাডাতে ভুলে গেলেন।

কসাই

সৈকত রক্ষিত

মেঘ করেছে একপেশে। পুবের চাপ চাপ মেঘ দেখতে-দেখতে আকাশময় ছড়িয়েও যাচ্ছে।

বিপরীতমুখী হাওয়ার ধাক্কায় হাড়িরাম সামলে উঠতে পারে না। গামছাটা সে ছাগলের গলায় জড়িয়ে তাকে টেনে-হিঁচড়ে হাঁটে। মুখ খিঁচিয়ে বলে, 'হিঁট্ র‍্যা শালা— হিঁঈঈট্!'

ধুলো ঢোকে হাড়িরামের চোখে। থুতনি কাত করে সে কাঁধে সাঁটিয়ে নেয়। কখনো-বা চোখ কচলে দেখে, সামনে, গ্রামের কাঁচা ঘরগুলো বেবাক উধাও। কোথায় লম্বা-লম্বা তার খুঁটা? পথের ধারে পড়ে থাকা নড়বড়ে কাঠের রথটাও বুঝি নেই। একটা বিরাট ধুলোর পিন্ড হাঁ করে তার দিকেই ছুটে আসছে।

দুর্যোগে পড়ে, হাড়ির যত ফালতু রাগ ছাগলটার ওপর। এটা না থাকলে কখন সে তুলিনে ঢুকে যেত। কিন্তু ওই! বকরি হল হারামি। মাঠ-খামার ডিঙিয়ে দেড় ক্রোশ রাস্তা সে এই হারামির সঙ্গে আসছে। কাড়িয়র গ্রাম থেকে। কখনো তাকে হাঁটিয়ে আনছে, কখনো-বা নিজের ছেলের পারা কোলে লাদিয়ে। যদিও হাড়িরামের কোনো ছেলে নেই।

ছেলের জন্য অনুশোচনাও তার নেই। এই তিন কুড়ি বয়সে সে-কথা নতুন করে কোন বুড়বক ভাবে? পড়শিরা যখন তার মর্দানিতে কাঠি দেওয়ার চেষ্টা করে, হাড়ি তখনও অমলিন। ছাগলের পিঠ চাপড়ে হয়ত বলে, 'ইটা হামার বিটি লয়? কি মৈৎলাল?'

মতিলাল হাসে, 'স্যা বটে।'

কোলে সন্তান পাওয়ার মতো ছাগলের আমদানিতে হাড়ি এমনি ডগমগায়। পাইকারের কাছে যদি সুবিস্তা দরে কিনতে পারে, তাকে কুপিয়ে বাজার দরে বিক্রি করলেও হাতে তার দশ-পনের টাকা থাকে।

পাঁঠার মাংস হাড়ি বেচে না। পঁচিশ টাকা দরের জিনিস খায়োয়া গাঁয়ের ভিৎরে ক'জন আছে? দু'কেজি বিকতেই বেলা কাবার হয়ে যাবে। সে বেচে পাঁঠির মাংস। কুড়ি টাকা কেজির মাল শেষতক আঠারোয়। গাঁয়ের খদ্দাররা পরনের লুঙ্গি কি শাড়ির আঁচলেই পোঁটলা পাকিয়ে নিয়ে যায়।

পাঁঠি কাটে সে হাটবারে। তুলিনের হাটে, দু-পহরে যখন আশপাশের গ্রাম থেকে লোক ঢুকতে শুরু করে, হাড়ি তখন ছুরি-বঁটিতে শান লাগায়। তলের পাটিতে অবশিষ্ট ছাগল নাদির পারা দাঁত কটা দেখিয়ে যে-কাউকে অনর্থক গন্তব্যের কথা জিজ্ঞেস করে নজর টানার চেষ্টা করে।

বগলের ছাতা কিংবা কাঁধের টাঙি নাচিয়ে হাটযাত্রী বলে, 'ঘুরৎ আসছি।'

হঁ, হাটে সয়দা-পাতি কেনা-বেচা করে তবেই না মাংস কেন।? আর মাংস কিনে সটান ঘর!

ধাপে ধাপে এমনি অনেক কথা আপ্‌সে হাড়ির মগজে এসে ভিড় করে। হাতে তার জ্যান্ত পাঁঠি, কিন্তু এরই মধ্যে, কল্পনায় সে তাকে ঘরের সামনে ছাই-টিবির খুঁটায় বেঁধে

ফেলেছে। দু'হাঁটুর মাঝে হারামিকে চেপে র‍্যাচ্ র‍্যাচ্ অস্ত্র চালিয়ে দিচ্ছে। ফের ঠ্যাঙে দড়ি পরিয়ে চালার বাঁশে পাঁঠি ঝুলাও। মাংস-চামড়া ভিনু করে দাও। একদিকে খদ্দের আসছে, একদিকে হাড়ি সাইজ-করা মাংস পাল্লা উপুড় করে তাদের বিকছে।

এই সব আগাম ভাবনায় হাড়ির দমতক ফুর্তি আসে। কেন-কি, কাজের প্রতিটি দফায় তার হাতে অস্ত্র। কাঁই খচ্-কাঁই খচ্! তাকে চনমনে করে। জাগিয়ে দেয়। হাতে অস্ত্র পেলে হাড়িরাম কল্লু অন্য মানুষ।

হিঁট্ র‍্যা শালা।

বুড়ো হাড়-পাঁজরায় বাতাসের ধাক্কাও সামলাতে সে পারে না। লুঙ্গি বারবার সরে গিয়ে তাকে বেআব্রু করে দিচ্ছে। বাতাসের ঠ্যালানিতে সে সামনে বাড়বে কি, কদম-দু'কদম পেছু হটে যাচ্ছে। একদিন ছিল, ডাগর ডাগর ভেড়ি-বকরি গাঁ-বস্তি থেকে কিনে দরকার বুঝলে ঘাড়েও তুলে নিত। আজ সামান্য পাঁচ-সাত সেরের ছাগলটা নিয়ে ঘর পৌঁছুতে তার কম হায়রানি?

লুঙ্গিটা পেটের দু'পাশে গুঁজে উরুর ওপর সে তুলে নিল। এখন তাকে বিলকুল কসাই লগছে। ছাগলের খুরের রঙ গায়ে, মুড়োনো মাথা আর হাড়-চামড়া বরাবর শরীরে তাকত কি হাড়ির কম? গামছায় হ্যাঁচকা টান দিয়ে হিড়-হিড় করে সে এগোতে থাকে। হাওয়ার গতিতে ছুটে-আসা বালি ঝাপ্টা মারে তার পায়ে।

নির্মম কসাইয়ের হাতে পড়ে জানোয়ারটা এক-তরফা গোঙানি ছাড়ে। হাড়িরাম মুখ খিঁচিয়ে বলে, 'হিঁট র‍্যা শালা!'

মাঝে মাঝে হাওয়ার ঝাপ্টা। বৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে স্থানান্তরে। পিচ রাস্তার দু-পাশাড়ি মাটির দেয়াল আর খড়ের চালা নিয়ে তুলিনের ছোট ঘরগুলো ঈষৎ কেঁপে ওঠে কিন্তু পড়ে না। পথের ধুলো-খড়-আস্তাকুড়ের আবর্জনা ঘরের ভিতর পর্যন্ত জোরজার ঢুকে পড়ে। খোলা বারান্দা আর গরাদহীন জানলার ফোকর দিয়ে।

চালাও বড় নিচু হাড়িরামের। কোলে ছাগল নিয়ে সে কুঁজো হয়ে বারান্দায় ওঠে। বৃষ্টি আটকাতে মাথায় জড়িয়েছিল গামছা। এখন সেই গামছার পাক খুলে ফের ছাগলের গলায় বেঁধে দেয়। বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে হাড়ি ডাকে তার বউকে, 'কুথা গেলি গো!' ঢিবির ওপর হাওয়ায় চিৎ হয়ে পড়ে থাকা দড়ির খাটটার দিকে তাকিয়ে সে বউকে দোষারোপ করে নিজেকেই শোনায়, 'দেখ্, আক্কেল দেখ্ মাঁএঞটার।'

পিছনের দেয়ালের গা থেকে হিমানী চটপট শুকনো ঘুঁটেগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছে। হাড়ির গলা পেয়ে বলে, 'যাছি যাছি।'

'আর বলে যাছি? আয় চাঁড়ে।'

'তিন দিন ল্যা শুঁকায় ঠনঠেনা হঁয়ে আছে। নাই উঠাব?' শুকনো ঘুঁটেগুলো বৃষ্টির আগে না তুলে নিলে? ভিজে সব বরবাদ হয়ে যাবে না?

বারান্দার কোণে ঝুড়ি উপুড় করে হিমানী, ঘুঁটের গাদায় ঘুঁটে মিলিয়ে দেয়। খাট তুলে সে হাড়ির পায়ের কাছে হড়াস করে পাতে। ছাগল-বাঁধা দড়ি তার হাতে দিয়ে বলে, 'দামে কিছু কমাল নাই? ঐ লি-ল?'

'কমাবেক? চুঁথিয়া টাকার জন্মা বঠে।' খাটের খুরায় ছাগলটা বেঁধে হাড়ি তার পিঠ ঝেড়ে দেয়। লোম ওড়ে। বয়স আর গা-গতরে কচি বলে চিকনাই আছে। ল্যাজের ডগায় লটকে থাকা বাবলা কাঁটাটা তুলে সে বলে, 'হামি কত করে বললি, আদিম ভাই, পাঁচ সেরের বেশি ইয়ার মাঁস হবেক নাই। ফির তুমার সঙে যখন ধারের কারবার নাই

তবে দুটাকা কমেই লাও? চুঁথিয়ার এক কথা। চার কুড়ি চার টাকার কম লিবেক নাই। — কই দে, ভাদ্ দে ভাদ্ দে।' খিদেয় পেট জ্বলে হাড়িরামের।

হিমানী ছাগলটার ঘাড়-গর্দান দেখে কুত করে। গায়ের মাংস খিমচে ধরে বলে, 'পাঁচ সেরের বেশিই জানাচ্ছে। হবেক-নাই?'

'আই দেখ্। পাঁচ সেরের বেশি হলেই হামি উয়াকে বলব ক্যানে? আচ্ছা বকা মাঁএ্র!'

হিমানী বোকা। বেচা-কেনার সে কী জানে? পাইকার যা ওজন বলবে হাড়িরাম অবশ্যই অপেক্ষাকৃত কম মাংস অনুমান করে দরাদরি চালাবে। আদিম আনসারি প্রথমে কী বলেছিল? নিট সাত সের মাঁস হবে। কেটে ফেলে দিলেই সওয়া'শ টাকা রকা! তবে সেই পাঁঠি তুমি শ টাকায় লিবে নাই ক্যানে হে?

হাড়ি জানে, কারবারিরা অমন ধাঁ-কে-সাঁ বলে। এবার তুমি কুত কর রে বাবু। কুত করা মানে হল, চোয়াল দেখে ঘাড় দেখে সেই অনুপাতে মাংসের পরিমাণ মালুম করা। হাড়ি বলেছিল, পাঁচ সেরের উপ্‌রে যাবেক নাই।

আখেরে ফয়সালা হল চার কুড়ি চারে। তবে?

'আগু খাঁইয়ে লি। বাদে বচসা হবেক।' ফোঁপরা পেট চোঁ চোঁ করছে। চৌকাঠে বসে কপাটে শরীর এলিয়ে বুকের নিচে সে আলগা হাত বোলায়।

অতটা পথ পায়দল করার ধকল তো আছে? কাড়িয়র যাওয়ার বাস নেই। তুলিন থেকে দক্ষিণমুখে নেমে ক্ষেত আর জঙ্গল মাড়িয়ে যেতে হয়। সেই সকালে বেরিয়ে এখন বেলা ডুবিয়ে যে মানুষ ঘরে ঢোকে, শরীর তার বেহাল হয়ে যাবে না? পেটটা দিন দিন পিঠের সঙ্গে লেপ্টে যাচ্ছে তার।

কাঁসার কানা-উঁচু থালাতে ভাত আর জলের ঘটি নামিয়ে দিল হিমানী, 'হাতে মুহে টুকু পানি লে, অঁ?'

'আর লিতে পারি।' ঘটি কাত করে সে ডান হাতে সামান্য জল নেয়। থালার কিনারে জল ছড়িয়ে আদেখলের মতো খেতে থাকে।

'কাঁথা-কানি মেলা আছে নাকি? উঠা উঠা। মেঘে ঘোর করে আসছে।' এঁটো হাত লম্বা করে সে মতিলালের চালার ওপারে প্রকাণ্ড কালো মেঘ প্রায় ধরে ফেলার ভঙ্গিতে হিমানীকে দেখায়, 'হি ডাগর দুয্যোগ। হুল-পাথরে ছ্যাচ্‌রা-ফুটা করে দিবেক।'

আগাম দুর্যোগ জানিয়ে রাখতে হাড়িরাম ভালবাসে। হিমানী ভাবে হয়ত তাই। হয়ত সারারাত মুষলধারে চলবে বৃষ্টি। হয়ত রাতভর শিলাবৃষ্টিতে ঘর-বাড়ি চাক্‌নাচুর করে দেবে।

হাড়ির কোনো ফিকির নেই। নতুন করে তার হারাবার কী আছে? না আছে বিশ-পঁচিশটা গাই-গরু, আবাদ করা চাষবাড়ি। তেমন শিলাবৃষ্টি হলেও বড়জোর চালটা চৌচির হয়ে যাবে। শুধু এই ছাগলটা কোলে পেটে আগলে রাখতে পারলেই হয়। খোলাখাপরা না হোক, ডালপালা দিয়ে আবার চালা বানাতে কতক্ষণ?

'আসুক। আসবেক নাই ক্যানে?' অনিবার্য লৌকিক ছড়া কাটে হাড়িরাম, 'কথায় বলে, চৈতে হুল-পাথর/বৈশাখে উথল-পাথল।'

মাঝরাতে প্রচন্ড বৃষ্টি।

কুপি জ্বেলে হিমানী দেখে চালা ফুটো হয়ে জল পড়ছে। কোথাও অনর্গল ধারা, কোথাও ফোঁটা-ফোঁটা। মাটির মেঝেতে গর্ত করে দিচ্ছে।

থালা-বাটি পাতে হিমানী। কিন্তু এমন মার-মার বর্ষা সে বাধা মানে? বাটি উপচে জল গড়িয়ে যাচ্ছে খাটের তলায়।

দুর্যোগ দেখতে দরজা খুলে দেয় হাড়ি। বাইরে জমাট অন্ধকার। মতিলালের টিনের চালার জল ছড়ছড় করে পড়ছে রাস্তায়। তল্লাট কাঁপানো বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির ঝাঁক তার মুখে ঝাপ্টা মেরে চলে যায়। প্রকৃতিকে এক কিস্তি গালাগাল করে হাড়ি স্বভাব-মাফিক চেঁচিয়ে ডাকে, 'কই শুনলি? ঘুঁটাগুলা ভিৎরাবি ন নাই, হ্যাঁ? সোব ভিজে গেল যে।'

হিমানীর সঙ্গে সে-ও হাত লাগায়। ঘুঁটে তুলে তুলে ঘরের ভেতরে গাদাগাদি করে রাখে।

বৃষ্টির ছাঁট খেয়ে মাঝ-ঘরের খুঁটোতে বাঁধা ছাগলটা ম্যাঁ-ম্যাঁ ডাকতে থাকে। নাকে সিকনি। খাটের নিচে বাসি কুসুম ডালটা জিভ দিয়ে টানার জন্য ছটপট করে সে। হাড়ি বলে, 'পাল্‌হা আছে ত দে দুটা। খাক।'

সবুজ পেচ্ছাপ আর নাদি পায়ে পায়ে মাড়িয়ে চারোতরফ ভরিয়ে দিয়েছে। দুর্গন্ধ তাদের নাকে লাগে না।

মেঝের কাদাজল ঝেঁটিয়ে চৌকাঠের দিকে ঠেলে দেয় হিমানী, 'ভিতর-বাহার সমান। জলের এমন বহি গেলে ঘরেও টেকা যাবেক কি করে?'

গম্ভীর হয়ে ওপরে তাকায় হাড়ি। ঘরামির দৃষ্টিতে সে দেখে মাথার ওপরে প্রচুর ঝুল। খোলার নিচের বাতায় উই ধরে চালা এখন বসে পড়ার সামিল।

কুপির আলো উঁচুতে তুলে হিমানী বলে, 'উঠবি নাকি?'

এক মুহূর্ত ভেবে নেয় হাড়ি। সারারাত কষ্ট পাওয়ার চেয়ে একবার চালায় উঠে যদি ফাটা খোলা কটা পাল্টে দেয় আপাতত নিশ্চিত। খাট পেতে রাতটা শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিতে পারে।

ছেঁড়া বস্তা ডোঙার মতো করে হাড়ি মাথায় পরে নেয়। পিঠও ঢেকে যায় তাতে। কাঁচা মাটির দেয়ালে পা ফসকে গেলেও সে সামলে উঠে যায়। ওপর থেকে বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে চিল্লায়, 'কন্‌খেনে গো?'

খাটের ওপর দাঁড়িয়ে কুপি হাতে হিমানী। ছোট লাঠি দিয়ে ফাটা খোলায় খোঁচা মারে, 'হি, এই ত। এহ্‌-এহ্‌-এইটা।'

ভাঙা খোলাটা ছুঁড়ে ফেলে হাড়ি। সেখানে বসিয়ে দেয় উঠোনে জমিয়ে রাখা পুরোনো খোলার একটি।

চালার মাথায়, ঝনঝমে বৃষ্টির মধ্যে হাড়িরাম, একটার পর একটা ভাঙা খোলা বদলে যায়।

ভোরের দিকে চোখ লেগেছিল। কপাটে ঠেস দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য সে ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালের আলো হাঁ করা মুখে পড়তেই সে গা ভাঙে। গোটা রাত দুর্যোগের পর একটা বিশুদ্ধ সকাল বড় আন্তরিক আর ঘনিষ্ঠ হয়ে তার কাছে আসে। সকালের ঠাণ্ডা বাতাস, জোড় গাছে কচি পাতার পিন-পিন কাঁপুনি, মাটির সোঁদা বাসের সঙ্গে একাকার ছাগলের নাদি-নদাড়ি-গু-মুতের দুর্গন্ধ— এইটুকুই হাড়ির নিজস্ব।

গেল রাতের প্রাকৃতিক উৎপাত তাকে সামান্যও বিপর্যস্ত করতে পারেনি। অতীত তার কাছে কোনো ঘটনা নয় স্মৃতিও নয়। পিঁচুটির চোখে সে, ছাইগাদার কাছে দাঁড়িয়ে, ডাইনে-বাঁয়ে অকৃপণ দৃষ্টি ফেলে।

পিচের রাস্তা আরো পরিচ্ছন্ন ও নিটোল হয়ে উঠেছে। সারি সারি খড়ের চালাগুলোর ছাঁচে এখনো টপ-টপ ঝরছে জল। মতিলালের উঁচু বারান্দায়, হাড়ি দেখে, দু-তিনটে কুকুর পরস্পর পেছনে চাটাচাটি করছে।

আর সে নিজে যে ঢিবিতে দাঁড়িয়ে, জলে তার পাঁশ ধুয়ে পোড়া কয়লার কুচি বেরিয়ে গেছে। পাতাহীন শুকনো কুসুমডাল, ছাগলের কবেকার রোঁয়ার গুচ্ছ, ময়লা আবর্জনা সব নালার মুখে জড়ো হয়েছে।

ঢিবিতে বসে হাড়ি, সেদিকেই তার গরম পেচ্ছাপ গড়িয়ে দেয়।

রোদ ওঠার আগেই দেয়ালে ভেজা কাঁথা-বস্তা মেলে রাখে হিমানী। খাট বের করে খাড়া করে দেয় রাস্তার ধারে। সেই খাটে বসে হাড়ি লম্বা আঁকশিটার ডগায় আলগা ফলাটা শক্ত করে বাঁধে সুতলি দড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। তারপর হিমানীকে কিছু না বলেই একহাতে আসমান ছোঁয়া আঁকশি আর অন্য হাতে দড়িসুদ্ধ ছাগল নিয়ে পাতপালা পাড়তে চলে যায়।

বাঁধের পাড় ধরে, তার পেছু পেছু যায় মতিলালের কুকুর।

কোমরে ডালা দুলিয়ে পাঁচু কামারের বউ এসে বসল। উঠোনে। খুঁট খুলতে খুলতে বলে, 'আনা চারেকের দে কুলু-বউ। শুখা-শুখা দিবি বাবা।'

হামার ঠিনে কবে ভিজা ঘুঁটা নিয়ে গেছিস গুরার মা?' শাড়ির আঁচলে ঘুঁটে এনে হিমানী তার সামনে ফেলে দেয়, 'এখন এই পাওয়াছে, এই বহুত। দুদিন বাদে ভিজা ঘুঁটাই পড়তে পাবেক নাই। আনায় তিনটা মাঙলেও নাই।'

বর্ষা আরেকটু জাঁকিয়ে নামলে দ্বিগুণ হবে ঘুঁটের দাম। গোরু-কাড়া রোজ গোঠে আসবে না। রাস্তার গোবর জলে ধুয়ে যাবে। তাছাড়া ঘুঁটে দেবে কোথায়? রোদ না উঠলে শুকোবেই বা কোন ভাটাতে?

গুরার মা মুখ বেঁকিয়ে দেয়। পাকানো নোট বের করলে হিমানী বলে, 'হামার ঠিনে খুচরা নাই ধন।'

'খুচরা নাই ক্যানে?' কুলু-বউকে রাগিয়ে দিতে সে বলে, 'ঝালদা থানায় বাটা পাছিস নকি?'

হিমানীর মুখ ভার দেখে তলপেটে লুকনো খুচরো তার হাতে দিয়ে বলে, 'ইবার শান্তি হল?'

যাবার সময় উঠোনে পড়ে থাকা টিনের কৌটোটা সে পায়ের আঙুলে তুলে ডালাতে ঢুকিয়ে নেয়।

ছুরি-বঁটির সঙ্গে একটু কুড়ুলও নামিয়ে দিয়ে হাড়িরাম বলে, 'পাইঝাও দেখি, পাঁচু ভাই। পাইঝাও।'

উনুন-শালে বসে হাপর টানতে টানতে পাঁচু ঘেমে উঠেছে। গলার ভাঁজে-ভাঁজে ভরপুর ময়লার সঙ্গে ঘাম টসটসিয়ে নামছে তার লোমশ ভুঁড়িতে। মুদ্রাবশে একবার ঘাড় কুঁচকে পাঁচু বলে, 'রাখে হরি ত মারে কে। হ্যাঁ হাড়িখুড়া, আজকাল তবে কুড়্হার দিয়েও পাঁঠি কাটার কাম হচ্ছে?' হাড়ির মুখের দিকে গম্ভীর হয়ে তাকিয়েই সে ফস্ করে হেসে ফেলে। সাথে সাথ নিতাইও।

পাঁচু নরম মানুষ। রসিকতা জানে। ছুরি-বঁটি দিয়ে ছাগল কাটাকাটি করে হাড়ি। মাসে-দুমাসে সেগুলো ভোঁতা লাগলে পাঁচুর কাছে পাঝিয়ে নেয়। আজ আচম্বিতে কুড়ুল দেখে কর্মকারের এই শ্লেষ।

হাড়ি বলে, 'কাঠ-মোট চালা করতে কুড়্হারের দরকার আছেই। বলি, শালে যখন যাছি ইটাও লিয়ে যাই। কী নিতা ভাই?'

'ঠিকেই্ করেছ। এক লম্বর কাম করেছ। আমার হিসাবে কী বলে জান?' নিতাই হালের টকটকে ফলা সাঁড়াশিতে উল্টেপাল্টে বলে, 'ঘরে অস্তর যখন আছে, আলবাৎ তাকে শানায় রাখ।'

'ক্যানে, ক্যানে?' প্রচুর আগ্রহ নিয়ে শুধায় পাঁচু।

'আহ, বিপদে-আপদে মানুইষ তুমার সঙ্গে থাকবেক নাই। অস্তরটা ত থাকবেক? বল, বঠে কি নাই?'

'এই?' কৌতূহল নিরসন হলে পাঁচু বলে, 'রাখে হরি ত মারে কে। কয়লা দাও।'

নিভন্ত আঁচে ফলা গুঁজে উঠে পড়ে নিতাই। টিনের ভেতর থেকে কুচি কয়লা মুঠোয় নিয়ে সে উনুনে দেয়। হাপরের শিকল টানে পাঁচু।

'তুলিনের ভিৎরে, বুঝলে পাঁচুদ্দা, হাড়িখুড়া আমাদে' সাহ্যাব মানুইষ', তর্জনীর ডগার বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে নিতাই দেখায়, 'আমার সনা-পকাটা যখন এৎটুকু ছিল, তখন লে দেখছি খুড়া পাঁঠি বিকছে। — পাঁঠি বিকেই একদিনকে দেখবে দালান বনাবেক।'

মাংসের পয়সায় বিল্ডিং ঠুকবে হাড়িরাম। তার ভাঙা খাপরার এক-খড়ের চালা ফেলে, মাটির ফাটা পাঁচিল ভেঙেচুরে মিশমার করে একদিন সেও বড় হবে। আজ যে হাতে সে পাঁঠি কাটছে, কসাইয়ের সেই কর্কশ নির্মম হাত জীবনের অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরে গিয়ে পাবে সভ্য মানুষের কোমলতা।

ছাই!

এইসব বুজরুকি আর ধড়িবাজি কথার অর্থ হাড়িরাম বোঝে না। বৃত্তি নিয়ে, জীবন-যাপন নিয়ে, সমাজে শ্রেণীগত ফারাক আর নিজস্ব দৈন্য নিয়ে আকুলি-বিকুলি তার নেই। এক কালে বাপ-চোদ্দপুরুষ তার ঘানি ঘুরাত। তখন এমন যত্র-তত্র পিষাইয়ের কল ছিল না, উপরন্তু সর্ষে কেনার পুঁজিও ছিল। আজ কী আছে তার? কী দিয়ে সে দুটো পেট পুষতে পারে? এই পেট পোষার জন্য তার পাঁঠি কাটা। আজ পাঁঠি কাটছে, দরকার হলে আগামী দিনে সে মানুষও কাটতে পারে। তবে কোনো কিছুর বিনিময়েই প্রাসাদবাসের অমন চতুর আসমানি মানসিকতা এই নিরীহ সঙ্কীর্ণ মানুষটিতে নেই।

বিদ্রূপ না প্রশংসা ধরতে না পেরে, নিতাইয়ের কথায় হাড়ি একটা ফাঁকা-ফাঁকা হাসি মুখে ছড়িয়ে বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। অনর্থক বসে থাকার অনিচ্ছা প্রকাশ করে বলে, 'কই, পাইঝাও?'

'হবেক হবেক।' পাঁচু শুধায়, 'এখন তাইলে বকরি আসছে কুথা থিকে?'

'হামার ত জানোই পাঁচু ভাই, মাহাজনের হামার ঠিক-ঠিকানা নাই। যার কাছেই দু-পসা সুবিস্তা পাই, তার ঠিনেই কিনি। ই-হাপ্তারটা আদিমের কাছ লে আইনেছি।'

'কাডিয়র লে? ক্যানে ঝালদার হাটে দু-দশ টাকা সস্তায় নাই মিলত?'

'তবে আর কী বলছি তুমাকে? টাকাই জগাড় করতে পারি নাই। আনুয়ার ভাই টাকা দিব দিব করে আখেরে বলল, লারছি কাকা।'

'রাখে হরি ত মারে কে। — তার বাদে?'

'কাল মৈৎলালের ঠিনে বহুত করে চার কুড়ি দশ টাকা নিয়েছি। আজ বিকে পুরাপুরি দিতে হবেক।'

মতিলাল বিড়ির পাতা কেনাবেচা করে। তার কাছে সময়-অসময়ে ধরনা দিলে হাড়ি কিছু পায়। যদিও ইনিয়ে-বিনিয়ে মতিলাল হরদম নিজেকে দরিদ্র বলে জানায়। শেষতক

কড়া শর্তে টাকা ছাড়তে কসুর করে না। বিশেষ করে হাড়িরাম, লুধু মুচি, এই-এই লোকের কাছে। যারা হাত পাতে ভিখিরি হয়ে, আবার সুদে-মূলে টাকা আপসও করে সসঙ্কোচে।

আজকের বিক্রি থেকে মতিলালকে হাতে-হাতে শ টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। শেয়াল-শুগনির পারা সে মাংস আগলে বসে থাকবে।

'ক্যানে, মনহর দারগা নাই দিছে?' নিতাই বলে, 'আগে-আগে যে উয়ার ঠিনেই হাওলাত লিতে?'

'ক্যানে নাই দিবেক? কিন্তুক উয়ার টাকা লিয়ে হামার পড়তা হবেক ক্যানে?' হাড়িরাম জানায়, 'শালার বহুত গরম। বলে চার কুড়ি দিয়ে পাঁচ কুড়ি লিব। —হ্যাঁ পাঁচুভাই, ইটা সম্ভব? তুমিয়েই বল হঁ? কুড়ি টাকা নাফা নাই কুড়ি টাকা সুদ দিব?'

হাপর টানার তালে পাঁচু শুধু এপাশ-ওপাশ থুতনি নাড়ে।

'আগে দু-একবাব না পারতকে নিয়েছি। এখন ধুর্ লে গড় করি। বলি তোর টাকা তোর ঠিনেই থাক।'

'গড় করবারেই বটে। দারগার টাকা।' নিতাই ঠাট্টা করে, 'আর নাইলে দু-পাঁচশ লিয়ে ফুটে দাও। কন্‌টোলের চাল-চিনি বেলেক্ করে দারগা বহুত কাময়ছে।'

পুলিসের রেশনের মাল তুলিনে মুদিদের কাছে বেশি দামে বিক্রি করে মনোহর। তাতে টাকার মালে তিন টাকা হয়। তার ওপর পুলিসে কাজ করে বলে হুমকি দিয়ে হাপ্তার হাটে গ্রামে-গ্রামে মাশুলও আদায় করে। হারামের রোজগার। হাড়িরাম এই ধান্দাবাজ লোকটার থেকে একটা মোটা টাকা ধার হিসেবে নিয়ে বেপাত্তা হয়ে গেলেই পারে?

নিতাইয়ের এমন দুঃসাহসিক প্রস্তাবে, পাঁচু জানায়, 'পুলিস-দারগা যে-সে লোক? কুকুর শুঁঙায় মানুইষ বার করাবেক।' পুলিসের এমন ক্ষমতায় পাঁচুই বিস্মিত হয় বেশি। হাড়িরাম নির্বিকার।

আগের প্রসঙ্গ টেনে নিতাই বলে, 'এখন তাইলে মৈৎলালের সঙেই লিয়াদিয়া? আর যদি হিসাবের টাকা ঘুরৎ দিতে না পার?'

'না পারি মানে? জবানের জবান!'

'আঃ, যদি-ই মনে কর কী দিতে— ভগবান না করুক— নাই পারলে? তবে?'

'তবে? হামি যেন পাঁঠিকে খিদি-খিদি করি, উ তেম্‌নেই হামার গায়ের মাঁস খিদি-খিদি করে লিবেক।'

লুঙ্গিটা নেংটির মতো করে এঁটে নিয়েছে।

ঝুলন্ত পাঁঠির সামনে ছুরি হাতে সে এখন বড় শানদার কারিগর। গোল করে টেংড়ির চামড়া কাটে, ছুরির আগা আলতো ডুবিয়ে। এমুড়ো-ওমুড়ো গেঞ্জি খোলার মতো সে চর্চর করে খুলে নিচ্ছে চামড়া। জানোয়ারটা টের পায় না তার চামড়াশূন্য দেহের প্রকাশ্য নগ্নতা।

আর হাড়িরাম? সে-রকমই নির্বোধ। হয়ত তার গায়ের চামড়াও এমনি নিপুণ কৌশলে কেউ অল্প অল্প করে খুলে নিচ্ছে। তার অজান্তেই।

ছাড়ানো চামড়ায় শেষ টান দিতেই মলদ্বার থেকে ঝুর-ঝুর করে পড়ে একগাদা নাদি।

মতিলাল অবাক। তাৎক্ষণিক অহিংসা আর গভীর অধ্যাত্ম ভাবনায় কাতর হয়ে বলে, 'জীবনের কী মাহাত্ম্য দেখ হাড়িভাই। বাঁচার কালে যা খাঁইয়েছিল মরার কালে সোব দিঁয়ে গেল!'

হাড়ি কান দেয় না। দেয়াল-কোলে চামড়াটা ছুঁড়ে বউকে বলে, 'কট্‌রাগুলা ফারাকে রাখ ক্যানে। সৈরা।'

মাটির ছ-সাত কোপটায় পাঁঠির রক্ত। এতক্ষণে জমাট হয়ে গেছে। কপালে ঘোমটা টেনে হিমানী সব সরিয়ে রাখে।

লধু এসে চামড়া তুলে নেয়। মাটিতে লম্বালম্বি বিছিয়ে বলে, 'তিরিশ ইঞ্চির বেশি হবেক নাই। লিবি কত হাড়িরাম?'

'তুঁইয়েই বল ন ভাই। আগু তোর দামটাই শুনি।'

'হামি? বলব?' লধু নিজের মনে বিড়বিড় করে নিয়ে বলে, 'দশ টাকার বেশি দিব নাই।'

'দিস না।'

'মানে?'

ছুরি থামিয়ে হাড়ি দেখে লধুকে। বিছানো চামড়ার দিকে ছুরি বাড়িয়ে বলে, 'মাপ দেখি। বার টাকার এক টিকলি কম হবেক নাই। লিবার আছে লে, নাই ত ভাগ্।'

'সাপা জবাব?'

'হু, সাপা জবাব।'

দরে কম করবার লোক হাড়ি নয়। তার বক্তব্য, ভেড়ার চামড়া কিনবে যাও পাঁচ টাকায় পাবে। আর ঐ মাপের চামড়া যদি খাসির হয়? পঁচিশ-তিরিশ টাকায় বেপারি লুপে নেবে। লধু মুচি চলে যাক, ফের কত-কত মুচি আসবে। খলিল আছে, গোবিন্দ আছে। তারা চামড়ার বেপারি। নুন মাখিয়ে দশ-বিশ রোজ মাল ফেলে রাখে। একদিন শহরে গিয়ে থোক বিক্রি করে আসে। বড় মহাজনের কাছে। কেউ কেউ আবার নিজেই মেহনত করে রোদে শুকিয়ে কেটে-কেটে কাজে লাগায়। তাতে শুখা-শুখির ঝামেলা থাকলেও তৈরি মালে পড়তা বেশি হয়। তবে? চামড়ার থোড়াই অবিক্রি আছে?

ফতুয়ার পাকিট থেকে গজ-সমান দড়ি বের করে লধু চামড়ার গায়ে ফেলে। বত্রিশ ইঞ্চির বেশি বই কম না। বারো টাকায় রাজি হয়ে সে পাকিটে হাত ঢোকায়।

মতিলাল বলে, 'দাও টাকা!'

বায়না করে লধু সাইকেল ঘুরিয়ে চলে যায় হাটে। সেখানে আরো কিছু যদি দরদস্তর করে পটিয়ে নিতে পারে। ঘুরতি পথে সব কটা মাল ক্যারিয়ারে বেঁধে সে গ্রামে ঢুকে যাবে। লধুর গ্রাম? ছোট বকন্দ।

ধুতি হাঁটুর কাছে টেনে মতিলাল গোড়ালির ভরে বসে। হাড়ির পাশে।

চামড়াটা টিবির ওপর ছড়িয়ে পেতে দিয়েছে। তাতে ডাঁই করা কাটা মাংস। একপাশে কোটরা।

কাঠের পিঁড়ি সামান্য পিছনে টেনে দাঁড়িপাল্লার পাক খুলে নেয় হাড়ি। গামছায় হাত মুছে কানে গুঁজে রাখা পোড়া বিড়ি বের করে ডাক দেয়, 'টুকু আগুনটা দিয়ে যাবে হে, ভাগবদ্দা।'

ভাগবৎ এলে, হাড়ি তার মুখের চুটি নিয়ে বিড়ি ধরিয়ে নেয়। লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া না ছেড়েই চোখ নাচায়, 'কেমন লাইগেছে?'

'হাট? নাহ্ সুবিধার লয়।'

'ক্যানে?' চাপা উদ্বেগ নিয়ে মতিলাল শুধায়।

'দিন-কে-দিন জিনিসপাতির দরেই বাড়ছে। কাঁহাতক মানুইষ্ খরিদ করতে পারে। বল্ ন ভালা?'

হাড়িরাম একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'কিন্তুক হামার জিনিসের দর কিন্তুক দেখ যে-কে সেই। আঠারকে আঠারই। দিব এক-আধ পুয়া? লিয়ে যাও র‍্যা ব ছ্যেলা-পালায় খাবেক।'

ভাগবতের কোনো আগ্রহ নেই। কোপটার দিকে থুতনি বাড়িয়ে বলে, 'আর রক্তবাটি?'

'ষাট প'সা। লাও লিবে ত আঠানায় দিঁয়ে দিব।'

মেঘ নামছে দেখে, সেই ছুতোয় ভাগবৎ চটপট চল্‌তা দিল।

খদ্দের আসে তারও পরে।

মাঝি-মাহাতান গোয়ালিনরা এসে নিজের হাতে বেছে মাংস পাল্লায় চাপায়। হাড়কাঁটা বাদে সবাই চায় নিট মাংস। এক পোয়া হোক আর আধ পোয়া হোক।

হাড়ি বলে, 'মাঁস-মাঁস বাইছে লিবি। আর হাড়গুলা কে লিবেক? চিবাব হামি?'

খদ্দেরের আদতই হল এই। আঁটি সে নেবে না, হরদম শাঁস চায়। তা বললে চলে? শেষে একগাদা হাড় যদি পড়ে থাকে কে কিনবে? ওজনের মালে লস্ খেয়ে যাবে না হাড়ি?

এমনিতেই সে এক ঘা ঠকে গেছে। পাঁঠিকে ঘিস-তিস খাইয়ে আদিম তার পেট ভারী করে রেখেছিল। সেটা মালুম করেও ওজন ঠিক-ঠাক ঠাওর করতে পারেনি হাড়ি। এখন রক্ত-টেংড়ি-ভুটি বাদে ছ'সেরের মাল সাড়ে পাঁচে দাঁড়িয়েছে। বুকটা তার গুপ্‌গুপ্ করছে।

এর ওপর মেঘের অবস্থা দেখ।

দু-এক ফোঁটা বৃষ্টির আভাস পেয়ে, মতিলাল, ভুরু কুঁচকে আকাশ দেখে। বলে, 'ভিংরা হাড়িভাই, ভিংরা এই বতর।'

ধুলা-গর্দা উড়ে আসে মাংসের গায়ে। জলদি জলদি তুলে নিয়ে তারা বারান্দায় বসে।

হিমানী বলে না কিছু। মহাজনের কাছে মাঁঞা মানুষ মুখ খুলবেই বা কেন? কারবারের ব্যাপার কারবারি পুরুষ বুঝুক।

হাড়ি বুঝেছে ঢের। ভাবনায় মুখ তার পাঁঠির মেটুলির মতো কালো হয়ে আসছে। যতটুকু বিক্রি হয়েছে তার গোটা নোটের হিসাব মতিলাল রেখেছে। কড়চে। পিঁড়ির তলায় খুচরো পয়সাগুলো দেখে হাড়ি বলে, 'ইস্ শ্লা ফ্যাচাং হয়ে গেল! ভোরখোর সময়ে মেঘ করে দিল?'

সত্যিই এটা তার চূড়ান্ত সময়। এখন হাওয়া-বাদলা মানেই বরবাদি। হাটের খদ্দের ভিড়-ভিড় করে পালাচ্ছে। ঝড় আসছে! গাঁয়ে ফিরতে-ফিরতে দুড়দাড় বারিশ নামবে তাদের মাথায়।

মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে মতিলাল বলে, 'তুমি মনে করে লাও হাড়িভাই— পাঁঠি যখন পড়ে গেছে বিক্‌রি তার হবেকেই। স্যা যতই দুয্‌যোগ আসুক!'

যদি না হয়? এই তিনচার কিলো মাংস নিয়ে সে কী করবে? বাসি মাংসই বা সে কার কাছে হাত জোড় করে ফেলে দেবে? কোথা থেকে পরিশোধ দিয়ে রাখবে সে জবানের জবান? মেঘের মতোই ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে আসে তার চিন্তা।

'হাড়িরাম! কুথা গেলি রে?' খাকি হাফপ্যান্টের সঙ্গে সাদা জামা গায়ে মনোহর। দেয়ালে সাইকেল ঠেসিয়ে বলে, 'দে, কী দিবি দে ত। — দুটু পঁন্দে-মুড়ে ধুলা ঢুকে গেল! দুহাতে এলোপাথাড়ি ঝাপটা দিয়ে সে ধুলো ঝাড়তে থাকে।

পাঁজরার হাড়গুলো থেকে মাংস ছাড়িয়ে হাড়িরাম তাদের গায়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নাড়িভুড়ি জড়ায়। তুখোড় সূচি-শিল্পীর মতো দ্রুত ফাঁস দিতে দিতে সে আড়চোখে মনোহরকে দেখে নেয়।

ঝাপ্টানি খেয়ে মনোহরের মাথার চুল এসে পড়েছে চওড়া কপালে। তাগড়াই চেহারার সঙ্গে খাপসই গোল মুখ, হাবিলদারসুলভ মাথার ছাঁচ, তার ওপর চুলের এই অবিন্যস্ততা— সব মিলিয়ে, হাড়িরামের তাকে মানুষ মনে হয় না।

জামার কাপড়ের প্রান্ত সরু করে পাকিয়ে অভিজাত ভঙ্গিতে সে নাকে ঢোকায়। তৃতীয়তম হাঁচির অপেক্ষায় মুখ বিকৃত রেখেও, হাঁচি নাহলে সে বলে, 'এই তুলিনের ভিৎরে, জানলে মতিলাল, হারামি লোকের তুমি অভাব পাবে নাই।' মতিলালকে বলার সুযোগ না দিয়ে সে নাগাড়ে শুনিয়ে যায়, 'গ্যানা হালদার হল এক্কের নম্বর হারামি। আজ তিন মাস হতে চলল দু টিন তেলের দাম পাছি নাই।'

'ক্যানে?'

'যখনি যাছি বলছে বিক্‌রি বাটা নাই', মতিলালকে গ্যানা হালদার ধরে নিয়ে মনোহর বলে, 'হ্যাঁ রে হারামি, বিক্‌রি-বাটা যদি নাই— দকান করেছিস ক্যানে? দুসরা লোককে ভাড়া দিঁয়ে দে?'

'ত কী বলছে— টাকা দিব নাই?' মতিলাল শুধায়।

'দিব নাই বলবেক? উয়ার বাপের হিম্মৎ আছে?'

'তবে?'

'ওই খিঁচায়-খিঁচায় দিছে। হাপ্তা-দুহাপ্তা বাদে লে দু টাকা লে পাঁচ টাকা! মনে করে যেমন দারগার মাল লদীর জলের ভাইসে আসছে।'

'ক্যানে নাই বলবেক?' মতিলাল ঠাট্টার ছলে খোঁচা দেয়, 'টাকার মাল তুমি কিনছ সিকার দরে। এমন চানোস্ যদি আমার মিলত তবে তুমার পারা আমিও লালে লাল বনে যাতি।'

'হঁ? হামি লালে লাল বনে গেছি? ফুট্!' সহাস্য মুখে ইচ্ছাকৃত বিরক্তি নিয়ে কথা পাল্টে দেয় মনোহর, 'কই হাড়িরাম! দে রে বাবু কী দিবিস? হাডভ্ডাওলাও কী মাঁসের দরে বিকাবেক?'

পিঁড়ির তল থেকে আধুলি বের করে হাড়িরাম বলে, 'ল্যান, ইয়ার বেশি আজ লারব। দেখছেন ত কী দুয্‌যোগ।'

'কী?' আদুলিটা মাংসের গাদায় ফেলে মনোহর খেঁকিয়ে ওঠে, 'ভিখ মাঙছি অ্যাঁ, ক-ন কী ভিক মাঙছি তোর ঠিনে?'

'ভিখ ক্যানে মাঙবেন? কিন্তুক আজ হামি দিতে লারব। কসম খাঁয়ে বলছি লারব।'

'লারব মানে?' মতিলালের দিকে সে চোখ পাকিয়ে শোনায়, 'কই, গটা হাটে দেখা দেখি কে মনোহরকে আঠানা দিল।'

'স্যা ত সোবেই বুঝছি। কিন্তুক না দিতে পারলে জুলুমে লিবেন?'

জুলুমের কথায় জ্বলে ওঠে মনোহর। দুটাকার এক পয়সা কম সে নেবে না। কিন্তু হাড়িরাম নিরুপায়। পায়ে চেপে রাখা বঁটি সরিয়ে মনোহরের কাছে প্রায় হাত জোড় করে, 'দু ঠ্যাঙা মারুন আইজ্ঞা, স্যা ভাল। কিন্তুক ইয়ার বেশি হামি কী করে দিব?'

মনোহরও নাছোড়বান্দা। কড়া হুশিয়ারি দিয়ে সে হাড়িকে দুর্বল করে দিতে চায়। আর আদায়ের ফিকিরে রাগ এবং উত্তেজনায় ভড়ং করতে করতে একসময় সত্যিই সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

'উঠা, উঠা সোব!' দাঁড়ি-পাল্লা মাংস লাথি মেরে মনোহর বলে, 'তোর কন্ বাপের এক্তিয়ারে তুঁই ঘরে বসে মাঁস বিকছিস? চল্ ঝালদা থানা।' কাঁধের গামছায় টান মেরে সে হাড়িকে বের করে। ছুটে আসে হিমানী।

'হেই হেই, ইটা কী করছেন! আহ্...' হাড়িরাম যাবে না। কেন যাবে? শরীরের ভারে পিছিয়ে ছাড়িয়ে নিতে চায় সে।

'কী করছি? চল্ সুগুম!' এক হাতে সাইকেল আর-এক হাতে হাড়িকে টানতে-টানতে মনোহর পিচ রাস্তায় ওঠে। মুখ খিঁচিয়ে বলে, 'হিট্ র‍্যা শালা!'

আংটার মতো জোরালো মনোহরের হাত। ছাড়াতে না পেরে গ্রামবাসীর মজ্জাগত আনুগত্য নিয়ে হাড়ি ফের বলে, 'কথাটা আগু শুনে ল্যান আইজ্ঞা। আমি কি দিব নাই বলেছি?'

এগিয়ে আসে মতিলাল। হাড়িকে আলগা ধমক দিয়ে বলে, 'ঝন্ঝট করলে কারবার চলে?'

আর ঝঞ্ঝাট করে মনোহরেরই বা ফায়দা কী? কী পাবে সে হাড়িকে এমন হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে? মাথা ঠাণ্ডা করে সে তৎক্ষণাৎ বলে, 'দু টাকা নাই পারবি ত দেড় টাকা দে রে বাবু? পাঁচ সিকাও দে?'

মতিলালের থেকে একটা নোট নিয়ে হাড়িরাম বাড়িয়ে দেয়, 'খুশি মনে ল্যান আইজ্ঞা।'

'হঁ-হঁ, ক্যানে লিবেক নাই?' আত্মীয়তার সুরে মতিলাল উপসংহার টানে, 'গাঁয়ে ঘরের ব্যাপার। ঝগড়া-ঝামেলায় কাজ হয়? আর বিকা-কিনার আবস্থা যদি স্যা-রকম থাকে, দুটাকা ক্যানে— পাঁচ টাকা দিলেও গায়ে বাজবেক নাই। কী হাড়িরাম?'

হাড়িরাম কিছু বলে না। দু-একটা খদ্দের দেখে সে দ্রুত বারান্দায় আসে।

চারপাশে অবিন্যস্ত ছুরি-বঁটি। মাংসের ডাঁই। কোথাও জমাট বাঁধা রক্তের ফোঁটা, কোথাও নাদি-পেচ্ছাব। এই সবের মাঝখানে, কাঠের পিঁড়িতে হাড়িরাম আবার দাঁড়িপাল্লা ধরে বসে।

কৃষ্ণযাত্রা

কুণালকিশোর ঘোষ

মন্দা একটা গান বলে ওঠে, 'শুক বলে আমার কৃষ্ণ বামেতে মদন...। মাদী গলা মেলায়, 'সারী বলে আমার রাধা থাকবে যতক্ষণ, নইলে কিসের মদন...! বৃন্দাবন বিলাসিনী।'

মন্দা মাদী দুজনেই গানের ভেতর হেসে ফেলে। গান শেষ হয় না। হাসতে হাসতে মাদী বলে, এ ক্যামুন গান! শ্যাষ জানেন না? শুধু দুইখান কথা। আর কিছু নাই?

— আর কিছু নাই— শুনে মন্দা মনে মনে গলগল করে, হাসে— কিছুই তো নেই। নাক, আঙুলের ডগা, চোকের প্যাখনা সব কেমন সট্ সট্ করে খসে গিয়ে নাই-নাই হয়ে গেল। মনের গলগল হাসির ভেতর থেকে মাদীর কথা ভেসে ভেসে উঠছিল, — এ গান আপনি শোনলেন কুথা থেকে? এমন আজিব গান কে গায়। শুধু দুইখান কথা!

মন্দা বলে, আহা গো!

সকলে এখন ওদের মন্দা-মাদী বলে ডাকে। ওরা তো নর-নারী। পুরুষ ও প্রকৃতি। সে কথা কারও কি মনে পড়ে! আজ সকালে ডাক্তারবাবু হোমের সুপারকে ডেকে বললেন, ও দুটোর ওপর খুব একটা নজরদারি করাব দরকার নেই। দেখবেন, বাউন্ডারির বাইরে যেন বেরিয়ে না যায়। লেপ্রোম্যাটাস টাইপ তো।

সুপার বললেন, স্যার, সব ঠিকই আছে। তবে মন্দার দুটো কিডনিই একেবারে ড্যামেজড্ বলেছিলেন, সে জন্যই কি ওটার চোখে ঘুম নেই? রাত বিরেতেও নাকি পুকুরঘাট আর ওই কদমগাছটার তলায় বসে থাকে, মাদীটাকে নিয়ে। রোদ্দুর দুপুরেও ওর ক্লান্তি নেই। দিনরাত এই বাউন্ডারির ভেতর টঙিয়ে যাচ্ছে। কী সব নাকি শাকপাতা গজাবে।

ডাক্তার নিজের মনে হাসলেন। ডাক্তারবাবুর ডিউটি শেষ। কড়া ওষুধের গন্ধ মাখানো লালচে রঙের সাবান দিয়ে কনুই পর্যন্ত হাত ধুয়ে মিটার ছাড়া অটোতে বসতে বসতে নিজের মনে বললেন, লেপ্রসিকেই ঠিকমতন বাগাতে পারলুম না, ইদানীং আবার এড্স নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে! ছোঃ।

অটোয় বসা ডাক্তারের বয়স ষাট ছুঁইছুঁই। ডাক্তার রায়ের স্নেহের পাত্র ছিলেন। মন দিয়ে ডাক্তারি শিখতে গিয়ে শাস্ত্রটা রপ্ত করেছিলেন বটে, টাকা রোজগারের ধান্ধাটা শিখে উঠতে পারেননি। তাই এ-বয়সে সবেধন নীলমণি তিন-পেয়ে নিজের ওই ফটফটিয়া অটো।

ফটফট শব্দ শুনে মাদী বলে, ডাক্তার আসছিল নাকি! আপনারে আমারে তো তলব করে নাই। আহা গো! উনি মানুষ লয়। রাস্তা থিকা আমারে উঠাইয়া আনছিলেন। তয় তো বাঁচি।

মন্দা ফিকফিক করে হেসে নেয়, এর নাম কি বাঁচা? দ্যালের গায়ের ফাঁক ফোঁকর দে তো বার-পিথিবী দেখা যায়। দেখোনি কোনদিন? মানুষগুলো কেমন গটগটিয়ে হাঁটা মারে। বাজার করে। থলে ভর্তি শাক কিনে নে যায়। দেখেছ? ঠিক যেন রাজামশায়?

গটগট করে অত কাজ করে তাও সব কেমন টানটান! আঙুল, নাক, চোকের প্যাখনা সব ঠিক আছে।

মন্দার নাক নেই। তা দেখে অন্য কুটেরা মজা করে, — নাক নাই তাই কফ নাই! সেই না থাকা পাটার পাসে ঘাম জমে। নাকবিহীন ফুটো থেকে সাপের হিসহিসানি শুনে মাদীর ভারি হাসি পায়। — আপনি তো দেখি ভারী দুখী! এত গোঁসা করেন ক্যান? গোঁসা কি আমাগো মানায়? বলতে বলতে মাদী, মন্দর পাশে ঘন হয়ে বসে।

টং টং টং করে ঘন্টা বাজে। দুপুরের খাবার ঘণ্টা। সানকিভরা ডাল লুচি মাংস সবজি, একটু টকটক গন্ধ, দেখে মন্দর ভারি আমোদ হয়। যেদিন যেমন জোটে। ঝুমঝুমি আর বাঁশি বাজিয়ে অন্যসব কুটেরা আজ বড্ড ভাল খাবার নিয়ে এসেছে। আজ যে ভিক্ষের দিন। টুপি প্যান্টলুন পরে, 'না-ছোঁয়াচে' কুটেরা সব খাবার এনেছে। নিশ্চয়ই বিয়ে বাড়ির বাসি খাবার। হোকনা বাসি। খাবার তো।

রাত আসে। শুনশান রাত। লেপারস্ হোম-এর রাতের ঘণ্টা অনেকক্ষণ আগে টং টং করে বলে দিয়েছে, — সবাই শুয়ে পড়ো। সবাই শুয়ে গেছে, কেবল আমাদের কুটে আর কুটুনি।

শুনশান রাতের ফ্যাটফ্যাটে চাঁদ এত্ত বড় টিপ হয়ে অনেকক্ষণ পরে আকাশের কপালের মধ্যিখানটায় সেঁটে বসে দেখল, — সবাই ঘুমিয়ে গেছে। কেবল এই দুটো কুট-কুটুনি। চোখে ঘুম নেই। সারা শরীর ভরা কত উৎসাহ! শরীর আর কি! হাত নাক প্রায় কিছু নেই। তাও কত লাফালাফি! কত ইচ্ছে!

পুকুরঘাটের ভাঙা সিঁড়ির ওপর চাঁদের আলো পড়ে কেমন যেন বায়োস্কোপ বায়োস্কোপ হয়ে যায়। টলটলে জল! ঢলঢলে ভাঙা সিঁড়ি। লাল লাল ভাঙা সিঁড়ির লাল ধুলো কুটুনি দু হাত ভবে তুলে নিয়ে..., হায়রে! পুরো হাত কোথায়? যতটুকু আছে! সেই আধ খাওয়া দু হাত দিয়ে লাল ধুলো তুলে নিয়ে কুটেকে বলে, আসেন। আমার পাশে আসেন। আপনারে বড় সাজাইতে মন চায়।

অনেক রাতের ফটফটিয়া চাঁদ দেখে, পুকুর ঘাটের ঢলঢলে ভাঙা সিঁড়ির ওপর, আকাশ পানে মুখ চেয়ে কুটে চুপটি করে বসে আছে। আর কুটেনি? তার এখন মস্ত কাজ। চুপটি করে থাকলে চলবে? ছেলেবেলায় দেখা পালা গানের নবাব সাজাবে কুটেকে। মাথায় তাজ বসানো মিছাকারের নবাব।

কুটের সারা মুখে লাল ধুলোর আস্তরণ। কুটেনি কুটের গালে পালাগানের পউডর মাখাতে মাখাতে বলে, আমার কুইট্টা সাহাবের নাকটা যান নবাব বাদশার পারা! কী ডাগর ডাগর আঁখ! হি হি হি...! ও কুইট্টা সাহাব, আপনারে আমি নবাবজাদা বানাইয়া দিমু। ঠ্যারেন ঠ্যারেন। ছট্‌ফট্ করেন ক্যান? গলার মালা, মাথার তাজ পিন্দানো হয় নাই।

কুড়িয়ে পাওয়া নারকেল দড়ির মালা কুটেনির হাতে মুক্তোমালা হয়ে কুটের গলায় ঝোলে। ছেঁড়া ফাটা গামছা পাকিয়ে কুটের মাথায় তাজ তৈরি করতে করতে কুটেনি গান গেয়ে ওঠে। গানের কথা ধরা যায় না। সুরটা বড্ড মনকেমন মাখানো। একই কথা বারবার গুনগুন করতে করতে কুটেনি তার কুটের মাথায় তাজ গড়ানো শেষ করে। দু চোখ ভরে কুটেকে দেখতে দেখতে বলে, ইডা মুর দ্যাশের গান।

কুটে ফিক্‌ফিক্ করে হেসে নেয়।

— তোমার দেশ কোথায়?

— অত কি আর জানি! তা গাঁয়ের নাম আছিল ইতনা। জিলার নাম যশোর। শুনছেন?

উত্তেজিত কুটে বলে, যশোর...! সে তো বাংলাদেশ! ঠিক বুয়েছি। তুমি মোছলমান! নাম কী?

কুটেনি এখন হি হি না হেসে, হা হা করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। — কুইট্টানির আবার নাম...! দ্যাশ! ছোঃ! ছোঃ! থুক ফেলি, থুক ফেলি। হাত পা সব আধখান আধখান, তা গো আবার নাম কিসির? মুর নাম আছিল মালেকা। ইখানে তো সকলে মাদিই কয়। আপনাব নামডা কি গো সাহাব?

পালাগানের পউডর মাখা মুখ, ছেঁড়া গামছার মুকুট আর কুড়ানো নারকোল দড়ির মালা পরা কুটে বলে, আমি সনাতন। সনাতন ঘরামী। মগরা হাটের অদ্যেক ঘর আমরা ছেয়েচি। বাপ কাকা আমি। আমার দাদুও ঘর ছাইত। এদানীং পাকা বাড়ির তোড়ে আমাদের কাজ গেছে। তাইতো শালা মদ্দা কুটে হয়ে ভিক্ষে দেওয়া মাংসও গপ্ কবে গিলে ফেলি। মগরা হাট ইস্টিশান চেনো? ড্যামনহারবার লাইনে যেতে হয়। কত গাছপালা গো.....! তুমি বিশ্বেস যাবে না। নিচু প্যায়রা সজনে সব ছিল। এদানীং স্রেফ পাকা বাড়ি। আট কেলাস অব্দি পড়িচি। বিশ্বাস যাবে?

মালেকা দেখে, সনাতনের ভাবি রাগ! পুরা বদন ভরা ছটপটানি। মস্করা করে গান ধরে, ও সাধের মিএগ গো..।

কুটে চোখ তুলে তাকায়। মালেকার গান বন্ধ হয়। এক্কেবারে বিয়ে করা পুরানো বউয়ের ঢঙে মালেকা ফিসফিস করে, বড় মন নিয়া, আপনারে সাজাইলাম। আপনি কিনা গোসা করেন! হায় আল্লা! এত্ত ছটপটানি ক্যান? আমাগো তো সব শ্যাষ।

মালেকার আধ-খাওয়া দুটো হাত সনাতনের মাথায় হাত-বোলায়। বড় বড় বুক দুটো কুটের খসা-ঠোঁটে ঘষ্টে গেল। গোপন লোভ! কুটে বলে, না মালেকা আর লয়। এবার চলো। ঘুমুতে হবি, না কি?

তারা দুজনেই জানে, তারা এখন দড়িছাড়া গরু। ঘুমোবার এত জায়গা, তাও তাদের চোখে ঘুম আসে না। কুটেনির অভিমান হয়। সিঁড়ির পাড় ছেড়ে যেতে যেতে বিড়বিড় করে, কেমন মরদ? জানে কোনো সাড় নাই! কুটেও মনে মনে কি এমন বলেছিল? — মালিকে, রাগ কোরোনি গো...। আদ খাওয়া অঙ্গ আমার। মনের লোভে বেইরে এসে যদি অশৌলি কিছু করি ফেলে? সে বড় পাপের কতা..!

এ ঠিক শহরতলি নয়। শহরতলির এক ঠেরে পাঁচিল ঘেরা এই 'হোম...'। মালিকবিহীন কুড়িয়ে পাওয়া এই মস্ত বাড়ির মালিকানা এখন সরকারের। সে নাম কা ওয়াস্তে। সরকারি সাহায্য যা পাওয়া যায় তা দিয়ে মাইনেপত্তর, খাওয়া-দাওয়া কুলোয় না। কুটে কুটেনির দল তাই নিয়ম মাফিক বাঁশি ঝুমঝুম নিয়ে শহরের রাস্তায় সাহায্যের হাত পাততে যায়। ভিক্ষে আর কি! এর তার দয়ায় "হোম" টিকে আছে। ডাক্তার আছে। সুপার। দু চারজন স্টাফ। কিছু নিয়ম কানুন। আর আছে আমাদের কুটে-কুটেনি।

কুটেনি বলে, পালকিখান ইখানে কেন বলেন তো! ইডাকি কুনো নবাবের ঘর আছিল?

কুটে হাসে, — তোমার মাতায় কেবল নবাব বাদশা! নিজেই তো বলেছ, ঘুঁটেকুড়ুনি ছিলে।

কুটেনি কলকল করে হাসে। বলে, গাই নাদলে ঘুইট্টা হয়। মুদের গাইও ছিলনি। ঘুইট্টাও লয়। বাবায় আছিল চাষা। তা জন্মেও চাষ করতি দেখি নাই। ভিক্ মাইঙ্গা দিন গুজরান...! হঠাৎ চুপ মেরে গিয়ে মাথার কাপড় ঠিক করতে করতে বলে, তা সেই পাপ! বোঝলেন কিনা? সেই গুনাহের বরদোয়া লাগছিল মুর শরীলে। হাতখান

ফোলে। পা খান ফোলে। হারামি হেকিম বলে, আগে লিয়ে এলে ইলাজ করে সারিয়ে দেতুম। মুর পিঠের এক ঠেরে ই শালার ব্যামো কামড় দিছিল। মু কি দেখতি পাই, লিজের পিঠ?

কুটে বলে, পাপ? কী পাপ করেছিলে?

কুটেনি চোখের ও-পাশে এ-পাশের দু চার ফোঁটা জল আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে বলে, পোড়া মাছ, লবণ আর কাঁচা মরিচের সাথে, খাইছেন? কী সোয়াদ! পানির মরশুমে ভিখ মাঙ্গা হাভাতের ঘরেও মাছ আসে। খাল বিলের দ্যাশতো...। মাছ গুলান য্যান লাফাইয়া লাফাইয়া গরিবের ঘরে ঢুইক্যা পড়ত। ত্যাল নাই। মশলা নাই। শুকনা কাঠ পাতার আঁচে মায়ের হাতের পোড়া মাছ! সাথে লবণ আর কাঁচা মরিচ। তার সোয়াদ এখনও জিব ভরাইয়া রাখে!

কুটে দেখে, কুটেনি ভারি সেয়ানা। পাপের কথা চাপা দিয়ে, পোড়ামাছ আর কাঁচা লঙ্কার গল্প ফেঁদেই চলেছে। টক করে মনে হয়, আহা গো! মেয়ে লোকটা এককেবারে গরিব-গুবরো ঘরের। বর্ষাকালে কুড়িয়ে পাওয়া মাছ, তাও পুড়িয়ে খেত! খুব প্রেমের গলায় বলে, হোকনা পোড়া, পোড়া, তাও তো মাছ খেতে পারতে। কি এমন হয়েছিল? মা বাবা সব ছেড়ে এ দেশে পালিয়ে এলে?

এ-দেশ ও-দেশের ফারাক মালেকার জানা নেই। খুব অবাক গলায় বলে, ই দ্যাশ, উ দ্যাশ ব্যাপারখ্যান কী বলেন তো? ঘর রাস্তা মানুষজন সব তো একই দ্যাখা যায়। তা একদিন..., — কুটেনি এবার কুটের মুখোমুখি হয়ে বলে, — বোঝলেন কি না..., একদিন দেখি কি..., মায়ে আমারে দেইখ্যা কাঁনতিছে! মায়ের আঁখ দিয়া পানি পড়ে। পড়শিরা মনে লয় মাইয়াটার লগে মায়ে কাঁনদে। কিন্তু তা লয়। আমি যে অন্য ব্যাপারখান দ্যাখছিলাম। আমি দেখি কি..., মায়ের দু আঁখ দিয়া ঘিন্না আর ভয় ফরফর কইরা বারায় আসতিছে। অনেক গুলান ভাইবুনের ঘরে এমন পাপের ব্যামো! তখন মুর নাকখান, আঙুলের ডগগুলান পাকা জামুনের পারা। টপ্ কইরা পড়নের বাকি। মাথাডা কেমন ঘুইরা গেল। সারা শরীরে য্যান ঘাম আসে। সেই সাঁঝের বেলায় পলাইলাম। যে পাপের ব্যামো মুর মায়ের আঁখে ভয় আনছিল, সেই ব্যামোই মুরে বাঁচাইয়া দিল।

বাঁচাইয়া দিল— শুনে কুটে ফিক্ করে হেসে ফেলে, মনে মনে বলে, এখনও বাঁচা...!

কুটেনি ফুঁসে ওঠে, — আপনি হাসতিছেন! কথাখান কিছু মিছা লয়। কুইট্টাখানির সকলেই ডরায়। সক্কলের লজরে সেই ঘিন্না আর ভয়। মুর দুধ দুইটা তখন ভর ভরান্ত। পাছায় ভারি গোস। তাও আমারে কেও খুবলায় নাই। আমারে কেও লজর মারে না, তাও ভিখ দেয়। ভিখের পয়সা কুড়োতি কুড়োতি ওই ডাক্তারসাহাবের লজরি পড়লাম। সি জন্যেই তো ইখানে আসা।

এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলে মালেকা ফক্ করে চুপ করে গেল। সনাতন এতক্ষণ ধরে একটা ছবি দেখল। অনেক লম্বা এক ছবি। অন্য দেশ। অন্য গাঁ। অন্য মেয়েছেলের দেখানো এক ছবি। তবুও নিজের সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল আছে। সেই গাঁ! সেই কুট! সেই ঘেন্না! নাক-ছাড়া নাক দিয়ে লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, দুঃখু করে লাভ নেই। তুমি আমি একই। আমিও তো কত কী ভেবেছিলুম। চায়ের দোকান দেব। সঙ্গে প্যাঁজবড়া, বেগুন বড়া, ফুলুরি বেচব। বাস রাস্তার গায়ে চালা ঘরও পেয়েছিলুম। কী হল? আমি নাকি কুটে। গোলদিঘি গাঁয়ের পাঁচটা লোকে বলে, — সনা, ভগমান যা করে মঙ্গলের জন্যি। বলে, এই যে তোর হাত পায়ের নোক খস্যে পড়ে গেচে, কত ভাগ্যির কতা! তা নালে গা-গতর চুলকাতি চুলকাতি লিজেকে অক্তাক্ত

করতিস। হারে ভগমান। এ নাকি ভাগ্যি! বলতে বলতে সনাতনের গলা কেমন মিইয়ে গেল। হঠাৎ চড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, দুর শালা...। চলো তো পুকুর জল দে পালকিটাকে মেজে ঘসে পরিষ্কার করি। দু ভায়রাভাই যে আসবে! তেনাদের বসতি দিতে হবে তো, না কি!

কুটেনি বলে, ভায়রাভাই কেমন মুনিষ? কইলেন না তো, ইখানে পালকি ক্যান?

সনাতন এককেবারে বিজ্ঞ পুরুষ বনে গিয়ে বানানো ভারি গলায় বললে, এ সব ড্যাঙ্গায় আগে বড়লোক বাবুদের ফুটানিমারা বাগানবাড়ি ছিল। লাচ-গান, পুকুরে চ্যান সব এক দ্যালের ভেতর। ওর ভেতরই কেউ শখ করে বোধহয় এমন শখের পালকি বাননে ছিল। কাঁচা পয়সার চুলকুনি আরকি। বুঝলে তো?

মালেকা কিছুই বোঝে না। অবাক গলায় বলে, পুকুরের পানি দিয়া পালকি সাফ করবেন! কিন্তু ক্যান? আপনার দু খান ভায়রাভাই কেমন মুনিষ কইলেন না তো? ভায়রাভাই কারে কন?

মগরাহাটে স্টেশনে নেমে হাঁটা পথে গাঁয়ের বাড়িতে ফেরার সময় সনাতনের ঠা ঠা হাসির শব্দ শোনা যেত। সে যেন কতকালের কথা! তখন বাস রাস্তার গায়ে সনাতনের চালাঘর রেডি হয়ে বসে আছে, পাঁজ বড়া ভাজবে বলে। সেই সব সকাল সন্ধ্যায় সনাতন খুব ঠা ঠা করত। — কোথা দে ফুড়ুৎ করে সব কেমন মিল্লে গেল..., ভাবতে ভাবতে মনে মনে বলে, — তা যাক। ক্ষেতি নেই। তবে শালা আমাকে এক্‌কেবারে খাবলে খুবলে দে গেল কেন বলো তো!

কার কাছে যে নালিশ করে, সনাতন নিজেই জানে না। তবে করে। ইদানীং প্রায়ই বিড়বিড় করে নালিশ জানায়। এখন, মালেকার কথায়, খুবলোনো নাক আর খাবলা মারা ঠোঁটের ভেতর দিয়ে প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করা হাসি হেসে বলল, দুর! আমার আবার ভাইরাভাই কী! বে'ই হয়নি। দু বুনের দুটো বর। হো লো তো? সেই বর দুটো কী হবে? অপর অপরের ভাইরাভাই কি না? এক ভায়রা আমার মেসো। অপরটা তোমার পিসে। ঠিক আছে? মালেকা আরও বোকা বনে যায়।

— মেসো! পিসে! সি গুলান আবার কি?

সনাতন হাসে। সেই প্যাঁক প্যাঁক শব্দমার্কা হাসি। মা জানো তো? মা? মায়ের বুন মাসি। আর সেই মাসির বর হল মেসো। বুয়েছ?

মালেকা ফিক্ করে বলে, খালু! তাই কন। তয় পিসে কী?

সনাতন বলে, আচ্ছা ঝামেলা তো! কতায় কতায় এত বুইজে বলা কি সোজা কতা? আমি কি গোলদিঘি ইস্কুলের মাস্টর? আরে বাপু, বাপের বুন হল কি না পিসি। আর সেই পিসির বর তো পিসে। এবার বুয়েছ?

মালেকা আবার ফিক্ করে— ফুফফা! খালু আর ফুফফা। তাই কন। আপনি তখন থিকা মেস মেস মেস আর পিস পিস পিস কী যে কন কিছুই বুঝি না। কইলেই হয়, খালু আর ফুফফা। কত্ত সহজ!

সনাতনের রাগ হয়। হঠাৎ রাগ। সেই রাগের গলায় বলে, নিজের মেসোকে আর পিসেকে, মেসো পিসে না বলে তোমার মত দাঁত ভাঙানি খাললু ফুল্লু বলতে আমার বয়ে গেছে।

মালেকা মনে মনে বাগিয়ে হাসল। মুখে বলে, আল্লা! আপনি দেখি গোসা করছেন। ওঠেন ওঠেন পালকি সাফ করবান না? কইলেন যে আপনার খালু আর ফুফফা আইবেন। আপনার খালু সাহেবের নামডা কি?

কুটে বলে, ভগমান। কুটেনি চমকে যায়।

— আর মুর ফুফফার?

— আল্লা।

— হায় আল্লা! কুটেনি বড় করে ঘোমটা টেনে চোখ বুজিয়ে ফেলে।

অনেক সময় নিয়ে পুকুর পাড়ে যায়। জল তোলে। খোবলা হাতে জল কি আর ওঠে? ওই আর কি। সেই জল দিয়ে পালকির গা কত আদরে মুছতে মুছতে কুটে বলে, জল দে ধবো। ফুল দে সাজাব। ঠিক যেন বে'র পালকি। আমাদের মেসো পিসে এলে, এই পালকি চড়িয়ে মাঠ ঘোরাবো, পুকুর দেখাব। কদমতলায় পালকি থাম্যে, গান শোনাব। ভগমানের গান। ওই যে তোমাকে সেই গান বলেছিলুম না...! বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের...।

কুটেনি হেসে হেসে মরে যায়। পুকুর পানিতে পালকি সাফ করবান, বেশ কথা। কিন্তু ফুল কোথা পাবেন? আপনি এমনধারা কথা কন য্যান সর্বক্ষণ আপনার আল্লারে দেখতি পাচ্ছেন।

সনাতন ধপ করে ঘাসের ওপর বসে পড়ে। মাথার ওপর কদমগাছটা ডাল নাড়িয়েই যাচ্ছে। তা দেখতে দেখতে বলে, ওপরে তাকালেই দেখতে পাবে। কত্ত ফুল যে এয়েচে! গুলটে গুলটে সবুজ রঙা সব কচি ফুল! গাছ ছে আছে। বর্ষা এলে দেখবে, রোঁয়া লাগা হলদে পানা। গাছ উপচে যায়। কী সুবাস গো...! তখন ওই গুলটেরা সব কদম হয়ে যায়। গাছে যদি দশ থাকে, নিচে তবে বিশ। সেই খসে পড়া কদম দে আমাদের পালকি সাজাবো। ভগমান ব'লে কতা! হেলা ফেলা করতি নেই গো! ভালোবাসতি জানতে হয়। তেমন করে ভালবাসলে তেনারা ছুটে আসেন।

কুটেনির গলায় এখন একদলা বিস্ময়।

— আপনি দ্যাখছেন? উনাদের ছুটাছুটি!

কুটে খুব নিশ্চিন্ত গলায় বলে, হ্যাঁ। কত্তবার। গরম করলে যেদিন গাছতলায় বসে একটু চোখ বুজুই তখনই তো দেখি। কালো রঙের কেষ্টঠাকুর সাদা গরুর পিঠে হাত রেখে কেমন মিঠেমিঠে মুকে আমার দিকে চে রয়েছেন।

মালেকার মনে পড়ে, — দ্যাখসি বটে! এমন একখান পুরানা ক্যালেন্ডার। আপিস ঘরের দেওয়ালে ঝোলে! উনিই নাকি কুইট্টার খালু! হায় গো! হঠাৎ কুটেনির বুকের ভেতর ভয়ের মেঘ করে আসে। ভালবাসার। সবই এই কুটের জন্য।

এমন— এমন শালার হড়হড়ানি বৃষ্টি জন্মেও দেখিনি। থামবার নাম নেই গো! শাবোন মাস শেষ হতি চল্ল। শালা হড়হড়িয়েই যাচ্ছে। পুকুর মাঠ সব একেকার করে ছাড়ছে। সব যেন কেমন হেজে যাচ্ছে। কেবল এ কদম গাছটা বাদ। কত ফুল ধরেছে রে বাপ! ছেঁড়া খোঁড়া একটা পড়ে-পাওয়া কম্বল দিয়ে নাক মাথা ঢাকতে ঢাকতে কুটে বিড়বিড়িয়ে উঠল। কুটে আজ সাতদিন পেচ্ছাপের রোগে বেঘোরে পড়ে আছে। দু চার দিন লালগুলি পেয়েছিল, তাতে ফল ফলেনি। কে জানে কেন, এক ঝটকায় পড়ে-পাওয়া কম্বল ঝেড়ে উঠে বসল। — বাপরে! গা গতরে কী বেতা! বলতে বলতে কুটে দেখল, — নিশ্চয় তবে ঘন রাত হয়েছে! আশপাশের সব কুটের দল ঘুমে যেন বেহুঁস!

পা টলছিল। কুছ পরোয়া নেই। টলা পা নিয়ে ঘরের বাইরে আসতে আসতে কুটে খুব সাফ গলায় বলল, — ওহে তোমার নামটা কি যেন? মালিকা! না। মল্লিকা! তাও তো নয়। মনে এয়েচে বটে! তুমি মালেকা। মালেকা। তা মালেকা আজ আমাদের খাল্লু

ফুল্লু আকাশ থেকে ছুটে এসে আমাদের সেই পালকিতে ঢুকে পড়বেন। মনে আছে তো? সেই যে বলেছিলুম, ভালবাসলেই ভগমান আসে। একদিন তাঁদের বড্ড ভালবেসেছিলুম। না এসে পারেন? তুমি কোতায়? মল্লিকা! কুটেনিবিবি। মালেকা। বলতে বলতে সনাতন ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

বৃষ্টি থেমেছে। চাঁদও একটা উঠেছিল। পুকুর ঘাটে গিয়ে দেখল, ঘাট ছুঁইছুঁই জল। চাঁদের আলোয় পুকুর জলের বড্ড শোভা...! কদমতলা ব্যতিরেকে সব চরাচর যেন ভাসতিচে! কুটের মনে হঠাৎ-আসা সুখ গুলিয়ে গুলিয়ে পাক মারছিল। একটা গান বলতে মন করছিল। কোনও সুর মনে এলো না। পাক মারা সুখেরা কুটের গলা টিপে আছে। কদমতলার আঁধার থেকে কে যেন বেরিয়ে আসছে! কুটের গা কাঁটা দিয়ে উঠল। — এমন চাঁদের জোছনায় তেনারা তো বড্ড বের হন না। গাঁ গঞ্জ হলে অন্য কতা— ভাবতে ভাবতে কুটে গলা খুলল, কে গা...? আঁধার থেকে জবাব এল, আপনার শরীরটা শুনি কাবু হইছে! তয় এই আঁধা রাতে ঘরের বার হইছেন ক্যান? বলতে বলতে কুটেনি কুটের শরীরের কাছে ঘন হয়ে এসে দু হাত দিয়ে জ্বর মাপতে লাগল।

কুটের শরীরে আজ কত বছর পরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। নাক আঙুল যখন ডুমো ডুমো হয়নি তখন ঘন ঘন এমন লেকটিকের খেলা হত। সারা শরীর জুড়ে। সে কি এ জন্মের কতা...? কুটে বলল, — মালেকা তোমার গা এমন গরম কেন? জ্বরে ধরেছে?

মালেকা বলে, — চুপ থাকেন। আপনার তো দেখি বদন ভরা বোখার। হাতে য্যান ছেঁকা লাগে।

কুটে আর কুটেনি। যতটুকু আছে, সেই খোবলা হাত নাক দিয়ে পরস্পরকে আদর করেই যাচ্ছে। কুটেনি ফিসফিস করে, — কতকাল য্যান আপনারে দেখি নাই। হা আল্লা!

কুটে আদর খেতে খেতে বলে, জ্বরের ঘোরে তোমাকে যে দেকলুম! তুমি কত পিরিত করছ! উঅ...উম...আই...ভগমান।

ভগবান আর আল্লা এক সময়ে এক হয়ে মিশে গেল। কুটের বিশ্বাস ছিল না সে এমন সব পারে। কুটেনিও কি জানত? এক নাগাড়ে উম উম শব্দ করতে করতে কুটে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলে, — কেউ নজর করছে নাকি? কাশির শব্দ শুনলাম যেন!

আরামের ঘুম পাওয়া জড়ানো গলায় কুটেনি বিড়বিড়িয়ে ওঠে, থামেন ক্যান! থামেন না। থামেন না। ও কার কাশি সেই জানে। আপনি থামেন ক্যান? এই রাতে এ দুইটা মিশকিনরে কে আর নজর করে?

কুটেনির কথায় কুটের ভয় কাটে। উম্ উম্ শব্দ বাড়াতে বাড়াতে বলে, — মিশকিন কি?

ওরা এত বছর পর এই প্রথম নারী-পুরুষ হল। ব্যাটাছেলে, মেয়েছেলে। ভালবাসাবাসি। কুটে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। পিঠের তলায় ভাঙা পুকুর ঘাট। ভিজে। কুটের সাড়ই নেই। বুকের ওপর কুটেনি। খোবলা দু হাতে কুটের মুখ ধরে আহ্লাদী করেই যাচ্ছে। — আপনি আমারে আজ মেয়ালোক বানায়লেন। ইডা যে এমন....! কুটেনির গলা ধরে এলো। ধরা গলায় বলে— আমার সেই গুণহার...! শুনবারে চান নাকি?

চিৎ হওয়া কুটে বলে, — হ্যাঁ।

মালেকা আরও ঘন হয়ে এসে, আরও আহ্লাদী করতে করতে বলে, — গরিব দ্যাখছেন? গরিব! এক্কেরে ভিক্‌মাঙ্গা যারে কয়। তো মোরা সেই গরিব। ঘরের চাল দিয়া কলের পানির পারা পানি পড়ে। চট চাটাই সব একসা। ভিইজ্যা গেছে যে...!

কুইট্যা সাহাব আপনি বিশ্বাস লিবেন না। কথাখান কিছু মিছা লয়। একখান ঘর। এত গুলান প্রাণী। রাতে বাপ মায়ের য্যান খেয়ালই নাই। কোন্ পোলাপানটা নিদ গেছে, কোন্টা যায় নাই। তখন মুর বয়স কত? দশ বারো? না কি আরও উচা। মায়ে যে সকাল সাঁঝ ঘ্যান ঘ্যানায়— বুকে কাপড় দে, বুকে কাপড় দে। হায় গো মা। প্যাটে দিবার চাউলই নাই, বদনের কাপড় মাগনা নাকি? সবই তো ঐ ভিখমাঙ্গা। চাউল, লবণ, মরিচ আর ফুটা ফাটা কাপড়। তা সেই সময়ে...! বোঝলেন? সেই ভিখমাঙ্গা রাত গুলায় দেখি কি... ! মায়ে বাপে দুজনই য্যান কেমন আহ্লাদী করেন। খেয়ালই নাই, আমি, বারো বৎসরের উঁচা মেয়া লোক, উই একখান ঘরের ভিতরেই ঠাসাঠাসি কইর‍্যা শুইয়া থাকি। বাপের-মায়ের আহ্লাদী সে কি দেখনের জিনিস। হায় গো আল্লা। হায়। হায়। সে যে কত বড় গুনহা। মালেকার কথা ফক্ করে নিভে যায়। আকাশের চাঁদ মালেকার লজ্জা ঢেকে নেবার ইচ্ছা নিয়ে কখন যে সরে গেছে এদের খেয়ালই নেই। অনেকক্ষণ বাদে চোখের জল মুছতে মুছতে বলে, — ইডা কি গুনাহ লয়? আপনি কন তো। মালেকার গলার স্বর কান্না সর্দিতে এক্কেবারে মাখামাখি।

শ্রাবণ রাতের ভরা আকাশের তলায়, বুকের ভেতর মালেকাকে নিয়ে শুয়ে থাকার ভেতরে সনাতনের সারা অঙ্গের খাবলা খুবলোগুলো কেমন ভরাট হয়ে আসছিল। পরিপূর্ণ একটা শরীর। নিটোল। এক্কেবারে নাড়ির ভেতর থেকে গভীর স্বর বার করে নিয়ে এসে সে বলল, — কোনটা পাপ আর কোনটা যে পুণ্যি, আমি যেন কেমন গুইলে ফেলেছি। সেদিন সুপারবাবু বললে, ওরে মন্দ, তোর লাগানো নটেশাক্ আব করলা সবাই খুব ভাল খেয়েছে। খুব ভাল। খুব ভাল। অপরের জন্যে কিছু করা বড় পুণ্যর কাজ। আমি কিছুই বুইতে পারলুম না। ডাক্তারবাবুর কাছে দানা চেয়েছিলুম। তা তিনি দেলেন। আম্মোও দানাও ছড়িয়ে গাচ বের করলুম। এর ভিতরি পুণ্যি এল কখন বলো তো? কেমন যেন গায়ে হাত বুলুনি কতা! আর এই যে এখন...! কতবাব নিজেকে বললুম— মালেকা বড্ড ভালো মেয়েছেলে। বড্ড দুঃখী। ওর কাছে মনের লোভ বার করে অশৈলি কিছু করিসনে বাপ আমার। তা কে কার কতা মান্য করে...। শুনলো আমাব কতা? এটা পাপ কিনা? তুমি বঁলো?

চোখ বোজা মালেকা বলে, — না। ইডা পাপ লয়, ইডা ছওয়াব। আপনে যে আমারে আজ মেয়াছেলা বানাইছেন! আপনে য্যান কি কইলেন? পাপ-পুণ্য? কুইট্টা সাহাব, পাপ-পুণ্য ভারী ওজনদার কথা। উয়াতে আমাগো কাম নাই। ওই পালকিডাবে ফুল দিয়া সাজাই। কইছিলেন না, আমাগো মিশ মিশ মিশ আর পিশ পিশ পিশরা আইবেন। চলেন। চলেন। মালেকার গলায় এখন কত জোর। ভালবাসার। আনন্দের।

পুকুরপাড় ছেড়ে দুজন পালকির দিকে চলল। আঁধার মাখানো ঢাউস কদমগাছটার তলায় এসে সনাতনের মাথায় এক চক্কর এলো। বোঁ বোঁ করা চক্কর। পড়েই যেত, মালেকা ঠিক সময়ে আঁকড়েছে। — কি হইল। কুইট্টা সাহাব, মাথা ঘোরে নাকি? এমন জ্বরে ঘরের বার হওয়া ঠিক হয় নাই।

এত আঁধারে কুটের চোখের আলো ঘুলিয়ে গেছে। কোন দূর থেকে কুটেনির কথা ভেসে আসছে। কিছু শুনলো। বেশিটাই শুনতে পায়নি। ঘোরলাগা জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করল, — কেমন বাস। তুমি পাচ্ছ। শাবন মাসের কদমফুল। সি কি যে সে কতা। পিথীবীর এ ফুল স্বপ্নের কেষ্টঠাকুরকেও ডেকে ডেকে নে আসে। কেমন সুবাস বলো। মালেকা দেখে— কুইট্টা সাহাব কেমন য্যান দফনে পা-রাখামানুষের মতন কথা কন।

আহা গো মালেকা! তোমার নিজেরও তো দফনে যাবার দাখিল। গত সাতদিনে কি খেয়েছ? ঘুসঘুস জ্বর তোমাকেও তো ধরেছে।

মাঝ রাত্তিরে এই ভিজে কদমতলায় ডাক্তারবাবু থাকলে বলতেন, বর্ষার পয়লা পাগল-পাগলি। সত্যিই তা। চাঁদের আলোর নিচে ও দুটো যেন বা বর্ষার প্রথম পাগল-পাগলি। একটা স্বর্গীয় পাগলামিতে বুঁদ হয়ে ওরা তখন। যদিও সেই ভাল ভাল কথা ওদের কোথাও নিয়ে যাবে না, তবুও কথাগুলো একটু ঝাড়-পোঁছ করে নিলে বোধহয় এ রকম কিছু দাঁড়াবে।

পুরুষ : পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর কি জিনিস বলো তো? পৃথিবী নিজেই। বুক ভরে ভালবাসা পুরে নাও, দেখবে পৃথিবীর সবকিছু কত সুন্দর! তোমাকে বলেছিলাম না তেমন করে ভালবাসার ডাক ডাকলে ভগবানও চলে আসে।

প্রকৃতি : এতদিন বুঝিনি। আজ বুঝলাম। ভালবাসায় আমি এখন পূর্ণ। তোমার ভগবানে আমি ভরে আছি। পাবো তো। তাঁর দেখা?

পুরুষ : নিশ্চয়ই পাবে। তুমি তো এখন ভালবাসায় ভরা! কত ভালবাসা দিলে। পেলে। দেখতে পাচ্ছ! আকাশ থেকে কেমন সোনার পথ এসে পড়েছে কদমগাছের মাথায়? ওই সোনার পথ বেয়ে সোনার রথে চড়ে আমার সোনার ঠাকুর আসছেন! দেখতে পাচ্ছ? দেখ? দেখ?

প্রকৃতি: আমি এতক্ষণ পাইনি। সব যেন কেমন নরম কুয়াশায় ঢাকা ছিল। যে মুহূর্তে তোমাকে ছুঁলাম সব কেমন উদ্ভাসিত হয়ে গেল! ওই তো সোনার পথ। সোনার রথ। এত আলো। এত সুগন্ধ। আর একবার দাও না, সেই ভালবাসা! পৃথিবী কত সুন্দর।

এই সুন্দর পৃথিবীর বুকে, কোনা এক কদমগাছের তলায় আধ-খাওয়া দুটো কুচ্ছিৎ কুটে-কুটুনি যখন ভালবাসাবাসির দেওয়া-নেওয়া করেই যাচ্ছিল তখন টুপ করে চাঁদ ঢেকে গিয়ে শ্রাবণের কালো আকাশ বেরিয়ে এলো। বৃষ্টি। একরাশ বৃষ্টির ভেতর হঠাৎ কুটের হাত পা থেমে যেতে কুটেনি বলল— কুইট্টা সাহাব, জোর দিয়া ধরেন। কী হইল! কী হইল! কী হইল!! ও কুইট্টা সাহাব, কথা কন না ক্যান?

ব্যাপারটা বুঝতে একটুকুও সময় লাগেনি, তার ভেতরই কুটেনির গলা চিরে একটা তীক্ষ্ণ হাহাকার বেরিয়ে এসেছিল, — না...! আপনে যে আমার শেষ সম্বল..., আমি আপনারে ছাড়বারে পারুম না। এত ঝড় জলে সে চিৎকার কারও কানে যাবার কথা নয়।

পরদিন ভোর ভোর সকালে হোম সুপার ডাক্তারবাবুকে ফোন করে বললেন, স্যার, কাল রাত্তিরে ওই ঝড়জলে গাছতলাতে ছিল! পাগল আর কাকে বলে। মাদিটার সাহসের বলিহারি! সারা রাত্তির ওই মড়া জড়িয়ে..., আপনি নিজে এসেই দেখতে পাবেন, ঠিক যেন সাপিনী। কামড়া-কামড়ি করে ঘাসে শুয়ে রয়েছে।

লেখক-পরিচিতি

(বয়সানুক্রমিক)

অষ্টম খণ্ড

দীপঙ্কর দাস ঃ জন্ম : ১৯৪৮ ; কলকাতা। পেশা : চাকুরি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ . দীপঙ্কর দাসের গল্প, সাঁকো, এক জন্মের ঋণ, ভগ্নস্তূপ পেরিয়ে, মরুজ্যোৎস্না ইত্যাদি।

হুমায়ূন আহমেদ ঃ জন্ম : ১৯৪৮ ; নেত্রকোণা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : আগুনেব পরশমণি, এই সব দিনরাত্রি, অন্যভুবন, ময়ূরাক্ষী, অমানুষ শতাধিক উপন্যাস ও গল্পসমগ্র ইত্যাদি।

দুলাল ঘোষ ঃ জন্ম : ১৯৪৯ , জম্মু। পেশা : চাকুরে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ · সমপরিমাণ মাটি, হেই সঞ্জীব ইত্যাদি।

শিবতোষ ঘোষ ঃ জন্ম : ১৯৪৯ ; মেদিনীপুর। পেশা : সাংবাদিকতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : খেলনাপাতি, বুকের ছবি ইত্যাদি।

নবকুমার বসু ঃ জন্ম : ১৯৪৯ ; ২৪ পরগণা। পেশা : চিকিৎসক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : গল্প গল্প, ক্রমশ মুখ, ছবির বাড়ী, মানব সাগর সংগমে ইত্যাদি।

শচীন দাশ ঃ জন্ম : ১৯৫০ ; কলকাতা। পেশা : চাকরি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : বনবিবির বাওয়ালী, চোখ, রক্তের স্বভাব ইত্যাদি।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য ঃ জন্ম : ১৯৫০ ; ভাগলপুর। পেশা : চাকরি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : রূপকথার জন্ম, হেমন্তের পাখি, যখন যুদ্ধ, এই মায়া, কাঁচের দেওয়াল, কাছের মানুষ।

জয়া মিত্র ঃ জন্ম : ১৯৫০ ; ধানবাদ। পেশা : অধ্যাপনা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : হন্যমান, আত্মকথা, একটি উপকথার জমি, স্বর্ণকমলের চিহ্ন, প্রত্নপ্রস্তরের গান ইত্যাদি।

দেবব্রত দেব ঃ জন্ম : ১৯৫০ , আগরতলা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : স্বতন্ত্র সূর্যোদয়, মাটি এবং অন্যান্য প্রকল্প ইত্যাদি।

সুব্রত মুখোপাধ্যায় ঃ জন্ম : ১৯৫০ ; চব্বিশ পরগণা। পেশা : চাকরি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : যে দেশেতে রজনী নাই, রসিক, সন্ত্রাস, চরমপত্র ইত্যাদি।

রাধানাথ মণ্ডল ঃ জন্ম : ১৯৫০ ; মেদিনীপুর। পেশা : সাংবাদিকতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : অমিতাভ অথবা সে নয়, আটঘরার মহিম হালদার, পদক্ষেপ ইত্যাদি।

জগন্নাথ প্রামাণিক ঃ জন্ম : ১৯৫০ ; মেদিনীপুরে। পেশা : লেখালেখি ও প্রকাশনা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : শিলাবতীর তীরে তীরে, নষ্ট চাঁদ, উড়োকাক, কাঁচের ঘর, চিত্তচরিত্র, পৃথিবীর উল্টোমুখে, শামুক ও অন্যান্য গল্প ইত্যাদি।

অসীম ত্রিবেদী ঃ জন্ম : ১৯৫০। উত্তর চব্বিশ পরগনার শ্রীকৃষ্ণপুরে। পেশা : চাকরি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : অবেলার গল্প, বর্ণপরিচয় ইত্যাদি।

অমর মিত্র ঃ জন্ম : ১৯৫১ ; বাংলাদেশের খুলনা জেলার সাতক্ষীরায়। পেশা : চাকরি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : মাঠ ভাঙে কালপুরুষ, দানপত্র, আসনবনি, সমাবেশ, ভি. আই. পি. রোড, অমর মিত্রের ছোটগল্প, সুবর্ণরেখা, আলোকবর্ষ ইত্যাদি।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী ঃ জন্ম : ১৯৫১ ; কলকাতায়। পেশা : আকাশবাণীতে কর্মরত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ — ভূমিসূত্র, অষ্টচরণ ষোলো হাঁটু, জার্সি গোরুর উল্টো বোচ্চা, ভিডিও ভগবান নকুলদানা, চতুষ্পাঠী, নবমপর্ব, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্প ইত্যাদি।

মানব চক্রবর্তী ঃ জন্ম : ১৯৫১ ; জামসেদপুর। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : কুশ, আগুনের কুয়োতলা, ওয়াগুারের মৃত্যু ইত্যাদি।

বীরেন শাসমল ঃ জন্ম : ১৯৫১ ; মেদিনীপুরে। পেশা : চাকরি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : গ্রামনগরের গল্প, পানপাতা মুখ, সাদ্দামের জন্য বাঙ্কার কবির জন্য তাকিয়া, আঁধিগ্রামে আলো, ধ্বংসকালীন গান ইত্যাদি।

নলিনী বেরা ঃ জন্ম : ১৯৫১; পেশা : চাকরি ও সাহিত্যচর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ভাসান, এই এই লোকগুলো, ইরিনা ও সুধন্যরা, অপৌরুষেয়, শঙ্করপুরাণ ইত্যাদি।

আবুল বাশার ঃ জন্ম : ১৯৫১ ; হাসনাপুরে। পেশা : সাংবাদিকতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : অন্য নক্সী, অগ্নিবলাকা, নির্বাচিত গল্প, ফুল বৌ ইত্যাদি।

কঙ্কাবতী দত্ত ঃ জন্ম : ১৯৫১ ; কলকাতায়। পেশা : সাহিত্যচর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : অথচ জীবন, তরুণী সংবাদ, যখন দ্বিতীয় বোতাম খোলা ইত্যাদি।

সুকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঃ জন্ম : ১৯৫১ ; কলকাতায়। পেশা : চিকিৎসক।

সুদর্শন সেনশর্মা ঃ জন্ম : ১৯৫১ ; অশোকনগরে। পেশা : চিকিৎসক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : চিত্রকরের ডানহাত, ভালোবাসার ডালপালা, মধ্যদিনের গান ইত্যাদি।

সুতপন চট্টোপাধ্যায় ঃ জন্ম : ১৯৫২ ; হুগলী। পেশা : চাকরি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : বুকের ছবি, ক্ষতমুখ, সুখ অসুখ ইত্যাদি।

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ জন্ম : ১৯৫২ ; কলকাতায়। পেশা : চাকরি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ললিত সাঁতরার সম্পত্তি লুঠ, মন্ত্রে মুখ যন্ত্রণায় পা ইত্যাদি।

শ্যামল মজুমদার ঃ জন্ম : ১৯৫২ ; কলকাতায়। পেশা : চাকরি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : প্র্যাকটিস চলছে, আকাশের যুবরাজ, মাঝখানের চারাগাছ, নিজের কাছে ইত্যাদি।

শৈলেন চৌধুরী ঃ জন্ম : ১৯৫২ ; বাংলাদেশ। পেশা : সাহিত্যচর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : গগনরাম ছুটছে, পদযাত্রা, ফেরা ইত্যাদি।

সোমক দাস ঃ জন্ম : ১৯৫৩ ; পেশা : সাহিত্যচর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : অনাবৃত শিলালিপি, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, সোমক দাসের ছোটোগল্প ইত্যাদি।

সনৎ বসু ঃ জন্ম : ১৯৫৩ ; বর্ধমানে। পেশা : চাকরি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : যুদ্ধ, শহিদের মা, হাঙর, মুখোশের মুখ, জেগে ওঠো শুদ্ধ বিবেক ইত্যাদি।

কিন্নর রায় ঃ জন্ম : ১৯৫৩ ; কলকাতার চেতলায়। পেশা : সাহিত্যচর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : রথযাত্রা, প্রকৃতিপাঠ, যক্ষ, মেঘপাতাল, ধর্মসংকট, কুরোশাওয়া ভিজে যাচ্ছে, এন্টারটেইনমেন্ট আওয়ার, অরূপকথা, যে লেখার সিরিয়াল হয় না, সংঘর্ষ, কিন্নর রায়ের ছোটগল্প, অন্য ধারার গল্প ইত্যাদি।

সুদেবসুন্দর মুখোপাধ্যায় ঃ জন্ম : ১৯৫৩ ; পেশা : সাহিত্যচর্চা।

অশোককুমার কুণ্ডু ঃ জন্ম : ১৯৫৩ ; পেশা : সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : গাঁওভাটি, শিশুসাহিত্য সংগ্রহ, প্রবাসের চিঠি মাকে ইত্যাদি।

ঋতুপর্ণ বিশ্বাস ঃ জন্ম : ১৯৫৩ ; পলতা। পেশা : চাকরী। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : সায়ং সম্পর্ক, সিপাহ্‌সলার কিম্বা কাটা সেপাইয়ের গল্প, চিল ইত্যাদি।

নজরুল ইস্‌লাম ঃ জন্ম : ১৯৫৩ ; পেশা : চাকরী, সাহিত্যচর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, অসুখ, পদ্ধতি ইত্যাদি।

মঞ্জু সরকার ঃ জন্ম : ১৯৫৩ ; রঙপুর। পেশা : সাহিত্যচর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : অবিনাশী আয়োজন, মৃত্যুবাণ, পুরাতন প্রেম ও অন্যান্য গল্প, আনন্দযাত্রা, অপারেশন জয়বাংলা, তমস, নগ্ন আগন্তুক, প্রতিমা উপাখ্যান, দাঁড়াবার জায়গা, আবাস ভূমি, স্বপ্নচোর ইত্যাদি।

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জন্ম : ১৯৫৪ ; কলকাতায়। পেশা : শিক্ষকতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : উটপাখি, অন্য জীবন, স্বদেশ কথা ও অন্যান্য গল্প, শরীরিণী ও কয়েকটি গল্প ইত্যাদি।

মোহিত রায় ঃ জন্ম : ১৯৫৪ ; নৈহাটিতে। পেশা : চাকরি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : মহাদেব নায়েক ও অন্যান্য গল্প, একটি অবধারিত মৃত্যুর ধারা-বিবরণী ইত্যাদি।

সৈকত রক্ষিতঃ জন্ম : ১৯৫৪ ; পুরুলিয়া। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : আকরিক, আরামচেয়ার, জন্মভূমি, বধ্যভূমি, ইত্যাদি।

কুণালকিশোর ঘোষ ঃ জন্ম : ১৯৫৪। পেশা : চাকরি ও সাহিত্যচর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : সেই সুধারস ও অন্যান্য গল্প।
